প্রথম খণ্ড

গোলাম মোস্তফা

নূতন দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৩

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
৬, এ্যান্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী : খালেদ চৌধুরী

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

মদিনা বুক ডিপো
২৮, কোয়ার চিৎপুর রোড
কলিকাতা-১

পুস্তকালয়
এ ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

ভারত সাহিত্য কুটীর
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

ওসমানিয়া লাইব্রেরী
৩০, মদন মোহন বর্মন ষ্ট্রীট
(মেছুয়াবাজার) কলিকাতা-৭

আম্মা ও আব্বার

খিদমতে

নূতন ভারতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বিশ্বনবী'র নূতন ভারতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া আজ শুধু বারে বারে আল্লাহ্‌তা'লার করুণার কথাই মনে পড়িতেছে। কোন পুস্তকের আটটি সংস্করণের ভূমিকা লিখিবার সৌভাগ্য খুব কম লেখকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

এই সংস্করণের আগাগোড়া এবার আমি দেখিয়া দিয়াছি, স্থানে স্থানে কিছু কিছু সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছি। কিছু কিছু নূতন তথ্যও সংযোজিত হইয়াছে।

গতবার পুস্তকের জ্যাকেট না দেওয়ায় অনেকেই ক্ষুন্ন হইয়াছিলেন। এবার সে অভাব পূর্ণ করা হইল। মুদ্রণ-পারিপাট্যও পূর্বাপেক্ষা এবার উন্নত হইয়াছে।

বিশ্বনবীর অনেক স্থানে কুরআন শরীফের আয়াত উদ্ধৃত করা হইয়াছে : মূল আরবী আয়াত না দিয়া শুধু বাংলা তর্জমা দিয়াছি। সেই সব তর্জমার কোন কোন স্থানে আল্লাহ্ সম্বন্ধে 'আমরা' (বহুবচন) ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন :

> "এবং যে কেহ এই দুনিয়ার পুরস্কার চায়, তাহাকে **আমরা** তাহাই দেই এবং যে কেহই পরকালের পুরস্কার চায়, তাহাকেও আমরা তাহাই দেই। আমরা কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিব।" —(৩ : ১৪৪)

এখানে আল্লার পরিবর্তে 'আমরা' শব্দের ব্যবহার দেখিয়া অনেক পাঠকের মনেই প্রশ্ন জাগে। তাঁহারা ভাবেন : আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয় ও লা-শরীক ; কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে 'আমরা' (বহুবচন) ব্যবহার করা যাইতে পারে না। তাই অনেকের ধারণা ইহা তর্জমার ভুল। কিন্তু তর্জমায় কোন ভুল হয় নাই। তর্জমা ঠিকই আছে। অন্য একটি গূঢ় কারণে 'আমি' স্থলে 'আমরা' লিখিতে হইয়াছে। আরবী ভাষায় সম্মানীয় ব্যক্তিদিগের বেলায় বহুবচন ব্যবহৃত হয়। ইহাকে সম্মানার্থে বহুবচন বলে। অন্যান্য ভাষাতেও এ বাক্-রীতি প্রচলিত আছে। কোন রাজকীয় ঘোষণায় সম্রাট, সম্রাজ্ঞী বা রাষ্ট্রপতি উত্তম পুরুষের বহুবচন (আমরা) ব্যবহার করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রের (Queen's Proclamation) উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে 'We' (আমরা) ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই রীতি কুরআন শরীফের নিজস্ব। আল্লাহ্ নিজেই এই বাচন-ভংগী শিক্ষা দিয়াছেন। 'আমি'

না বলিয়া 'আমরা' বলিয়াছেন। কাজেই, তর্জমার ভুল হইয়াছে—পাঠক যেন সেরূপ মনে না করেন। মূলে বহুবচন আছে বলিয়াই তর্জমাতেও বহুবচন আসিয়াছে। উপরের আয়াতের ইংরাজী তর্জমাতেও 'We' শব্দ আছে :

"And whoever desires the reward of this world We will give him of it and whoever desires the reward of the hereafter, We will give him of it, and We will reward the grateful."

—Moulana Muhammad Ali

আল্লামা ইউসুফ আলি একই রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। উপরোক্ত আয়াতের অনুবাদে তিনি লিখিতেছেন :

"If any do desire a reward in this life,

We shall give it to him……".

বস্তুতঃ অনুবাদ ঠিক রাখিতে হইলে মূলের সহিত তাহার মিল রাখিতেই হইবে। বলা বাহুল্য, এই কারণেই বাংলা তর্জমায় আল্লার স্থানে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে।

বহু সতর্কতা সত্ত্বেও এবারেও কিছু কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গেল। তবে সেগুলি বিশেষ মারাত্মক নয়। পাঠক-পাঠিকা সেগুলি নিজেরাই সংশোধন করিয়া লইবেন। আরয ইতি—

বিনীত

গোলাম মোস্তফা

প্রকাশকের নিবেদন

অনেক চেষ্টার পরে বহু আকাঙ্ক্ষিত 'বিশ্বনবী'র তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল। 'বিশ্বনবী'র পুরাতন সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় গ্রন্থকার এই পুস্তকের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নূতন করে করেন ; তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'বিশ্বনবী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল।

আশা করি বহুদিনের অদম্য পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল এই 'বিশ্বনবী' পড়ে হযরত মুহম্মদ ও ইসলামধর্ম সম্বন্ধে পাঠকের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। সাফল্য ও অসাফল্যের বিচার পাঠকবর্গই করবেন।

কাগজের মূল্য ও মুদ্রণজনিত অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বইয়ের দাম সঙ্গত কারণেই বাড়াতে বাধ্য হলাম। যাঁরা এই কাজে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সূচীপত্র

(প্রথম খণ্ড)

(দ্বিতীয় খণ্ড)

পরিচ্ছেদ : ১

আবির্ভাব

রবিউল্-আউয়াল মাসের বারো তারিখ।

সোমবার।

শুক্লা-দ্বাদশীর অপূর্ণ-চাঁদ সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে। সুব্‌হে-সাদিকের স্বর্থ নূরে পুব-আসমান্ রাঙা হইয়া উঠিতেছে। আলো-আঁধারের দোল খাইয়া ঘুমন্ত প্রকৃতি আঁখি মেলিতেছে।

বিশ্ব-জগত আজ নীরব। নিখিল সৃষ্টির অন্তর-তলে কি-যেন-একটা অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার বেদনা রহিয়া রহিয়া হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। কোন্ স্বপ্নসাধ আজও যেন তার মিটে নাই। যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত সেই নিরাশার বেদনা আজ যেন জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আরবের মরু-দিগন্তে মক্কা-নগরীর এক নিভৃত কুটীরে একটি নারী ঠিক এই সময়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

নাম তাঁর আমিনা।

তিনি দেখিতেছিলেন: অসীম আকাশের ওপার হইতে জ্যোতির্ময় ফিরিশ্‌তারা যেন মিছিল করিয়া অগ্রসর হইতেছে। মুখে তাহাদের অপূর্ব উল্লাস, কণ্ঠে তাহাদের 'মারহাবা' ধ্বনি। কোন্ অনাগত পথিকের আগমন-

মুহূর্ত যেন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে; নিখিল ধরণী অনিমেষ নয়নে তাই তাঁহার আসা-পথ চাহিয়া আছে। দিকে দিকে পুলক-স্পন্দন জাগিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রসূর্য, গ্রহতারা, আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, বন-উপবন—সবাই আজ পুলকিত, শিহরিত—হিল্লোলিত। একটা সার্থকতা ও পূর্ণতার সম্ভাবনায় সারা সৃষ্টি আজ চঞ্চল।

গ্রহনক্ষত্র ছাড়িয়া আকাশ ঘুরিয়া মিছিল অবশেষে আরব-গগনে আসিয়া দাঁড়াইল; তারপর ধীরে ধীরে আমিনার কুটীর-প্রাংগণে অবতরণ করিল। এক অপূর্ব জ্যোতিতে ঘরখানি আলোকিত হইয়া গেল। আমিনা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কেন আজ তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহে এত আলো—এত সমারোহ? বিবি হাজেরা, বিবি রহিমা, বিবি মরিয়ম—কেন এই পুণ্যময়ী নারীরা বিহিশ্‌ত্‌ ছাড়িয়া তাঁহার শিয়রে আজ দণ্ডায়মান? বিস্ময়ে ও আনন্দে আমিনার হৃদয় ভরিয়া গেল।

এই সুন্দর মুহূর্তে আমিনা এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন: কোলে তাঁহার পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সারা সৃষ্টির অন্তর ভেদিয়া ঝঙ্কৃত হইল মহা-আনন্দধ্বনি: "খুশ্‌ আমদিদ্‌ ইয়া রসূলুল্লাহ্‌!" "মারহাবা ইয়া হাবীবুল্লাহ্‌!" বিহিশ্‌তের ঝরোকা হইতে হুর-পরীরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল; অনন্ত আকাশের অনন্ত গ্রহনক্ষত্র তস্‌লিম জানাইল। বিশ্ববীণাতারে আগমনী-গান বাজিয়া উঠিল। নীহারিকা-লোকে, তারায় তারায়, অণুপরমাণুতে আজ কাঁপন লাগিল। সবারই মধ্যে আজ যেন কিসের একটা আবেগ, কিসের একটা চাঞ্চল্য! সবারই মুখে আজ বিস্ময়! সবারই মুখে আজ কি-যেন-এক চরম পাওয়ার পরম তৃপ্তি সুপ্রকট। প্রভাত-সূর্য রশ্মি-করাঙ্গুলি বাড়াইয়া নব-অতিথির চরণ-চুম্বন করিল; বনে বনে পাখীরা সমবেত কণ্ঠে গান গাহিয়া উঠিল; সমীরণ দিকে দিকে তাঁহার আবির্ভাবের খুশ্‌-খবর লইয়া ছুটিয়া চলিল। ফুলেরা স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া তাহাদের অন্তরের গোপন সুষমা নজরানা পাঠাইল। নদ-নদী ও গিরি-নির্ঝর উচ্ছ্বসিত হইয়া আনন্দ-গান গাহিতে গাহিতে সাগর-পানে ছুটিয়া চলিল। স্থলে-জলে, লতায়-পাতায়, তৃণে-গুল্মে, ফুলে ফলে আজ এমনি অবিশ্রান্ত কানাকানি আর জানাজানি। যার আসার আশায় যুগযুগান্ত ধরিয়া সারা সৃষ্টি অধীর আগ্রহে প্রহর গণিতেছিল সে যেন আসিয়াছে—এই অনুভূতি আজ সর্বত্র প্রকট।

আরবের মরুদিগন্তে আজ এ কী আনন্দোচ্ছ্বাস! মরি! মরি! আজ তার কী গৌরবের দিন। সবচেয়ে যে নিঃস্ব, সবচেয়ে যে রিক্ত তাহারই অন্তর আজ এমন করিয়া ঐশ্বর্যে ভরিয়া গেল! চরম রিক্ততার অধিকারেই কি আজ সে এমন চরম পূর্ণতার গৌরব লাভ করিল! বেদুঈন বালারা অকস্মাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। দিগন্ত-বিস্তৃত উষর মরুর দিকে দিকে আজ এ কী অপূর্ব দৃশ্য! এত আলো, এত রূপ কোথা হইতে আসিল আজ? আজিকার প্রভাত এমন স্নিগ্ধ পেলব হইয়া দেখা দিল কেন? খর্জুর-শাখায় আজ এত শ্যামলিমা কে ছড়াইয়া দিল? মেঘ-শিশুরা আজ এত উল্লসিত কেন? নহরে-নহরে এত স্নিগ্ধ বারিধারা আজ কোথা হইতে আসিল? কিসের উল্লাস আজ দিকে দিকে?

আকাশ-পৃথিবীর সর্বত্র আজ এমনই আলোড়ন। ছন্দ-দোলায় সারা সৃষ্টি আজ যেন দোল খাইতে লাগিল। জড়-চেতন সকলের মধ্যেই আজ যেন অভূতপূর্ব এক শান্তির হিল্লোল বহিয়া গেল। কোথাও ব্যথা নাই, বেদনা নাই, দুঃখ নাই, অভাব নাই; সব রিক্ততার আজ যেন অবসান ঘটিয়াছে,—সব অপূর্ণতা আজ যেন দূরীভূত হইয়াছে। বিশ্বভুবনে আল্লার অনন্ত আশীর্বাদ ও অফুরন্ত কল্যাণ নামিয়া আসিয়াছে। আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, লতায়-পাতায়, জড়-চেতনে আজ যেন সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার এক মহাতৃপ্তি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মহাকাল-ঋতুচক্রে আজ কি প্রথম বসন্ত দেখা দিল? প্রকৃতির কুঞ্জবনে তাই কি আজ এত শোভা, এত সমারোহ? সেই বনে আজ নানা রঙের ফুল ফুটিয়াছে, আর সবার মাঝখানে কেবলমাত্র একটি গুলাবই রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বভুবন উজালা করিয়া আছে!

কে এই নব অতিথি—কে এই বিহিশ্‌তী নূর—যাহার আবির্ভাবে আজ দ্যুলোক-ভূলোকে এমন পুলক শিহরণ লাগিল?

এই মহামানবশিশুই আল্লার প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ পয়গম্বর—নিখিল বিশ্বের অনন্ত কল্যাণ ও মূর্ত আশীর্বাদ—মানবজাতির চরম এবং পরম আদর্শ—স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—বিশ্বনবী—

—হযরত মুহম্মদ—

(সাল্লাল্লাহু আলায় হি অ-সাল্লাম!)

পরিচ্ছেদ : ২

কোন্ আলোকে ?

কে এই মুহম্মদ ?* তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কী ? সত্য পরিচয় কী ?

একদিকে দেখিতেছি তিনি আল্লার প্রেরিত রসুল। অপরদিকে দেখিতেছি তিনি পৃথিবীর মানুষ—রক্তমাংস দিয়া গড়া তাঁর শরীর। একদিকে তিনি স্রষ্টার, অপরদিকে তিনি সৃষ্টির। কোন্ আলোকে এখন আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিব ? কোন্ চক্ষে দেখিব ? তিনি কি মানুষ, না অতিমানুষ ?

এই জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা আমরা এখানে করিব না। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক ইহার বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন। তবে এ সম্বন্ধে এখানে দুই-একটি কথা না বলিয়াও আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। হযরত মুহম্মদের জীবনালোচনা করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে প্রথমেই সজাগ হইতে হইবে; অন্যথায় আমরা তাঁহাকে সম্যক্রূপে চিনিতে ও বুঝিতে পারিব না—তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনাই আমাদের কাছে হয়ত বিসদৃশ বোধ হইবে।

হযরত মুহম্মদকে সত্য করিয়া চিনিবার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধাই হইতেছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিভ্রম। আমরা দোষে-গুণে জড়িত মানুষ, সীমাবদ্ধ আমাদের জ্ঞান ; তাই স্বভাবতই তাঁহাকে আমাদের মত করিয়া দেখি এবং আমাদের মাপকাঠিতে বিচার করি। কিন্তু সত্যই কি তিনি 'আমাদের মত' মানুষ ছিলেন ?

কেমন করিয়া বলি ? যাঁহার জীবনে এত অতিমানবিক উপাদান রহিয়াছে, তাঁহাকে শুধুই 'মানুষ' বলিতে পারি কি ?

তবে তিনি কি মানুষ ছিলেন না ? তাহাই বা কি করিয়া বলা যায় ? তাঁহার জীবনের প্রতিটি ঘটনা ইতিহাসের আলোকে সমুজ্জ্বল। কে ইহা অস্বীকার করিবে ?

* হযরত মুহম্মদের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর দরূদ পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আশা করি পাঠক-পাঠিকা নিষ্ঠার সহিত সে কর্তব্য পালন করিবেন।

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদকে যাহারা কেবলমাত্র 'অতিমানুষ' রূপে মানব-গণ্ডীর ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিবেন, তাহারাও যেমন ভুল করিবেন, যাহারা তাঁহাকে আমাদেরই মত 'মাটির মানুষ' বলিয়া ধরার ধুলায় টানিয়া রাখিবেন, তাহারাও ঠিক তেমনই ভুল করিবেন।

হযরত মুহম্মদ ছিলেন মানুষ ও অতিমানুষের মিলিত রূপ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তিনি ছিলেন যোগসূত্র। অন্য কথায়: তিনি ছিলেন আল্লার রাজপ্রতিনিধি বা খলিফা (viceregent) এই ভঙ্গিতে দেখিলেই তাঁহাকে চেনা সহজ হয়।

আল্লাহ্ নিরাকার। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না, কাহারও দ্বারা তিনি জাতও নহেন। তিনি এক, অথচ সৃষ্টি বহু ও বিচিত্র। স্রষ্টা নিরাকার, অথচ সৃষ্টি সাকার।

কেমন করিয়া অরূপ হইতে রূপে, নিরাকার হইতে সাকারে পৌঁছা যায়? এপারে-ওপারে কি করিয়া সংযোগ রাখা সম্ভব হয়?

একজন বাহন বা medium-এর এখানে নিতান্ত প্রয়োজন। খেয়াতরীর মাঝির মতন এপারে-ওপারে সে পারাপার করে।

এই মাধ্যমই হইতেছেন হযরত মুহম্মদ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে তিনি মিলনসূত্র। একদিকে যেমন তিনি আল্লার প্রতিনিধি, অপরদিকে তেমনই তিনি আমাদেরও প্রতিনিধি। একদিকে তিনি আল্লার বাণী বহন করিয়া আনিয়া সৃষ্টির প্রাণের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেন, অপরদিকে তেমনি সৃষ্টির ব্যথা-বেদনা ও অভাব-অভিযোগ আল্লার দরবারে পেশ করেন। কাজেই তাঁহাকে লইয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টি—উভয়েরই এত প্রয়োজন।

কুরআন শরীফে তাই বলা হইয়াছে:

"কুল ইয়া আইওহান্নাসো ইন্নি রাসুলুল্লাহি ইলাইকুম্ জামীয়া"

অর্থাৎ: হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লার প্রেরিত রসুল।

অন্যত্র তেমনি বলা হইয়াছে:

"কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিস্লুকুম ইউহা ইলাইয়া"

অর্থাৎ: বল, হে মুহম্মদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষ যার উপর অহি-নাজিল হয়।

এখানে দুই দিক হইতে হযরত মুহম্মদের পরিচয় আমরা পাইতেছি। আল্লার তরফ হইতে তিনি তাঁহার প্রেরিত রসুল। আবার মানুষের তরফ হইতে তিনি অহি-নাজিল হওয়া মানুষ।

কাজেই দেখা যাইতেছে, হযরত মুহম্মদ শুধু মানুষও নন, শুধু অতিমানুষও নন: দুইয়েরই তিনি মিলিত রূপ।

হযরত মুহম্মদকে দেখিতে ও চিনিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিকোণকে প্রথম হইতে এই ভঙ্গিতেই বাঁধিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় আমরা তাঁহার সাচ্চা চেহারা দেখিতে পাইব না।

এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পাঠক দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিতে পাইবেন।

পরিচ্ছেদ : ৩

প্রতিশ্রুত পয়গম্বর

হযরত মুহম্মদ ছিলেন "প্রতিশ্রুত পয়গম্বর" অর্থাৎ আল্লাহ্ যে তাঁহাকে দুনিয়ায় পাঠাইবেন, একথা পূর্বেই তিনি বিঘোষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাতে কোনই অস্বাভাবিকতা নাই। সৃষ্টি-বিধানের স্বাভাবিক নিয়মেই মুহম্মদের আবির্ভাব অনিবার্য হইয়াছিল। নিরাকার আল্লাহ্ যখন এই রূপময় বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিতে চাহিলেন, তখনই তিনি অনুভব করিলেন একজন বাহনের প্রয়োজনীয়তা ; সর্বপ্রথমেই তাই তিনি সৃষ্টি করিলেন এই বাহনকে। এই বাহনই হইতেছেন নূরে-মুহম্মদী। একটি হাদিসে তাই আসিয়াছে :

"আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু নূরী"

অর্থাৎ : (হযরত মুহম্মদ বলিতেছেন) সর্বপ্রথমেই আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করেন তাহা আমার নূর।

এই নূরে-মুহম্মদীই হইতেছেন প্রথম সৃষ্টি। কাজেই একথা অনায়াসে বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদ তাঁহার জন্মের পূর্বেই জন্মিয়াছিলেন। সারা সৃষ্টি তাঁহার নূরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। চাঁদে-চাঁদে তারায়-তারায় গ্রহে-গ্রহে লোকে-লোকে তাঁহার ধ্যানমূর্তি একটা জ্যোতির্ময় ছায়া ফেলিয়াছিল। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর জুড়িয়া তাই এক পরম কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল : কোথায় কবে কোন্খানে কিভাবে নিখিলের এই চিরসুন্দর সৃষ্টি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবে।

প্রতিশ্রুত পয়গম্বরকে (promised prophet) এই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিশ্রুত পয়গম্বর তিনি—যাঁর আবির্ভাব সৃষ্টির নীতি হিসাবেই অংগীকৃত হইয়া থাকে। সৃষ্টিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মে যাহা অনিবার্য, আবির্ভাবের পূর্বে তাহাই প্রতিশ্রুত। 'মুহম্মদ' আসিবেন একথা তাই বিশ্ব-নিখিলের অবিদিত ছিল না। সৃষ্টির অপূর্ণতার বেদনার মধ্যেই তাঁর ধ্যানমূর্তি জাগিয়া ছিল। হযরত আদম্, হযরত নূহ, হযরত মুসা, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ঈসা প্রভৃতি পূর্ববর্তী যাবতীয় পয়গম্বর ও তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই তাই জানিতেন যে, সেই নিশ্চিত অনাগত একদিন আসিবে ; তাই তাঁহারা প্রত্যেকেই হযরত

মুহম্মদের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। বেদ-পুরাণ, জিন্দাবেস্তা দিঘা-নিকায়া, তাওরাৎ, জবুর, বাইবেল প্রভৃতি পুরাকালীন প্রধান প্রধান ধর্ম-গ্রন্থেই তাই মুহম্মদের গুণগান ও তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত হইয়াছে। নিম্নের কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারাই পাঠক সে কথা বুঝিতে পারিবেন:

বেদ-পুরাণে

বেদ-পুরাণ এবং উপনিষদ হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এইসব প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে 'আল্লা' 'রসুল' 'মুহম্মদ' ইত্যাদি শব্দ কিরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে দেখুন:

অথর্ববেদীয় উপনিষদে আছে:

অস্য ইল্ললে মিত্রাবরুণো রাজা
তস্মাৎ তানি দিব্যানি পুনস্তং দুধ্যু
হবয়ামি মিলং কবর ইল্ললাং
অল্লোরহসুলমহমদরকং
বরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লল্লেতি ইল্লল্লা ॥ ৯ ॥

ভবিষ্য পুরাণে আছে:

এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতঃ।
মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখাসমন্বিতঃ ॥ ৫ ॥
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থলনিবাসিনম্
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্যসমন্বিতৈঃ
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ তুষ্টাব মনসা হরম্ ॥ ৬ ॥
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থলনিবাসিনে
ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়াপ্রবর্তিনে ॥ ৭ ॥

ভোজরাজ উবাচ—

ম্লেচ্ছৈর্গুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
ত্বং মাং হি কিঙ্করং বিদ্ধি শরণার্থমুপাগতম্ ॥ ৮ ॥

ভাবার্থ: ঠিক সেই সময় 'মহামদ' নামক এক ব্যক্তি যাহার বাস 'মরুস্থলে' (আরব দেশে)—আপন সাঙ্গোপাঙ্গ সহ আবির্ভূত হইবেন। হে আরবের প্রভু, হে জগদগুরু, তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি

জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করিবার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস; আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও। 'অল্লোপনিষদের' একটি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়:

হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণ অল্লাম ॥
আল্লাহ্ রসুলমহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাম!
আদল্লাবুকমে ককম অল্লাবুক নিখাতকম ॥ ৩ ॥

ভাবার্থ: আল্লা সকল গুণের অধিকারী। তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহম্মদ আল্লার রসুল। আল্লা আলোকময়, অক্ষয়, এক, চিরপরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভু।

'অথর্ববেদে' উল্লিখিত হইয়াছে:

ইদঃ জনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে ॥
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আরুশমেষু দদ্মহে ॥ ১ ॥

ভাবার্থ: হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। 'প্রশংসিত জন' লোকদিগের মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন। আমরা পলাতককে ৬০,০৯০ জন শত্রুর মধ্যে পাইলাম।

বলা বাহুল্য, এখানে যে হযরত মুহম্মদের কথাই বলা হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কারণ মুহম্মদের অর্থই হইতেছে 'প্রশংসিত জন', আর মক্কার অধিবাসীদিগের তৎকালীন সংখ্যাও ছিল প্রায় ৪০,০০০ হাজার।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করিতে পারিতেছেন যে, আর্য ঋষিগণ ধ্যানবলে বহু শতাব্দী পূর্বেই মুহম্মদের স্বরূপ ও আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত ছিলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে

বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দিঘা-নিকায়ায়' উল্লিখিত হইয়াছে:

"মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলিয়া যাইবে, তখন আর-একজন বুদ্ধ আসিবে, তাঁহার নাম 'মৈত্রিয়' (সংস্কৃত মৈত্রেয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।"

আমরা নিম্নে সিংহল হইতে প্রাপ্ত (from Ceylonese sources) একটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। তাহাতেও উপরোক্ত কথার সমর্থন আছে :

"Ananda said to the Blessed One, 'Who shall teach us when thou art gone ?"

And the Blessed One replied :

'I am not the first Buddha who came on the earth, nor shall I be the last. In one time another Buddha will arise in the world, a holy one, a supremely enlightened one, endowed with wisdom in conduct·· He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure such as I now proclaim···

Ananda said, 'How shall we know him ?'

The Blessed One said. 'He will be known as Maitreya' ".

—The Gospel of Buddha by Carus, 117-18)

অর্থাৎ : আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদিগকে উপদেশ দিবে ?

বুদ্ধ বলিলেন : আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসিবেন—আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত—তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করিবেন—।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে আমরা চিনিব কি করিয়া ?

বুদ্ধ বলিলেন : তাঁর নাম হইবে মৈত্রেয়।

এই 'শান্তি ও করুণার বুদ্ধ' (মৈত্রেয়) যে মুহম্মদ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; কুরআন শরীফে মুহম্মদের বিশেষণও অবিকল এইরূপই আছে। মুহম্মদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : তিনি 'রহমতুল্লিল্ আলামিন্' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য মূর্ত করুণা ও আশীর্বাদ।

পার্শী ধর্মশাস্ত্রে

পার্শী জাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবিস্তা' ও 'দসাতির'। জিন্দাবিস্তায় হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। এমন কি

'আহমদ' নামটি পর্যন্ত উল্লিখিত রহিয়াছে। আমরা মূল শ্লোক ও তাহার অনুবাদ দিলাম—

"Noid te Ahmad dragoyeitim fram-raomi
Spetama Zarathustra yam dahmam vangnim afritim.
Yunad haka hahi humananghad hvakanghad
Hushyanthnad hudaenad."

—(Zend-Avesta, Part 1, Translated by
Max Muller, p. 260)

অর্থাৎ: "আমি ঘোষণা করিতেছি, হে স্পিতাম জরথুষ্ট্র, পবিত্র আহমদ (ন্যায়বানদিগের আশীর্বাদ) নিশ্চয়ই আসিবেন যাঁহার নিকট হইতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে।"

'দসাতির' গ্রন্থেও অনুরূপ আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। উহার সারমর্ম এইরূপ:

"যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলিয়া গিয়া নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইবে, তখন আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন—যাঁহার শিষ্যেরা পারস্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারশিক জাতিকে পরাজিত করিবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপূজা না করিয়া তাহারা ইব্রাহিমের কা'বা-ঘরের দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিবে; সেই কা'বা প্রতিমা-মুক্ত হইবে। সেই মহাপুরুষের শিষ্যেরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হইবে।"

"তাঁহারা পারস্য, মাদায়েন, তুস, বল্খ প্রভৃতি পারশিকদের যাবতীয় পবিত্র স্থান অধিকার করিবে। তাহাদের পয়গম্বর একজন বাগ্মী পুরুষ হইবেন এবং তিনি অনেক অদ্ভুত কথা বলিবেন।"

—Muhammad in World Scriptures.
(by A. Huq Vidyarthi, p. 47)

তাওরাতে

ইহুদীদিগের ধর্মশাস্ত্র 'তাওরাতে' নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী আছে:

"The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me. Unto him ye shall hearken." —(Duet, 15 : 18)

অর্থাৎ : "তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে আমার (মূসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করিবেন ; তাঁহার কথা তোমরা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে।"

অন্যত্র আছে :

"I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him.

And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him."

—(Duet, 18 : 18-19)

অর্থাৎ : "(ঈশ্বর বলিতেছেন) আমি তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে তোমার (মূসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করিব এবং তাঁহার মুখে আমার বাণী প্রকাশ করিব। তিনি তোমাদিগকে আমি যাহা আদেশ করিব তাহাই শুনাইবেন। এবং ইহা অবশ্য ঘটিবে যে তাঁহার মুখ নিঃসৃত আমার সেই বাণী যাহারা শুনিবে না, তাহাদিগকে আমি শুনিতে বাধ্য করিব।"

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখুন :

"And this is the blessing wherewith Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death ;

And he said, The Lord came from Sinai rose up from Seir unto them ; he shined from mount Paran and he came with ten thousands of Saints ; from his right hand went a fiery law for them."

—(Duet, 33 : 1-2)

অর্থাৎ : "এবং ঈশ্বরের মনোনীত পুরুষ মূসা মৃত্যুর পূর্বে এই বলিয়া বনি-ঈস্রাইলদিগকে আশীর্বাদ করিলেন :

এবং তিনি বললেন : প্রভু (মূসা) সিনাই পর্বত হইতে আসিলেন এবং সিয়ের (Seir) পর্বত হইতে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার (অর্থাৎ যিনি আসিবেন) জ্যোতিঃ ফারাণ পর্বত হইতে বিকীর্ণ হইল ; তিনি দশ

হাজার ভক্ত সঙ্গে আনিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে এক জীবন্ত আইনগ্রন্থ বাহির হইল।"

এই সমস্ত উক্তি যে একমাত্র হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, বিদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

বাইবেলে

হযরত মুহম্মদের আবির্ভাব সম্বন্ধে বাইবেল হইতেও বহু প্রমাণ দেওয়া যায়। আমরা নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি:

যিশুখৃষ্টের সমসময়ে সাধু যোহন (St. John) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যখন সকলকে বাপ্তাইজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন জেরুজালেম হইতে ইহুদীরা কতিপয় পাদ্রীকে তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা আসিয়া যোহনকে যে কয়টি প্রশ্ন করেন এবং যোহন তাহার যে উত্তর দেন, তাহাতেই হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায়। বাইবেলে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে:

"And this is the record of John, when Jews sent priests and Laites from Jerusalem to ask him, who art thou ?

And he confessed and denied not—I am not the Christ,

And they asked him, what then ? Art thou Elias ? And he saith, I am not, Art thou THAT PROPHET ? And he answered No.···

And they asked him and said unto him, why baptizest thou then, if thou be not the Christ, nor Elias, neither that prophet ?

John answered them, I baptize with water, but there standeth one amongst you whom ye know not.

He it is who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose."

—(John. Chap. 1 : 19-27)

অর্থাৎ : "যোহন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, যখন জেরুজালেম হইতে ইহুদীদের দ্বারা প্রেরিত কতিপয় পাত্রী যোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? তখন যোহন স্বীকার করিলেন, আমি যিশুখৃষ্ট নহি। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস? তিনি বলিলেন, আমি ইলিয়াস নহি। আপনি তবে কি সেই নবী? যোহন উত্তর দিলেন, না।

তখন তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আপনি যিশুখৃষ্ট, ইলিয়াস, অথবা সেই নবী না হন, তবে কেন বাপ্তাইজ করিতেছেন?

যোহান উত্তর দিলেন, আমি পানি দ্বারা বাপ্তাইজ করি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আসিবেন যাঁহাকে তোমরা জান না।

তিনিই সেইজন যিনি আমার পরে আসিয়াও আমা অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হইবেন এবং আমি যাহার জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য নহি।" এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যিশুখৃষ্ট এবং ইলিয়াস ছাড়া তৃতীয় আর একজন নবী যে আসিবেন, সে কথা ইহুদীরা জানিত।

এই '**সেই নবী**' যে একমাত্র হযরত মুহম্মদই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কারণ যিশুখৃষ্টের পরবর্তী পয়গম্বর (এবং সর্বশেষ পয়গম্বর)-ই হইতেছেন হযরত মুহম্মদ।

যিশুখৃষ্ট নিজেও বলিয়াছেন :

"If you love me, keep my commandments. And I will pray to the father and He shall give you another comforter that he may abide with you for ever."

—(John, Chap. 14 : 15-16)

অর্থাৎ : "যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তবে আমার উপদেশ মত কাষ করিও; আমি স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করিব যাহাতে তিনি তোমাদিগকে আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন—যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন।"

"Nevertheless I tell you the truth : It is expedient for you that I go away ; for it I go not away, the comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you."

—(John : 17 : 7.8)

অর্থাৎ : "যাহাই হউক, আমার উচিত যে তোমাদের মঙ্গলের জন্ত আমি চলিয়া যাই, কারণ আমি না গেলে সেই শান্তিদাতা আসিবেন না ; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"

"Howbit when he the spirit of truth is come, he will guide you unto all truth : for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear that shall he speak and he will show you things to come." —(John : 16 : 13)

অর্থাৎ : "যাহাই হউক, যখন সেই সত্য-আত্মা আসিবেন, তখন তিনি তোমাদিগকে সর্বপ্রকার সত্য পথে চালিত করিবেন, কারণ তিনি নিজের কথা কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা তিনি (ঈশ্বরের নিকট হইতে) শুনিবেন, তাহাই বলিবেন ; এবং তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা দেখাইবেন।"

এই 'শান্তিদাতা' (paraclete) কে ? হযরত মুহম্মদকেই কি স্পষ্টাক্ষরে এখানে ইংগিত করা হইতেছে না ? যিশুখৃষ্টের পরে এক হযরত মুহম্মদ ছাড়া আর অন্ত কোন পয়গম্বর অবির্ভূত হন নাই। তা ছাড়া paraclete শব্দের অর্থও হইতেছে 'শান্তিদাতা' অথবা 'চরম প্রশংসিত'। এই দুইটি বিশেষণই হযরত মুহম্মদের জন্ত নির্দিষ্ট। কাজেই এ সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই।

কুরআন শরীফের বহু স্থানেও এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে নানা প্রসংগে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই আয়াতের উল্লেখ করা যায় :

"এবং যখন আল্লাহ্ সমস্ত পয়গম্বরদিগের সমক্ষে এই চুক্তি করিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি যে-সমস্ত বাণী তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা সত্য, অতঃপর একজন রসুল আসিবেন এবং তিনি আসিয়া তোমাদের নিকট যাহা আছে তাঁহার সত্যতা প্রমাণ করিবেন ; তোমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবে। তিনি বলিলেন : তোমরা এই ব্যাপারে আমার কথা স্বীকার করিলে ত ? তাঁহারা বলিল : আমরা স্বীকার করিলাম। তখন তিনি বলিলেন : তাহা হইলে সাক্ষী থাকো। আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী থাকিলাম।" —(৩ : ৮০)

এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী হইতে কী বুঝা যায়? যাঁহার প্রশংসা এবং আগমনবার্তা বহু পূর্ব হইতেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, আল্লাহ্ যাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সর্বোত্তম আদর্শরূপে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন, তিনি কি সাধারণ মানুষ? কখনই নয়।

অতএব হযরত মুহম্মদকে আমরা যেন সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করিয়া বিচার না করি। তাঁহার জীবনে আমরা অনেক সময় অনেক অলৌকিক মহিমার প্রকাশ দেখিতে পাইব, তাঁহার অনেক কায হয়ত আমাদের কাছে বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু সেগুলিকে আমরা যেন ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, এক মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি এ দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন।

———

পরিচ্ছেদ : ৪

বংশ-পরিচয়

হযরত মুহম্মদ কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিলেন, ইতিহাসের দিক দিয়া এইবার তাহা আলোচনা করিব।

ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হযরত ইব্রাহিমই হইতেছেন হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ কারণ। তাঁহারই বংশে হযরত মুহম্মদের জন্ম এবং তিনিই তাঁহার পূর্বপুরুষ। কাজেই, হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের আদি বৃত্তান্ত জানিতে হইলে হযরত ইব্রাহিম সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু জানিতেই হয়।

এখন হইতে আনুমানিক ৪০০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান মেসোপোটেমিয়ার অন্তর্গত 'বাবেল' শহরে হযরত ইব্রাহিমের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল আযর। তিনি কুম্ভকারের কার্য করিতেন। তিনি ছিলেন পৌত্তলিক। দেবমূর্তি নির্মাণই ছিল তাঁহার ব্যবসায়। হযরত ইব্রাহিমের কিন্তু এই জড়ধর্ম ভাল লাগিল না; পৈত্রিক ধর্ম না মানিয়া তিনি হইলেন তৌহীদবাদী। নিরাকার আল্লার এবাদত এবং মানুষের সহিত প্রেমই হইল তাঁহার ধর্মের মূলমন্ত্র। বলা বহুল্য, পুত্রের এই নবধর্মমত পিতা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই পিতাপুত্রে বিরোধ উপস্থিত হইল। পিতা পুত্রকে স্বমতে আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন পিতা পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া বাদশার নিকট ধরাইয়া দিলেন।

বাদশা ছিলেন নমরূদ। তিনি ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া পুড়াইয়া মারিবার আদেশ দিলেন।

কিন্তু তাও কি হয়? আল্লার নবীকে পুড়াইয়া মারিবে কে? ইব্রাহিম আগুনে পুড়িলেন না। আল্লার অসীম অনুগ্রহে তিনি রক্ষা পাইলেন!

অতঃপর ইব্রাহিম শিষ্যবৃন্দের সহিত প্যালেষ্টাইন প্রদেশে চলিয়া গেলেন এবং সেইখানেই বসবাস করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পর হযরত ইব্রাহিম তাঁহার স্ত্রী বিবি সারাকে সঙ্গে লইয়া মিশর দেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। মিশরের রাজা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং হাজেরা নাম্নী একটি সুন্দরী মিশর কুমারীকে উপঢৌকন দিলেন। হাজেরাকে লইয়া পুনরায় তিনি প্যালেষ্টাইনে ফিরিয়া আসিলেন।

বিবি সারা ছিলেন বন্ধ্যা। কাজেই হযরত ইব্রাহিম হাজেরাকে বিবাহ করিলেন। বিবি হাজেরার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিলেন তাঁহার প্রথম পুত্র ইসলাম।

কিন্তু সপত্নীর ঈর্ষার ফলে বিবি হাজেরা স্বামীর সহিত বাস করিতে পারিলেন না। আল্লাহ্‌তালার আদেশে তখন হযরত ইব্রাহিম শিশুপুত্র ইসমাইল সহ হাজেরাকে আরবের এক মরু-প্রান্তরে নির্বাসন দিয়া আসিলেন।

বিবি হাজেরার তখন কী ঘোর বিপদ! বিজন মরুভূমি। কোথাও জনমানবের বসতি নাই। খাদ্য নাই। পানি নাই। শিশু ইসমাইল তৃষ্ণায় অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন। ব্যাকুলা জননী শিশুকে একস্থানে শোয়াইয়া রাখিয়া অদূরবর্তী সাফ-মারওয়া পাহাড়ে পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করিতেছেন। কিন্তু কোথাও পানি মিলিতেছে না।

হাজেরা গভীর নিরাশায় দৌড়াইয়া শিশুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চোখ জুড়াইয়া গেল। তিনি দেখিতে পাইলেন, শিশুর চরণাঘাতে কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়া এক চমৎকার ঝর্ণা-ধারা বহিয়া চলিয়াছে। আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। আল্লার অসীম করুণার কথা মনে করিয়া বারে বারে তিনি তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন।

এই ঝর্ণা-ধারাই সেই পবিত্র জমৃজম্—ইসলামের অন্তর্বিগলিত সুধা-নির্ঝর মুসলিমের জীবনামৃত—আবে-কওসর!

ইহার কিছু পরেই কতিপয় সওদাগর সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া এবং জমৃজমের সুপেয় পানির সন্ধান পাইয়া তাঁহারা সেইখানেই বসতি স্থাপন করিলেন। এইরূপে বিশ্বমুসলিমের মিলনকেন্দ্র পবিত্র মক্কা নগরীর ভিত্তিপাত* হইল।

* কিন্তু এ কথার অর্থ এ নয় যে, এর পূর্বে মক্কা নগরীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মক্কাই দুনিয়ার সর্বপ্রথম মানব-বসতি। হযরত আদমই মক্কা নগরের প্রকৃত স্থাপয়িতা। এই জন্যই কুরআন-মুজিদে আল্লাহ্‌তালা মক্কাকে 'উম্মুল-কোরা' (বসতি-জননী) এবং কা'বাকে 'প্রথম গৃহ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। —(২য় খণ্ড দেখুন)

ইসমাইল সেইখানে ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। আরব তাঁহার স্বদেশ হইল, আরবী তাঁহার মাতৃভাষা হইল।

হযরত ইব্রাহিম বিবি হাজেরাকে চিরতরে নির্বাসন দেন নাই। হাজেরা ও ইসমাইলকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসিতেন; তাই মাঝে মাঝে তিনি আসিয়া স্ত্রী-পুত্রের খবর লইয়া যাইতেন। পরবর্তীকালে তিনি মক্কা নগরে আসিয়াই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ইসমাইলের কুরবানি ব্যাপার এই মক্কা-নগরেই সংঘটিত হয়।

ইসমাইল যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন হযরত ইব্রাহিম মক্কার জুরহাম গোত্রের মাদাদের কন্যা সাইদার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

মক্কায় অবস্থানকালে একদিন হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল তথায় 'বায়তুল্লাহ্' বা কা'বা-গৃহের পুনর্নির্মাণের জন্য আল্লার 'অহি' বা প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন। এই প্রত্যাদেশ অনুযায়ী তাঁহারা কা'বা-গৃহের নির্মাণ কার্যে অগ্রসর হইলেন। নির্মাণকার্য শেষ হইলে পিতাপুত্র মিলিতভাবে প্রার্থনা করিলেন।

"হে আমাদের প্রভু, আমাদের উভয়কেই তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধরদিগের মধ্য হইতে একটি মহাজাতির সৃষ্টি কর এবং আমাদিগকে তোমার ইবাদতের (উপাসনার) পদ্ধতি শিক্ষা দাও এবং আমাদের প্রতি করুণা কর। নিশ্চয়ই তুমি (করুণার প্রতি) চির-প্রত্যাবর্তনশীল এবং দয়াময়।

"হে আমাদের প্রভু, আমাদের বংশধরদিগের মধ্য হইতে (সেই) একজন রসুল উত্থিত কর যিনি তাহাদের নিকট তোমার বাণী প্রচার করিবেন এবং কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দিবেন, জ্ঞান দান করিবেন এবং তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন। নিশ্চয়ই তুমি শক্তিমান এবং পরম জ্ঞানী।"

—(সুরা বকারা: ১২৪-১২৯)

বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তালা এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারেই পরবর্তীকালে ইসমাইলের বংশে হযরত মুহম্মদের জন্ম হইল।

হযরত আদম হইতে হযরত মুহম্মদ পর্যন্ত ধারাবাহিক বংশ-শৈলী নিম্নে দেওয়া হইল :

হযরত মুহম্মদের বংশ-তালিকা*

১। **আদম**
২। শীশ
৩। ইউনুস
৪। কাইনান
৫। মহলিল
৬। ইয়ার্দ
৭। ইদ্রিস্
৮। মাতুশালাখ
৯। লমক
১০। নূহ
১১। শাম
১২। আরফাখ্‌শাদ
১৩। সালিক্
১৪। আইবর
১৫। ফালিস্
১৬। রাউ
১৭। সরুগ
১৮। নাহুর
১৯। তাহির (আযর)
২০। **ইব্রাহিম**
২১। ইসমাইল
২২। কাইজার
২৩। আওয়াম
২৪। ঔস্
২৫। মর্‌্যহ
২৬। সমৃঈ
২৭। রোজাহ্‌
২৮। নাজিব
২৯। যোয়াসির
৩০। ঈহাম্
৩১। আফতাদ্
৩২। ঈসা
৩৩। হাসান
৩৪। আনফা
৩৫। অরওয়া
৩৬। বলখা
৩৭। হারী
৩৮। হারী
৩৯। ইয়াসিন
৪০। হুমরান
৪১। আলকয়া
৪২। ওবাইদ
৪৩। আন্‌ফ
৪৪। আস্‌কী
৪৫। মাহী
৪৬। মাখুর
৪৭। ফাজেম
৪৮। কালেহ্‌
৪৯। বদ্‌লান
৫০। ইয়ালদারুম
৫১। হেররা
৫২ নাসিল
৫৩ আবিল আউআম
৫৪ মতাসাবিল্
৫৫ বরু
৫৬ ঔস্

৫৭। সলমান	৭৪। মুদরিকা
৫৮। হামিসা	৭৫। খুজাইমা
৫৯। উদদ	৭৬। কিনান
৬০। আদনান	৭৭। নযর
৬১। মুঈদ	৭৮। মালিক
৬২। হমল	৭৯। ফিহির (কোরেশ)
৬৩। নবিত	৮০। গালিব
৬৪। সলমান	৮১। লোবাই
৬৫। হুমিসা	৮২। কা'ব
৬৬। আল্-ঈসাউ	৮৩। মোরা
৬৭। উদদ	৮৪। কিলাব
৬৮। উদ্	৮৫। কোসাই
৬৯। আদনান	৮৬। আব্দল মন্নাফ
৭০। মা'দ্	৮৭। হাশিম
৭১। নজর	৮৮। আবদুল মুত্তালিব
৭২। মুদার	৮৯। আবদুল্লাহ্
৭৩। ইলিয়াস	৯০। মুহম্মদ

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, হযরত মুহম্মদের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র রক্তধারার মিশ্রণ হইল। হযরত ইব্রাহিমের মধ্য দিয়া আসিল পারস্যের রক্তধারা, বিবি হাজেরার মধ্য দিয়া আসিল মিসরের রক্তধারা এবং বিবি সাঈদার (ইসমাইলের স্ত্রীর) মধ্য দিয়া আসিল আরবের রক্তধারা। তিনটি বিশিষ্ট প্রাচীন সভ্যতার মিলন-মোহনায় জন্ম হইল এই মরুপয়গম্বরের। পক্ষান্তরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের কেন্দ্রভূমিও হইল এই আরব দেশ। কাজেই হযরত মুহম্মদের মধ্যে যে ফুটিয়া উঠিবে একটা উদার বিশ্বজনীন রূপ—ইহাতে আর আশ্চর্য কি।

* এই তালিকা রসুলুল্লার প্রাথমিক জীবন-লেখক ইবনে-ইসহাক প্রণীত "সীরাৎ-ই রসুলুল্লাহ্" । এবং স্যার সৈয়দ আহমদ প্রণীত "Essays on Muhammad and Islam" হইতে গৃহীত।

কোরেশ-বংশ

হযরত মুহম্মদের ঊর্ধ্বতন একাদশ পুরুষের নাম ছিল ফিহির। তিনি 'কোরেশ' নামেও অভিহিত হইতেন। এই কারণে তাঁহার বংশধরগণ কোরেশ নামেও খ্যাতিলাভ করেন। এই হিসাবেই হযরত মুহম্মদ কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে কোরেশদিগের মধ্যে নানা শাখার উদয় হইয়াছিল এবং নানা গোত্রে তাঁহারা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হযরত মুহম্মদের জন্মগ্রহণের প্রাক্কালে এই কোরেশগণই মক্কা নগর শাসন করিতেছিলেন। হযরতের পিতামহ আবদুল মুত্তালিব একজন ধার্মিক লোক ছিলেন। মক্কায় কা'বা-গৃহে প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে তীর্থযাত্রীরা তীর্থ করিতে আসিত। আবদুল মুত্তালিবের উপর এই সব তীর্থযাত্রীদের পানি সরবরাহের ভার ন্যস্ত ছিল। তীর্থের সময় প্রতি বৎসর সুপেয় পানির অভাব ঘটিত। আবদুল মুত্তালিব ইহাতে বিচলিত হইয়া পানি সরবরাহের কোন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিলেন। সহসা তাঁহার মনে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপিল। হযরত ইসমাইলের সময়কার সেই বিখ্যাত 'জমজম্' উৎসটি কালক্রমে মাটির তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই হারানো উৎসের পুনরাবিষ্কারের জন্য আবদুল মুত্তালিব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি উৎসটির কোনই সন্ধান পাইলেন না। লোকে তখন তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল।

এদিকে আবদুল মুত্তালিবের বয়স্‌ও দিন দিন বর্ধিত হইতেছিল, অথচ কোনই সন্তান-সন্ততি জন্মিতেছিল না। এই জন্যই তিনি একদিন কঠোর প্রতিজ্ঞা করিলেন: "যদি আমার দশটি পুত্র জন্মে এবং যদি আমি জমজম্ উৎসের আবিষ্কার করিতে পারি, তবে একটি পুত্রকে হযরত ইব্রাহিমের ন্যায় আমিও কুরবানি দিব।"

আশ্চর্যের বিষয়, কালক্রমে তিনি জমজম্ উৎসের আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন এবং একে একে দশটি পুত্রসন্তানও লাভ করিলেন।

তখন আবদুল মুত্তালিব পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত একটি পুত্রকে কুরবানি দিতে মনস্থ করিলেন। পুত্রদিগের মধ্যে ভাগ্যপরীক্ষা (লটারী) করা হইল; ফলে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লার নাম উঠিল।

আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসিতেন, তবু কর্তব্যের খাতিরে তাহাকেই কুরবানি দিবার জন্য কা'বা-গৃহে লইয়া গেলেন। লোকেরা তাঁহাকে একার্য করিতে নিষেধ করিল।

অনেক বুঝাইবার পর আবদুল মুত্তালিব 'শিয়া' নামক একজন ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে গিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। শিয়া এই নির্দেশ দিলেন: আবদুল্লার বিনিময়ে দশটি উট নির্ধারিত করিয়া উট ও আবদুল্লার মধ্যে ভাগ্য-নির্ণয় কর। যতক্ষণ না উটের নাম উঠিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকবার উটের সংখ্যা দশগুণ বাড়াইয়া দাও। এইরূপে যখন উটের নাম পাওয়া যাইবে, তখন নির্দিষ্ট সংখ্যক উট কুরবানি করিও।

ঠিক তাহাই করা হইল। দশম বারের বার উটের নাম উঠিল। কাজেই উটের সংখ্যা দাঁড়াইল একশত। তখন আবদুল মুত্তালিব সন্তুষ্টচিত্তে ১০০টি উট কুরবানি দিলেন। সেই হইতে কাহারও প্রাণের বিনিময়ে একশত উট কুরবানি প্রথা আরবে প্রচলিত হইয়া গেল।

এইরূপে আবদুল্লাহ্ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। পরবর্তী-কালে যিনি বিশ্বনবীর পিতা হইবার গৌরব অর্জন করিবেন, তাঁহার জীবন এরূপভাবে হেলায় নষ্ট হইলে চলিবে কেন? অনন্ত করুণা ও কল্যাণের উৎস-মুখ কি এত সহজেই রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে?

ক্রমে ক্রমে যখন আবদুল্লাহ্ বিশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন, তখন বনি-জোহ্‌রা গোত্রের ওহাবের কন্যা রূপেগুণে অতুলনীয়া পুণ্যময়ী আমিনার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। ইহার কিছুদিন পরেই বাণিজ্য ব্যপদেশে আবদুল্লাহ্ সিরিয়া যাত্রা করিলেন। তখন আমিনা গর্ভবতী।

সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে আবদুল্লাহ্ মদিনা নগরে কয়েকদিন বিশ্রাম করিতেছিলেন; এমন সময় হঠাৎ তাঁহার কঠিন পীড়া হইল। এই সংবাদ পাইয়া আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহ্‌কে গৃহে আনিবার জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হারিসকে মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু হায়! হারিস আবদুল্লাহ্‌কে না আনিয়া আনিলেন তাঁহার নিদারুণ মৃত্যু-সংবাদ! বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব ও আমিনার হৃদয় শোকে-দুঃখে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

এইরূপে মাতৃগর্ভে থাকিতেই বিশ্বনবী পিতৃহীন হইলেন। বেদনার অমৃত মুখে লইয়াই তিনি ধরায় আসিলেন।

পরিচ্ছেদ : ৫

নামকরণ

বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব তখন কা'বা-গৃহে বসিয়া আপন গোত্রের লোকদিগের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। একটা অভূতপূর্ব নৈসর্গিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্ময় মানিতেছিলেন। এমন সুন্দর প্রভাত তো তাঁহারা আর কখনও দেখেন নাই! এমন সময় সংবাদ আসিল, আমিনা এক পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছেন। হর্ষ ও বিষাদে আবদুল মুত্তালিবের হৃদয় ভরিয়া গেল। আজ তাঁহার প্রিয় পুত্র আবদুল্লার বিয়োগ-বেদনা বড় করুণ হইয়া বাজিয়া উঠিল। পক্ষান্তরে সেই মৃত পুত্রের স্মৃতি বহন করিয়া আসিল এই নবাগত তরুণ অতিথি। এ-সংবাদও তো তাঁহার জীবনে কম আনন্দের নয়! সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি আমিনার গৃহে উপস্থিত হইয়া আবদুল্লাহ্-তনয়ের মুখদর্শন করিলেন। কী সুন্দর জ্যোতির্ময় বিহিশ্‌তী মুখশ্রী! আবদুল মুত্তালিবের চোখ জুড়াইয়া গেল। আকুল আগ্রহে শিশুটিকে কোলে লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কা'বা-মন্দিরে আসিয়া তাহার জন্য প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর শিশুটিকে দোলা দিতে লইয়া গিয়া আমিনার কোলে ফিরাইয়া দিলেন। তখন কি তিনি জানিতেন কাহাকে তিনি কোলে লইয়া দোলা দিতেছেন!

সাতদিন পরে আরবের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আবদুল্ মুত্তালিব শিশুর 'আকিকা' উৎসব করিলেন। মক্কার বিশিষ্ট কোরেশ নেতৃবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াৎ দেওয়া হইল। উৎসব-শেষে কোরেশ দলপতিগণ শিশুকে দেখিয়া খুসি হইলেন এবং কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "শিশুর নাম কী রাখিলেন?"

"মুহম্মদ।"

কোন্ এক অদৃশ্য ইংগিতে আবদুল মুত্তালিব এই কথা বলিয়া ফেলিলেন।

"মুহম্মদ! এমন অদ্ভুত নাম তো আমরা কখনও শুনি নাই! কোন দেবতার নামের সঙ্গে নাম মিলাইয়া রাখিলেন না কেন?"

তৎকালে কোরেশদিগের মধ্যে ইহাই ছিল প্রথা। দেবদেবীর নামের সংগে মিলাইয়া শিশুর নামকরণ করা হইত।

বৃদ্ধ বলিলেন: "আমার এই স্নেহের নাতিটি বিশ্ববরেণ্য হইবে—সমগ্র জগতে ইহার মহিমা ও প্রশংসা পরিকীর্তিত হইবে—এই জন্যই ইহার নাম রাখা হইয়াছে মুহম্মদ।"

সকলে শিশুকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে বিবি আমিনাও গর্ভাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেন, তাঁহার প্রাণের দুলালের নাম যেন 'মুহম্মদ' রাখা হইয়াছে। আবার কখনও দেখিতেন তিনি যেন 'আহমদ' নামেও পরিচিত হইতেছেন। এইজন্য 'মুহম্মদ' নামের সংগে সংগে তিনি 'আহমদ' নামও রাখিয়া দিলেন।

এইরূপে হযরত দুই নামে অভিহিত হইলেন: মুহম্মদ ও আহমদ। 'মুহম্মদের' অর্থ 'চরম-প্রশংসিত', আর 'আহমদের' অর্থ 'চরম-প্রশংসাকারী'। বলা বাহুল্য, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে হযরত সম্বন্ধে যে-সব ভবিষ্যবাণী করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এই দুইটি নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলিম জগতে এই দুইটি নাম চির-পরিচিত। প্রত্যেকেই আমরা হযরতকে এই দুই নামে ডাকি, চিনি এবং পরিচয় দেই। কিন্তু এই দুইটি নামের ব্যাখ্যা কী, তাৎপর্য কী, হযরতের জীবনে ইহাদের কোন সার্থকতা আছে কিনা, একটি নামের পরিবর্তে দুইটি নামের প্রয়োজনীয়তাই-বা কেন হইল, সে কথা কি আমরা কখনও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি?

'মুহম্মদ' ও 'আহমদ' নামের মধ্যে একটা গভীর দার্শনিক রহস্য লুক্কায়িত আছে। হযরতের পূর্ণ-পরিচয়ের জন্য দুইটি নামেরই নিতান্ত প্রয়োজন। শুধু 'মুহম্মদ' বা শুধু 'আহমদ' দ্বারা তাঁহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে না। দুইটি মিলিয়া এক হইলেই তবে তাঁহাকে সত্যরূপে চেনা যায়। কাজেই বলা যাইতে পারে, নাম দুইটি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এই দুইটি চুম্বক শব্দের ব্যাখ্যা করিলেই হযরতের গোটা সত্তা এবং স্বরূপ আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে।

পাঠক দেখিয়াছেন, এক নামে তিনি 'মুহম্মদ', অন্য নামে তিনি 'আহমদ', অর্থাৎ একদিকে তিনি 'চরম-প্রশংসিত', অপরদিকে তিনি 'চরম-প্রশংসাকারী'। কিন্তু বলিতে পারেন কি, কাহার দ্বারাই-বা তিনি চরম-প্রশংসিত, আর

যাহারই-বা তিনি চরম-প্রশংসাকারী ? আল্লার দ্বারাই তিনি চরম-প্রশংসিত হইয়াছেন, আবার আল্লাকেও তিনি চরম-প্রশংসা করিয়াছেন। অন্য কথায় : যে চরম প্রশংসা ও সম্মান মুহম্মদ লাভ করিয়াছেন, অন্য কাহারও ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই ; পক্ষান্তরে মুহম্মদ আল্লার যে প্রশংসা ও যে গুণকীর্তন করিয়াছেন, অন্য কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। উভয়দিক হইতেই প্রশংসা ও গৌরব-দানের চরম হইয়া গিয়াছে।

এখন দেখা যাউক, এই 'চরম-প্রশংসিত' ও 'চরম-প্রশংসাকারী' কে হইতে পারে।

'চরম-প্রশংসিত' একমাত্র সে-ই হইতে পারে—যাহার মধ্যে চরম পূর্ণতা আছে। সর্বশ্রেষ্ঠ না হইলে কেহ কখনও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা লাভ করিতে পারে না। যাহার মধ্যে অপূর্ণতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, তাহাকে কেহই চূড়ান্ত প্রশংসা করে না—করিতে পারা যায় না। কাজেই 'চরম-প্রশংসিত' বলিলেই এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা সর্বপ্রথমেই আমাদের মনে জাগে। 'চরম-প্রশংসিত' হইতে হইলে তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বা অনুপম হইতে হয়। সুতরাং একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ যে মুহম্মদকে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে প্রদর্শন করিবেন, সমস্ত পরিপূর্ণতা যে তাঁহাকে দিবেন, তাঁহাকে যে চরম এবং পরম আদর্শরূপে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন, এই ইংগিতই পাইতেছি আমরা তাঁহার 'মুহম্মদ' নামের মধ্যে। পক্ষান্তরে আল্লার পরিপূর্ণ সত্য-পরিচয় যে মুহম্মদের দ্বারাই সারা জগতে বিঘোষিত হইবে, মুহম্মদের হাতেই যে আল্লার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইবে, এই ইংগিতও পাইতেছি আমরা তাঁহার 'আহমদ' নামের মধ্যে। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর চরম-প্রশংসা কেবলমাত্র তিনিই করিতে পারেন—যিনি সেই ব্যক্তি বা বস্তুর রূপ ও গুণ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান রাখেন। কাজেই মুহম্মদ যে আল্লার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হইবেন, এবং তাঁহার সত্য-পরিচয় যে একমাত্র তিনিই দিতে পারিবেন, এই কথারই আভাস পাইতেছি তাঁহার 'আহমদ' নামের মধ্যে।

অতএব দেখা যাইতেছে, আল্লার বিচিত্র লীলা-প্রকাশের জন্য মুহম্মদ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। অবশ্য আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সকল অভাব ও সকল প্রয়োজনের অতীত। জানি ; তবু বলিব : সৃজন-লীলার সার্থকতার জন্য মুহম্মদকে কল্পনা না করিয়া তিনি পারেন নাই। নিখিল সৃষ্টির মূলে যদি কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকিয়া থাকে, তবে সে হইতেছে আল্লারই আত্মপ্রকাশের

উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তাঁহার এই সৃষ্টি-লীলার মধ্য দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিতে চান। আপন মহিমায় অন্তর্লীন হইয়া থাকিলে কে তাঁহাকে চিনিত? শুধু স্রষ্টা থাকিলেই হয় না, দ্রষ্টাও চাই, নতুবা স্রষ্টার সৃষ্টি সার্থক হইবে কেন? দ্রষ্টা না থাকিলে কে স্রষ্টার মহিমা পরিকীর্তন করিবে? উপযুক্ত গুণীর কদর করিবার জন্য তাই প্রয়োজন হয় উপযুক্ত গুণগ্রাহীর। আল্লাহ্‌তাআলাও তাই আত্ম-অভিব্যক্তির জন্য এমন একজন উপযুক্ত গুণগ্রাহী বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন—যাহার নিকট তিনি আপন স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন এবং যিনি সেই মহাসত্যের বেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য রাখেন। এই জন্যই বিশ্ব সৃষ্টির সংগে সংগে এমনিই একজন উপযুক্ত মহাপুরুষের সৃজন অনিবার্য হইয়াছিল।

সেই ভাগ্যবান পুরুষই হইতেছেন মুহম্মদ।

দেশের সম্রাট যদি তাঁহার অধীন কোন কর্মচারীর সহিত কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে চান, তবে পূর্ব হইতেই তাঁহাকে উচ্চপদ ও খেতাব দিয়া মৈত্রী স্থাপনের উপযুক্ত করিয়া লন। বিদ্যুৎ-প্রবাহকে কোথাও সঞ্চারিত করিতে হইলে তাহার ধারক-যন্ত্র (receiver)-কেও তদনুরূপ শক্তিশালী করিয়া লইতে হয়। হযরত মুহম্মদকে ঠিক তাহাই করা হইয়াছিল। আপন সৃষ্ট 'বান্দা' হইলেও আল্লাহ্ তাঁহাকে সর্বগুণে গুণান্বিত করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া-ছিলেন। আল্লার বিরাটত্বের খাতিরে মুহম্মদকেও বিরাট করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। পূর্ণ-আল্লার পূর্ণ-পরিচয়ের জন্য একজন পূর্ণ-মানুষেরই তো প্রয়োজন!

এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে: মুহম্মদের পূর্বে তবে কি জগতে কোন পূর্ণ-মানুষ আসে নাই? অথবা জগদ্বাসী কি আল্লার পূর্ণ-পরিচয় পায় নাই? উত্তর: না। মুহম্মদের পূর্বে বহু পয়গম্বর ও তত্ত্বদর্শী সাধুপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু নিজেদের ধারণ-ক্ষমতার অপূর্ণতার জন্য আল্লার সম্পূর্ণ ও ব্যাপক পরিচয় তাঁহারা কেহই নিজেরাও পান নাই, অপরকেও দিতে পারেন নাই। সে-গৌরব রক্ষিত হইয়াছিল পূর্ণ-মানব মুহম্মদের জন্য। কাজেই আমরা বলিতে পারি, মুহম্মদের পূর্বে কোন পূর্ণ-মানুষকেও আমরা দেখি নাই—পূর্ণ-আল্লাকেও দেখি নাই।

মুহম্মদের 'আহমদ' রূপ এখনও প্রকটিত হয় নাই। আল্লাহ্‌তাআলাকে তিনি কিরূপ প্রশংসা করিবেন, কিভাবে তাঁহার পরিচয় দিবেন এবং সে

প্রশংসা ও পরিচয় চরম এবং পরম হইবে কিনা, তাহা বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। মুহম্মদের জীবন-শেষে সে-বিচার আমরা করিব।

মুহম্মদকে আল্লাহ্ 'হাবীব' বা 'দোস্ত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং তিনি যে 'রহমতুল্লিল আলামিন্'—অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির বুকে আল্লার মূর্তিমান করুণা ও আশীর্বাদ, এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে। চরম প্রশংসার সংগে চরম প্রেম এবং আশীর্বাদও জড়িত থাকে। শিল্পী যাহাকে আপন মনের সমস্ত সুষমা মিশাইয়া নিখুঁতভাবে রচনা করে, তাহাকে সে কেবল প্রশংসাই করে না, ভালোওবাসে। বিশ্বশিল্পী তবে কেন তাঁহার এই শ্রেষ্ঠ শিল্পকে ভালোবাসিবেন না? এই জন্যই মুহম্মদ আল্লার মাহ্‌বুব বা প্রেমাস্পদ। শুধু তাই নয়, যেহেতু মুহম্মদকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন, এ কারণে মুহম্মদকে যাহারা ভালোবাসেন, অথবা মুহম্মদ যাহাদিগকে ভালোবাসেন, তাহাদিগকেও আল্লাহ্ ভালোবাসেন। কাজেই মুহম্মদের আবির্ভাব বিশ্বমানুষের জন্য এক অপূর্ব কল্যাণের উৎস হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের ধর্মই এই!

'মুহম্মদ' হইলে যেমন তাহাকে 'হাবীব' হইতে হয়, তেমনি তাহাকে 'আহমদ' না হইয়াও উপায় নাই। 'মুহম্মদ' এমন শব্দ—যাহার মধ্যে 'হাবীব' ও 'আহমদের' ধারণা ওতঃপ্রোতভাবেই নিহিত থাকে। শ্রেষ্ঠ শিল্প শুধু শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রেম লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বিনিময়ে শিল্পীর শ্রেষ্ঠ মহিমাও সে ঘোষণা করে। শিল্পের মধ্যে শিল্পী আত্মপ্রকট হয়। শিল্পের প্রশংসা তাই প্রকৃতপক্ষে শিল্পীরই প্রশংসা। শিল্প অচেতন হইলে শিল্পীর প্রশংসা সে নীরবে করে, সচেতন হইলে প্রকাশ্যে করে। ঠিক যে-পরিমাণে শিল্প সার্থক ও সুন্দর হয়, সেই পরিমাণে শিল্পীও সার্থক ও সুন্দর হইয়া দেখা দেয়। কাজেই শিল্প যদি চরম-প্রশংসিত ও পরম-পূর্ণ হয়, তবে শিল্পীও তখন তার মধ্য দিয়া চরম-প্রশংসিত এবং চরম-পরিচিত না হইয়াই যায় না।

আদর্শ শিল্পের মধ্যে সমগ্র অন্তর-মানুষটি ধরা পড়ে। শিল্পীর যাহা-কিছু অনুভূতি, যাহা-কিছু প্রেরণা, যাহা-কিছু দরদ এবং যাহা-কিছু গুণপনা বা কলাকৌশল—সমস্তই রূপায়িত ও লীলায়িত হয় তাহার সেই শিল্পের মধ্যে। শিল্প যেমন করিয়া শিল্পীকে জানে, তেমনটি আর কে জানে? শ্রেষ্ঠ শিল্প জানে তাই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ-পরিচয়, আর এই কারণেই করিতে পারে সে তাহার চরম প্রশংসা।

'মুহম্মদ' ও 'আহমদ' তাই একই ব্যক্তি না হইয়া পারে না। স্রষ্টার দিক দিয়া যিনি মুহম্মদ, সৃষ্টির দিক দিয়া তিনিই আহমদ।

ইহাই হইতেছে 'মুহম্মদ' ও 'আহমদ' নামের দার্শনিক তাৎপর্য। এই দুইটি নামই মুহম্মদের স্বরূপ-প্রকাশের দুই প্রতীক শব্দ (symbol)। মুহম্মদের সমগ্র জীবন ও কর্ম এই দুইটি নামেরই বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এই দুইটি নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছে কিনা, অর্থাৎ আল্লার চরম-প্রশংসা তিনি লাভ করিয়াছেন কিনা—পক্ষান্তরে তিনি আল্লার চরম-প্রশংসা করিতে পারিয়াছেন কিনা—ইহাই হইবে তাঁহার জীবনালোচনার দুই প্রধান লক্ষ্যবস্তু—ইহাই হইবে তাঁহার সাফল্য বিচারের দুই প্রধান মাপকাঠি।

পরিচ্ছেদ : ৬

সমসাময়িক পৃথিবী

৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, মুতাবিক ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার সুবেহ্-সাদিকের সময় হযরত মুহম্মদ ভূমিষ্ঠ হন।*

হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবকালে জগতের ধর্মিক, নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কিরূপ ছিল?

এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়: সে সময়ে জগতে সত্যই আঁধার যুগ নামিয়া আসিয়াছিল। আরব, পারস্য, মিশর, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি তৎকালীন সভ্য জগতের সর্বত্রই সত্যের আলো নিভিয়া গিয়াছিল। জবুর, তাওরাৎ, বাইবেল, বেদ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্মগ্রন্থই বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল, ফলে স্রষ্টাকে ভুলিয়া মানুষ সৃষ্টির পায়েই বারে বারে মাথা নত করিতেছিল। তৌহিদ বা একেশ্বরবাদ জগৎ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; প্রকৃতি-পূজা, প্রতিমা-পূজা, প্রতীক-পূজা, পুরোহিত-পূজা অথবা ভূত প্রেত ও জড়পূজাই ছিল তখনকার দিনে মানুষের প্রধান ধর্ম। রাষ্ট্রিক, সামাজিক বা নৈতিক শৃঙ্খলা কোথায়ও ছিল না। অনাচার, অবিচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারে ধরণী পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা একে একে ঐ সমস্ত দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে এইখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষ

সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন লীলাভূমি ভারতবর্ষের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নিরাকার পরব্রহ্মের আরাধনা ধর্ম হিসাবে ভারতবর্ষে কোন-দিনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বেদের কোন কোন সূক্তে 'অজ', 'অকায়ম' ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম' ঈশ্বরের উল্লেখ থাকিলেও আর্যগণ দেবদেবীর আরাধনাই করিতেন। জনৈক খ্যাতনামা লেখক বৈদিক যুগের ধর্ম ও সংস্কার সম্বন্ধে বলিতেছেন: "বৈদিককালের ধর্ম ছিল ভৌতিক প্রকৃতির প্রত্যক্ষগোচর

* এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিস্তৃত আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

পদার্থের বা দৃশ্যের আরাধনা। এই সমস্ত পদার্থ বা দৃশ্যকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসকের অন্ন-ধন-পুত্র-পরিজন লাভের জন্য এবং বিপদুদ্ধার ও দুঃখ-পরিহার বা শত্রু-পরাভবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও স্তুতি করিতেন এবং অগ্নিতে সেই সব দেবতার উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন এবং সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন। এই হিসাবে বেদের ধর্ম বহুদেববাদ বলা যাইতে পারে।"

"প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ব্যাপার যেমন দেবত্ব লাভ করিয়াছিল, পার্থিব বহু বস্তুও তেমন দেবত্ব লাভ করিয়াছিল। ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ, উষা, রাত্রি প্রভৃতির সংগে সংগে জল, নদী, পর্বত, ওষধি, গাভী, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিও দেবতাত্মা বলিয়া বন্দিত হইত।"*

বৈদিক যুগের কিছুকাল পরেই আর্যদিগের মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথার প্রচলন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণে গোটা হিন্দু-সমাজ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই বেদপাঠের এবং পৌরোহিত্য করিবার অধিকার থাকায় ব্রাহ্মণেতর লোকদিগের কোন ধর্মাধিকারই ছিল না। বহু সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিল। শূদ্রদিগের বেদপাঠ করা তো দূরের কথা, বেদমন্ত্র শ্রবণ করিলেও উত্তপ্ত সীসা কানে ঢালিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু শাস্ত্রকার মনু বলিতেছেন:

"যো হ্যস্যধর্মাচষ্টে কশ্চৈবাদিশতি ব্রতম।
সোহসংবৃতং নাম তমঃ নহ তেনৈব মজ্জতি॥"

—মনুসংহিতা, ৪।৮১

অর্থাৎ: "যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হইবেন।"

নারীজাতির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। বেদমন্ত্রে তাঁহাদের কোন অধিকার ছিল না। নারীকে পুরুষের দাসীরূপেই গণ্য করা হইত, কোনরূপ সামাজিক অধিকার বা মর্যাদা তাঁহার ছিল না। রাক্ষস-বিবাহ, পৈশাচিক বিবাহ, ক্ষেত্রজ-পুত্র ইত্যাদি প্রথাই তাহার প্রমাণ।

* শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বেদবাণী: ১৪ ও ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নারীর চরিত্র বা প্রকৃতি সম্বন্ধেও তখনকার যুগে অত্যন্ত হীন ধারণাই লোকে পোষণ করিত। স্বয়ং মনু বলিতেছেন :

"নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি মর্যোব্যবস্থিত
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহইতমিতি স্থিতিঃ।" ১৮

অর্থাৎ : মন্ত্রদ্বারা স্ত্রীলোকদিগের সংস্কারাদির ব্যবস্থা হয় না, একারণ উহাদের অন্তঃকরণ নির্মল হইতে পারে না।

এইরূপে সমাজের প্রতি স্তরে বহু পাপ ও বহু জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হইয়াছিল।

চীন

চীনাদের অবস্থা ভারতীয়দিগের অপেক্ষাও শোচনীয় ছিল। ধর্ম-প্রচারক হিসাবে চীনদেশে 'কনফুসিয়াস' ও 'তা-ও'-এর নাম শুনা যায়, কিন্তু তাঁহাদের যে কী ধর্মমত ছিল তাহা সম্যক বুঝিয়া উঠা কঠিন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনাদিগের মধ্যে প্রকৃতি-পূজা, পুরোহিত-পূজা ও পূর্বপুরুষ-পূজার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছিল। এক কথায় বলিতে গেলে নর-পূজাই ছিল তাহাদের প্রধান ধর্ম। অতঃপর বৌদ্ধধর্ম যখন চীনদেশে প্রবেশলাভ করে, তখনও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বরং বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদ চীনাদের জীবনে আরও ঘোরতর অধঃপতন আনয়ন করিয়াছিল। চীনারা নৈরাশ্যবাদী নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধের মূর্তিপূজা এবং নৃপতি পূজাই তাহাদের সার ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। কোনরূপ নীতিজ্ঞান ছিল না; কর্মই ছিল তাহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়।

পারস্য

অতি প্রাচীনকাল হইতেই পারস্যে অগ্নি-উপাসনা ও প্রকৃতি-পূজার প্রচলন ছিল। প্রাচীন পারশিকদের ধর্মগুরু ছিলেন জরদস্ত্ বা Zoroaster এবং তাহাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল জিন্দাবিস্ত্। জরদস্ত্ প্রচার করেন : দুইজন দেবতার দ্বারা জগতের সমুদয় মংগল-অমংগল সাধিত হইতেছে; মংগলের দেবতা 'আহুর-মাজ্দা' অথবা 'অরমাজ্দ' আর অমংগলের দেবতা 'আহরিমান'। উভয় দেবতার মধ্যে দিবানিশি সংঘর্ষ চলিতেছে,

সেই সংঘর্ষে আহুর-মাজদাই জয়লাভ করিতেছেন। এই আহুর-মাজদার পূজাই ছিল পারশিকদের প্রধান ধর্ম।

কালক্রমে এই ধর্মও লোপ পাইল তখন পৌত্তলিকতা তাহার সমস্ত অভিশাপ লইয়া পারশিকদিগের মধ্যে আসন পাতিল। পুরোহিতদিগের অত্যাচারে পারস্যবাসীরা জর্জরিত হইয়া উঠিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহাদের সমাজ-বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল। দুর্নীতি ও কুসংস্কারের অন্ধকারে পারস্য ডুবিয়া গেল।

ইহুদী জাতি

ইহুদী জাতির দশা চিন্তা করিলে সত্যই দুঃখ হয়। এই জাতি পূর্বে আল্লাহ্‌তালার 'অনুগৃহীত' জাতিরূপে পরিগণিত ছিল। ইহাদেরই উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌তালা হযরত মুসা, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান প্রভৃতি পয়গম্বরদিগকে প্রেরণ করেন এবং 'জবুর' ও তাওরাৎ নামক দুইখানি ধর্মগ্রন্থ ইহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এত বড় স্বর্গীয় সম্পদ লাভ করা সত্ত্বেও আপন কর্মদোষে ইহারা আজ অবলুপ্ত ও নিগৃহীত। বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতা ছিল তাহাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, হযরত মুসা, হযরত ঈসা, হযরত মুহম্মদ প্রভৃতি পয়গম্বরদিগের সহিত ইহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ছাড়ে নাই। হযরত মুসাকে ইহারা ভীষণভাবে নির্যাতন করিয়াছে; যিশুখৃষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছে এবং হযরত মুহম্মদকেও মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। এক ইহুদী রমণী হযরত মুহম্মদকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিষদান করিয়াছিল। আল্লাহ্‌তালার অনুগ্রহে হযরত রক্ষা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই বিষের ক্রিয়া তিনি সারাজীবন ধরিয়াই অনুভব করিয়াছিলেন। অনেকের মতে তাঁহার মৃত্যুকালীন ব্যাধি এই বিষ-ক্রিয়া হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, এই জাতির নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন কী ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল। বড় বড় পয়গম্বরগণ যাহাদের হাত হইতে রক্ষা পান নাই, সে জাতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন রাখে না।

খৃষ্টান জাতি

ষষ্ঠ শতাব্দীতে খৃষ্টান জাতির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। যিশুখৃষ্টের শিক্ষা ও বিধান পাদ্রী ও সাধুপুরুষদিগের হস্তে এতই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে, স্বয়ং যিশু ফিরিয়া আসিলেও উহাকে আর নিজধর্ম বলিয়া চিনিতে পারিতেন না! যিশুখৃষ্ট পবিত্র তৌহীদবাদই প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সাধু পল, পিটার প্রভৃতি ধর্ম-যাজকেরা উহাকে ত্রিত্ববাদে (Trinity) পরিণত করিয়া ছাড়িয়াছিলেন! যে-যিশু মূর্তিপূজা দূর করিতে ধরায় আসিলেন, সেই যিশুর মূর্তিই খৃষ্টানেরা পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগে সংগে তাঁহার মাতা মেরীও ঈশ্বরের এক-তৃতীয়াংশরূপে সর্বত্র পূজিত হইতে লাগিলেন। শুধু কি তাই? স্বয়ং পল এবং পিটারের মূর্তিও গির্জাঘরে স্থাপিত হইল। জীবনে যে যত পাপই করুক, ত্রাণকর্তা যিশুকে ভজনা করিলেই সকল পাপ দূর হইয়া যাইবে, এই বিশ্বাস প্রত্যেক খৃষ্টানের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। কালে কালে 'Holy Roman Empire' নামে স্বতন্ত্র খৃষ্টজগৎ রচিত হইল এবং রোমের পোপ খৃষ্টানদিগের যাবতীয় ধর্মসংক্রান্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে পোপেরা যে বীভৎস লীলাখেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠক তাহা জানেন। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন: স্বর্গের চাবি তাঁহাদের হাতে। যতবড় পাপীই হউক, উপযুক্ত মূল্যে পোপের নিকট হইতে স্বর্গের 'পাসপোর্ট' ক্রয় করিলে আর তাহার কোন ভয় নাই, নির্ঘাৎ সে স্বর্গে যাইবে! বলা বাহুল্য, ইহার ফলে খৃষ্টান জগতে যে দুর্নীতি ও পাপের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

আরব জাতি

আরবের অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ছিল। চুরি-ডাকাতি, মারামারি-কাটাকাটি, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, মদ্যপান, নারীহরণ প্রভৃতি যত রকমের পাপ ও দুর্নীতি থাকিতে পারে, আরব-চরিত্রে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না। আল্লাকে তাহারা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল।

বুৎপুরুস্তি (মূর্তিপূজা) ও কুসংস্কারের অন্ধকারে সারাদেশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হযরত ইব্রাহিম আল্লাহ্ তালার ইবাদতের জন্য যে কাবা-ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই 'খোদার ঘরেই' আরবেরা ৩৬০টি দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল।

নারীজাতির অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। গৃহপালিত পশুর মতন তাহাদিগকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করা হইত। পিতার মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত স্ত্রী-কন্যাগণও পুত্রের ভোগে আসিত। কন্যাসন্তানকে অনেক সময় জীবন্ত প্রোথিত করা হইত। বিবাহিতা স্ত্রীদিগকে যখন খুশি তালাক দেওয়া যাইত। পক্ষান্তরে একই নারী একই সময় বিভিন্ন পুরুষকে বিবাহ করিয়া উৎকট সামাজিক বিশৃংখলার সৃষ্টি করিত।

আরবে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। হাটে-বাজারে দাসদাসীর ক্রয়বিক্রয় চলিত। সময়ে সময়ে কাবা-গৃহে নরবলিও হইত।

ইহাই ছিল আরব জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য!

আঁধার যুগের অবস্থা এইরূপই ভয়াবহ ছিল। মানুষ পশু হইয়া গিয়াছিল। সেই নরপশুদিগের বীভৎস তাণ্ডব-লীলায় ধর্ম ও নীতির অস্ফুট আর্তনাদ কোথায় তলাইয়া গিয়াছিল। এই চরম দুর্গতি হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব তাই আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

পরিচ্ছেদ : ৭

শিশুনবী

হযরত মুহম্মদের জন্মের সপ্তাহ দুই পরেই মরুভূমি হইতে বেদুঈন-ধাত্রীরা শিশুসন্তানের অনুসন্ধানে মক্কানগরে আসিয়া উপনীত হইল। তখনকার দিনে আরবে ইহাই ছিল প্রচলিত প্রথা। সম্ভ্রান্ত আরব-পরিবারে কোন শিশুসন্তান জন্মিলে তাহার স্তন্যদান ও লালন-পালনের ভার ধাত্রীর হস্তে ন্যস্ত করা হইত। অবশ্য এজন্য ধাত্রীরা উপযুক্ত পুরস্কার ও বেতন পাইত।

এই প্রথানুযায়ীই প্রতিপাল্য শিশুদিগের সন্ধানে মাঝে মাঝে ধাত্রী ব্যবসায়ী বেদুঈন রমণীরা শহরে আসিত; বলা বাহুল্য, এই উপায়ে তাহারা বেশ-কিছু উপার্জন করিয়া লইত। অবস্থাপন্ন ঘরের শিশুদিগের প্রতিই তাহাদের অধিকতর আকর্ষণ ও লক্ষ্য থাকিত। এজন্য ধাত্রীদিগের মধ্যে প্রথমতঃ কেহই বিধবা আমিনার পুত্রকে গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। অপেক্ষাকৃত ধনীগৃহের সন্তান-লাভের প্রতিই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল:

ধাত্রীদিগের সকলেই মনের মত এক-একটি শিশুসন্তান লাভ করিয়া ফিরিয়া গেল; কিন্তু ধাত্রী হালিমার ভাগ্যে মুহম্মদ ছাড়া অন্য কোন শিশু জুটিল না। তখন হালিমা স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইয়া লাভ কী? এই এতিম শিশুটিকেই গ্রহণ করি, কি বল?"

স্বামী উত্তর দিলেন: "নিশ্চয়ই। মুহম্মদকে গ্রহণ কর। হয়ত ইহার মধ্য দিয়াই আমাদের নসীব্ বুলন্দ হইবে।"

হালিমা তখন শিশু-মুহম্মদকে গ্রহণ করিলেন।

হালিমা ছিলেন বনি-সা'দ গোত্রের মেয়ে। এই সা'দ-বংশের লোকেরা সে-যুগে বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলিবার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। শহরের ভাষা নানা ধারার সংমিশ্রণে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষা এই গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরবে তখন অনাস্থ কুপ্রথা বিদ্যমান থাকিলেও কাব্যকলা ও সুললিত ভাষার খুবই আদর ছিল। যাহার ভাষা যত উদ্দাম ও সাবলীল হইত,

সর্বসাধারণ তাহাকেই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। আশ্চর্যের বিষয়, কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির ইংগিতে শিশু-মুহম্মদের লালন-পালনের ভার গিয়া পড়িল এই মার্জিতরুচি ও উন্নতমনা সা'দ-বংশের উপরে। পরবর্তীকালে হযরত মুহম্মদ যে কথাবার্তায় মিষ্ট ও লালিত্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এইখানে মিলিবে।

শিশু মুহম্মদকে লইয়া হালিমা নিজগৃহে ফিরিয়া চলিলেন। বিবি আমিনা প্রাণের দুলালকে ধাত্রী-হস্তে সমর্পণ করিয়া আল্লাহ্‌তালার নিকট তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন। সেই নিষ্কলঙ্ক চাঁদ মুখখানি দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার সাধ যেন আর মিটিতে চাহে না। করুণ নয়নে তিনি পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে হালিমার উট দৃষ্টি-সীমার আড়ালে চলিয়া গেল।

মুহম্মদকে নিজগৃহে লইয়া আসিবার সংগে সংগে হালিমা এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার গৃহপালিত মেষগুলি অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল এবং অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দান করিতে লাগিল। খর্জুর বৃক্ষে প্রচুর পরিমাণে খর্জুর ফলিতে লাগিল; কোন দিক দিয়াই তিনি আর কোন অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন না। আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার তিনি এই লক্ষ্য করিলেন যে, শিশুনবী যখন হালিমার স্তন্য পান করিতেন, মাত্র একটি স্তন্যই পান করিতেন, অন্যটি করিতেন না। মনে হইত মুহম্মদ যেন জানিয়া শুনিয়াই অপর স্তন্যটি তাঁহার দুধভাই…হালিমার আপন শিশুপুত্রের জন্য রাখিয়া দিতেন। এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া হালিমা প্রথম হইতেই এই অনুপম শিশুটির প্রতি কেমন যেন আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

হালিমার এক পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। পুত্রটির নাম আবদুল্লাহ্ এবং কন্যা তিনটির নাম আনিসা, হোজায়ফা এবং শায়েমা। শায়েমার বয়স তখন সাত-আট বৎসর। মুহম্মদের লালন-পালন কার্যে শায়েমা সর্বদা মাতাকে সাহায্য করিত। মুহম্মদকে সে বড়ই ভালবাসিত। সেই অপরূপ মুখশ্রী, সেই ভুবন-ভুলানো হাসি, সেই স্নিগ্ধ চাহনি দেখিয়া শায়েমার কচি মন বালিকাসুলভ আনন্দে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। আপন সহোদরের মতই সে তাহাকে স্নেহ করিত। মুহম্মদকে কোলে লইয়া দোলা দিতে দিতে সে প্রায়ই সুললিত কণ্ঠে গান গাহিত :

"বেঁচে থাকুক মুহম্মদ···সে দীর্ঘজীবী হোক,
চির-তরুণ চির কিশোর চিরমধুর রো'ক।
হয় যেন সে সরদার আর পায় যেন সে মান,
শত্রু তাহার ধ্বংস হউক···ঘুচুক অকল্যাণ।
মুহম্মদের পানে খোদা করুণ চোখে চাও,
চিরস্থায়ী গৌরব যা—তাই তাহাঁরে দাও।"

কী সুন্দর দৃশ্য এ! বিশ্বনবীকে দোলা দিয়া খেলা করিতেছে এক বেদুঈন বালিকা। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর খোদার পিয়ারা নবী তাহার খেলার সাথী। শায়েমার এই গৌরব—এই আনন্দের তুলনা কোথায়? পরবর্তীকালে হযরত মুহম্মদের জীবনের সহিত কত সাহাবা, কত জ্ঞানীগুণীর কত সম্বন্ধই না স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শায়েমা ও শিশুনবীর এই সম্বন্ধটুকু একেবারে অন্তরঙ্গ! এ যেন একটি ছোট্ট বেহেশ্‌তি ফুল, সকল দৃষ্টির অন্তরালে কালের এক নিভৃত কোণে চিরদিনের মত অক্ষয় ও ভাস্বর হইয়া আছে।

দুই বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। হালিমা মুহম্মদকে আমিনার নিকট লইয়া আসিলেন। আমিনা পুত্রের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মধুর মূর্তি ও দিব্য কান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে তিনি আল্লাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। হালিমার উপরেও তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

এই সময়ে মক্কায় অত্যন্ত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। এ-কারণ আমিনা মুহম্মদকে আরও কিছুদিন হালিমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেওয়া সংগত মনে করিলেন। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিবও এ-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। পুনরায় মুহম্মদ হালিমার গৃহে ফিরিয়া চলিলেন।

মহাপুরুষদিগের জীবনের গতি কত বিচিত্র, কত রহস্যপূর্ণ; পিতৃহীন হইয়াই মুহম্মদ জন্মগ্রহণ করিলেন; এক সপ্তাহ বয়স হইতে না হইতেই জননীর স্নেহের নীড় ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন পরিবেষ্টনের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। দুই বৎসর পরে যদিও বা জননীর কোলে ফিরিয়া আসিলেন; তখনও মাতৃস্নেহ ভোগ করিবার মত অবসর তাঁহার জুটিল না। জননীর স্নেহ, গৃহের মায়া, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেম—কোন কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। ঘর তাঁহার পর হইল, পর তাঁহার আপন হইল। জীবনের প্রথম প্রভাতেই তিনি বিশ্বের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

পরিচ্ছেদ : ৮

প্রকৃতির কোলে

দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে হালিমার কুটীর। বেদুঈন-জীবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সেখানে বিদ্যমান। চতুর্দিকে মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতি—মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, মুক্ত প্রান্তর; তারি মাঝে মুক্ত মানুষের মুক্ত মন। কোথাও বাধা নাই, বন্ধন নাই, জীবনযাত্রার মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা নাই: প্রকৃতির সঙ্গে চমৎকার সুসংগতি তার। শুধু জড়জীবনের ক্ষুধাতৃষ্ণা ও হাসিকান্নাই এ-জীবনের সবটুকু নয়। এর খানিকটা বাস্তব, খানিকটা স্বপ্ন, খানিকটা কঠোর, খানিকটা কোমল; খানিকটা গদ্য, খানিকটা কবিতা। প্রভাত-আলোর ঝর্ণাধারায় প্রাতঃস্নান করা, ঘোড়া ছুটাইয়া দূর-দিগন্তে বিলীন হইয়া যাওয়া, মরু-উদ্যানের খর্জুর বীথিতে ডেরা ফেলিয়া বাস করা, চাঁদনী রাতে নহর কিনারে ভ্রমণ করা, কখনও বা মরু-সাইমন বা মরু-ঝটিকার সম্মুখীন হওয়া—এ সমস্তই বেদুঈন জীবনের রোমান্সের দিক: জীবনের চারিপাশে এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই মিশামিশি আলো-ছায়ার এই লুকোচুরি খেলা, এই আধ-জাগরণ আধ-স্বপ্নের সংমিশ্রণ; ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জীবন। প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন যে জীবন, তাহার কোন মাধুর্য নাই। প্রকৃতির সহিত মানুষ যেখানে মিলিয়া যায়, সেইখানেই জীবনের চমৎকারিত্ব। সাধে কি কবি গাহিয়াছেন:

> "ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুঈন
> চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"

এমনি পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে শিশুনবীর জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল।

শৈশবকাল শিক্ষার সময়। এই সময়ে শিশুর মনে যে-শিক্ষা ও যে-আদর্শের রেখাপাত করা যায়, তাহাই স্থায়ী হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হযরত মুহম্মদের সেরূপ কোন শিক্ষার ব্যবস্থাই হইল না।

কিন্তু সত্যই কি তাই? মুহম্মদের শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থাই নাই?

নিশ্চয়ই হইয়াছে। পিতা নয়, মাতা নয়, শিক্ষক নয়, সমাজ নয়··· স্বয়ং আল্লাহ্‌তালাই তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী-রসুলদের শিক্ষা তো এইভাবেই হইয়া থাকে। মানুষের শিক্ষা ও কৃত্রিম জ্ঞান তো

তাঁহাদের জন্য নয়। তাঁহাদের শিক্ষার পদ্ধতি ও উপাদান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কী অদ্ভুতভাবেই না শিশুনবীর জীবন আরম্ভ হইল। সাধারণ মানব-জীবনের সহিত এ-জীবনের কত পার্থক্য। খোদা যেন কোন্ এক গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই মুহম্মদকে বারে বারে ঘর হইতে টানিয়া বাহিরে আনিলেন। সমাজের বিকৃত চিন্তা ও কলুষিত আদর্শের ছাপ পড়িবার পূর্বেই তিনি তাঁহাকে সরাইয়া আনিয়া বিশাল মরুভূমির উন্মুক্ত পট-ভূমিতে স্থাপন করিলেন। তারপর প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থ তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়া একে একে তাঁহাকে প্রাথমিক পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভাতের অরুণ-রাঙা আকাশ, মধ্যাহ্নের অগ্নিক্ষরা 'লু'-ভরা বাতাস, নিস্তব্ধ নির্জন রাতের ধ্যান-গম্ভীর মৌনতা, দূরে দূরে গিরি-উপত্যকার ধূসর শ্রী, মরু-দিগন্তের মায়া-মরীচিকা, সমস্তই তাঁহার মনে এক অপূর্ব বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে একজন নিয়ন্তা আছেন, তিনি যে আড়ালে থাকিয়া নানা বর্ণে, নানা গন্ধে, নানা গানে, নানা ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন এ সত্য তিনি তাঁহার অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে বেদুঈন-জীবনের সহজ-সরল প্রকাশ-ভঙ্গী, তাহাদের তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, স্বদেশপ্রেম—এ সমস্তও তাহার শিশু-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। এইরূপ অদ্ভুত পদ্ধতিতেই শিশুনবীর শৈশব-শিক্ষা আরম্ভ হইল। সকল জ্ঞানের, সকল সত্যের, সকল তথ্যের, উৎসমুখ যেখানে সেখানে বসিয়াই তিনি জ্ঞানামৃত পান করিতে লাগিলেন। মানুষের রচিত বিকৃত শিক্ষা কেন তিনি গ্রহণ করিবেন? বিশ্বগুরু হইবার জন্য যিনি ধরায় আসিলেন, তিনি কেন অপরকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবেন? তাই তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন—'উম্মি' ছিলেন—ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিকই হইয়াছিল। অসম্পূর্ণ মানুষের অসম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করিলেই তিনি ছোট হইয়া যাইবেন। মানুষের দেওয়া জ্ঞান তাঁহার মনের উপর একটি পর্দার আড়াল টানিয়া দিত, চিরজ্যোতির্ময়ের জ্যোতিঃপুঞ্জ তখন আর প্রত্যক্ষ-ভাবে তাঁহার চিত্তে আসিয়া প্রতিফলিত হইতে পারিত না। এই কারণেই বোধ হয় আল্লাহ্‌তালা সতর্ক অভিভাবকের মত শিশু-মুহম্মদকে সমাজের বিকৃত আবহাওয়া হইতে সরাইয়া লইয়া নির্জন মরুবক্ষে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সৃষ্টিলীলার সমস্ত গোপন রহস্য ও মূল সত্যগুলি জানা হইলেই তো সব

জানা হইয়া যায়। সেই জ্ঞানই তো পরম জ্ঞান। মুহম্মদ সেই স্বর্গীয় জ্ঞানেরই অধিকারী হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ হযরত মুহম্মদ সত্যই যে জগদ্‌গুরু ছিলেন, তাহার এক বড় প্রমাণ: তিনি নিরক্ষর ছিলেন—তাঁহার কোন গুরু ছিল না।

মুহম্মদের বয়স ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এখন পাঁচ বৎসরের বালক। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার এখন প্রাথমিক জ্ঞান জন্মিয়াছে। দুই-ভাইবোন ও অন্যান্য বেদুঈন বালক-বালিকাদের সংগে তিনি এখন খেলিয়া বেড়ান।

কিন্তু এই অল্প বয়সেই মুহম্মদ অতিমাত্রায় চিন্তাশীল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সকল কাজে, সকল কথায় হাবভাবেই কেমন-যেন-একটা অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। কখনও তিনি উন্মনা, কখনও বা তিনি উদাস, কখনও বা তিনি ভাবগম্ভীর। অন্তত তাঁহার সুদূরের পিয়াসী, দৃষ্টি তাঁহার দিগন্ত-বিসারী। দূরের পানে আঁখি মেলিয়া সর্বদাই তিনি কি-যেন-কি ভাবেন। আকাশ যেন নীল নয়ন মেলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে, চাঁদ যেন তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে, তারারা যেন তাঁহাকে দেখিয়া মিটিমিটি করিয়া হাসে, বাতাস যেন তাঁহার কানে-কানে কী গোপন বাণী কহিয়া যায়। দৃশ্য জগতের অন্তরালে ভাঙা-গড়ার যে লীলা চলিতেছে, তাহার রহস্য যেন তিনি পূর্বে জানিতেন, কিন্তু আজ আর মনে নাই। অর্ধবিস্মৃত স্বপ্নের মত এই নিখিল মাখ্‌লুকাত্‌ কেবলি তাঁহাকে উতলা করিয়া তুলে। চেনা-অচেনার আলো-ছায়ায় মন তাঁহার সতত দুলিতে থাকে। সেই পূর্বস্মৃতি মনে পড়াতেই যেন তিনি মাঝে মাঝে এমন বিমনা হইয়া পড়েন।

এমন যে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী। মহাপুরুষদিগের জীবন প্রভাত এমনই বিচিত্র ও সুন্দর!

পরিচ্ছেদ : ৯

বক্ষ-বিদারণ

হালিমার গৃহে অবস্থানকালে হযরত মুহম্মদের জীবনে একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ঘটনাটি এইরূপ :

একদিন শিশু-মুহম্মদ তাঁহার দুধভাই ও অন্যান্য বালকদিগের সহিত মাঠে মেষ চরাইতে গিয়াছেন, এমন সময় একজন ফিরিশ্‌তা তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। মুহম্মদের হাত ধরিয়া তিনি তাঁহাকে একটু আড়ালে লইয়া গেলেন। তারপর তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাঁহার বুক চিরিয়া কি-যেন বাহির করিলেন। মুহম্মদ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। দূর হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বালকেরা ভয়ে দৌড়াইয়া গিয়া বিবি হালিমাকে বলিল : "দেখ গিয়া মুহম্মদ নিহত হইয়াছে"; সংবাদ শ্রবণ মাত্র হালিমা এবং তাঁহার স্বামী ছুটিয়া আসিলেন, দেখিলেন মুহম্মদ বাস্তবিকই অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেবা-শুশ্রূষা করিয়া উভয়ে মুহম্মদকে গৃহে লইয়া আসিলেন।

এই ঘটনা পরবর্তীকালে হাদিস-শরীফে নিম্নরূপে উল্লিখিত হইয়াছে :

"আনাস বলিতেছেন : একদা হযরত বালকদিগের সহিত খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় জিব্রাইল ফিরিশ্‌তা তথায় উপস্থিত হইলেন। জিব্রাইল হযরতকে একটু আড়ালে লইয়া তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইলেন; তারপর তাঁহার বুক চিরিয়া হৃৎপিণ্ডটিকে বাহিরে আনিয়া তাহার মধ্য হইতে খানিকটা জমা-রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন : শয়তানের অংশ যেটুকু তোমার মধ্যে ছিল তাহা এই। তারপর সেই হৃৎপিণ্ডটিকে একটি সোনার তশ্‌তরীতে রাখিয়া জমজমের পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। অতঃপর সেটিকে জোড়া লাগাইয়া পুনরায় যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন। বালকেরা দৌড়াইয়া গিয়া হালিমাকে বলিল : 'দেখ গিয়া, মুহম্মদ নিহত হইয়াছে।' তখন সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মুহম্মদ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়া আছেন। আনাস বলিতেছেন : 'আমি হযরতের বুকে সেলাইয়ের দাগ দেখিয়াছি।"

শুধু যে আনাসই এই হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নহে। ইবনে-হিশাম এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে-হিশাম বলিতেছেন :

"হালিমা বলিয়াছেন : মুহম্মদ একদিন তাহার দুধভাইদের সহিত বাড়ীর নিকট মেষ চরাইতেছিল, এমন সময় বালকেরা ছুটিয়া আসিয়া আমার নিকট বলিল যে, দুইজন শ্বেতবাসপরিহিত লোক আসিয়া তাহাদের কোরেশ-ভাইকে ধরিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আমি এবং আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম মুহম্মদ বিবর্ণ ও ভীত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। আমরা বালকটিকে আলিংগন করিলাম এবং এরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন বালক উত্তর দিল : "দুইটি শ্বেতবাস-পরিহিত লোক আমার নিকট আসিয়া আমাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া আমার কলিজা বাহির করিয়া লইল এবং উহার মধ্য হইতে একটা-কিছু বাহির করিয়া ফেলিল। সে যে কী জিনিস, আমি জানি না।"

অন্য আর একটি হাদিসে আছে :

"একদা কতিপয় লোক হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিল। হযরত বলিতে লাগিলেন : "হযরত ইসমাইলের প্রতি খুদাতালা যে-আশীর্বাদ প্রেরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমি সেই আশীর্বাদ এবং যিশু যাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্যক্তি। আমি যখন মায়ের পেটে ছিলাম, তখন আমার মা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে তাঁহার মধ্য হইতে একটি দিব্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া সিরিয়ার রাজপ্রাসাদকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। একদিন আমি আমার দুধভাইদের সংগে মেষ চরাইতেছিলাম এমন সময় শুভ্রবেশধারী দুই ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া ফেলিয়া হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া উহার মধ্য হইতে এক ফোঁটা কালো রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন। তারপর তাঁহাদের হস্তস্থিত তশ্‌তরীর পানিতে উহা ধৌত করিয়া দিলেন। তখন একজন ফিরিশ্‌তা আমাকে ওজন করিবার জন্য অপরকে বলিলেন। ওজনে আমি দশজনের চেয়েও ভারী প্রমাণিত হইলাম। তখন আমাকে একশত জনের বিরুদ্ধে ওজন করা হইল, এবারেও আমি সকলের চেয়ে ওজনে ভারী হইলাম। তখন একজন অপরজনকে বলিলেন : আর দরকার নাই, সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে ওজন

করিলেও ইহার ভার কম হইবে না।

হযরতের বক্ষ-বিদারণ লইয়া অনেকেই অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। ইউরোপীয় লেখকেরা এ-ঘটনা স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে হযরতের (Epilepsy) বা (Falling disease)—অর্থাৎ 'মূর্চ্ছা' বা 'মৃগীরোগ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা 'possessed' অর্থাৎ 'ভূতে-পাওয়া' বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। এরূপ ব্যাপারে মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

শুধু ইউরোপীয় লেখকদেরই বা দোষ দেই কেন? বক্ষ-বিদারণ ব্যাপারটিকে স্বয়ং বিবি হালিমা এবং তাঁহার স্বামীও এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। শিশু-মুহম্মদের এই আবিষ্টভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের আশংকা হইয়াছিল, হয়ত ছেলেটিকে ভূতে পাইয়াছে বা জীনে ধরিয়াছে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরাইয়া দিবার জন্য হালিমা তাই মুহম্মদকে আমিনার নিকট লইয়া গেলেন। কিন্তু বিবি আমিনা এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন: "তুমি কি মনে করিতেছ যে আমার পুত্রের উপর ভূতপ্রেতের আসর হইয়াছে?" হালিমা উত্তর করিলেন: "হ্যাঁ, সেইরূপই মনে হয়।" আমিনা বাধা দিয়া বলিলেন: "অসম্ভব! উহার উপর ভূতপ্রেতের প্রভাব হইতেই পারে না। আমার পুত্রের মধ্যে একটা পবিত্র ভাব নিহিত আছে। উহা সেই ভাবেরই প্রকাশ।"

বক্ষ-বিদারণ ঘটনাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করা অত্যন্ত কঠিন। রসূলুল্লার জীবনে যেসব অতি-স্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ আছে, বক্ষ-বিদারণ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ঘটনার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত ও ব্যাখ্যা আছে। কেহ বলেন দৈহিকভাবেই এই বক্ষছেদন হইয়াছিল। কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লার বুকে সেরূপ সেলাইয়ের দাগ পর্যন্ত দেখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আবার অনেকেই মনে করেন: ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। তাঁহারা বলেন: বক্ষসম্প্রসারণকে রূপকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। নবী, রসূল, দার্শনিক ইত্যাদি অসাধারণ ব্যক্তিদিগের হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই সম্প্রসারিত করা হইয়া থাকে। মহাপরীক্ষার জন্য, বৃহত্তর কল্যাণের জন্য, মহাকার্য সাধনের জন্য হৃদয়ের পরিব্যাপ্তির একান্ত প্রয়োজন। হৃদয়ক্ষেত্র বিশাল না হইলে মহাসত্যের স্থান হয় না। রসূলুল্লার বক্ষ-বিদারণকে তাঁহারা এই দার্শনিক আলোকেই গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেন।

আমাদের মতে দৈহিক বক্ষ-বিদারণের উপযুক্ত কোন নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতেই সকলের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

—

* এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। হার্ট বা অন্য যে-কোন অংগের অপারেশনের বেলায় ক্লোরোফরম্ বা ঐ জাতীয় anaesthetic দিয়া অনুভূতিকে লোপ করিয়া দিতে হয়। রসুলুল্লার মারফত চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই জগদ্বাসী এই অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতির সন্ধান পায় নাই কি? ঘটনাটির ব্যাখ্যা যেরূপই হউক, নুতন আইডিয়া হিসাবে ইহার মুল্য আছে।

পরিচ্ছেদ : ১০

শিশুনবী এতিম হইলেন

বিবি হালিমা শিশু-মুহম্মদকে আমিনার নিকট ফিরাইয়া দিলেন। পাঁচ বৎসর পর শিশুনবী জননীর কোলে ফিরিয়া আসিলেন। ধাত্রী-গৃহের শৈশব-জীবন এখানেই তাঁহার শেষ হইল।

ইহার পর দিন হালিমা এবং শায়েমা ঘটনার অন্তরালে সরিয়া যাইবেন; আর তাঁহাদের সহিত পাঠকের বড় একটা সাক্ষাৎ হইবে না। হযরতের জীবনের বিপুল পরিসরের মধ্যে খুব একটি ক্ষুদ্র অংশের সংগেই তাঁহারা জড়িত ছিলেন; কিন্তু কত অনিন্দ্য সেই সম্বন্ধটুকু! মায়ের স্নেহ, বোনের ভালবাসা হযরত একমাত্র তাঁহাদের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে হযরতের জীবনে একমাত্র তাঁহারাই পারিবারিক স্নেহ-প্রীতির ছাপ দিতে পারিয়াছিলেন। হৃদয় ও মন কত উদার ও কোমল হইলে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া অপর নারীর একটি শিশুপুত্রকে স্নেহমমতা দিয়া বশ করিয়া রাখা যায়! হালিমার হস্তে শিশু-মুহম্মদ কোন দিনই অযত্ন বা স্নেহের অভাব অনুভব করেন নাই। এতই মধুর ছিল তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ।

অন্যদিকে হযরত মুহম্মদ যে কিরূপ মাতৃভক্ত ছিলেন এবং ভাই-বোনদিগকে তিনি যে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহারও প্রমাণ পাই আমরা এই হালিমা ও শায়েমার প্রতি তাঁহার আদর্শ ব্যবহার দেখিয়া। আপন মাতাপিতাকে সেবা করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য তাঁহার জুটে নাই। জন্মের পূর্বেই পিতাকে এবং অতি শৈশবেই মাতাকে তিনি হারাইয়াছিলেন। কাজেই পুত্ররূপে হযরতকে আমরা দেখিতে পাইব না। কিন্তু হালিমার প্রতি তিনি যে অকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই এ কথা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয় না যে, আব্দুল্লাহ্ ও আমিনা জীবিত থাকিলেও তিনি তাহাদিগকে কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। "বিহিশ্‌ত জননীর চরণতলে অবস্থিত"—এই অমরবাণী যে মহাপুরুষের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহার মাতৃভক্তি যে একেবারে অতুলনীয় হইত, ইহা বুঝাইয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত মুহম্মদ কোন দিন এই দুধ-মা ও দুধ-বোনকে ভুলিতে পারেন নাই। যতদিন হালিমা জীবিত ছিলেন, ততদিন হযরত তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া গিয়াছেন। হালিমা যখনই হযরতের সহিত দেখা করিতে আসিতেন, তখনই হযরত পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন এবং যথোপযুক্ত উপহারাদি দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতেন। একবার হযরত তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় হালিমা হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। হযরত তাঁহাকে দেখিবামাত্র আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজের শিরস্ত্রাণ বিছাইয়া তাঁহাকে বসিতে দিয়া সকলের নিকট এই বলিয়া পরিচয় দিলেন: "মা! আমার মা!"

বিবি খাদিজার সহিত হযরতের যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি এই দুধ-মা ও দুধ-বোনকে আনিতে ভোলেন নাই। আবার যখন আরবে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন হালিমা হযরতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে হযরত সন্তুষ্ট চিত্তে এক-উট-বোঝাই খাদ্যদ্রব্য এবং চল্লিশটি মেষ তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন।

শায়েমার স্মৃতিও হযরত কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। তায়েফ নগর অবরোধকালে শায়েমা বন্দিনী হন। হযরত তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া আপন পরিবারের লোকদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। শুধু তাই নয়, সমগ্র বনি-সা'দ গোত্রের প্রতিই চিরদিন তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

বিবি হালিমা হযরতের নবুয়ত-প্রাপ্তি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি সে সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পরই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিবি হালিমার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজ সহস্র সালাম। এমন সেবাপরায়ণা পুণ্যময়ী জননীর স্পর্শ মানুষের জীবনে এক মস্তবড় আশীর্বাদ। হযরত-জননী যেন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই রূপে দেখা দিয়াছিলেন। আমিনা ছিলেন তাঁহার গর্ভধারিণী জননী, আর হালিমা ছিলেন তাঁহার স্তন্যদায়িনী জননী। অমৃত যেন এক, শুধু পাত্রের বিভেদ। ধন্য হালিমা! অনন্তকালের জন্য তুমি হযরত-পরিবারের সহিত জড়াইয়া গিয়াছ। তোমার

আসন চিরকালের মত বিবি আমিনার পার্শ্বে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। আল্লার অনন্ত রহমত তোমার উপর বর্ষিত হউক।

বালক মুহম্মদ মক্কায় আসিলেন। নতুন করিয়া আবার তাঁহার জীবন-যাত্রা শুরু হইল। মরুভূমির বেদুঈন-জীবন ছাড়িয়া এবার তিনি নাগরিক জীবন আরম্ভ করিলেন। এই জীবনের পারিপার্শ্বিকতা এবং আবহাওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর আমিনা আপন দুলালকে বুকে পাইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিবও এই সুন্দর পৌত্রটির মুখশ্রী ও অসামান্য হাবভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইলেন। স্নেহ দিয়া মমতা দিয়া তাঁহারা এই বালককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু হায়! এ-সুখ মুহম্মদের ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী হইল না।

আমিনার সাধ জাগিল, তাঁহার প্রাণের দুলালকে একবার মদিনায় লইয়া গিয়া পিতৃকুলের সকলকে দেখাইয়া আসেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উম্মে-আইমান নাম্নী একটি পরিচারিকা সংগে লইয়া মদিনা যাত্রা করেন। মদিনায় পৌছিয়া আমিনা তাঁহার স্বামীর কবর জিয়ারত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অতীত দিনের কত স্মৃতি আজ তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। বালক মুহম্মদও আজ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, তিনি পিতৃ-হীন: তাঁহার কচি মনেও একটা বেদনার দোলা লাগিল।

একমাস আনন্দের মধ্যে কাটাইয়া আমিনা পুনরায় মুহম্মদকে লইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু যখন তিনি মক্কা এবং মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহার এক সাংঘাতিক পীড়া জন্মিল। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে তিনি সেইখানেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

কী করুণ দৃশ্যই না ফুটিয়া উঠিল সেই মরুভূমির মধ্যে! চারিদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমি, মাথার উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ! পিতা নাই, মাতা নাই, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহ কাছে নাই। মরুপ্রান্তরে শুধু একটি দাসী আর এই বালক, আর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের উট। শিশু মুহম্মদ জীবনে এই প্রথম ভীষণতার সম্মুখীন হইলেন। আমিনাকে কোন মতে সেইখানে কবর দিয়া উম্মে-আইমান মুহম্মদকে লইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু ইহাই চরম নয়। শিশুনবীর দুঃখের পিয়ালা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এ-পিয়ালা পূর্ণ হইল তখনই—যখন ইহার দুই বৎসর পরে বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব ও মুহম্মদকে ছাড়িয়া দুনিয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

একে একে সকল বন্ধনই কাটিয়া গেল। পূর্বনির্ধারিত একটা গোপন অভিপ্রায় অনুসারেই যেন এই বন্ধন-মুক্তির পালা শুরু হইয়াছিল। মুহম্মদ এখন মুক্ত। মনের চারিপাশে তাঁহার আর কোন বন্ধন নাই। বিশ্বের বুকে তিনি এখন একা। নিঃসংগ অবস্থায় এবার তিনি পথে বাহির হইলেন। অসহায় বালক, সম্মুখে দুর্গম গিরিকান্তার। সহায় নাই, সংগী নাই, পথ নাই, পাথেয় নাই। তবু তিনি বুঝিলেন, এই দুস্তর প্রান্তর একাই তাঁহাকে পাড়ি দিতে হইবে।

পরিচ্ছেদ : ১১

সিরিয়া ভ্রমণ

দিন যায়। বালক মুহম্মদ কৈশোরে পদার্পণ করিলেন।

নবুয়ত বা পয়গম্বরী লাভ করিবার জন্য হযরত মুহম্মদকে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময় তাঁহার জীবনে ব্যর্থ যায় নাই। বিশ্বনবীর গুরুদায়িত্ব বহন করিবার জন্য এই দীর্ঘদিন ধরিয়া আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলেন—একে একে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া তাঁহার পয়গম্বর জীবনের বুনিয়াদকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন। কাজেই বলা যাইতে পারে, এ-যুগ তাঁহার গঠনের যুগ—আয়োজনের যুগ। এখন হইতে হযরতের জীবনে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিবে, পাঠক দেখিতে পাইবেন, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই একটা গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হযরতের জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। প্রকৃতির পাঠ শেষ করাইয়া আনিয়া আল্লাহ্ এবার মানব সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর দিকে হযরতের দৃষ্টি ফিরাইলেন। সমাজ-জীবনের বিচিত্র ধারা দেখিয়া কিশোর নবী অবাক হইলেন। ইহুদী, খৃষ্টান, আরব, পারশিক—কত জাতির কত বৈশিষ্ট্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বাণিজ্য-ব্যাপদেশে অথবা কা'বা-মন্দিরের তীর্থ উপলক্ষে যখন নানাদেশ হইতে নানা জাতীয় লোক আসিয়া মক্কা-নগরে সমবেত হইত, তখন বালক মুহম্মদ নীরবে তাহাদের গতিবিধি ও আচার-অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিতেন। কত মানুষের কত ধারা মক্কাতীর্থে আসিয়া মিলিত হইত, আবার দু'দিন পরেই কোথায় মিলাইয়া যাইত। বাহিরের বিশ্ব যে কত বিরাট, কর বিপুল তখন হইতেই তিনি তাহা ভাবিতে শিখিলেন। কেমন করিয়া কোথায় কোন্ জাতি বাস করে, কেমন তাহাদের দেশ, কেমন তাহাদের জীবন, জানিবার জন্য স্বভাবতই তাঁহার মনে কৌতূহল জন্মিল।

তৎকালে সিরিয়া ও এয়মন প্রদেশের সহিত আরবের বাণিজ্য চলিত। ব্যবসায়ীগণ উটের কাফেলা লইয়া সিরিয়া যাত্রা করিত। বালক মুহম্মদ

দূর হইতে মক্কার তোরণে-তোরণে এই সকল কাফেলার যাওয়া-আসা লক্ষ্য করিতেন। কৌতূহলী মন তাঁহার কোন্ সুদূরে ছুটিয়া যাইত। জন্মভূমির বাহিরে যে বিশাল জগৎ পড়িয়া আছে, সেই জগতের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। কেমন করিয়া মক্কার সীমাপ্রাচীর পার হইয়া বাহিরের জগতের সন্ধান লইবেন, তাহাই তিনি ভাবিতেন।

সুখের বিষয়, এ সাধ তাহার অচিরেই পূর্ণ হইল।

মুহম্মদের বয়স তখন বারো বৎসর। আবুতালিব অন্যান্য মক্কাবাসীদিগের সহিত মালপত্র বোঝাই করিয়া সিরিয়া যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় মুহম্মদ আসিয়া বলিলেন, "চাচাজান, আমিও যাইব।"

আবুতালিব মুহম্মদকে এতই স্নেহ করিতেন যে, তিনি তাঁহার এই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মুহম্মদ যেরূপ অসাধারণ মেধাবী ও সচ্চরিত্র ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সংগে লইয়া গেলে যে আবুতালিবের লাভ ছাড়া কোন ক্ষতির সম্ভাবনাই নাই, তাহা তিনি ভাল করিয়া জানিতেন। হাসিমুখে তাই আবুতালিব এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

হযরতের জীবনে আজ এক নূতন দিন। ভাবী বিশ্বনবীর আজ প্রথম বিশ্ব-পরিচয়। আনন্দ ও কৌতূহলে তাঁহার সারা প্রাণ দুলিয়া উঠিল; উটের পিঠে চড়িয়া তিনি মরুভূমি পার হইয়া চলিলেন। নিখিলের চিরসুন্দর সৃষ্টি···আল্লার প্রিয় নবী মুহম্মদ··আজ ঘর ছাড়িয়া সর্বপ্রথম বিদেশে যাইতেছেন, বহিঃপ্রকৃতি আজ তাই যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল। কোন রাজপুত্র দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলে যে-পথ দিয়া তিনি যান, সে-পথের উভয় পার্শ্বে যেমন করিয়া সাড়া পড়িয়া যায়, হযরতের পথের দুইধারেও তেমনি চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। বিশ্বের সমস্ত উপাদানই আজ যেন মুহম্মদকে একটু সেবা করিতে পারিলে পরম ধন্য হয়।

কাফেলা ধীরে ধীরে গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বহু প্রাচীন নগরীর সহিত মুহম্মদের পরিচয় ঘটিল। হেজার নামক নির্জন পার্বত্য মরু-প্রান্তরে উপনীত হইলে মুহম্মদ জানিতে পারিলেন, এই সেই প্রাচীন নগরী—যেখানে 'সমুদ' জাতির বাসস্থান ছিল। হযরত ইব্রাহিমের আবির্ভাবেরও পূর্বে এই দুর্ধর্ষ জাতি এখানে বাস করিত। ইহারা ঘোর পৌত্তলিক ছিল, আল্লাকে কিছুতেই ইহারা স্বীকার করিত না। তখন আল্লাহ্‌তালা ইহাদিগকে হেদায়েত করিবার জন্য হযরত

সালেহ্ পয়গম্বরকে পাঠাইয়া দিলেন। সমূদগণ প্রথমতঃ তাঁহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। নিকটবর্তী একটি পর্বতগুহার দিকে নির্দেশ করিয়া বলিল: "যদি ঐ গুহার মধ্য হইতে তুমি একটি গর্ভবতী উট আমাদের সম্মুখে বাহির করিয়া আনিতে পার, তবেই বুঝিব যে তুমি পয়গম্বর।" এ কথা শুনিয়া হযরত সালেহ্ আল্লাহ্‌তালার নিকট প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহ্ তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন। শীঘ্রই পর্বতগুহা হইতে একটি উট বাহির হইয়া আসিল এবং অল্পক্ষণ পরেই একটি শাবক প্রসব করিল। সমূদদিগের অনেকেই এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া হযরত সালেহ্‌কে পয়গম্বর বলিয়া মানিয়া লইল এবং আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। তখন হযরত সালেহ্ সেই উটটিকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন: "সাবধান, তোমরা এই উটকে কখনও মারিয়া ফেলিও না। ইহা আল্লাহ্‌তালার দান। যদি ইহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার কর, তবে আল্লার গজব তোমাদের উপর নামিয়া আসিবে।"

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সমূদগণ ক্রমে ক্রমে আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়া পুনরায় মূর্তিপূজা আরম্ভ করিল এবং অবশেষে একদিন উটটিকেও মারিয়া ফেলিল।

সংগে সংগে আকাশ-পথে ভীষণ বজ্রধ্বনি ও ভূমিকম্পের শব্দ উত্থিত হইল। নিমেষের মধ্যে রোজ-কিয়ামৎ ঘটিয়া গেল। পরদিন দেখা গেল, সমগ্র সমূদ জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের দেশ একটা বিজন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

সমূদ জাতির এই কাহিনী শুনিয়া এবং স্বচক্ষে তাহাদের দেশের এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া হযরতের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

মরুভূমি পার হইয়া কাফেলা বোসরা-সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিল। এইবার আর-এক নূতন দৃশ্য হযরতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এতদিন তিনি প্রকৃতির রুদ্রগম্ভীর রুক্ষ মূর্তিই দেখিয়া আসিয়াছেন, স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি দেখেন নাই। এইবার তাহা দেখিতে পাইলেন। বোসরার তরুলতার কী শ্যামল শ্রী! ছায়াঢাকা পাখীডাকা কুঞ্জতল, শাখায় শাখায় ফুল ও ফল, কোথাও বা উচ্ছল কলকল নদীজল! সৃষ্টির এই রূপবৈচিত্র্য দেখিয়া তাঁহার কিশোর কল্পনা কাহার সন্ধানে কোন্ অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিল! আল্লাহ্‌তালার অস্তিত্ব, একত্ব এবং সৃজন-লীলার চমৎকারিত্ব

একসংগে যেন জোর করিয়া তাঁহার মনের উপর দাগ কাটিয়া বসিয়া গেল।

মোয়াবাইট ও এমনাইটদিগের প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া কাফেলা বোসরা নগরে উপনীত হইল। তৎকালে এই নগরী নেষ্টরীয় খৃষ্টানদিগের বাসভূমি ছিল। প্রতি বৎসর এখানে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসিত। নানা দূরদেশ হইতে সওদাগরগণ এখানে বাণিজ্য করিতে আসিত।

এইখানে আসিয়া আবুতালিব তাঁবু ফেলিলেন। নিকটেই ছিল একটি মঠ। বহিরা নামক জনৈক খৃষ্টান সন্ন্যাসী এই মঠে বাস করিতেন। অনতিবিলম্বে বহিরা মঠ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং কাফেলার চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মুহম্মদের হস্ত ধারণপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "এই তো সেই বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শক! এই তো সেই যিশুর প্রতিশ্রুত শান্তিদাতা! আল্লাহ্ ইহাকেই তো সকল জগতের আশীর্বাদস্বরূপ পাঠাইয়াছেন।" বাইবেলে বর্ণিত অনাগত মহানবীর সমস্ত লক্ষণ তিনি মুহম্মদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই তিনি মুহম্মদকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

বহিরা ছিলেন নেষ্টরীয় খৃষ্টান। খৃষ্টানদিগের অন্যান্য সম্প্রদায় তখন পৌত্তলিকতার পাপপংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কিন্তু নেষ্টরীয় সম্প্রদায় আদৌ কোন পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেন না, এমন কি ক্রুশ-চিহ্নকেও তাঁহারা পৌত্তলিকতার প্রতীক বলিয়া বর্জন করিতেন। যিশু-খৃষ্টের প্রচারিত ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই ছিল তাঁহাদের ধর্মজীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই সব কারণে সাধু বহিরা বাইবেলে বর্ণিত যিশুর পরবর্তী নবীর আগমন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন এবং সেই ভাববাদীর আবির্ভাব যে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন। নানা নৈসর্গিক পরিবর্তন ও অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনাদৃষ্টে তৎকালীন অনেক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুপুরুষই এ কথা বিশ্বাস করিতেন। কাজেই বহিরার পক্ষে হযরত মুহম্মদকে চিনিতে পারা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার হয় নাই।

বহিরা হযরত মুহম্মদের সম্মানার্থ এক ভোজসভার আয়োজন করিয়া আবুতালিব ও তাঁহার সংগীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই উপলক্ষে হযরত মুহম্মদের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইল। বহিরা আবুতালিবকে মুহম্মদ সম্বন্ধে সতর্ক হইতে উপদেশ দিলেন। সিরিয়ার

ইহুদীগের হস্তে যাহাতে এই বালক না পড়ে, সেজন্য তিনি বিশেষভাবে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন, কারণ তাঁহার আশংকা হইল ইহুদীরা যদি এই মহাপুরুষের সন্ধান পায়, তবে নিশ্চয়ই ইঁহাকে মারিয়া ফেলিবে।

বহিরার সহিত আলাপ-আলোচনার ফলে মুহম্মদ খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে মোটা-মুটি একটা জ্ঞান লাভ করিলেন। বাহিরে খৃষ্ট-জাতির বিকৃত রূপ এবং নেষ্টরীয় সম্প্রদায়ের সহিত তাহার পার্থক্য দেখিয়া খৃষ্টধর্মের ভিতরকার চিত্র তাঁহার চক্ষে সম্যক পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই জ্ঞান পরে তাঁহার কাজে লাগিয়াছিল।

আবুতালিব মুহম্মদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন। ইহুদীদিগের সম্পর্ক যথাসম্ভব এড়াইয়া সেবারকার মত তিনি বাণিজ্যযাত্রা শেষ করিলেন।

হযরতের সিরিয়া ভ্রমণের মধ্যে আল্লার কতকগুলি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। বোসরার শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও পুষ্পবিতানের মধ্যে কিশোরনবী দেখিতে পাইয়াছিলেন আল্লার সৃষ্টিলীলার কমনীয় রূপ, সমুদ জাতির বাসভূমির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখিয়াছিলেন পৌত্তলিকতা ও খোদা-দ্রোহিতার ভয়াবহ পরিণাম আর বহিরার সহিত সাক্ষাতের ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছিলেন খৃষ্টধর্মের সহিত সত্যিকার পরিচয়। তিনটিই তাঁহার জীবন-সাধনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

পরিচ্ছেদ : ১২

আল্-আমিন্

আবুতালিব সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সেবার বাণিজ্যে তাঁহার প্রচুর লাভ হইল।

ইহার পর আরও কয়েকবার হযরত মুহম্মদ বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলেন। ইহুদী, খৃষ্টান, পারশিক প্রভৃতি তৎকালীন জাতিসমূহের ধর্ম, সংস্কার ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপেই তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

অবসর সময়ে হযরত মুহম্মদ মেষ চরাইতেন। মেষচারণের সহিত পয়গম্বর জীবনের এক আশ্চর্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে অনেক পয়গম্বরই মেষপালক ছিলেন। ইহার গূঢ় কার্যকারণসম্বন্ধ আছে। উন্মুক্ত নীল আকাশের তলে বিশাল প্রান্তরে এক পাল মেষ আর তার একজন চালক। কোন মেষ যাহাতে বিপথগামী না হয়, অপরের শস্যক্ষেত্র নষ্ট না করে, হারাইয়া না যায়, বাঘে না ধরে, অথচ প্রত্যেকেই উপযুক্ত আহার পাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া সন্ধ্যাকালে প্রভুর গৃহে নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসে, ইহাই থাকে মেষ-চালকের প্রধান কর্তব্য ও লক্ষ্য। এই কর্তব্য ও লক্ষ্যের সহিত পয়গম্বর-জীবনের কর্তব্য ও লক্ষ্যের কত নিকট-সম্বন্ধ! পয়গম্বরও তো এক একটা জাতির এমনি পরিচালক! মেষ-চালকের মত সেও ত নর-চালক! খোদার বান্দার পিছনে থাকিয়া তাহাদিগকে সুপথে চালনা করা এবং ইহলোকের ও পরলোকের খোরাক জোগাইয়া পরিপুষ্ট অবস্থায় সকলকে প্রভুর ঘরে পৌঁছিয়া দেওয়াই তো তাঁহার কর্তব্য। এ কর্তব্য, এ দায়িত্বকে বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিবার জন্যই পয়গম্বর মেষচালনা করিতে ভালবাসিতেন। লোকালয়ের বাহিরে নির্জন পাহাড়ের ধার, উপরে উদার নীল আকাশ, নিম্নে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, সমাজ ও সংসারের কলকোলাহল হইতে সেস্থান চিরমুক্ত। চমৎকার পারিপার্শ্বিকতা! প্রকৃতির নিবিড় নীরবতার মধ্যে যে-প্রশান্তি লুকাইয়া থাকে, এইখানে আসিলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়। অসীমের স্পর্শ মনকে যেন উতলা করিয়া তুলে। বনানীর পত্রমর্মর, গিরি-নির্ঝরের

কুলুকুলুধ্বনি, কুসুমের স্নিগ্ধ হাসি, বিহংগের কলগীতি—সমস্তই মনকে পবিত্র করে। এইখানে চিরমৌনা প্রকৃতি যেন কথা কহিতে চাহে। নীরবতার অতল গহনে মন এখানে ডুবিয়া যায়, অসীমের কত কী গোপন বাণী সে শুনিতে পায়। এইখানেই তো সৃষ্টির গূঢ় রহস্য ধরা পড়িবার কথা। আল্লার বাণী নামিয়া আসিবার পক্ষে ইহাই তো উপযুক্ত ক্ষেত্র।

ভিতরে-বাহিরে এমনি করিয়া হযরত মুহম্মদের পয়গম্বর-জীবনের গঠন-কার্য চলিতেছিল। একদিকে বাহির হইতে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন, অপর দিকে ভিতর হইতে তাঁহার মন প্রস্তুত হইতেছিল।

এই সময়ে তিনি এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। বৎসরের এক-একটি নির্দিষ্ট সময়ে হেজাজ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে তখনকার দিনে এক-একটি মেলা বসিত। ঐ সমস্ত মেলায় বিবিধ পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় তো হইতই, অধিকন্তু কাব্যযুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ইত্যাদিও চলিত। দলে দলে লোক আসিয়া ঐ সব মেলায় যোগদান করিত। বিভিন্ন গোত্রের দলপতিরা উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহাদের সম্মুখে কবিরা আপন আপন গোত্রের বংশ-মর্যাদা ও অন্যান্য কীর্তি-কাহিনীর বর্ণনা করিয়া নিজেদের কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিত। কখনও বা কোন বীর নিজের রণনৈপুণ্য ও বিজয়-গাথার আবৃত্তি করিয়া এবং সংগে সংগে অপর গোত্রের কাপুরুষতা ও কুৎসা-কাহিনী বর্ণনা করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করিত। এই সমস্ত ব্যাপার হইতেই বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি ও গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হইত।

একবার এইরূপ একটি দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। তখন যতগুলি মেলা হইত, তাহাদের মধ্যে, 'ওকাজ' মেলাই ছিল সর্বপ্রধান। এই মেলা হইতেই স্বাভাবিকভাবে একটি কলহের সৃষ্টি হইল এবং পরে সেই কলহই ভীষণ যুদ্ধে পরিণত হইয়া আরবের সকল গোত্রের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল এবং হাজার হাজার লোক ইহাতে মারা গিয়াছিল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'হর্‌বে-ফোজ্জার' (অন্যায় সমর) নামে অভিহিত।

হাশিম বংশও এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহাদের মধ্যে আবুতালিব ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনও ছিলেন। শেষদিকে হযরত মুহম্মদকেও

পিতৃব্যের সহিত এই যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছিল। তবে তিনি কাষতঃ যুদ্ধ করেন নাই, পিতৃব্যদের সংগে থাকিয়া তাঁহাদের তীর কুড়াইয়া দিতেন মাত্র।

এই যুদ্ধে কোরেশদিগের কোনই দোষ ছিল না। বিপক্ষগণ অন্যায়-ভাবে তাঁহাদিগের উপর আক্রমণ করাতেই কোরেশগণ যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হন।

হযরত মুহম্মদের যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ইহাই প্রথম। এই যুদ্ধে তিনি কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিলেও একটা মস্তবড় লাভ তাঁহার হইয়াছিল। আরবদিগের মধ্যে যে-নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা লুকাইয়া ছিল, তাহা যেন মূর্তি ধরিয়া তাঁহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। বিনা কারণে মানুষ মানুষের প্রতি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে! বিনা কারণে মানুষ এমন করিয়া মানুষের রক্ত পান করিতে পারে! সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর ধরিয়া কত ঘরেই না কত ক্রন্দন, কত হাহাকার উত্থিত হইয়াছে! কত নারীই না বিধবা হইয়াছে, কত শিশুই না পিতৃহীন হইয়াছে! এই অন্যায় জুলুমের কি কোন প্রতিকার নাই?

মুহম্মদ বসিয়া বসিয়া ভাবেন।

সুখের বিষয়, এই চিন্তায় তিনি একজন দোসর পাইলেন। ইনি মুহম্মদের কনিষ্ঠ পিতৃব্য জুবায়ের। এই তরুণ যুবক ছিলেন নিশান-বরদার, কাজেই তিনিও বাস্তব যুদ্ধের অংশ গ্রহণ করেন নাই। একজন নিশানধারী, আর একজন তীরসংগ্রহকারী। কাজেই রণক্ষেত্রে কী বীভৎস লীলা চলিয়াছে, তাহা সম্যকরূপে দেখিবার ও ভাবিবার মত মনের অবস্থা উভয়েরই ছিল। যুদ্ধে যাহারা লিপ্ত থাকে, তাহারা ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বুঝিতে পারে না। যাহারা দর্শক, তাহারাই তাহা ভালরূপে বুঝিবার সুযোগ পায়। হযরত মুহম্মদ ও জুবায়েরও এই কারণেই এই ভয়াবহ যুদ্ধের স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

একটা সন্ধির দ্বারা এই আত্মঘাতী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করা হইল।

কিন্তু হযরতের মন তখনও শান্ত হইল না। আর্ত, পীড়িত, ব্যথিত, অত্যাচারিতকে রক্ষা করিবার জন্য—সংগে সংগে অত্যাচারীকে বাধা দিবার জন্য—তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। পূর্বে আরবের প্রথা ছিল যে স্বগোত্রের কোন লোক কোন অন্যায় করিলেও তাহাকে দলগতভাবে

সমর্থন করা হইত। হযরত দেখিলেন, এই কুৎসিৎ মনোবৃত্তিই সকল সর্বনাশের মূল। যে-কেহই অন্যায় করুক, তাহা অন্যায়ই এবং তাহাকে রোধ করিতেই হইবে—ইহাই হইল তাঁহার দৃঢ় পণ।

এতদুদ্দেশ্যে আরবের কতিপয় উৎসাহী যুবককে লইয়া তিনি একটি সেবাসংঘ গঠন করিলেন। সেবকগণ আল্লার নামে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন:

(১) আমরা নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদিগকে সেবা করিব।

(২) অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দিব।

(৩) অত্যাচারিতকে সাহায্য করিব।

(৪) দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিব।

(৫) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করিব।

এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা-বাণীর নাম হইল 'হিলফ্-উল-ফযুল।'

তরুণের কী সুন্দর ও শাশ্বত আদর্শই না আমরা এখানে পাইলাম। উপরোক্ত পাঁচটি আদর্শ যুগে-যুগে দেশে-দেশে সকল তরুণেরই অনুকরণীয় নহে কি? আর্তকে সেবা করা, অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া, উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও মৈত্রী স্থাপন করা—ইহাই তো তরুণের ধর্ম। এই তরুণকেই তো আমরা কামনা করি। তরুণের এক হাতে থাকিবে সেবা, প্রেম ও সংগঠনের উপচার, অন্য হাতে থাকিবে নাঙ্গা তলোয়ার। সত্য, সুন্দর ও মংগলকে সে বরণ করিবে—অসত্য, অসুন্দর ও অমংগলের বিরুদ্ধে সে জেহাদ করিবে। তরুণকে আসিতে হইবে ফুলের মত সুন্দর হইয়া—ফলের অন্তহীন সম্ভাবনা লইয়া। বাহিরে সে হইবে উচ্ছল লীলা-চঞ্চল, কিন্তু ভিতরে সে হইবে একজন সংযমী সাধক। সে আসিবে প্রাণের প্রাচুর্য লইয়া—রিক্ত হস্তে নয়। দক্ষিণ সমীরণে সে হাসিবে, নাচিবে, খেলিবে বটে, কিন্তু বিদায়-বেলায় সে রাখিয়া যাইবে তাহার প্রাণের সমস্ত সঞ্চয়কে ঐ পুরাতন বৃক্ষের কাণ্ডে কাণ্ডে, ডালে ডালে। তরুণের হাতে এমনি করিয়া বর্ষে বর্ষে আসিবে পুরাতনের পুষ্টি ও নবজীবনের উল্লাস। তরুণের বিদ্রোহ হইবে তাই সৃষ্টিধর্মী; তার জীবনের লীলা প্রকাশ পাইবে পুরাতনকে অস্বীকার করিয়া নয়—সহজভাবে তাহাকে স্বীকার করিয়া; স্বতন্ত্র হইয়া নয়—তাহাকেই আশ্রয় করিয়া। এত প্রাণ-প্রাচুর্য লইয়া আসিবে যে, প্রাচীনের সমস্ত দৈন্য ও অভাব ঢাকিয়া দিয়াও তাহার প্রাণশক্তি যথেষ্ট অবশিষ্ট থাকে। প্রাচীনকে

তাই সে ভয় করিবে না বা অস্বীকার করিবে না ; তার সব অক্ষমতাকে মানিয়া লইয়াই তাহাকে আসিতে হইবে। এইখানেই তো তরুণের কৃতিত্ব। তরুণ হইবে একজন 'মর্দ্-ই-মুমী'ন্—শৌর্যে-বীর্যে জ্ঞানে-গুণে বলিষ্ঠ কর্মবীর। এই আদর্শ-তরুণ বেশেই আমরা দেখিলাম যুবক-নবী মুহম্মদকে। এই তরুণের সেদিনও যেমন প্রয়োজন ছিল, আজও আছে ঠিক তেমনি প্রয়োজন। দেশ ও জাতি এই তরুণকে আজ সারা প্রাণ দিয়া কামনা করে।

হযরতের প্রতিষ্ঠিত সেবাসংঘ বেশ ভালভাবেই চলিতে লাগিল। হযরত ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোথায় কোন্ অনাথ বালক ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দন করিতেছে, কোথায় কোন্ দুঃস্থ পীড়িত রুগ্নব্যক্তি আর্তনাদ করিতেছে, কোথাও কোন্ বিধবা নারী নিরাশ্রয় হইয়াছে, তাহাই তিনি সন্ধান করিয়া ফিরিতেন। কোথাও বা তিনি এতিম শিশুকে কোলে লইয়া আদর করিতেন, কোথাও বা রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার পরিচর্যা করিতেন, কোথাও বা অন্য কোন কল্যাণ-কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রতিবেশীকে সাহায্য করিতেন। এমনিভাবে লোকসেবায় তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন।

এই সেবা, এই ত্যাগ, এই মানব-প্রীতি কি কখনও ব্যর্থ যাইতে পারে? সত্যিকার কল্যাণপ্রচেষ্টা ও নিঃস্বার্থ সেবা মানুষ কতদিন অস্বীকার করিয়া চলিবে? আরবগণ তাই দিনে দিনে মুহম্মদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। মুহম্মদ যে ভণ্ড নয়, এ বিশ্বাস সকলের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গেল। অবশেষে এমন হইল যে, আরবগণ একবাক্যে তাঁহাকে 'আল্-আমিন্'—অর্থাৎ 'বিশ্বাসী' —এই উপাধি দান করিয়া ফেলিল। 'মুহম্মদ' নাম চাপা পড়িয়া গিয়া 'আল্-আমিন্' নামই ভাসিয়া উঠিল। দেখা হইলেই লোকেরা বলিয়া উঠিত: "এই যে আমাদের 'আল্-আমিন্' আসিতেছে।"

নীতিধর্মবিবর্জিত ঈর্ষাবিদ্বেষকলুষিত পরশ্রীকাতর দুর্ধর্ষ আরবচিত্তে এতখানি স্থান লাভ করা তখনকার দিনে সহজসাধ্য ছিল না। অনুপম চরিত্র-মাধুর্য, সততা, আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম মানব-প্রেম ছিল বলিয়াই মুহম্মদের পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

বস্তুতঃ হযরতের 'আল্-আমিন্' উপাধি লাভের মধ্যে এই সত্যই আমরা উপলব্ধি করিলাম যে, ভবিষ্যৎ-জীবনের সমস্ত সার্থকতা নির্ভর করে বাল্য-জীবনের সত্যবাদিতার উপরে। সত্যবাদিতাই চরিত্র-গঠনের প্রথম উপকরণ। আমাদের অভিভাবকদিগকে এইখানে পাঠগ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

পরিচ্ছেদ : ১৩

শাদী-মুবারক

এই সময়ে মক্কানগরে কোরেশ গোত্রে এক সম্ভ্রান্ত বিধবা মহিলা বাস করিতেন। নাম তাঁহার খাদিজা। এমন সতীসাধ্বী পুণ্যময়ী নারী তখনকার দিনে আরবে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। সমগ্র দেশ জুড়িয়া যেখানে নারীত্বের প্রতি লাঞ্ছনা ও দুর্গতির লীলা চলিতেছিল, নারী যেখানে কেবলমাত্র ভোগের বস্তু রূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল সেখানে এই মহীয়সী মহিলা আপন মর্যাদা বাঁচাইয়া পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিতেছিলেন। অন্তরের শুচিতায় ও শুভ্রতায় এতই তিনি যশস্বিনী হইয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে খাদিজা না বলিয়া 'তাহিরা' (পবিত্রা) বলিয়া ডাকিত।

খাদিজার শুধু যে অন্তরের ঐশ্বর্যই ছিল, তাহা নহে ; প্রভূত ধনসম্পত্তিরও তিনি অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার দুইবার বিবাহ হইয়াছিল ; কয়েকটি পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছিল। দ্বিতীয় স্বামী মৃত্যুকালে অগাধ ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন ; সেই সূত্রেই তিনি এমন সম্পদশালিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। কর্মচারী দ্বারা তিনি নানাদেশে বাণিজ্য চালাইতেন এবং নিজেই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। একজন নারীর পক্ষে এত বড় একটা ব্যবসায় পরিচালন করা তখনকার দিনে কম কৃতিত্বের বিষয় ছিল না।

এদিকে 'আল্-আমিনের' গুণগরিমাও আরবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ত্যাগ, সেবা, সততা ও চরিত্র-মাধুর্য দ্বারা তিনি সারা আরবের হৃদয় জয় করিয়া ফেলিয়াছেন। শুধু তাই নয়, বৈষয়িক বুদ্ধিতেও মুহম্মদ সকলকে হার মানাইয়াছেন। যতবারই তিনি বাণিজ্য করিতে গিয়াছেন, ততবারই তিনি প্রচুর লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই ধীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান যুবকটির কীর্তিকথা বিবি খাদিজার কর্ণে পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটে নাই। অন্তরের অন্তস্থলে তাঁহার সাধ জাগিতেছিল— এই চরিত্রবান যুবকটির উপর-যদি তিনি তাঁহার বাণিজ্য-ভার অর্পণ করিতে পারিতেন !

এই উদ্দেশ্যে খাদিজা একদিন মুহম্মদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দূর সম্পর্কে মুহম্মদ তাঁহার চাচাতো ভাই হইতেন। মুহম্মদ আসিলে খাদিজা বলিলেন: "ভ্রাতঃ, আমার একটি অনুরোধ আপনি রাখিবেন কি?"

মুহম্মদ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন: "কী অনুরোধ, বলুন?"

"আমার এই তেজারতির ভার আপনাকে লইতে হইবে। ইহার জন্য আপনাকে আমি দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিব।"

হযরত মনে মনে খুশী হইলেন; তবে তিনি তখনই কোন চূড়ান্ত জবাব দিলেন না। বলিলেন: "আমার চাচাজীর মতামত লইয়া আপনাকে জানাইব।"

মুহম্মদ আসিয়া আবুতালিবকে এ কথা বলিলেন। আবুতালিব অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; অবস্থা তো তাঁহার স্বচ্ছল ছিল না; তাই এ প্রস্তাব তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন।

কাফেলা প্রস্তুত হইল। মুহম্মদ বাণিজ্যে চলিলেন।

এবার দামেশ্‌ক্‌ অভিমুখে। ইয়াস্রেব, হাইফা, জেরুজালেম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে করিতে মুহম্মদ দামেশ্‌কে পৌঁছিলেন। সর্বত্রই তাঁহার প্রভূত লাভ হইল।

অন্যান্য বার হযরত বাণিজ্য করিতে যাইতেন পিতৃব্যের সহকারীরূপে, এবার গিয়াছিলেন বিবি খাদিজার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরূপে। কাজেই এবারকার বাণিজ্যে একটা স্বাধীনতার আনন্দ ছিল। আপন অন্তর্নিহিত শক্তি ও গুণাবলীকে তিনি এবার কাজে লাগাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আশানুরূপ লাভ হওয়ায় হযরত তাই মনে মনে একটা আত্মপ্রত্যয় ও নব স্ফূর্তির আনন্দ উপভোগ করিলেন।

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। বিবি খাদিজা মুহম্মদের আসা-পথ চাহিয়া আছেন। একটা কিসের যেন অশান্তি ও উদ্বেগ তাঁহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। মুহম্মদের প্রশান্ত কমনীয় মূর্তি নিশিদিন তাঁহার মনে জাগিতেছে। এই অহেতুক ব্যগ্রতা ও আকুলতার কারণ কী? একি প্রেম? কে বলিবে! বিধবা হইবার পর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি খাদিজাকে বিবাহ করিবার জন্য পয়গাম পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কাহারও প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। আজ এ কী নূতন অনুভূতি তাঁহার অন্তর-তলে দেখা দিল! জীবনের সুপ্ত সাধ এই অবেলায় কেন আবার

জাগিয়া উঠিল। খাদিজা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। একটা নূতন প্রেরণা আসিয়া যেন তাঁহার অন্তরকে বাহিরে টানিয়া চলিল, কিছুতেই তিনি আপনাকে আপনার মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না।

একদিন অপরাহ্ণে খাদিজা আপন গৃহের চত্বরে দাঁড়াইয়া দিগন্তের পানে চাহিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন: মরুভূমির ওপার হইতে উটের পিঠে চড়িয়া মুহম্মদ ফিরিয়া আসিতেছেন। একদৃষ্টে তিনি সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইতে লাগিল, একটি বিহিশ্‌তী রঙিন স্বপ্ন যেন ধীরে ধীরে তাঁহার নয়ন-পথে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে।

মুহম্মদ আসিয়া সমস্ত হিসাবপত্র ও টাকাকড়ি বুঝাইয়া দিলেন। প্রচুর লাভ হইয়াছে দেখিয়া খাদিজা মুহম্মদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার সততা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়াও তিনি মুগ্ধ হইলেন। প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়া তিনি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

দিন যায়। খাদিজার অন্তর ক্রমেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে তিনি সত্যই বুঝিতে পারিলেন, মুহম্মদকে তিনি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। মুহম্মদকে বিবাহ করিবার জন্য তাই তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

নফিসা নাম্নী খাদিজার এক সহচরী ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষেরই আত্মীয়া। খাদিজা তাঁহার নিকটে আপন প্রাণের গোপন কথা ব্যক্ত করিলেন। মুহম্মদের মতামত জানিবার জন্য তিনি তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।

নফিসা মুহম্মদের নিকট পৌঁছিয়া প্রসংগটি অতি সুন্দরভাবে উত্থাপন করিলেন। বলিলেন: "আপনি বিবাহ করিতেছেন না কেন?"

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া মুহম্মদ বলিলেন: "কে আমাকে বিবাহ করিবে? বিবাহ করিবার মত সামর্থ্য আমার কই?"

নফিসা: "যদি তাহার সুব্যবস্থা হয়?"

মুহম্মদ: "তার মানে?"

নফিসা: "মনে করুন যদি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা—যিনি রূপে-গুণে ধনে-মানে অতুলনীয়া—আপনাকে বিবাহ করিতে চান?"

মুহম্মদ: "কে তিনি? শুনিতে পারি কি?"

নফিসা: "তিনি বিবি খাদিজা।"

মুহম্মদের প্রাণ দুলিয়া উঠিল। তিনিও মনে মনে এই অনুমানই করিতেছিলেন। বিবি খাদিজার প্রতি তাঁহার অন্তরও আকৃষ্ট না হইয়া পারিল না। খাদিজা পরিণতবয়স্কা এবং বিধবা হইলেও তাঁহার মধ্যে একটা শান্ত শ্রী ও ফিরদৌসের সুষমা লুকাইয়া ছিল। সেই পবিত্র সৌন্দর্য লালসার দৃষ্টিতে কখনও ধরা পড়ে না; শুচি-শুভ্র অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তাহা দেখিতে হয় এবং তাহা ভোগ করিতে হইলে সংযম ও সাধনা দ্বারা হৃদয়কে পূর্ব হইতেই পবিত্র করিয়া রাখিতে হয়।

মনে মনে মুহম্মদ খুশি হইলেন। কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন: "কি করিয়া আপনি জানিলেন যে, বিবি খাদিজা আমাকে বিবাহ করিতে চান?"

নফিসা হাসিয়া উত্তর দিলেন: "আমি জানি এবং আমি ইহা করাইয়াও দিব।"

এইবার মুহম্মদ নিজেকে ধরা দিয়া বলিলেন: "বেশ, তিনি যদি রাজী হন, আমিও রাজী।"

তখন উভয়পক্ষের অভিভাবকদিগের মধ্যে যথারীতি প্রস্তাব ও আলোচনা আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষই সম্মত হইলেন। বিপুল উৎসাহ ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়া মুহম্মদ ও খাদিজার শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। মুহম্মদের পক্ষে তাঁহার চাচা আবুতালিব এবং খাদিজার পক্ষে তাঁহার চাচা আমর-বিন্-আসাদ অভিভাবকত্ব করিলেন। মাত্র সাড়ে বারো 'উকিয়া' (তৎকালীন মুদ্রা) পণ নির্ধারণে এই শুভ শাদী সুসম্পন্ন হইল।

কী অপূর্ব এই মিলন! একটি পঁচিশ বৎসরের তরুণ যুবক—রূপে-গুণে যাঁহার তুলনা নাই—তিনি বিবাহ করিতেছেন চল্লিশ-বৎসর-বয়স্কা বিগতযৌবনা এক বিধবা নারীকে! ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াসেই কোন পরমাসুন্দরী আরব-তরুণীকে বিবাহ করিতে পারিতেন। জানিয়া শুনিয়াই তবে কেন তিনি এই বিবাহে স্বীকৃত হইলেন? মুহম্মদের জীবনে কি তবে যৌবনের স্বভাব-ধর্ম প্রকাশ পায় নাই? তাঁহার মনে কি কোন সৌন্দর্যানুরাগ ছিল না?—নিশ্চয়ই ছিল। তবে সে সৌন্দর্যানুভূতি স্থূল নহে—সূক্ষ্ম। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের স্বপ্ন-বিলাস, কামনার ফেনিলোচ্ছ্বাস তাঁহার মধ্যে ছিল না। দেহের অন্তরালে অন্তর্লোকের যে গোপন সুষমা,

মুহম্মদ ছিলেন তাহারই পিয়াসী। সেই সৌন্দর্য খাদিজার ভিতরে পরিপূর্ণ মাত্রায় ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এ বিবাহের ঘটকও নফিসা নহে, মুহম্মদ-খাদিজারও এ বিবাহ নহে। এ বিবাহের ঘটক স্বয়ং আল্লাহ্ এবং প্রকৃতপক্ষে এ বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল 'আল্-আমিন্' ও 'তাহিরা'-র মধ্যে—সত্য ও পবিত্রতার মধ্যে। একদিকে বিশ্বাসের জলন্ত প্রতীক মুহম্মদ, অপরদিকে পুণ্য ও পবিত্রতার শুভ্র প্রতিমূর্তি খাদিজা—কেন তবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট না হইবে!

সত্য ও পবিত্রতার আকর্ষণ এমনই সুন্দর ও স্বাভাবিক।

বলা বাহুল্য, এই বিবাহও হযরতের পয়গম্বর-জীবনের আয়োজন মাত্র। হযরতের নবুয়তের বিকাশ ও সার্থকতার জন্য খাদিজার সহযোগের প্রয়োজন তাই ছিল, আল্লাহ্‌তালা এমনভাবে এই মিলন সংঘটিত করিয়া দিয়াছিলেন। এ মিলন যতটা না দৈহিক, তার চেয়ে বেশী আত্মিক। ইহার মধ্যে এক অপার্থিব সম্পদ নিহিত ছিল। তাহা না হইলে এরূপভাবে একজন প্রতিভাবান যুবক তাহার সমগ্র যৌবন নির্বাণোন্মুখ একটি নারীর জন্য অকাতরে বিলাইয়া দিতে পারিত না। একদিনের জন্য নয়, দুদিনের জন্য নয়, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল মুহম্মদ এই স্ত্রীর সহিত হাসি মুখে কাল কাটাইয়াছেন। খাদিজা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মুহম্মদ দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেন নাই। ৬৫ বৎসর বয়সে বিবি খাদিজার মৃত্যু হয়, তখন মুহম্মদের বয়স ৫০ বৎসর। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একদিনের তরেও হযরত খাদিজার উপর বিরক্ত হন নাই, সমগ্র যৌবন বিফলে গেল বলিয়াও কোনদিন অনুযোগ করেন নাই। পরম তৃপ্তি এবং সন্তোষের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। স্বার্থসিদ্ধির মানসে নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে নয়, নিতান্ত অকৃত্রিম প্রেম ও প্রীতির বন্ধনেই এই দুইটি হৃদয় চিরদিন সমভাবে নিবদ্ধ ছিল। শুধু তাই নয়। খাদিজার মৃত্যুতে হযরত গভীর মর্মবেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। এবং আজীবন তিনি খাদিজার স্মৃতিকে পরম শ্রদ্ধাভরে বহন করিয়া চলিতেছিলেন। বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর প্রয়োজনবোধে তিনি আরও কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকল স্ত্রীর ঊর্ধ্বে ছিল খাদিজার আসন। পরবর্তীকালে তরুণ-বয়স্কা বিবি

আয়েষা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : "হে রসুলুল্লাহ্, আপনি সর্বদা বিবি খাদিজার প্রশংসাই কেন করেন ? আমি কী খাদিজার চেয়েও রূপে-গুণে শ্রেয়ঃ নহি ?" তদুত্তরে হযরত বলিয়াছিলেন : "আয়েষা, বিবি খাদিজা যাহা ছিলেন, তুমি তাহা নও।" ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, খাদিজার মধ্যে মুহম্মদ কী অপরিসীম বিহিশ্‌তী সওগাত লাভ করিয়াছিলেন।

জগতে বহু পয়গম্বর আসিয়াছেন এবং অনেক বিবাহও করিয়াছেন। কিন্তু এমন সুস্পষ্টভাবে অপর কাহারও বিবাহ আমরা দেখিতে পাই নাই। এ যেন আমাদেরই কোন প্রতিবেশীর বিবাহ—একেবারে বাস্তব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ !

এই বিবাহ দ্বারাই আল্লার রসুল সত্যিকারভাবে মাটির মানুষ সাজিলেন, মানবীয় আবেষ্টনের মধ্যে এইবার তিনি সম্পূর্ণরূপে ধরা দিলেন। আকাশচারী নন্দন-পাখী মাটির পৃথিবীতে যে নীড় রচনা করিল।

পরিচ্ছেদ : ১৪

কা'বা-গৃহের সংস্কার

মক্কার কা'বা-গৃহ চির-প্রসিদ্ধ। ইহার নাম ছিল 'বায়তুল্লাহ্' বা আল্লার ঘর। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই গৃহটি জগতের সর্বপ্রধান ভজনালয় রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। অন্ধ কুসংস্কারের মোহে পড়িয়া কোরেশগণ এই পবিত্র গৃহে বহু দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করিলেও মনে মনে তাহারা এ কথা জানিত যে, ইহা সত্যই আল্লার ঘর এবং ইহার রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্। কা'বাশরীফ সম্বন্ধে এই ধারণা যে তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, একটি প্রসিদ্ধ ঘটনায় তাহা সুপ্রকট হইয়া আছে। ঘটনাটি এই :

হযরত মুহম্মদ যে-বৎসর ভূমিষ্ঠ হন, সেই বৎসর (অনেকের মতে তাঁহার জন্মদিনেই) কা'বা-গৃহের উপর এক ভীষণ বিপদ আপতিত হয়। এয়মনের খৃষ্টান শাসনকর্তা আবরাহা এক বিপুল—হস্তিসেনাবাহিনী লইয়া মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। স্বীয় রাজধানীতে তিনি এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় ও তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার সাধ জাগিয়াছিল। কিন্তু মক্কায় কা'বা-গৃহই তাঁহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, কারণ পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগৃহ বলিয়া তখন ইহার খ্যাতি দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য মনে মনে তিনি কা'বা-মন্দিরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতে থাকেন এবং উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইহাই ছিল আবরাহার মক্কা-অভিযানের মূল কারণ ও লক্ষ্য।

তখন আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কা'বা-গৃহের সংরক্ষক এবং কোরেশদিগের দলপতি। আবরাহা যখন মক্কার উপকণ্ঠে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন, তখন ঘটনাচক্রে আব্দুল মুত্তালিবের দুই শত উট আবরাহার সৈন্যদিগের কবলে পতিত হয়। আব্দুল মুত্তালিব এই সংবাদ পাইয়া আবরাহার শিবিরে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। আবরাহা ভাবিলেন, আব্দুল মুত্তালিব নিশ্চয়ই ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে

আসিয়াছেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ মঞ্জুর করিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার নিকট উপস্থিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন: "দয়া করিয়া আমার উটগুলি ফিরাইয়া দিন।" আবরাহা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন: "বেশ তো মজার লোক আপনি! একটু পরেই যে আমি আপনার কা'বা-মন্দিরকেই ধূলিসাৎ করিয়া দিব। সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া আপনি শুধু আপনার কয়েকটি উটের জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন, দেখিতেছি!" এই বলিয়া তিনি একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। তখন আব্দুল মুত্তালিব দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কা'বা-গৃহের জন্য আমার মাথা-ব্যথা নাই। কা'বার মালিক আল্লাহ্। আল্লাই উহা রক্ষা করিবেন। উটের মালিক আমি, তাই উটগুলি রক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

আবরাহা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

যথাসময়ে তিনি সসৈন্যে কা'বা-মন্দির আক্রমণ করিতে চলিলেন। অগণিত শত্রু-সেনার বিরুদ্ধে বাধা দেওয়া নিরর্থক মনে করিয়া কোরেশগণ মক্কা ছাড়িয়া পর্বত-গুহায় আশ্রয় লইল। তখন আব্দুল মুত্তালিব কা'বা-গৃহের আঙিনায় দাঁড়াইয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন: "হে আল্লাহ্, আমরা দুর্বল, তোমার ঘর তুমি রক্ষা কর।"

আব্দুল মুত্তালিবের এই প্রার্থনা আল্লাহ্ সত্যই কবুল করিয়াছিলেন। আসন্ন বিজয়-গর্বে উন্মত্ত হইয়া আবরাহার সৈন্যদল যখন কা'বা-মন্দির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল, তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া বসিল। আবরাহার হস্তী কিছুতেই আর কা'বার দিকে অগ্রসর হইতে চাহে না, কা'বার উদ্দেশে মাথা নোয়াইয়া সে শুইয়া পড়ে। তাহাকে কত মারধর করা হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। অন্য যে কোন দিকে মুখ ফিরাইয়া দিলে সে উঠিয়া হাঁটা দেয়, কিন্তু কাবা'র দিকে মুখ ফিরাইলেই শুইয়া পড়ে! সঙ্গে সঙ্গে আর এক দারুণ বিপদ দেখা দিল। হঠাৎ কোথা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে 'আবাবিল' পাখী উড়িয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের প্রত্যেকের মুখে এক একটি কঠিন প্রস্তর-খণ্ড। প্রস্তর-খণ্ডগুলি তাহারা বৃষ্টিধারার মত আবরাহা-সৈন্যদিগের মস্তকে অবিরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেনাদল দিশেহারা হইয়া ফিরিয়া চলিল। কিন্তু কেহই রেহাই পাইল না, যে যেখানে ছিল, সেইখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

এইরূপে নিমেষের মধ্যেই আবরাহা ও তাঁহার বিপুল বাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।*

কুরআন-শরীফে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন:

"তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রভু কেমন করিয়া গজপতির সহিত ব্যবহার করিলেন? তিনি কি তাহার যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন নাই? ঝাঁকে ঝাঁকে 'আবাবিল' পক্ষীকে তাহাদের উপর পাঠান নাই—যাহারা তাহাদিগকে শক্ত পাথর ঠুকিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল? এইরূপে তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত তৃণের ন্যায় নিশ্চিহ্ন করিয়া ছাড়িয়াছেন।"

(সূরা ফিল)

এমনই ছিল কা'বা-গৃহের মাহাত্ম্য।

হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবকালে কা'বা-গৃহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর-বেষ্টিত না থাকায় বর্ষার সময় ভিতরে পানি ঢুকিয়া পড়িত। তা ছাড়া উপরে কোন ছাদ ছিল না বলিয়া সময়ে সময়ে ইহার আসবাবপত্রও চুরি যাইত। এই সব কারণে কোরেশগণ বহুদিন হইতে কা'বা গৃহের মেরামতের জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন।

এই সময়ে জেদ্দা-বন্দরে হঠাৎ একখানি জাহাজ বানচাল হইয়া যাওয়ায় কোরেশদিগের কা'বা-মেরামতের আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। জাহাজ-খানির তক্তাগুলি তাঁহারা সস্তাদরে কিনিয়া আনিলেন এবং তাহাই দিয়া মেরামত-কার্য আরম্ভ করিলেন।

কোরেশ দলপতিগণ সকলেই বেশ মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ একটি বিভ্রাট ঘটিল। কা'বা-গৃহের প্রাংগণে যে কৃষ্ণপ্রস্তরখানি ছিল, তাহা তুলিয়া আনিয়া নির্দিষ্ট স্থানে কাহারা স্থাপন করিবে, ইহাই লইয়া দলপতিদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। প্রস্তরখানির সহিত সামাজিক মর্যাদা ও কুলগত প্রাধান্যের সম্বন্ধ ছিল। কাজেই প্রত্যেক গোত্রই উহা তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। প্রথমে বচসা, তারপর তুমুল দ্বন্দ্ব-কোলাহল আরম্ভ হইল। চারিটি দিন এইভাবে কাটিয়া

* ইবনে-ইসহাক (ইংরাজী) হইতে গৃহীত।

গেল, কিন্তু কোনই মীমাংসা হইল না। তখন চিরাচরিত প্রথানুসারে সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। যুদ্ধ যখন একেবারে অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন: "ক্ষান্ত হও, আমার কথা শোন। সামান্য কারণে কেন রক্তপাত করিবে? ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা কর। আমার প্রস্তাব: যে ব্যক্তি আজ সর্বপ্রথম কা'বা-মন্দিরে প্রবেশ করিবে, তাহার উপরেই বিবাদের ফয়সালার ভার অর্পণ করা যাউক। সে যে-সিদ্ধান্ত করিবে, তাহাই আমরা মানিয়া লইব। ইহাতে তোমরা রাজী আছ?"

বৃদ্ধের এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন।

তখন প্রথম আগন্তুকের আগমন প্রতীক্ষায় সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। প্রত্যেকের মনে কত চিন্তার উদ্রেক হইতে লাগিল। যে আসিবে, সে কেমন লোক হইবে, কোন্ পক্ষে সে রায় দিবে, তাহার সিদ্ধান্ত যদি সকলের মনঃপূত না হয় তখন কী ঘটিবে, ইত্যাদি ভাবের নানা চিন্তা প্রত্যেকের মনে খেলিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময় সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল: "এই যে আমাদের 'আল্-আমিন্' আসিতেছেন। আমরা তাঁহার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মানিয়া লইব।"

মুহম্মদ তখন তরুণ যুবকমাত্র। কিন্তু তবুও মক্কাবাসীদের কী অগাধ বিশ্বাস তাঁহার উপর!

মুহম্মদ আসিলে সকলে তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। তখন তিনি বলিলেন: "বেশ ভাল কথা। যে-সকল গোত্র কৃষ্ণপ্রস্তর তুলিবার দাবী করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে নিজেদের মধ্য হইতে এক-একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করুন।"

ঠিক তাহাই করা হইল। তখন হযরত সেই প্রতিনিধিদিগের সংগে লইয়া কৃষ্ণপ্রস্তরের নিকট উপস্থিত হইলেন। একখানি চাদর বিছাইয়া নিজে সেই প্রস্তরখানিকে উহার মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। তারপর প্রতিনিধিগণকে বলিলেন: "এইবার আপনারা প্রত্যেকেই এই চাদরখানির এক এক প্রান্ত ধরিয়া পাথরখানিকে যথাস্থানে লইয়া চলুন।"

সকলে তাহাই করিলেন। গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলে মুহম্মদ পুনরায় প্রস্তরখানি নিজহস্তে তুলিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

এই বিচারে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। মুহম্মদের বিচক্ষণতায় একটা আসন্ন সমরানল হইতে আরব-ভূমি রক্ষা পাইল।

এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা গূঢ় তাৎপর্য নিহিত আছে। 'হয্‌রে আস্‌ওয়াদ' বা কৃষ্ণপ্রস্তরখানি ইসলামের এক অতি পবিত্র বস্তু। 'হযরত আদমের স্পর্শ, ফিরিশ্‌তাদিগের স্পর্শ ও হযরত ইব্রাহিমের স্পর্শ উহাতে জড়িত রহিয়াছে। ঐ প্রস্তরখানি হইতেছে 'আল্লার ঘরের' ভিত্তি-প্রস্তর। কাজেই, সেই 'আল্লার ঘরের' নবপ্রতিষ্ঠার দিনে এই পবিত্র প্রস্তর কি হযরত মুহম্মদের হস্তেই স্থাপিত হওয়া সঙ্গত ও সুশোভন হয় নাই? কোরেশ দলপতিদিগের মধ্যে পরস্পর কলহ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে হযরত মুহম্মদের আবির্ভাব,—ইহা দ্বারা আল্লার এই প্রচ্ছন্ন ইংগিতই যেন ধরা পড়ে। পক্ষান্তরে ইসলামের ভবিষ্যতের একখানি উজ্জ্বল চিত্রও ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম লইয়া জগতে বিভিন্ন মতাবলম্বী-দিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং সে বিরোধের মীমাংসা না করিতে পারিয়া অবশেষে সকলেই যে একজন আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিবে এবং বিবদমান সকল পক্ষই যে তাঁহারই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবে, সমস্ত বিরোধ ও বৈষম্য দূর করিয়া তিনিই যে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন—এই মহাসত্যই যেন এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠিল।

সেই হইতে আজ পর্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তরখানি কা'বা-শরীফে একইভাবে শোভা পাইতেছে। হজযাত্রীরা প্রতি বৎসর মক্কায় গিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত এই প্রস্তরখানিকে চুম্বন করিয়া থাকেন। এই চুম্বনের মধ্যে একটা বিপুল আধ্যাত্মিক উল্লাস আছে। ইহা তো প্রস্তরে চুম্বন দান নহে—প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেছে হযরত মুহম্মদের দস্ত-মুবারকেই চুম্বন দান। এইখানেই এর শেষ নয়। বিদ্যুদ্বেগে ইহা প্রবাহিত হয় রসূলুল্লার নিকট হইতে হযরত ইব্রাহিমের হস্তে—সেখান হইতে হযরত আদমের হস্তে—সেখান হইতে ফিরিশ্‌তাদের হস্তে—সেখান হইতে আল্লাহ্‌তালার দরবারে। একটি চুম্বনে এতগুলি সংযোগ-কেন্দ্রে আলোড়ন জাগে। আধ্যাত্মিক প্রেমের এ-একটা গোপন প্রবাহ! ভক্তের হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়া বিভিন্ন বাহনের (medium) মধ্য দিয়া এ প্রবাহ পৌঁছে গিয়া অবশেষে সেই আল্লাহ্‌তালার রহমত ও প্রেমের দরিয়ায়

হজের তাই এ একটা প্রধান অঙ্গ, আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কত যুগের পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে এই প্রস্তরখানি! কত পবিত্র হস্তের—কত পবিত্র আত্মার সুরভি জড়ানো রহিয়াছে এর অণু-পরমাণুতে! এই প্রস্তরখানি তাই গোটা মানব জাতিরই এক পরমাশ্চর্য স্মৃতিফলক। একে স্পর্শ করিলে যেন গোটা মানব জাতিকেই স্পর্শ করা হয়।

অনেকে এই প্রস্তর চুম্বনের মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ পান, কিন্তু এর নাম পৌত্তলিকতা নয়। ইসলামের মূল সুরই হইতেছে সংস্কার বা শুদ্ধিকরণ—সংহার বা মূলোৎপাটন নয়। কৃষ্ণপ্রস্তরের ব্যাপারে এই সত্যই প্রতিপন্ন হয়। প্রত্যেক কার্যের দোষগুণ তার নিয়তের উপর নির্ভর করে। মূর্তি-অংকিত মুদ্রা অহরহ ব্যবহার করিলেও যেমন তাহা মূর্তিপূজা হয় না, বৃহত্তর মানবতার স্বার্থে কৃষ্ণপ্রস্তরকে চুম্বন করিলেও তেমনি তাহাকে মূর্তিপূজা বলা যায় না। মানবজাতির অতীত কাহিনীর এ যেন এক প্রস্তরীভূত ইতিহাস। ইসলামের ঐতিহাসিক চেতনার এ এক সুন্দর নিদর্শন।

পরিচ্ছেদ : ১৫

গৃহীর বেশে

মুহম্মদ এখন সংসারী হইয়াছেন। খাদিজা তাঁহার যথাসর্বস্ব স্বামীর চরণে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ভোগবিলাসের মধ্যে পড়িয়াও হযরত একেবারে নির্বিকার। বাহিরের কোন আকর্ষণই তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিল না। কী অসীম মনোবল ও আত্মসংযম এই মহামানবের! কত বিভিন্ন মুখিন—কত ব্যাপক তাঁহার জীবনের প্রকাশ। অন্যান্য মহাপুরুষদিগের ন্যায় 'কামিনী-কাঞ্চনের' ভয়ে তিনি সংসার ছাড়িয়া বনবাসী সন্ন্যাসীও হইলেন না, আবার ভোগলালসার মায়াজালেও জড়াইয়া পড়িলেন না। শক্তির প্রাচুর্যে জীবন তাঁহার বলিষ্ঠ ও বেগবান। তাঁহার জীবনের পরিসর এত বিপুল যে, বাসনা-কামনা ও সংযম-সাধনাকে তিনি এক পংক্তিতে বসাইতে পারেন—সকলের মধ্যেই একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন। যাঁহার জীবনের পটভূমি যত ব্যাপক, তাঁহার সৃষ্টিও তত বিচিত্র। অসীম অনন্ত আকাশের অবসরে তাই তো কোটী গ্রহ-নক্ষত্রের এমন সুন্দর সমাবেশ।

মুহম্মদ এখন খাদিজার বিশাল বাণিজ্যের অধিকারী। কখনও বা তিনি এই বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করেন, কখনও বা নিজেই বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করিতে যান।

বাণিজ্যের প্রতি মুহম্মদ এত অনুরক্ত ছিলেন কেন? ইহারও একটা কারণ ছিল। বাণিজ্যই তো মানুষের অন্তর্নিহিত বহু গুণের প্রকৃষ্ট বিকাশ-ক্ষেত্র। একদিকে নানা দেশের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ, অপরদিকে নানা মানুষের মনের সংগে নিত্য নব নব পরিচয়। একদিকে ধনাগম, অপরদিকে সততা, সাধুতা, মিতব্যয়িতা, দূরদর্শিতা, বিশ্বস্ততা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি নানা বৃত্তির উন্মেষ ও পরীক্ষা—এ সমস্তই বাণিজ্যের শিক্ষা। বস্তুতঃ মানুষের আভ্যন্তরিক বহু সুপ্ত শক্তি ও প্রতিভা বাণিজ্যের ভিতর দিয়াই সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হইতে পারে। এর মধ্যে

আছে একটা সৃষ্টির উল্লাস, আছে একটা স্বাধীনতার আনন্দ, আছে একটা আত্মপ্রত্যয়ের গৌরব। এই জন্যই তো হযরত বাণিজ্যকেই জীবিকার্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিতেন।

মুহম্মদ খাদিজার নিকট হইতে তিনটি পুত্র এবং চারিটি কন্যা লাভ করেন। পুত্রদিগের নাম কাসেম, তাহের ও তৈয়ব। কন্যাদিগের নাম জয়নব, রোকাইয়া, উম্মে-কুলসুম এবং ফাতিমা। পুত্র তিনটি হযরত নবুয়ত লাভের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কন্যাদিগের মধ্যে বিবি ফাতিমাই হযরতের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। হযরত আলির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইঁহাদেরই দুই পুত্র—ইমাম হাসান ও ইমাম হুসেন।

মুহম্মদের পুত্রসন্তান একটিও জীবিত না থাকায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মর্মে মর্মে দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তালা এক অদ্ভুত উপায়ে তাঁহাদের এই পুত্র-সুখের কামনাকে পূর্ণ করিয়া দিলেন।

'ওকাজ'-মেলা হইতে বিবি খাদিজা 'জায়েদ' নামক একটি দাস-বালককে ক্রয় করেন। বলা বাহুল্য, তখন পৃথিবীর সর্বত্র দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। হাটে-বাজারে দাসদাসীর ক্রয়-বিক্রয় চলিত। দাসদাসীর প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়নের সীমা ছিল না। প্রভুরা দাসদাসীকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিতেন।

বিবি খাদিজা এই জায়েদকে খাস করিয়া মুহম্মদের খিদ্‌মতের জন্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। বিশ্বমানুষের যিনি মুক্তিদাতা, তিনি কি নিজে কাহাকেও দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে পারেন? এক আল্লাহ্‌ ছাড়া যিনি অন্য কাহাকেও প্রভু বলিয়া স্বীকার করেন না, সব মানুষই যাঁহার নিকট ভাই-ভাই, তিনি কি নিজেই অপর একজন মানুষের প্রভু হইতে পারেন? কখনই না। মুহম্মদ কিছুতেই ইহা বরদাশ্‌ত করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তিনি জায়েদকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন: "জায়েদ, আজ হইতে তুমি আযাদ।"

মুহম্মদ জায়েদকে এতই স্নেহ করিতে লাগিলেন যে, জায়েদকে সকল লোকে 'জায়েদ-বিন-মুহম্মদ' অর্থাৎ 'মুহম্মদের পুত্র জায়েদ' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিল।

কিছুদিন পরে জায়েদের পিতা হারিস এবং পিতৃব্য কা'ব জায়েদের সন্ধানে মক্কায় আসিলেন। মুহম্মদের নিকটে আসিয়া তাঁহারা বিনীতভাবে এই আর্জি পেশ করিলেন: "হুজুর আমরা জায়েদকে ফিরিয়া পাইতে চাই, দয়া করিয়া একটু বিবেচনার সহিত আপনি উহার মুক্তিপণ নির্ধারণ করিয়া দিন।"

তদুত্তরে মুহম্মদ বলিলেন: "এই কথা? ইহার জন্য এত কাকুতি-মিনতি কেন? জায়েদকে তো মুক্তি দিয়াছি। ইচ্ছা করিলে সে এখনি চলিয়া যাইতে পারে।

বিনা পণে মুক্তিদান! তখনকার দিনে এ যে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। জায়েদের পিতা ও পিতৃব্য অবাক হইয়া মুহম্মদের পানে চাহিয়া রহিলেন। সন্তানকে ফিরিয়া পাইবার আসন্ন আনন্দে উভয়ের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাঁহাদের এ-সাধ পূর্ণ হইল না। জায়েদ মুহম্মদকে ছাড়িয়া কিছুতেই পিতার সহিত ফিরিয়া যাইতে রাজী হইলেন না। মুহম্মদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: হযরত, আপনিই আমার পিতা, আপনার খিদ্‌মতের খুশনসীব হইতে এ অধমকে বঞ্চিত করিবেন না।"

কোন্ যাদুমন্ত্রে এমন হইল? মুক্তি ভিখারী দাস-বালক, মুক্তিকে পায়ে ঠেলিয়া বন্ধনকে মাগিয়া লইল? আপন পিতাকে ভুলিয়া পরকে পিতা করিল?

জায়েদের পিতা ও পিতৃব্য সম্মত হইলেন। সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহারা জায়েদকে মুহম্মদের নিকট রাখিয়া গেলেন।

কিন্তু মুহম্মদ বুঝিলেন, এরূপভাবে জায়েদকে নিজের কাছে রাখিয়া দিলে লোকে তাহাকে ক্রীতদাসই বলিবে, স্বাধীন মানুষের মত উন্নত মস্তকে সে চলাফেরা করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে জায়েদের মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের চিরদিন একটা প্রচ্ছন্ন গ্লানি ও হীনতার ভাব জাগিয়া থাকিবে। ইহাই ভাবিয়া তিনি জায়েদকে সংগে লইয়া তৎক্ষণাৎ কা'বা-গৃহে যাইয়া সমবেত কোরেশ নেতাদিগের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "সকলে সাক্ষী থাকো, এই জায়েদ আমার পুত্র; সে আমার উত্তরাধিকারী, আমি তার উত্তরাধিকারী।"

বিস্মিত জনমণ্ডলী অবাক হইয়া রহিল।

কোথায় অজ্ঞাতকুলশীল একটি ক্রীতদাস, আর কোথায় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী! দোযখ্ হইতে একেবারে বিহিশ্‌তে উন্নয়ন! লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানবাত্মাকে এর চেয়ে আর বড় কী সম্মান দেওয়া যাইতে পারে? মানব-কল্যাণের একেবারে চরম হইয়া গেল না কি?

পরবর্তীকালে এই জায়েদই যুদ্ধ-অভিযানে সেনাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। মানুষের মধ্যে কত শক্তি ও সম্ভাবনাই না এমনি করিয়া লুকাইয়া থাকে! সুযোগ ও সহানুভূতি পাইলে কত 'ছোটলোক'ই না এমনি বড় হইতে পারে! মুহম্মদ যদি জায়েদকে এই সুযোগ না দিতেন, তবে সে চিরদিন ক্রীতদাসই রহিয়া যাইত, সেনাপতি হইতে পারিত না। এইখানেই তো ইসলামের বিশেষত্ব। 'সব মানুষই সমান' এই সাম্যবাণী দ্বারা মানুষের অন্তরের অপরিসীম শক্তি ও সম্ভাবনাকে সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং তাহাদের আত্মপ্রকাশের পথকে একেবারে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাই তো পরবর্তীকালে দেখিতে পাই, ক্রীতদাস হইয়াও বেলাল মুসলমান জাতির মুয়াজ্জিন হইয়াছেন, কুতুবুদ্দীন ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট হইবার গৌরব অর্জন করিয়াছেন। যুগে যুগে কত অস্পৃশ্য, কত শূদ্র, কত পারিয়াই না ইসলামের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এইরূপে জ্ঞানে গুণে বিশ্ববরেণ্য হইয়া গিয়াছেন! বস্তুতঃ আল্লাহ্ কোন মানুষকেই ছোট করেন নাই, মানুষই মানুষকে ছোট করিয়াছে। কোটী কোটী মানুষ এইরূপে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের অত্যাচারে নিগৃহীত পদদলিত ও ব্যর্থমনোরথ হইয়া জগৎ হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। কবি সত্যই বলিয়াছেন:

"What man has made of man !"

পরিচ্ছেদ : ১৬

সত্যের প্রথম প্রকাশ

সব আয়োজন শেষ হইয়াছে। বিশ্বনবীর আত্মপ্রকাশের আর বেশী বিলম্ব নাই।

খাদিজার সহিত বিবাহের পর হইতে হযরত মুহম্মদ অভাব ও দৈন্যের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাই তিনি আত্মচিন্তায় অধিকতর নিমগ্ন হইবার সময় ও সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মুহম্মদ শৈশব হইতেই চিন্তাশীল ছিলেন। সে-চিন্তার কোনকালেই বিরাম ছিল না। কোন্ অজানা রহস্যলোকের সহিত তাঁর আত্মার যোগাযোগ ছিল—সর্বদা তিনি সেই অতীন্দ্রিয়-লোকে যাওয়া-আসা করিতেন। সেই আধ্যাত্মিক জগতের কত দৃশ্য থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। এক-এক সময় তাঁহার মনে হইত, কে যেন তাঁহার কানে কানে কী কহিয়া গেল, কে যেন তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল, কে যেন তাঁহার নয়নকোণে নিমেষের জন্য প্রতিভাত হইয়া নিমেষেই মিলাইয়া গেল। এক এক সময় তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেন, কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া কহিতেছে, "মুহম্মদ, তুমি আল্লার রসুল।" পাহাড়, পর্বত, তরুলতা সকলেই যেন তাঁহাকে চেনে, সকলেই যেন তাঁহাকে তাযীম্ করে। মুহম্মদ কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন না, কেবলি ইহাদের কথা ভাবেন।

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স হইতে মুহম্মদ আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। আপন অন্তরের প্রদীপ্ত চেতনায় আপনি অধীর হইয়া ঘরে-বাহিরে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। একটা শংকা, একটা ভীতি, একটা অস্বস্তি, একটা উদ্বেগ, সংগে অজানাকে জানিবার জন্য একটা দুর্জয় কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এই সময় হইতে তিনি মানসনেত্রে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিতে লাগিলেন। কোন্ সুদূর হইতে যেন এক সুললিত সুর-তরংগ ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সংসারের কর্ম-কোলাহলে পাছে তাঁহার এই আধ্যাত্মিক চেতনা ব্যর্থ হইয়া যায়, সমাজ-জীবনের পংকিলতার মধ্যে পাছে সেই পবিত্র জ্যোতির গতিস্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়, এই আশংকায়

তিনি মক্কার অনতিদূরে 'হেরা' নামক এক নিভৃত পর্বত-গুহায় আশ্রয় লইলেন। বিবি খাদিজাও প্রকৃত সহধর্মিণীর ন্যায় স্বামীর এই কার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি দুই-তিন দিনের মত খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করিয়া দিতেন, মুহম্মদ তাহাই লইয়া প্রস্থান করিতেন। সেই খোরাকি ফুরাইয়া গেলে পুনরায় গৃহে আসিয়া ঐরূপ খাদ্য-সামগ্রী লইয়া ফিরিয়া যাইতেন। খাদিজা সতর্ক দৃষ্টিতে স্বামীর গতিবিধি ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। মুহম্মদ যে একজন প্রেরিত পুরুষ, তাঁহার ভিতরে যে একটা দারুণ অন্তর্বিপ্লব চলিতেছে এবং সেই বিপ্লব যে ক্রমশঃই একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, খাদিজা তাহা ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আর বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তো তিনি স্বামীর আধ্যাত্মিক জীবনের সংগিনী হইতে পারিয়াছিলেন।

রমযান মাস। মুহম্মদ রোজা রাখিয়া নিশিদিন ইবাদৎ-বন্দেগী করেন। হেরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে সারারাত্রি জাগিয়া কাটান।

তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর।

কয়েকদিন হইতে ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে তিনি কাল কাটাইতেছেন। নিশিদিন অবিশ্রান্ত কে যেন তাঁহার কানে কানে বলিয়া যাইতেছে: "ইয়া মুহম্মদ, আন্তা রসূলুল্লাহ্।"—হে মুহম্মদ। তুমি আল্লার রসূল। চিরবাঞ্ছিতকে পাইবার প্রাক্কালে মানুষের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, মুহম্মদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে!

রজনী গভীর। মুহম্মদ ধ্যান-মগ্ন। এমন সময় হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে: 'মুহম্মদ!'

মুহম্মদ নয়ন মেলিয়া দেখিলেন, এক জ্যোতির্ময় ফিরিশ্‌তা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহারই জ্যোতিতে গুহা আলোকিত হইয়া গিয়াছে।

ইনিই আল্লার বাণীবাহক ফিরিশ্‌তা 'জিব্রাইল।'

মুহম্মদ তখন স্তম্ভিত। বাহিরের জ্ঞান তাঁহার লোপ পাইয়াছে, এক মহা মুহূর্তের তিনি সম্মুখীন হইয়াছেন।

সহসা নূরের আখরে লেখা এক জ্যোতির্ময়ী বাণী মুহম্মদের নয়ন-কোণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জিব্রাইল মুহম্মদকে বলিলেন: "পাঠ কর।"

মুহম্মদ কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন: "আমি পড়িতে জানি না।"

জিব্রাইল তখন মুহম্মদকে দৃঢ়ভাবে আলিংগন করিলেন। মুহম্মদের মনে হইল তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব আলোকময় হইয়া গেল।

ফিরিশ্‌তা পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন: 'পাঠ কর।"*

মুহম্মদ এবারও পূর্ববৎ উত্তর দিলেন: "আমি পড়িতে পারি না।"

জিব্রাইল তখন আবার তাঁহাকে আলিংগন করিলেন। এইরূপ তিনবার করিবার পর মুহম্মদের মুখ হইতে নিঃসারিত হইল:

ইক্‌রা-বিস্‌মি রাব্বিকাল-লাযী খালাক্‌...

"পাঠ কর তোমার সেই প্রভুর নামে—
যিনি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন—
যিনি একবিন্দু রক্ত হইতে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন,
পাঠ কর—তোমার সেই মহিমময় প্রভুর নামে,
যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন,
যিনি মানুষকে অনুগ্রহ করিয়া অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান
দান করিয়াছেন।"

নূর! নূর! সমস্তই নূর! মুহম্মদের ভিতরে-বাহিরে শুধুই নূরের জৌলুস। জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে লৌহপিণ্ড যেমন স্বতন্ত্র হইয়াও অগ্নিময় হইয়া উঠে, মুহম্মদের সমস্ত দেহমনও সেইরূপ জ্যোতিঃস্নাত হইয়া উঠিল।

মুহম্মদ অভিভূত হইয়া রহিলেন। মহাসত্যের প্রথম উপলব্ধির এই মহামুহূর্তে তাহার চিত্তে কী যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা শুধু অনুভব করিবারই কথা, বর্ণনা করিবার নয়।

মুহম্মদের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। দেখিলেন, আকাশ-পথে জিব্রাইল তখনও দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। দিশাহারা হইয়া তিনি খাদিজার নিকট ছুটিয়া চলিলেন।

* 'When it was the night on which God honoured him with his mission and showed mercy on his servent thereby, Gabriel brought him the Command of God. 'He came to me', said the Apostle of God, 'while I was asleep, with a coverlet of brocade whereon was some writing and said, "Read".'

—Ibn-i-Ishaq—p. 106

তখন রজনী প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। অরুণরাগে পূর্বগগন রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। স্নিগ্ধ নয়ন মেলিয়া ভোরের তারা ধরণীর পানে চাহিয়া আছে। ঘুমন্ত মক্কানগরী একখানি অস্পষ্ট ছবির মত আলো-আঁধারে শোভা পাইতেছে। প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি ফুটনোন্মুখ শতদলের মত দাঁড়াইয়া আছে।

এমন সময় খাদিজার গৃহদ্বারে কে নাড়া দিয়া উঠিল। খাদিজা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দেখিলেন মুহম্মদ। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন: "ব্যাপার কী?"

মুহম্মদ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আমায় আবৃত কর। আমায় আবৃত কর। আমার বড় ভয় হইতেছে।"

খাদিজা তাহাই করিলেন। তিনি মুহম্মদকে একটি কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সান্ত্বনা ও অভয় দিতে লাগিলেন।

ক্ষণপরে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে মুহম্মদ খাদিজাকে সকল ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। খাদিজা উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিলেন: "হে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা), কোন ভয় নাই। আল্লার কসম, তিনি আপনাকে কখনো অপদস্থ করিবেন না। আপনি আত্মীয়স্বজনের কল্যাণ করিয়া থাকেন, অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিয়া থাকেন, দুঃস্থ-পীড়িতের সেবা ও সাহায্য করিয়া থাকেন, মেহ্‌মানকে আশ্রয় দিয়া থাকেন, ঘোর বিপদের মধ্যেও আপনি সত্য পালন করিয়া থাকেন। কেন তবে আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি বিমুখ হইবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লার কোন মহান উদ্দেশ্যই আপনার দ্বারা সাধিত হইবে।"

সহধর্মিণীর উপযুক্ত কথাই বটে। হৃদয় যাঁহার পবিত্র, সত্যের উপলব্ধি তাঁহার কাছে এমনই সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে।

এইখানে ইবনে-ইসহাক একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত মুহম্মদের পয়গম্বর-জীবনে বিবি খাদিজা যে কত বড় বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নীরবে তিনি রসূলুল্লাকে যে কতভাবে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়াছিলেন, এই ঘটনায় তাঁহার প্রমাণ মিলিবে। রসূলুল্লাহ্‌ হেরা গিরিগুহা হইতে যখন খাদিজার নিকট ফিরিলেন, তখন তাঁহার অভিভূত অবস্থা। বারে বারে তিনি জিব্রাইল ফিরিশ্‌তাকে চোখে দেখিতে পাইতেছিলেন এবং শুনিতেছিলেন: "হে মুহম্মদ, তুমি আল্লার রসূল আর

আমি জিব্রাইল।" মুহম্মদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া খাদিজা বুঝিতে পারিতেছিলেন না তিনি সত্যই ফিরিশ্‌তার আশ্রিত, না কি শয়তান তাঁহাকে দাগা দিতেছে। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য খাদিজা এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। রসুলুল্লাকে ধরিয়া তাঁহাকে তিনি বাম ঊরুর উপর বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন: এখনও কি আপনি কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন? রসুলুল্লাহ্‌ বলিলেন: হাঁ। তখন বিবি খাদিজা স্বামীকে দক্ষিণ ঊরুর উপর বসাইলেন। বলিলেন: এখনও দেখিতে পান? রসুলুল্লাহ্‌ বলিলেন: হাঁ। তখন খাদিজা তাঁহাকে আপন কোলের উপর বসাইয়া পুনরায় একই প্রশ্ন করিলেন। রসুলুল্লাহ্‌ বলিলেন: হাঁ, এখনও দেখিতেছি। খাদিজা তখন দেহের বস্ত্র খানিকটা উন্মুক্ত করিয়া রসুলুল্লাহ্‌কে বলিলেন: এখনও কি আপনি কাহাকেও দেখিতেছেন? রসুলুল্লাহ্‌ বলিলেন, না। যিনি ছিলেন, তিনি এখন অন্তর্হিত হইলেন। তখন বিবি খাদিজা উল্লসিত হইয়া বলিলেন: 'হে পিতৃব্যপুত্র, আনন্দ করুন। যিনি আপনাকে দেখা দিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই আল্লার ফিরিশ্‌তা—শয়তান নয়। শয়তান হইলে সে বেহায়ার মত আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াই থাকিত।

বিবি খাদিজার এই চিত্রের তুলনা নাই।

খাদিজা যথাসাধ্য মুহম্মদকে সান্ত্বনা দিলেন। মুহম্মদের মন হইতে তবু ভয় দূর হইল না। এ ভয় অন্য কিছুই নয়। তড়িৎ-প্রবাহের প্রথম স্পর্শে যেমন তড়িৎ-শলাকায় কম্পন লাগে, চিরজ্যোতির্ময়ের প্রথম স্পর্শে মুহম্মদের প্রাণেও ঠিক তেমনি করিয়া শিহরণ লাগিয়াছিল।

মুহম্মদ সারা দেহ আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া খাদিজা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার চাচাতো ভাই 'অর্কার' নিকটে গমন করিলেন। অর্কা তখনকার দিনে আরবের একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কোরেশদিগের পৌত্তলিক মতবাদকে সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস হযরত মুহম্মদ সংক্রান্ত ব্যাপারটি অবগত হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: "কুদ্দুসুন্! কুদ্দুসুন্!...পবিত্র! পবিত্র! হযরত মুসা ও ঈসার প্রতি আল্লাহ্‌ যে 'নামুস-ই-আকবর' (মহান নিদর্শন) প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই মামুস। হায় মুহম্মদ! তোমার দেশ-বাসী তোমার উপর অত্যাচার করিবে, তোমাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া

দিবে। আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করিব।"

খাদিজা পুলকিত হইলেন। তাড়াতাড়ি তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৌরবে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলেন, মুহম্মদের মধ্যে অনাগত যুগের মহাপয়গম্বর জন্মলাভ করিতেছেন।

পরিচ্ছেদ : ১৭

সত্যের স্বরূপ

আল্লার পাক-কালামের প্রথম প্রকাশ। কত সুন্দর, কত মধুর। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে-মহাসত্যের জন্য ধরণী প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল, যে-বাণী প্রেরণ করিবেন বলিয়া আল্লাহ্ বহু যুগ পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছিলেন, সেই বাণী আজ অবতীর্ণ হইল। সে বাণীর আরম্ভই হইল : পাঠ কর—অর্থাৎ জ্ঞান লাভ কর। সমগ্র কুরআনের সর্বপ্রথম বিষয়বস্তুই হইল জ্ঞান। জ্ঞানের প্রসংগ লইয়াই সূচিত হইল হযরতের পয়গম্বর জীবন, আর ইসলামের নূতন জয়যাত্রা। জ্ঞানের প্রতি কত বড় মর্যাদা এ! এই উন্নত আলোকের যুগে ইসলাম বিশ্বের সম্মুখে গর্ব করিয়া বলিতে পারে : জ্ঞান-সাধনাই হইতেছে তাহার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান পয়গাম।

পক্ষান্তরে কী গভীর দার্শনিক তাৎপর্যই না নিহিত আছে এই প্রথম-অবতীর্ণ ক্ষুদ্র আয়াত কয়টির মধ্যে। পাঠক হয়ত ভাবিতেছেন, সমগ্র কুরআনের তুলনায় এই 'ইক্‌রা বিস্‌মি' সূরার বিশেষত্ব ও গুরুত্ব এমনি কীই বা বেশী, যার দরুণ ইহা প্রথম-অবতরণের মর্যাদা লাভ করিল? সূরা 'ফাতিহা', সূরা 'এখলাস্' প্রভৃতি গভীর তত্ত্বপূর্ণ কোন একটি সূরা বা আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হইলেই তো হইত। এ কথা আমার মনেও থাকিয়া থাকিয়া জাগিত। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, কুরআনের এই অংশটুকুই প্রথম নাযিল হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা রাখে। এই তিনটি লাইনের মধ্যেই সম্পূর্ণ কুরআনের সারাংশ এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত মূলসত্য ধরা পড়িয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লার যাহা-কিছু বলিবার ছিল, বিশ্ববাসীর নিকট যে-বাণী পৌছাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা তিনি চুম্বকে মুখবন্ধেই বলিয়া ফেলিয়াছেন। এই বাণী—এই মহাসত্য—প্রচার করিবার জন্যই তো তিনি হযরত মুহম্মদকে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে এই সত্য পুরাপুরিভাবে কেহ জানিতও না, মানিতও না। কাজেই ইহার পূর্ণ প্রকাশ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছিল।

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই ক্ষুদ্র আয়াত কয়টিতে মাত্র তিনটি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে: (১) আল্লাহ্, (২) মানুষ, (৩) জ্ঞান। প্রথমেই আল্লাহ্ আত্মপরিচয় দিয়া বলিতেছেন: তিনিই বিশ্বনিখিলের একমাত্র প্রভু—তিনিই 'রব'—অর্থাৎ তিনিই সৃজনকারী, পোষণকারী এবং ধ্বংসকারী। এইখানে প্রচলিত বহু ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন হইয়া যাইতেছে। জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, পুরুষ ও প্রকৃতিই সৃষ্টির দুই মৌলিক উপাদান, ঈশ্বরের ন্যায় জড়পদার্থও (Matter) আদি ও অনন্ত (co-eternal), এই বিশ্বের কোনই স্রষ্টা নাই, ইহা স্বয়ংসৃষ্ট, অথবা একাধিক ঈশ্বর ও দেবদেবীর দ্বারা এই বিশ্ব রচিত ও পরিচালিত—ইত্যাদি ধরনের যাবতীয় মতবাদকেই আল্লাহ্ এখানে বাতিল করিয়া দিতেছেন এবং স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন যে, একমাত্র তিনিই ইহার স্রষ্টা ও নিয়ামক। তারপর আসিল মানুষের পরিচয়। মানুষ কোথা হইতে আসিল? কে পয়দা করিল? সে পরিচয় দিতে গিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন: মানুষকে আল্লাই পয়দা করিয়াছেন—সামান্য রক্ত-কণিকা হইতে। এখানেও বলা হইল যে, মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাঁহার অংশ নহে, অথবা স্বয়ম্ভূত নহে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এইখানে বিবর্তনবাদ বা 'Theory of Evolution'-এর কথা আসিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র একটি রক্তবিন্দুর মধ্যে আল্লাহ্ মানুষের সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, তারপর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া সেই রক্তবিন্দুকে তিনি জ্ঞানবিবেকসম্পন্ন শক্তিশালী মানুষে পরিণত করিয়াছেন। অবশেষে আসিল জ্ঞানের কথা। মানুষের জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? আল্লাহ্ বলিতেছেন: তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। এই জ্ঞান দুই প্রকারের: লেখনীলব্ধ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং লেখনীর বহির্ভূত, অর্থাৎ আল্লার অনুগ্রহলব্ধ। জগতের দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-ইতিহাস যাবতীয় বিষয়বস্তুই লেখনীলব্ধ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ কোন-না-কোন উপকরণ সাপেক্ষ। কিন্তু ইহা ছাড়াও আর এক প্রকারের জ্ঞান আছে—যাহা লাভ করিতে হইলে কোন উপকরণ বা বাহনের প্রয়োজন হয় না, আল্লাহ্ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়া দান করেন, সে-ই তাহা পায়। ইহা অধ্যাত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান (ইল্মে-ইলাহী), এ জ্ঞানের উপকরণ অনুভূতি, যুক্তিতর্ক বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য-দর্শন বা সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি (intuition)।

আর কী চাই? সকল জ্ঞানের, সকল তথ্যের ইহাই তো সার কথা। সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের (Philosophy) বিষয়বস্তুও তো এই। God (খালিক), Man (মানুষ) এবং Knowledge (ইল্‌ম), অর্থাৎ স্রষ্টা, মানুষ এবং জ্ঞান—এই তিনটির স্বরূপ ও সম্বন্ধ-নির্ণয়ই তো হইতেছে দর্শনের আলোচ্য বিষয়। স্রষ্টা কে, তাঁহার স্বরূপ কী, সৃষ্টি কেমন করিয়া সম্ভব হইল, মানুষ কোথা হইতে আসিল, জ্ঞান কেমন করিয়া জন্মিল, জ্ঞান কয় প্রকারের, কতদূর তাহার সীমা, ইত্যাদি সমস্যার সমাধানই হইতেছে দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। বহু বাদানুবাদ ও যুক্তিতর্কের পর দর্শন আজ এই সত্যে উপনীত হইয়াছে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একজন নিয়ন্তা আছেন, তাঁহারই ইংগিতে বিশ্বজগৎ পরিচালিত হইতেছে; সমস্ত সৃষ্টি তাহা হইতেই আসিয়াছে, মানুষকে তিনি পয়দা করিয়াছেন এবং জ্ঞান দিয়াছেন। এই জ্ঞান দুই প্রকারের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

এইবার দেখা যাউক, আল্লাহ্ যাহা বলিতেছেন, আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রের সহিত তাহার কতদূর মিল আছে। আল্লাহ্ বলিতেছেন: নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তিনি। দর্শন বলিতেছে: এই বিশ্ব জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা (Prime Mover) আছেন—যিনি আড়ালে থাকিয়া সমস্ত পরিচালনা করিতেছেন। আল্লাহ্ বলিতেছেন: মানুষকে তিনি একবিন্দু রক্ত-কণিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; দর্শন বলিতেছে: প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) নামক সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। আল্লাহ্ বলিতেছেন: দুই প্রকারে মানুষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে, প্রথম: লেখনীর সাহায্যে, দ্বিতীয়: প্রত্যক্ষভাবে। দর্শন বলিতেছে: জ্ঞান দুই প্রকারের—প্রথম: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান বা Reason, দ্বিতীয়: প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা Intuition.

আল্লার বাণী এবং দার্শনিক সত্যের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি? সপ্তসমুদ্র মন্থন করিয়া দর্শন আজ যে-সত্যে উপনীত হইয়াছে, আল্লাহ্‌তালা কত সহজে, কত অল্প কথায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন!

অতএব এখন আমরা বলিতে পারি, সমস্ত মানবীয় জ্ঞানের (human knowledge) সার কথাই হইতেছে:

(১) আল্লাই নিখিল বিশ্বের প্রভু।

(২) মানুষকে তিনি সৃজন করিয়াছেন।

(৩) তিনিই মানুষকে সর্বপ্রকার জ্ঞান দান করিয়াছেন।

এই মহাসত্যই আল্লাহ্ সর্বপ্রথম তাঁহার রসুলকে আভাসে দান করিলেন। আল্লার যে-কথা বলিবার ছিল, যে-বাণী বিশ্ববাসীর প্রাণের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা এই। বড় কোন কথা নয়, জটিল কোন তথ্য নয়,—এই সহজ সরল সত্য-প্রকাশই ছিল তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। মহাসত্য চিরদিন এমনই সহজ ও সরল।

হযরত মুহম্মদ এই মহাসত্যেরই প্রচারক—এই মহাবাণীরই তিনি দূত। ইসলাম কোন নূতন কথা বলে নাই—এই শাশ্বত চিরন্তন সত্যকেই সে রূপ দিয়াছে মাত্র। সমগ্র কুরআন এই মহাসত্যেরই বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। ইসলাম মানুষকে শুধু এই তিনটি কথাই উপলব্ধি করিতে বলে: অর্থাৎ সে চায় যে মানুষ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করুক যে আল্লাই নিখিল বিশ্বের একমাত্র প্রভু, মানুষকে তিনিই সৃজন করিয়াছেন, এবং যাহা-কিছু জ্ঞান তিনিই দিয়াছেন। এই তিনটি সত্য উপলব্ধি করিলেই তাহার আর পথ ভুল হইবে না; 'সিরাতাল্ মুস্তাকিম' (সরল পথ) দিয়াই সে চলিবে এবং অবশেষে তাহার লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবে। মানুষ যদি জানে এবং মানে যে, এই বিশ্বনিখিলের সৃজনকারী রক্ষাকারী ও ধ্বংস-কারী একমাত্র আল্লাহ্—তিনিই আমাদের জীবন-মরণের প্রভু, তিনি ছাড়া আর কেহ আমাদের সহায় নাই, শরণ নাই; আদি তিনি, অন্ত তিনি, তবে আর সে কেমন করিয়া আল্লাকে ছাড়িয়া অপর কাহারও পূজা করিবে? নত মস্তকে তাহাকে বলিতেই হইবে: প্রভু হে, একমাত্র তুমিই আমাদের 'রব', তুমি ছাড়া আর আমাদের কোন নমস্য নাই, উপাস্য নাই, তোমাকেই আমরা আরাধনা করি, তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তারপর নিজের দিকে তাকাইয়া সে যদি বুঝিতে পারে যে, কত নিঃসহায় অবস্থা হইতে আল্লাহ্ তাহাকে জ্ঞানবিবেকসম্পন্ন মানুষে পরিণত করিয়াছেন, তবে আল্লার অসীম করুণা ও কুদ্‌রতের কথা ভাবিয়া কৃতজ্ঞতায় তাহার মাথা সেই রহ্‌মানুর-রহিম ও রব্বুল-আলামিনের উদ্দেশ্যে নত না হইয়াই পারিবে না। আবার, সে যদি বুঝিতে পারে যে, আল্লাই সকল জ্ঞানের উৎস এবং জ্ঞানলাভ ছাড়া সৃষ্টি-লীলার কোন রহস্যই সে বুঝিতে পারিবে না, তবে সে আল্লার নামে জ্ঞান-সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেই। রাষ্ট্র, সমাজ ও

জীবনের অন্যান্য সমস্যা এই তিনটি উপলব্ধি হইতেই আসিবে এবং তাহার চিন্তা ও কর্ম নব নব পথে প্রধাবিত হইবে। আধ্যাত্মিক জীবনেও সে উৎকর্ষ লাভ করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, 'ইক্‌রা বিসমি' সূরার এই ক্ষুদ্র অংশটুকু সমস্ত জ্ঞানের সারাংশ। ইসলামে ইহাই মূলসত্য। আল্লাহ্‌তালা হযরত মুহম্মদের অন্তরে সর্বপ্রথম এই মূল-সত্যেরই রেখাপাত করিলেন। কোন লোককে কোন ধর্মে মুরিদ করিতে হইলে পীর যেমন তাহার কর্ণে সর্বপ্রথম সেই ধর্মের মূল কলেমা (creed) দান করেন এবং পরে একে একে আনুষংগিক অন্যান্য বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া মূলবস্তুকে বুঝাইয়া দেন, আল্লাও তাঁর প্রিয়নবী মুহম্মদকে লইয়া সেইরূপ করিলেন। মূল সত্য ও লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে চুম্বক আভাস দিয়া তিনি কার্য আরম্ভ করিলেন।

এমন সুন্দর সহজ অথচ গভীর অর্থপূর্ণ সূরাই সর্বপ্রথম ধরায় অবতীর্ণ হইল। প্রথম অবতরণের উপযুক্ত বাণীই বটে!

পরিচ্ছেদ : ১৮

সত্য প্রচারের আদেশ

মুহম্মদ ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঝড়ের পরে প্রকৃতি যেমন শান্ত হয়, তেমনি একটা প্রশান্তি তাঁহার চোখে-মুখে নামিয়া আসিল।

কিছুদিন যাবৎ আর কোন বাণীই অবতীর্ণ হইল না। ইহাতে মুহম্মদ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, হয়ত বা কোন ত্রুটি ঘটিয়া গিয়াছে·· যাহার জন্য আল্লাহ্ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রায় ছয়মাস এইভাবে কাটিয়া গেল। অবশেষে নিরাশা ও অধৈর্যের মাত্রা যখন চরমে উঠিল, তখন জিব্রাইল আবির্ভূত হইয়া হযরতকে এই আশ্বাসবাণী শুনাইলেন :

"ঊষার শপথ"
এবং অন্ধকার রজনীর শপথ।
তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, কিংবা অসন্তুষ্ট হন নাই।
নিশ্চয়ই তোমার ভবিষ্যত তোমার অতীত অপেক্ষা উজ্জ্বল।
এবং শীঘ্রই তোমার প্রভু তোমার উপর এমন কিছু দান করিবেন,
যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে।
তিনি কি তোমাকে এতিম বালকরূপে দেখেন নাই এবং আশ্রয় দান
করেন নাই ?
এবং তিনি কি তোমাকে পথহারা অবস্থায় দেখেন নাই এবং তোমাকে
সুপথ দেখান নাই ?
এবং তিনি কি তোমাকে অভাবগ্রস্ত দেখেন নাই এবং অভাবমুক্ত করেন
নাই ? অতএব যে অনাথ, তাহাকে তুমি উৎপীড়ন করিও না।
যে ভিক্ষুক, তাহাকে তুমি তিরস্কার করিও না, এবং তোমার প্রভুর
অনুগ্রহের কথা প্রচার কর।" ···(সূরা আদ্-দোহা)

কত বড় প্রেরণা এ! মুহম্মদের ব্যাকুল হৃদয় এইবার শান্ত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এক গুরুদায়িত্বভার শীঘ্রই তাঁহার মাথায় নামিতেছে।

মন যখন ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন পুনরায় এই আয়াতটি নাযিল হইল :

"হে আমার রসুল,
তোমার প্রভু তোমাকে যে সত্য দান করিয়াছেন,
তাহা প্রচার কর।" (৫ : ৬৭)

সব সন্দেহ দূর হইয়া গেল। আল্লাহ্‌তালা এই আয়াতেই হযরত মুহম্মদকে সর্বপ্রথম "হে আমার রসুল" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এইদিন হইতেই হযরত বুঝিতে পারিলেন, তিনি সত্যসত্যই আল্লার রসুল। জীবনের লক্ষ্য ও গতিপথ এখন তাঁহার সুনির্দিষ্ট হইল। নিশ্চিত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তিনি এখন হইতে সত্য প্রচারে ব্রতী হইলেন।

এরপর আর ভয় কী? আর কুণ্ঠা কী? আসুক বাধা, আসুক বিপদ, আসুক অত্যাচার—দুঃখ নাই। জীবন যাইবে? যাউক। আল্লার জন্য না হয় জীবনপাতই বা হইল। তিনি যে রসুল, তিঁনি যে আল্লার বাণীবাহক! এ দৌত্য কার্য তাঁহাকে সমাধা করিতেই হইবে। যে-পয়গাম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা মানুষের প্রাণের দুয়ারে পৌছাইয়া দিতেই হইবে, নতুবা তাঁহার 'রসুল' নাম সার্থক হইবে কেন?

মুহম্মদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সত্যের সুদৃঢ় বর্মে আচ্ছাদিত হইয়া বিপুল উদ্যমে তিনি কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন :

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর্ রসুলুল্লাহ্"

এইখানে মানব-জীবনের একটি নিগূঢ় তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইল। কোন সত্য শুধু উপলব্ধি করিলেই হয় না, সেই সত্যকে বাহিরে প্রচার করিতেও হয়। সত্য তাই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপলব্ধির বস্তু নয়—প্রচারেরও বস্তু। অপ্রচারিত সত্যের কোন মূল্য নাই। যে কোন সত্যকে জয়যুক্ত করিতে হইলে তার প্রচার বা প্রোপ্যাগাণ্ডা করা দরকার। 'প্রোপ্যাগাণ্ডা' কথাটি আজকাল খারাপ শোনায়, কিন্তু আসলে তা নয়। জগতের সমস্ত ধর্মগুরু তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, সে-সত্যকে বাহিরেও ছড়াইয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম এইভাবেই প্রচারিত হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্মের মূলেও আছে পাদ্রীদের ব্যাপক প্রচার। এমন

কি বর্তমান যুগে কমিউনিজ্‌মের প্রসারও একনিষ্ঠ প্রচারের ফল। কাজেই সত্যের সংগে প্রচারের নিকট-সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রচার না করা পর্যন্ত কোন সত্যের পূর্ণ হয় না। অবশ্য মৌখিক প্রচারণার সংগে সত্যের বাস্তব রূপায়ণও দরকার। সেও তো আর এক প্রচারণা।

এই জন্যই আল্লাহ্‌ তাঁর রসূলকে সত্য প্রচারের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। বলা বাহুল্য, কার্যকরী প্রচারের দ্বারাই ইসলাম জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

পরিচ্ছেদ : ১৯

সত্যের প্রথম প্রচার

হযরত মুহম্মদের জীবনের এইবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। এখন হইতে প্রকাশ্যভাবে তিনি 'আল্লার রসুল' রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। সত্য প্রচারই এখন তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইল।

প্রথম প্রচার কোথায় আরম্ভ হইল? কে তাঁহার হস্তে প্রথম বয়েৎ হইলেন? কে তাঁহার এই নূতন সত্যে প্রথম বিশ্বাস করিলেন?

সে তাঁহারই আপন সহধর্মিণী বিবি খাদিজা। এই মহীয়সী নারীই ইসলামের সর্বপ্রথম ভক্ত। প্রথম মুসলিমের গৌরব তাই একজন নারীর।

এটা খুবই স্বাভাবিক হয় নাই কি? খাদিজা অপেক্ষা মুহম্মদকে কে বেশী চিনিতে পারিয়াছেন? কে তাঁহার ভিতর-বাহির এমন সুন্দর করিয়া দেখিয়াছেন? খাদিজা তো দূরের কেহ নন, মুহম্মদেরই জীবন-সংগিনী। কাজেই মুহম্মদের অন্তরে যে-সত্য প্রতিভাত হয়, খাদিজাকে তাহা স্পর্শ না করিয়াই যায় না। এই জন্য অতি সহজেই তিনি স্বামীর ধর্মমত গ্রহণ করিলেন। যুক্তিতর্কের কোনই প্রয়োজন হইল না। সমসূত্রে-গ্রথিত দুইটি বৈদ্যুতিক আলোর ন্যায়, একটির সংগে সংগে অপরটিও জ্বলিয়া উঠিল।

বস্তুতঃ ইসলামের জয়যাত্রার পথে খাদিজার দান ও নৈতিক সহযোগিতার তুলনা নাই। চারিপাশে যখন সংশয়, ভয়ভীতি ও নিরাশার অন্ধকার, তখন এই নারীই সর্বপ্রথম মুহম্মদকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করিলেন। এইরূপে মুহম্মদের গুরুভার ও দুশ্চিন্তা তিনি লাঘব করিয়া দিলেন এবং নৈতিক সমর্থন দিয়া তাঁহার মনোবলকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। সত্যের অভিযানে প্রথম পদক্ষেপেই রসুলুল্লাহ্ তাঁহার আপন স্ত্রীর মধ্যে একজন অকৃত্রিম দোসর খুঁজিয়া পাইলেন। আদর্শ জীবন-সঙ্গিনীর ইহাই তো কর্তব্য।

পক্ষান্তরে হযরত মুহম্মদ যে আল্লার সত্য পয়গম্বর, তাঁহার ধর্মমত যে মিথ্যা নয়, কৃত্রিম নয়—এর প্রমাণও পাই আমরা বিবি খাদিজার এই ইসলাম গ্রহণের মধ্যে। স্বামীর মধ্যে কোন শঠতা বা কোন ভণ্ডামি থাকিলে স্ত্রীই তাহা ভাল বুঝিতে পারেন। ভণ্ডামির পরিচয় পাইলে খাদিজার মত

তেজস্বিনী নারী কখনই এত সহজে স্বামীর নূতন ও বিপজ্জনক ধর্মমত গ্রহণ করিতেন না। ইসলামের কঠিন দিনে খাদিজার এই সমর্থন সমগ্র নারী-জাতিকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

বাহিরে অজ্ঞানতার ঘন-অন্ধকার, সমগ্র দেশ ডুবিয়া আছে সেই অন্ধকারে। তাহারই মাঝখানে শুধু দুইটি প্রাণ নিভৃত নির্জনে একটি সত্যের দীপশিখা আগুলিয়া বসিয়া আছে।

দিন যায়।

ইত্যবসরে জিব্রাইল আসিয়া মুহম্মদকে নামায পড়িবার পদ্ধতি শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা 'সূরা ফাতিহা' তখন অবতীর্ণ হইয়াছে :—

"আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল্ আলামিন···
"সব গুণগান সেই আল্লার
যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও পরম করুণাময়
যিনি বিচার-দিনের প্রভু।
(হে আল্লাহ্) আমরা তোমারই ইবাদৎ করি,
তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
আমাদিগকে সেই সরল পথ দেখাও
যে-পথে তোমার অনুগৃহীত প্রিয়জনেরা চলে,
নয় তাহাদের পথে—যাহারা অভিশপ্ত ও পথভ্রান্ত।"*

গভীর রাত্রে সুললিত কণ্ঠে এই 'সূরা ফাতিহা' পাঠ করিয়া হযরত বিবি খাদিজার সহিত নামায পড়েন। মক্কা-নগরী তখন বাহিরে ঘুমায়।

একটি বালক লুকাইয়া লুকাইয়া এই পবিত্র দৃশ্য দেখে আর কেবলই চিন্তা করে।

কে এই বালক?

ইনি মুহম্মদের পিতৃব্য-পুত্র আলি। আবুতালিবের তিন পুত্র ছিলেন: আলি, জাফর এবং আকিল। পিতৃব্যের অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলিয়া খাদিজাকে বিবাহ করিবার পর মুহম্মদ আলির লালন-পালনের সম্পূর্ণ ভার

* সূরা ফাতিহার অবতরণ-কাল লইয়া কিছু মতভেদ আছে। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে অবতরণের ক্রম হিসাবে সূরা ফাতিহা দ্বিতীয় স্থানীয়। অর্থাৎ ইকরা সূরার প্রথমাংশের পরেই সূরা ফাতিহা নাযিল হয়। এ মত সমর্থনযোগ্য।

লইয়াছিলেন। সেই হইতে আলি মুহম্মদের সংগেই বাস করিতেছিলেন। হযরতের নবুয়ত লাভের সময় আলি একজন বালক মাত্র। বয়স তাঁহার বারো-তেরো।

মুহম্মদ ও খাদিজার নূতন উপাসনা-পদ্ধতি দেখিয়া আলি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন: "আপনারা কাহাকে এমনভাবে সিজ্‌দা (প্রণতি) দেন, ভাইজান?"

মুহম্মদ বলিলেন: "অদ্বিতীয় লা-শরীক সেই পরমসুন্দর আল্লাকে—যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা—যিনি রহমানুররহিম—যিনি সর্বশক্তিমান।"

আলি বলিলেন: "আমিও তবে আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করিব। আমাকে নামায পড়া শিখাইয়া দিন।"

মুহম্মদ বলিলেন: "তোমার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ?"

আলি উত্তর দিলেন: "না, আল্লার খিদমতের জন্য আব্বাকে জিজ্ঞাসা না করিলেও চলে। আল্লাই যখন আমার স্রষ্টা এবং আমার জীবন-মরণের প্রভু, তখন কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমি তাঁহার বন্দিগী করিব।"

আলি বয়েৎ হইলেন। এইরূপে আলিই পুরুষদিগের মধ্যে প্রথম শিষ্য হইবার গৌরব লাভ করিলেন।

বালকের সৎসাহস দেখিয়া হযরত মুগ্ধ হইলেন। এই বালক যে কালে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ হইবেন, তখনই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন।

এদিকে আবুতালিব যখন জানিতে পারিলেন যে, আলি মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তিনি আলিকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:

"সত্যই কি তুমি মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ?"

আলি বিনীতভাবে উত্তর দিলেন: "জি হাঁ, এই ধর্মই সত্য বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আব্বা।"

আবুতালিব তখন মুহম্মদের নিকট গিয়া বলিলেন: "মুহম্মদ, বল তো, তোমার এই নূতন ধর্মের মর্ম কী?"

মুহম্মদ বলিলেন: "ইহাই আল্লার ধর্ম। যে-ধর্ম আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস্-সালাম পালন করিতেন, ইহা সেই ধর্ম। ইহাই ইসলাম।"

"আর তুমি কে?"

"আমি আল্লার রসুল। চাচাজান, আমার বিনীত অনুরোধ, আপনিও

এই সত্যধর্ম গ্রহণ করুন! বুৎপোরস্তি (মূর্তিপূজা) ছাড়িয়া দিন, উহা মহা পাপ।"

আবুতালিব মুহম্মদকে প্রাণ হইতে ভালোবাসিতেন, তাই এই কথাতে তিনি তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন না। একটু কোমল স্বরে বলিলেন: মুহম্মদ, আমি জানি, তুমি সত্যবাদী। কিন্তু কি করিয়া পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করি, বল? আমি তাহা পারি না। তবে এ কথা বলিতে পারি, আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তোমাকে কোরেশদিগের জুলুম ও দাগাবাজি হইতে রক্ষা করিব।

ইহাই বলিয়া আলিকে ডাকিয়া বলিলেন: "আলি, আমার সঙ্গে এস।"

আলি হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হযরতের মুখের দিকে তিনি একবার চাহিলেন। হযরত তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন: "যাও ভাই, চাচাজান বলিতেছেন।"

আলির দিল দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। একদিকে পিতার আদেশ, অপরদিকে সত্যের আকর্ষণ। কোন্ দিকে যাইবেন? মুহূর্ত মধ্যে মন স্থির করিয়া তিনি বলিলেন: "আব্বা, বেয়াদবী মাফ করিবেন। আল্লাহ্ এবং রসুলের সেবায় এ জীবন নিসার করিয়া দিয়াছি। এখন আর ফিরিতে পারি না। আপনাকে ছাড়িতে পারি, কিন্তু রসুলুল্লাকে ছাড়িতে পারি না।"

বালকের কথায় একটা তেজোব্যঞ্জক দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল।

আবুতালিব মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন: "বেশ, তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, এস না। আমি জানি, মুহম্মদ তোমাকে কখনও বিপথে চালিত করিবে না।"

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কী অদ্ভুত চরিত্র এই আবু তালিবের! যুল্‌মাৎ-রাতে ভীরু দীপশিখার মত বাহিরের ঝঞ্ঝা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া আপন কক্ষকে সে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে!

পরিচ্ছেদ : ২০

প্রথম তিন বৎসর

প্রথম তিন বৎসর গোপনে গোপনেই প্রচারকার্য চলিল। আলির পরে হযরতের পালিত পুত্র জায়েদ ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তারপর আবুবকর, ওসমান, আব্বাস ও আরও কয়েকজন। মহিলাদিগের মধ্যে আবুবকরের কন্যা আস্‌মা, ওমরের ভাগিনী ফাতিমা প্রভৃতি প্রথম বয়েৎ গ্রহণ করেন।

মুহম্মদ যে একটি নূতন ধর্মমত প্রচার করিতেছেন এবং কেহ কেহ যে গোপনে সে-ধর্ম গ্রহণও করিয়াছে, মক্কাবাসী কোরেশ নেতৃবৃন্দ তাহা জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহারা বিচলিত হয় নাই। এমন ধর্মবিপ্লব তো কত আসে কত যায়। কত কোরেশ তো খৃষ্টধর্মও গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে কা'বা-মন্দিরের বা আরাধ্য দেবদেবীদের কতটুকু ক্ষতি হইয়াছে? ধর্মদ্রোহী মুহম্মদ কী করিবে? ইহাই ভাবিয়া কোরেশগণ মুহম্মদের ধর্মমতকে প্রথমে উপেক্ষা করিয়াই চলিল।

হযরত গোপনে গোপনে আপন ধর্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বেশী দিন গোপন প্রচার চলিল না। শীঘ্রই প্রকাশ্য প্রচারের আদেশ আসিল। মুহম্মদ তখন একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদিন তিনি আত্মীয়-স্বজন ও কোরেশ দলপতিদিগকে দাওয়াৎ দিয়া নিজগৃহে ডাকিয়া আনিলেন। প্রায় চল্লিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। আহারাদির পর মুহম্মদ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "হে আমার দেশবাসী, শ্রবণ করুন। এক অপূর্ব বিহিশ্‌তী সওগাত আমি আপনাদের জন্য লইয়া আসিয়াছি। আল্লার পাক্ কালাম আমি লাভ করিয়াছি। আপনারা আর মূর্তিপূজা করিবেন না। একমাত্র আল্লাকে উপাসনা করুন। বলুন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর্ রসূলুল্লাহ্।' ইহাই আল্লার মনোনীত ধর্ম। এই ধর্ম গ্রহণ করুন। ইহকাল ও পরকালে আপনাদের কল্যাণ হইবে। আপনাদের মধ্যে কে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবেন? কে এই সত্য প্রচারে আমাকে সাহায্য করিবেন? আসুন।"

কোরেশগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মুহম্মদের উপরে মনে মনে তাহারা ভীষণ চটিয়া গেল। মুহম্মদের পক্ষে এটা একটা মস্ত বড় ধৃষ্টতা বলিয়া তাহাদের মনে হইল।

বিখ্যাত কোরেশ-প্রধান আবুলাহাব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল: "মুহম্মদ, ধৃষ্টতা পরিত্যাগ কর। তোমার পূজনীয় পিতৃব্য ও খুল্লতাত ভ্রাতৃগণ এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে বাতুলতা করিও না। তুমি কুলাংগার। তোমার আত্মীয়গণের উচিত যে তোমাকে কয়েদ করিয়া রাখে।"

এই বলিয়া সে একটা শোরগোল পাকাইয়া তুলিয়া সকলকে লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তখন বালক আলি সম্মুখে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন: "হে রসুলুল্লাহ্, আমি আপনার পার্শ্বে দাঁড়াইতে প্রস্তুত আছি। আল্লার কসম, আজ হইতে আমার এই জীবন আপনার সেবায় নিয়োজিত করিলাম।"

সকলে আলির প্রতি ফিরিয়া দাঁড়াইল। এতটুকু বালকের বেয়াদবী দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইল। আবুতালিবকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা শ্লেষ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিতে লাগিল: "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কল্যাণে এখন বুঝি আপনাকে এই পুত্ররত্নের আদেশই মানিয়া চলিতে হইবে?" এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিল।

প্রথম দিনের এই ব্যর্থতায় হযরত বিচলিত হইলেন না। দ্বিতীয়বার আহ্বানের জন্য তিনি সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

এই সময় আরবে একটি প্রথা ছিল। বিপদের সময় নগরবাসীকে আহ্বান করিতে হইলে, অথবা কোন বিষয়ে কেহ বিচারপ্রার্থী হইলে, মক্কার সাফা পর্বতের শীর্ষে দাঁড়াইয়া তাহাকে কতিপয় সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করিতে হইত। সেই সংকেত-ধ্বনি শুনিয়া নাগরিকগণ পর্বতের পাদদেশে আসিয়া সমবেত হইত। সংকেতদাতা তখন তাহার বক্তব্য সকলকে বুঝাইয়া বলিত।

একদিন এক সুন্দর প্রভাতে মুহম্মদ সেই সাফা পর্বতের শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া সেইরূপ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কোন-কিছু বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়া একে একে সকলে ছুটিয়া আসিল। তখন মুহম্মদ প্রত্যেক গোত্রের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন: "আজ যদি বলি এই সাফা পর্বতের অন্তরালে একদল প্রবল শত্রু তোমাদিগকে হামলা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তবে কি তোমরা আমার সে কথা বিশ্বাস করিবে?"

সকলে উত্তর দিল: "নিশ্চয়ই করিব, কারণ তুমি 'আল্-আমিন্'। এ পর্যন্ত তোমাকে আমরা কোনদিন মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই।"

মুহম্মদ বলিলেন : তাই যদি হয়, তবে বিশ্বাস কর—সত্যই এক মহা বিপদের তোমরা সম্মুখীন হইয়াছ ; সত্যই একদল শয়তানী ফৌজ তোমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। আল্লা-বিস্মৃতি ও প্রতিমা-প্রীতি, কাপট্য ও লাম্পট্য, অত্যাচার ও ব্যভিচার এবং আরও শত প্রকারের পাপ ও মলিনতা তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল, হুঁশিয়ার! এখনও সময় আছে, এখনও পথ আছে। যদি বাঁচিতে চাও, তবে কা'বার ঐ দেবমূর্তিগুলি ভাঙিয়া ফেল, উহারাই তোমাদের প্রবল শত্রু। এক আল্লার উপাসনা কর, অন্তরকে শুচি-সুন্দর কর, তাহা হইলেই দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের মংগল হইবে।"

মুহম্মদের কথা শুনিয়া আবুলাহাব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল : "জাহান্নামে যাও হতভাগা! এই জন্যই বুঝি তুমি আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছ?"

সকলেই তখন আবুলাহাবের পক্ষ সমর্থন করিল। মুহম্মদকে গালি দিতে দিতে তাহারা চলিয়া গেল।

মুহম্মদের আহ্বানে কেহ সাড়া দিল না বটে, কিন্তু এ আহ্বান বিফলেও গেল না। মক্কার ঘরে-ঘরে পথে-প্রান্তরে সকলের মধ্যেই আল্লাহ্ ও রসূলের নাম আন্দোলিত হইতে লাগিল। বিরোধ ও অস্বীকৃতির মধ্য দিয়াই ইসলামের বাণী দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

———

পরিচ্ছেদ : ২১

সংঘর্ষের সূচনা

মুহম্মদ এতদিন বাহিরে বাহিরেই প্রচার করিতেছিলেন। এইবার কা'বা-গৃহের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। 'আল্লার ঘর' হইতে আল্লাহ্ নির্বাসিত হইয়াছেন, আর সেই ঘরে আজ বিরাজ করিতেছে কল্পিত দেবদেবীর পাষাণ-প্রতিমা। হযরত তাই এই 'আল্লার ঘরে' আল্লার বাণী প্রচারের জন্ম বদ্ধ-পরিকর হইলেন। একদিন তিনি কা'বা-গৃহে প্রবেশ করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রসূলুল্লাহ্"। সমস্ত কা'বা-গৃহ সেই মহামন্ত্রের কল-ঝংকারে মুখরিত হইয়া উঠিল। দেবমূর্তিগুলি যেন থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

ব্যাপার বুঝিয়া দলে দলে কোরেশগণ ছুটিয়া আসিল। মুহম্মদ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন: "হে কোরেশগণ, এই দেবমূর্তিগুলি ভাঙিয়া ফেল, আল্লার উপাসনা কর। একমাত্র তিনি ছাড়া আমাদের আর কেহ উপাস্য নাই, আর কেহ সাহায্যকারী নাই।"

শুনিয়া কোরেশগণ একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দেবদেবীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের এমন বেইজ্জতী—এমন অপমান! মুহম্মদের ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস তো কম নয়! সকলে মুহম্মদকে গালাগালি দিতে লাগিল এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্ম উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া বিবি খাদিজার পূর্ব-স্বামীর ঔরসজাত পুত্র তরুণ যুবক হারিস বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। কোরেশগণ তখন তাঁহাকেই আক্রমণ করিল। ফলে এই তরুণ মুসলিম যুবকটি সেইখানেই শহীদ হইলেন।

সত্যের সংগে মিথ্যার সংঘর্ষ এইখান হইতেই আরম্ভ হইল। প্রথম দিনেই একজন মুসলিম তরুণ রক্তদান করিলেন। শহীদের পুণ্য রক্তে গোসল করিয়া শিশু-ইসলাম অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কোরেশগণ এইবার সংঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। আবুলাহাব, আবুজহল, আবু স্থফিয়ান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তাহাদিগের অধিনায়ক হইল।

মুহম্মদ কিন্তু কোন বাধা-বিঘ্নের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। অটল অচলভাবে তৌহিদের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

মুহম্মদের প্রতি কোরেশদিগের আক্রোশ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। অবশেষে তাহারা একদিন আবুতালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল: "হে আবুতালিব, আপনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কল্যাণে আমাদের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। আপনার নিজের মত কী, তাহাও আমরা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের আচরণ কি আপনি সমর্থন করেন? তাহার সম্বন্ধে পূর্বেও আপনাকে বলিয়াছি, কিন্তু আপনি কোনই প্রতিকার করেন নাই।"

"আজ আবার বলিতেছি: আপনি যদি তাহাকে নিবৃত্ত না করেন, তবে আপনাকেও আমরা মুহম্মদের সংগী বলিয়া মনে করিব এবং নিজেরাই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিব।"

কোরেশ দলপতিদিগের ভীতি-প্রদর্শনে আবুতালিব বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাদের সম্মুখেই মুহম্মদকে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে লাগিলেন: "মুহম্মদ, তোমার এই নূতন ধর্ম পরিত্যাগ কর। অনর্থক আমাদের দেবদেবীর নিন্দা করিও না। ইহাতে খামখা দুশমনি বাড়িবি বৈ তো নয়?"

তদুত্তরে মুহম্মদ বলিলেন: "দুশ্‌মনির জন্য আমি ভয় করি না, চাচাজান! শুধু কোরেশ কেন, সমগ্র জগত যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবু আমি আমার সত্য-প্রচারে বিরত হইব না। আমি তো ইচ্ছা করিয়া আপনাদের দেবদেবীর নিন্দা করি না। ইসলাম প্রচার করিতে গেলেই দেবদেবীকে মিথ্যা না বলিয়া উপায় থাকে না। তৌহিদের অর্থই হইল দেবদেবীর অস্বীকার। কাজেই বাধ্য হইয়া দেবদেবীকে মিথ্যা বলিতে হয়। আপনারা ভাবিতেছেন আমি আপনাদের দুশমন। কিন্তু আমি দুশমন নই, আমিই আপনাদের দোস্ত্। আমার কথা শুনুন, ইসলাম কবুল করুন, আপনাদের মংগল হইবে।"

কোরেশগণ এই কথায় আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা মুহম্মদকে নানারূপ ভয় দেখাইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু মুহম্মদ বিচলিত হইলেন না। যথারীতি তৌহিদ প্রচার করিয়াই চলিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

কিছুদিন পরে কোরেশ প্রধানগণ আর একদিন আবুতালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্বের ন্যায় অভিযোগ করিল। আবুতালিব পুনরায়

মুহম্মদকে ডাকিয়া বলিলেন: "বাবা, আমি যে-ভার বহিতে পারি না, তাহা আমার ঘাড়ে চাপাইও না।"

মুহম্মদ বুঝিলেন, তাঁহার পার্থিব জীবনের প্রধান অবলম্বন আবু-তালিবও বুঝি তাঁহাকে ছাড়িয়া যান। কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কী? দৃঢ়কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন: "চাচাজান, আপনারা সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতেও আমি ভীত হইব না। আমি আমার সত্য প্রচার করিবই।"

কোরেশদিগের ক্রোধের মাত্রা এবার চরমে উঠিল। একবাক্যে তাহারা বলিয়া উঠিল: "মুহম্মদ, সাবধান! যদি বেশী বাড়াবাড়ি কর, তোমাকে খুন করিয়া ফেলিব।"

মুহম্মদের অমংগল আশংকায় আবুতালিবের দুর্বলতা কাটিয়া গেল। তিনি কোরেশ দলপতিদিগকে বলিতে লাগিলেন: "থামো। অত উত্তেজিত হইও না। তোমরাই এক সময়ে মুহম্মদকে 'আল্-আমিন' উপাধি দিয়াছিলে, আজ কেন তবে তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না?"

অনেক বাদানুবাদের পর কোরেশগণ সেদিনকার মত প্রস্থান করিল।

সকলে চলিয়া গেলে আবুতালিব মুহম্মদকে বলিলেন: "আল্লার কসম, আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। তোমার কর্তব্য তুমি করিয়া যাও।"

মুহম্মদ খুশি হইয়া বলিলেন: "তবে কেন আপনি নিজে ইসলাম কবুল করিতেছেন না চাচাজান? বলুন: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু···

আবুতালিব বাধা দিয়া বলিলেন: "থাক্ থাক্, সে পরে হইবে।"

মুহম্মদকে কিছুতেই নিরস্ত করিতে না পারিয়া কোরেশগণ এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিল। একদিন তাহারা ওমারা-বিন-অলিদ নামক একটি সুন্দর যুবককে সংগে লইয়া আবুতালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল: "এই ধনবান খুবসুরৎ যুবকটিকে আপনি গ্রহণ করুন, আর ইহার বিনিময়ে মুহম্মদকে আমাদের হস্তে দিন, আমরা তাহাকে খুন করিব।"

আবুতালিব দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন: "হুঁশিয়ার হইয়া কথা বলিও। আবুতালিব এত নীচ নয় যে, তুচ্ছ ধনসম্পদের লোভে মুহম্মদকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করিবে।"

কোরেশগণ ভয় দেখাইতে দেখাইতে চলিয়া গেল। আবুতালিব তৎক্ষণাৎ হাশিম ও মুত্তালিব বংশের সকলকে ডাকিয়া এই বিপদের কথা বলিলেন। সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহারা মুহম্মদকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে তাঁহারাও যে কোরেশ নেতাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন, এ কথা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন।

———

পরিচ্ছেদ : ২২

উৎপীড়ন

এইবার সত্যসত্যই উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। প্রথমেই হযরতের অংগে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হইবে না ভাবিয়া কোরেশগণ হযরতের শিষ্যদিগের উপর অত্যাচার করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু ইসলামের কী অপূর্ব প্রাণশক্তি! নিষ্পেষণের মাত্রা যতই বাড়িতে লাগিল, ভিতর হইতে ততই সে শক্তিশালী হইতে লাগিল। আগুনকে আঘাত করিলে সে যেমন আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, আঘাত খাইয়া ইসলামও ঠিক তেমনিভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এই সময়ে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মোট সংখ্যা ৪০-এর বেশী হইবে না। এই মুষ্টিমেয় নও-মুসলমানদিগের ঈমানের তেজ দেখিলে সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়। একে তো নূতন ধর্ম, তাহাতে আবার প্রচলিত সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার পশ্চাতে না ছিল কোন রাজশক্তি, না ছিল কোন বলপ্রয়োগ, না ছিল কোন আকর্ষণ, না ছিল কোন প্রলোভন। পক্ষান্তরে পদে পদে ছিল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান-নির্যাতন, ধনহানি ও প্রাণহানির আশংকা। এ সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই এই শিষ্যগণ একে একে দিনে দিনে মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠক, চিন্তা করুন, অন্তরতলে কতখানি সত্যাগ্রহ জাগিলে এমনটি সম্ভব হয়। বিপদে ভয় নাই, উৎপীড়নে দুঃখ নাই, জীবনদানের কুণ্ঠা নাই—এমনি জিন্দাদিল্ কতিপয় লোক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এক একজন করিয়া দিনে দিনে হযরতকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও এই কঠিন পথে পা বাড়াইল। যুগসঞ্চিত সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের মোহ এড়াইয়া এরূপভাবে বিপদসঙ্কুল নূতন পথে নিঃসংগ অবস্থায় চলিবার সৎসাহস কয়জন রাখে? সত্যের জন্য এমন আত্মোৎসর্গ, এমন যথাসর্বস্ব ত্যাগ জগতের ইতিহাসে বাস্তবিকই বিরল। প্রাথমিক যুগের এই শিষ্যবৃন্দকে দেখিলে মনে হয়, ইহারা যেন এক-একটি হীরকখণ্ড—ঈমানে অটল, চরিত্রে উজ্জ্বল। ইহারা ভাঙিয়া পড়ে, কিন্তু নত হয় না। এতখানি চরিত্রবল ছিল বলিয়াই তো এই ভক্তদলের প্রত্যেকেই ইসলামের ইতিহাসে এমন অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কোরেশগণ নও-মুসলিমদিগের প্রতি কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই পাঠক তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন :—

(১) সর্বপ্রথমেই মনে পড়ে আমাদের বেলালের কথা। বেলাল ছিলেন একজন কাফ্রী ক্রীতদাস। দেখিতে তিনি অত্যন্ত কৃষ্ণকায় ও কদাকার ছিলেন। কিন্তু হইলে কী হয়! বাহিরটা তাঁহার কালো হইলেও ভিতরটা যে আলোয় আলোময়! কালো কয়লার খনির তলে যেমন করিয়া উজ্জ্বল হীরকখণ্ড লুকাইয়া থাকে বেলালের কুৎসিৎ দেহের মধ্যে তেমনি ছিল একটি সুন্দর জ্যোতির্ময় আত্মা!

বেলালের প্রভুর নাম ছিল উমাইয়া। বেলাল গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিশিদিন আল্লার গুণগান করিতেন। এ কথা জানিতে পারিয়া উমাইয়া একেবারে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত হইয়া উঠিল। বেলালকে তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আনিয়া মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল : "যদি ভাল চাস্ তো এখনি মুহম্মদের ধর্ম পরিত্যাগ কর্।" কিন্তু বেলাল কিছুতেই রাজী হইলেন না। অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া চলিল, কিন্তু বেলাল একেবারে অনমনীয়।

তখন উমাইয়া এক অদ্ভুত শাস্তির ব্যবস্থা করিল; বেলালের গলায় দড়ি বাঁধিয়া পশুর মত টানা-হেঁচড়া করিবার জন্ম তাঁহাকে মক্কার বালক-দিগের হস্তে সমর্পণ করা হইল। বালকেরা প্রত্যহ তাঁহাকে রাজপথে টানিয়া লইয়া বেড়াইত এবং নানাভাবে বিদ্রূপ ও উৎপীড়ন করিত; তারপর সন্ধ্যার সময় অর্ধমৃত অবস্থায় উমাইয়ার বাড়ীতে রাখিয়া আসিত; উমাইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বেলালকে জিজ্ঞাসা করিত : "কেমন, এখনো মুহম্মদের ধর্ম পালন করিবার সাধ আছে নাকি?"

বেলাল নির্ভীক চিত্তে উত্তর দিতেন : "জীবন থাকিতে এ ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

বেলালকে কিছুতেই যখন নিরস্ত করা গেল না, তখন উমাইয়া অত্যা-চারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। বেলালকে হাত-পা বাঁধিয়া মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখর রৌদ্রতপ্ত মরু-বালুকার উপরে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইল এবং যাহাতে সে পার্শ্বপরিবর্তন করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে পাষণ্ডেরা তাহার বুকের উপর এক প্রকাণ্ড পাথর চাপাইয়া দিল। এই অবস্থায় উমাইয়া তাঁহাকে শাসাইয়া বলিল, "বেলাল, যদি ভাল চাও,

হবে এখনও মুহম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর।" কিন্তু বেলাল প্রশান্তমুখে উত্তর দিলেন: "আহাতুন! আহাতুন! এক—সেই অদ্বিতীয় এক!"

বেলালকে কখনও বা অনাহারে রাখা হইত। সারাদিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় বেলাল যখন অবসন্ন হইয়া পড়িতেন তখন উমাইয়া তাঁহাকে চাবুক মারিতে মারিতে বলিত: কেমন, এখনও মুসলমান হইবার সাধ আছে তোমার?

বেলালের মুখে সেই একই বাণী: আহাতুন্! আহাতুন্!

কী পবিত্র দৃশ্য এ! ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বেত্রাঘাতে দেহ জর্জরিত, শোণিত-ধারায় সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত; অথচ তার মধ্য হইতে ঝংকৃত হইতেছে শুধু সেই এক অদ্বিতীয় আল্লার জয়-ঘোষণা!

কিছুদিন এইরূপে কাটিয়া গেল। তারপর নামিল আল্লার করুণা। আবুবকরের অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। বেলালের দুর্দশার কথা জানিতে পারিয়া তিনি বহু অর্থের বিনিময়ে অতি কষ্টে উমাইয়ার নিকট হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন।

এই বেলাল—এই কাফ্রী বেলালই—মুসলিম জগতের প্রথম মুয়াজ্জিন। ইঁহারই কণ্ঠে আমরা শুনিতে পাইয়াছি তৌহিদের অগ্নিবাণী "আল্লাহু আকবর"।

মুসলিম জগতের প্রবলপ্রতাপান্বিত খলিফা হযরত ওমর পরবর্তীকালে এই বেলাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন: "আমাদের হযরত আবুবকর আমাদের হযরত বেলালকে মুক্ত করিয়াছিলেন।"

মানুষ মানুষকে এর বেশী শ্রদ্ধা দেখাইতে পারে না।

(২) ইয়াসির এবং তাঁহার স্ত্রী সুমাইয়া ও পুত্র আম্মারের উপরেও কোরেশ পশুগণ অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছিল। ইয়াসিরের দুই পায়ে দুইটি দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ির প্রান্তদ্বয় দুইটি উটের পায়ের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিয়া বিপরীত দিকে উট তাড়না করা হইল। ফলে ইয়াসিরের দেহ চিরিয়া দুই-টুকরা হইয়া গেল; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। আম্মারকেও প্রহার করিতে করিতে অচেতন করিয়া ফেলা হইল। ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও বিবি সুমাইয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না; তিনি পূর্ববৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কলেমা উচ্চরণ করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড আবুযহল ক্রুদ্ধ হইয়া বিবি সুমাইয়াকে বর্শা বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। নারীদিগের মধ্যে বিবি সুমাইয়াই প্রথম শহীদ।

(৩) ওসমান ছিলেন বুনিয়াদি ঘরের ছেলে। তাঁহার সহিত হযরত আপন এক কন্যাকে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং কালে তিনিই তৃতীয় খলিফা রূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই ওসমানও যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন, তখন কোরেশগণ একেবারে হিংস্র পশুর ন্যায় ক্ষেপিয়া গেল। ওসমানের পিতৃব্যের সহিত যোগ দিয়া তাহারা ওসমানকে হাত-পা বাঁধিয়া প্রত্যহ নির্মমভাবে প্রহার করিত। ওসমান আল্লার নামে সমস্তই সহ্য করিতেন।

(৪) খাব্বার নামক একজন ভক্তকে কোরেশগণ জ্বলন্ত অংগারের উপর শোওয়াইয়া দিয়া তাঁহার বুকে পা দিয়া চাপিয়া রাখিত। এই ধরনের আরও বহু অত্যাচার তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত। খাব্বারের জীবন রক্ষা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু চিরদিনের মত তাঁহার পৃষ্ঠে ধবল কুষ্ঠের মত সাদা দাগ পড়িয়া গিয়াছিল।

(৫) জেন্নিরা নাম্নী এক মুসলিম নারীর উপর এমন অত্যাচার করা হইয়াছিল যে, চিরদিনের জন্য তাঁহার চোখ দুইটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

(৬) শোয়েব নামক আর একজন ভক্ত ভীষণভাবে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। বহু রকম অত্যাচারের পর কোরেশগণ বলিল: "তোমার ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সব যদি পরিত্যাগ করিয়া দেশত্যাগী হইতে পার, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।" শোয়েব তাহাতেই রাজী হইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন: "এই সব বিষয়-সম্পত্তি আল্লার রসুলের পায়ের একটি ধূলিকণারও সমান নয়।"

নবদীক্ষিত মুসলমানদিগের উপর কোরেশগণ এমনই শয়তানি জুলুম আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! অনন্ত জীবনের সন্ধান পাইয়া ভক্তবৃন্দ এই তুচ্ছ জীবনের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হযরত নীরবে সমস্তই দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। কী আর করিবেন? আল্লার নামে ধৈর্য ধরিয়া থাকিবার জন্য তিনি সকলকেই উপদেশ দিলেন। বিপদের ইহাই যে শেষ নয়, ইহাই যে আরম্ভ, এ কথা তিনি পরিষ্কারভাবে শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোরেশদিগের উপর তিনি একটুও ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি জানিতেন উহারা ক্রোধের পাত্র নয়, কৃপার পাত্র।

পরিচ্ছেদ : ২৩

'—এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে'

পাঁচটি বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। হযরত আপন শিষ্যদিগের নিরাপত্তার জন্ম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কোরেশদিগের অত্যাচারে ভক্তগণ আদৌ ধর্মকর্ম পালন করিতে পারেন না, প্রকাশ্যভাবে কুরআন পাঠ করিতে পারেন না, নামায পড়িতে পারেন না। এমনই তাঁহাদের দুর্দশা। সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাই হযরত স্থির করিলেন, অত্যাচারকে রোধ করিবার শক্তি ও সামর্থ্য যখন তাঁহাদের নাই, তখন আপাততঃ অত্যাচারীদিগের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাওয়াই যুক্তিসংগত।

এই সময়ে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান সম্রাট নাজ্জাশী অতিশয় স্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক বলিয়া সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে মক্কাবাসিগণ কোন কোন সময় আবিসিনিয়ায় গমন করিতেন, এ-কারণ এই দেশ সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু খবর রাখিতেন। এই আবিসিনিয়া দেশেই একদল উৎপীড়িত শিষ্য পাঠাইয়া দেওয়া হযরত সংগত মনে করিলেন।

পাছে এই দেশান্তরের কথা জানিতে পারিয়া কোরেশগণ একটা অনর্থ ঘটায়, এই আশংকায় গোপনে গোপনে সমস্ত আয়োজন করা হইল। দশজন পুরুষ এবং চারিজন নারী ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, স্বদেশ ও স্বজাতিকে ছাড়িয়া দুর্গম অজানা দেশে হিযরৎ করিলেন :—

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রথম দলে ছিলেন :

ওসমান ও তাঁহার স্ত্রী রোকাইয়া (রসূলুল্লার কন্যা), আবু হোজাইফা ও তাঁহার স্ত্রী সাহলা, আবু সালমা ও তাঁহার স্ত্রী উম্মে সাল্মা, আমর-বিন্-রাবিয়া ও তাঁহার স্ত্রী লায়লা।

পাঠক মনে করিতে পারেন, যাঁহাদের সাহায্য করিবার কেহই ছিল না, তাঁহারাই বুঝি এমন করিয়া দেশত্যাগী হইলেন। কিন্তু তাহা মোটেই নয়। চৌদ্দজন নরনারীর মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সম্ভ্রান্তবংশীয় এবং সংগতিসম্পন্ন। হযরতের কন্যা রোকাইয়া ও তাঁহার স্বামী ওসমানও এই দলের

অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, শরীফ ও অবস্থাপন্ন ঘরের নর-নারীও কোরেশদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় নাই। পক্ষান্তরে বেলাল, আম্বর প্রভৃতি যাঁহারা সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা হযরতকে একা ফেলিয়া কিছুতেই দেশত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। বস্তুতঃ যাঁহারা দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা করেন নাই, তাঁহাদের কেহই মহত্ত্ব ও ত্যাগে কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না। সমস্ত ছাঁড়িয়া অজানা দেশে প্রস্থানের মধ্যে যেমন ধর্মানুরাগ, সৎসাহস, ত্যাগ ও মহত্ত্ব ছিল, সমস্ত বিপদকে বরণ করিয়া হযরতের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিবার মধ্যেও ছিল তেমনি আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি অপূর্ব ভক্তি, সত্যাগ্রহ ও চরিত্রবল।

যাহাই হউক, কোরেশগণ যখন জানিতে পারিল যে, কতিপয় শিকার তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা ভীষণ হিংস্র হইয়া উঠিল। পলাতক মুসলিমদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাহারা একদল লোককে জেদ্দা বন্দরের দিকে প্রেরণ করিল। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, কোরেশদিগের লোকজন জেদ্দায় পৌঁছিয়াই শুনিল, একটু পূর্বেই আবি-সিনিয়ার জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

অনুচরগণ ফিরিয়া আসিয়া কোরেশদিগকে এই নিরাশার সংবাদ দিল। পরাজয়ের কলংক ও গ্লানিতে তাহারা তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। কেমন করিয়া তাহারা ইহার প্রতিশোধ লইবে, ভাবিতে লাগিল।

নও-মুসলিমগণ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় উপনীত হইলেন। নাজ্জাশী তাঁহাদিগকে আদর করিয়া নিজ রাজ্যে বাস করিবার অনুমতি দিলেন। নির্বিঘ্নে তাঁহারা সেখানে ধর্মকর্ম পালন করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে হযরতের আদেশে আলির ভ্রাতা জাফরের অধীনে আরও ৮৩ জন মুসলমান নরনারী আবিসিনিয়ায় হিযরত করিলেন।

হযরতের শিষ্যগণ এইরূপভাবে নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কেরেশ দলপতিগণ বিচলিত হইল। তাহারা তখন পরামর্শ করিয়া দুইজন প্রতিনিধিকে নাজ্জাশীর নিকট পাঠাইতে মনস্থ করিল। উদ্দেশ্যঃ ফেরারী আসামীরূপে মুসলমানদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে জব্দ করা। আবদুল্লাহ্-ইব্নে-আবুরাবিয়া এবং আমর-বিন্-আ'স নামক দুইজন বিচক্ষণ লোক এই কার্যের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হইল।

কোরেশগণ নাজ্জাশী ও তাঁহার সভাসদবর্গকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানাবিধ মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাইয়া দিল। প্রতিনিধিদ্বয় আবিসিনিয়ায় পৌছিয়া প্রথমেই সভাসদবর্গকে সেই সব উপহার দিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিল। তাহারা তাঁহাদিগকে বুঝাইল যে, পলাতক মক্কাবাসীরা তাহাদেরই লোক; না বলিয়া তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে; লোকগুলি ভীষণ বদমায়েশ; উহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্যই এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহারা আবিসিনিয়ায় আসিয়াছে। অতএব দয়া করিয়া যেন লোকগুলিকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

পারিষদবর্গ কোরেশ প্রতিনিধিদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন এবং তাহাদের জন্য সম্রাটের নিকট সুপারিশ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে কোরেশ দূতগণ রাজ-দরবারে হাজির হইয়া সম্রাটকে উপঢৌকনাদি প্রদান করিল। সম্রাট খুশি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "তোমরা কেন আসিয়াছ?"

আব্দুল্লাহ্ এবং আমর বলিল: "জাঁহাপনা, আমাদের নেতৃবৃন্দ আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের দেশের কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ধর্মদ্রোহী নরনারী আপনার রাজ্যে পালাইয়া আসিয়াছে। তাহারা পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্ভুত নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। উহা না আমাদের ধর্ম, না আপনাদের ধর্ম। কাজেই উহাদের আত্মীয়স্বজন ও মনিবগণ আমাদিগকে হুজুরের নিকট পাঠাইয়াছেন। দয়া করিয়া উহাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সভাসদ্‌বর্গ বলিয়া উঠিলেন; "হাঁ, হাঁ, এ প্রার্থনা খুবই সংগত বটে।" নাজ্জাশী কিন্তু এ কথা সমর্থন করিতে পারিলেন না। বলিলেন: "অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনিয়া আমি হুকুম দিতে পারি না। লোকগুলিকে দরবারে হাজির কর।"

আদেশক্রমে মুসলমানগণ রাজদরবারে হাজির হইলেন। তখন নাজ্জাশী তাঁহাদিগকে বলিলেন: "তোমরা কোন্ ধর্ম পালন কর?"

মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে জাফর উত্তর দিলেন: "ইসলাম।"

"এ ধর্মের ব্যাখ্যা কি?"

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রসুলুল্লাহ্"—ইহাই হইতেছে এ ধর্মের মূল কালেমা। আল্লাকে ভুলিয়া আমরা এতদিন দেবদেবীর মূর্তি পূজা করিতাম।

আমাদের মন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে পূর্ণ ছিল। নানা পাপে আমরা লিপ্ত ছিলাম। ঠিক এই দুর্দিনে আল্লার রসুল মুহম্মদ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক। আল্লার পাক কালাম তিনিই লাভ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে এক-আল্লার ইবাদৎ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সর্বপ্রকার কলুষতা হইতে মনকে পবিত্র রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন, সত্যাশ্রয়ী ও পরোপকারী হইতে বলিয়াছেন, বিধর্মীদিগের সহিত শান্তিতে বাস করিতে বলিয়াছেন, আর্ত, পীড়িত ও ব্যথিতকে সেবা করিতে বলিয়াছেন, মানুষকে ঘৃণা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহাই আমাদের ধর্মের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা! এই পবিত্র ধর্ম আমরা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমাদের আত্মীয়স্বজন ও কোরেশ দলপতিগণ আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা তিষ্ঠিতে না পারিয়া দেশত্যাগী হইয়াছি। বাদশানামদারের ন্যায়বিচারের কথা শুনিয়া, স্বয়ং হযরত মুহম্মদ আমাদিগকে আপনার রাজ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া পুনরায় অত্যাচার করিবার মানসেই এই কোরেশ দূতগণ আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। শাহিনশাহ্ যদি ইহাদের প্রার্থনা অনুযায়ী আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেন, তবে এবার আর আমাদের রক্ষা নাই। হে সম্রাট, আমরা আপনার অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি।"

জাফরের ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। সম্রাট বলিলেন: "তোমাদের নবী যে-প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছেন, তাহার কোন অংশ আমাকে শুনাইতে পার?"

জাফর তখন যিশুখৃষ্ট ও তাঁহার মাতা মরিয়ম সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলি সুললিত কণ্ঠে পাঠ করিলেন। সম্রাট মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে বলিলেন: "যিশুখৃষ্টের বাণী যেখান হইতে আসিয়াছে, এ-বাণী ঠিক সেখান হইতেই আসিয়াছে। কোরেশদূতগণ, তোমরা চলিয়া যাও, তোমাদের প্রার্থনা না-মনযুর।"

কোরেশ প্রতিনিধিগণ বিমর্ষ হইয়া সেদিনকার মত রাজসভা পরিত্যাগ করিল। পরদিন পুনরায় তাহারা সম্রাটের নিকট আসিয়া বলিল: "সম্রাট, এই নূতন ধর্মাবলম্বীরা যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধে অত্যন্ত জঘন্য ধারণা পোষণ করে, তাহারা যিশুকে 'খোদার বেটা' বলিয়া স্বীকার করে না। বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন।"

পুনরায় মুসলমানদিগকে ডাকিয়া পাঠান হইল। এইবার তাঁহারা বিপদ গণিলেন। যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে যে-মত অভিব্যক্ত আছে, খৃষ্টান মতের সহিত তাহার ঘোর বিরোধ। এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁহার সভাসদবর্গ যে আশ্রয়প্রার্থী মুসলমানদিগের উপর বিরূপ হইয়া পড়িবেন, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এ আশংকা তাঁহারা করিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ ও রসূলের নামে যাঁহারা দেশত্যাগী হইয়াছেন, সত্যের জন্য যাঁহারা নিজেদের জীবন কুরবান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা কি সত্যের অপলাপ করিতে পারেন? নির্ভীক চিত্তে জাফর দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন: "হে সম্রাট, আমাদের পয়গম্বর যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা তাই বিশ্বাস করি। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি বলিয়াছেন: যিশুখৃষ্ট আল্লার পুত্র নন, তিনি আল্লার দাস এবং তাঁহারই মত আল্লার প্রেরিত একজন নবী। কুমারী মরিয়মের নিকট তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।"*

নাজ্জাশী তখন সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন: "শুনিয়া সুখী হইলাম যে আমাদের ধর্মে এবং তোমাদের ধর্মে বিশেষ কোনই পার্থক্য নাই। তোমরা নির্বিঘ্নে এখানে বাস করিতে থাক। তোমাদের কোন ভয় নাই।"

কোরেশ দূতগণের শেষ প্রচেষ্টাও এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল। হতাশ প্রাণে তাহারা আবিসিনিয়া ত্যাগ করিল।

এশিয়া ছাড়িয়া এইরূপে আফ্রিকা মহাদেশের মরুভূমির মধ্যে ইসলামের জ্যোতিঃ ছড়াইয়া পড়িল।

* দেখুন কুরআন: ৫ : ৭২—৭৫, ১১৬—১৯ ; ১৬—৪০ এবং ৮৮—৯৩

পরিচ্ছেদ : ২৪

প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল

কোরেশ প্রতিনিধিগণ আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন নিজেদের ব্যর্থতার কাহিনী বর্ণনা করিল, তখন কোরেশ দলপতিদিগের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে তাহারা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। দ্বিগুণ উৎসাহে এইবার তাহারা অত্যাচারের পালা শুরু করিল।

এইবার স্বয়ং হযরত মুহম্মদের উপরেই তাহাদের সমস্ত ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হইল। তাঁহাকেই ভালরূপে শিক্ষা দিবার জন্য কোরেশগণ পণ করিল।

কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। সেই প্রতিক্রিয়া এইবার আরম্ভ হইল। গরল-সমুদ্র মন্থন করিতে গিয়া অমৃত উঠিল।

একদিন হযরত সাফা পর্বতের নিভৃত গুহায় বসিয়া ধ্যানমগ্ন আছেন, এমন সময় আবুযহল গিয়া সেখানে উপস্থিত। প্রথমে সে হযরতকে নানারূপ গালাগালি দিতে লাগিল, কিন্তু হযরত তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন সে তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধে নানা কুৎসা আরম্ভ করিল। ইহাতেও হযরতের কিছুমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল না। তখন নরাধম একখণ্ড প্রস্তর ছুঁড়িয়া হযরতের মস্তকে আঘাত করিল। আঘাতের ফলে দরদর করিয়া লোহু ঝরিতে লাগিল। সেই রক্তে তাঁহার সারা দেহ রঞ্জিত হইয়া গেল। কিন্তু তখনও সেই পবিত্র মুখে এতটুকু ক্রোধ বা অভিশাপের চিহ্ন নাই। শোণিতসিক্ত দেহে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করিলেন না।

একজন ক্রীতদাসী দূরে দাঁড়াইয়া এই ঘটনা দেখিতে পাইয়াছিল। সে আসিয়া হামজার নিকটে বলিয়া দিল।

হযরতের অন্যতম পিতৃব্য বীরকেশরী হামজা তখন মৃগয়া হইতে সবেমাত্র ফিরিয়া আসিতেছিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন:, "কী! এত বড় স্পর্ধা! মুহম্মদের অংগে হস্তক্ষেপ! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কাহার কী ক্ষতি করিয়াছে? কী অপরাধ

করিয়াছে? মূর্তিপূজা ছাড়িয়া দিয়া এক-আল্লার ইবাদৎ করিতে বলা কি এতই অপরাধের কাজ? না হয় সে একটা নূতন ধর্মই প্রচার করিতেছে; তাই বলিয়া সে তো জোর করিয়া কাহারও উপর সে-ধর্ম চাপাইয়া দিতেছে না। সে শুধু প্রচার করিয়া যাইতেছে মাত্র। ইহার জন্ম এত অত্যাচার? এত জুলুম? আমি নিজে না হয় তাঁহার ধর্মমত না-ই গ্রহণ করিয়াছি, তাই বলিয়া কি অপরে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবে, আর আমি নীরবে তাহা সহ্য করিব? কখনই নয়।" বলিতে বলিতে তিনি সেই বেশেই বেগে বাহির হইয়া গেলেন।

আবুযহল তখন কা'বা-মন্দিরে বসিয়া অন্যান্য কোরেশদিগের সহিত এই প্রস্তর-নিক্ষেপ ব্যাপার লইয়া বেশ খানিক কৌতুক উপভোগ করিতেছিল, এমন সময় হামজা গিয়া সেখানে উপস্থিত। আবুযহলকে দেখিতে পাইয়া হামজা ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করিয়া তাহার উপর আপতিত হইলেন এবং স্বীয় স্কন্ধবিলম্বিত ধারা তাহার মস্তকে ভীষণভাবে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন: "শয়তান, মুহম্মদের গায়ে হাত দিয়াছিস? জানিস না সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র?"

আবুযহল বিপদ গণিল। ভীত কণ্ঠে বলিল: "ধর্মের জন্যই এ কাজ করিয়াছি।"

হামজা উত্তর দিলেন: "ধর্মের জন্য? তবে শোন্, আজ হইতে আমিও মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন: "লা ইলাহা-ইল্লাল্ল হু মুহম্মদর রসূলুল্লাহ্!"

আবুযহল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হামজার মত বীর মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিল? কোরেশদিগের পক্ষে এ যে মস্ত বড় পরাজয় ও দুর্ভাবনার কথা!

আবুযহলের দুর্দশা দেখিয়া তাহার পক্ষের অন্যান্য লোকজন ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আবুযহল দেখিল, এখন যদি একটা খুনখারাবী হইয়া যায়, তবে তাহার পরিণাম ফল শুভ হইবে না। হাশিম ও মুত্তালিব বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে অনেকেই বিগড়াইয়া যাইবে। তাই সে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল: "হামজাকে কেহ কিছু বলিও না। আমি বাস্তবিকই মুহম্মদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি।" এই বলিয়া আবুযহল ব্যাপারটাকে আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে দিল না। হামজাকে শান্ত করিয়া সেদিনকার মত ফিরাইয়া দিল।

হামজা গৃহে ফিরিলেন। যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই ফিরিলেন; কিন্তু মনে হইতে লাগিল, সবই যেন নূতন—তিনিও নূতন, পথও নূতন!

হামজা সোজাসুজি হযরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। হামজার স্থায় বীরপুরুষের ইসলাম গ্রহণে হযরত অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। আঘাতের সকল বেদনা নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল।

এদিকে কোরেশগণ মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল। দিনে দিনে মুসলমান-দিগের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিছুতেই এই নূতন ধর্মীয় উৎপাতটিকে দূর করা যাইতেছে না, ইহা তাহাদের পক্ষে মস্ত একটা দুর্ভাবনার কথা হইয়া দাঁড়াইল।

উৎপীড়নে কোনই সুফল ফলিল না দেখিয়া এইবার তাহারা এক নূতন চাল চালিল। একদিন মুহম্মদ কা'বা-গৃহে বসিয়া আছেন এমন সময় কোরেশদিগের প্রতিনিধি-স্বরূপ ওৎবা হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল: "দেখ মুহম্মদ, তুমি আমাদের পর নও, আমরাও তোমার পর নই। সর্বদা আমরা তোমার মংগল কামনাই করিয়া থাকি। তুমি বল, কী তোমার উদ্দেশ্য? তুমি কি দেশের নেতৃত্ব চাও? রাজমুকুট চাও? ধনসম্পদ? সুন্দরী কন্যা? বল, যাহা চাও, তাহাই আমরা তোমার চরণতলে আনিয়া দিব। কিন্তু দোহাই তোমার, ওই অদ্ভুত নূতন ধর্মমত আর প্রচার করিও না।"

হযরত ধীরে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন: "যদি তোমরা আমার এক হাতে সূর্য এবং আর-এক হাতে চন্দ্র আনিয়া দাও, তবুও আমি এই সত্য প্রচারে বিরত হইব না।"

বলিতে বলিতে তিনি কুরআন-শরীফের 'হা-মিম' সূরা পাঠ করিতে লাগিলেন:

> (হে মুহম্মদ) বল, আমিও তোমাদের মত মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র অদ্বিতীয় সেই আল্লাহ্। অতএব সরল পথ অনুসরণ কর এবং তাঁহার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং পৌত্তলিকদিগের জন্য দুঃসংবাদ।" —(৪১ : ৬)

পবিত্র মুখ-নিঃসৃত সেই পবিত্র বাণী শ্রবণ করিয়া ওৎবা মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরব হইয়া রহিল। ভিতর হইতে সে যেন সমস্ত শক্তি ও সাহস হারাইয়া ফেলিল। আর কোন বাদানুবাদ না করিয়া ওৎবা চলিয়া গেল।

কোরেশগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া ওৎবার আশাপথ চাহিয়া ছিল। ওৎবা ফিরিয়া যাইতেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল: "খবর কি? উদ্দেশ্য সফল তো?"

ওৎবা উত্তর দিল: "সত্যিই বলিতেছি, মুহম্মদের মুখে আজ যাহা শুনিলাম, জীবনে কখনো শুনি নাই। এ বাণী নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক। ভাবে, ভাষায় ইহা একেবারে অতুলনীয়! তোমরা আমার কথা শোন, মুহম্মদকে যাহা খুশি করিতে দাও, তাঁহাকে লইয়া আর অনর্থক গণ্ডগোল করিও না।"

ওৎবার কথায় কোরেশগণ নিরুৎসাহ হইয়া বলিতে লাগিল: "তোমাকেও ভূতে ধরিয়াছে দেখিতেছি। তুমিও মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আসিলে নাকি?"

ওৎবা বলিল: "তা নয়। তবে আমার মতামত তোমাদিগকে বলিলাম, এখন তোমাদের যাহা খুশি করিতে পার।"

কোরেশগণ তখন ভাবিল, এরূপ ব্যক্তিগত চেষ্টায় কোন ফল হইবে না। তাহারা এক সভা আহ্বান করিল। মুহম্মদকে সেই সভায় ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন দূত প্রেরিত হইল। দূত গিয়া মুহম্মদকে বলিল: "আমরা আজ একটি সভা ডাকিয়াছি। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। আপনার সহিত তাঁহারা দুই-একটি কথা বলিতে চান। যাইবেন কি?"

হযরত উত্তর দিলেন: "কেন যাইব না? নিশ্চয়ই যাইব। চল যাই।"

নির্ভীক মুহম্মদ দ্বিধাহীন চিত্তে একা সেই বিপক্ষ দলের সভায় গিয়া হাজির হইলেন। তখন কোরেশ-দলপতিগণ পূর্বের ন্যায় তাঁহাকে অনেক প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। তাহাদের বক্তব্য শেষ হইলে হযরত বলিতে লাগিলেন: "হে কোরেশগণ, আমি তোমাদের নিকট কোন কিছুরই প্রত্যাশী নই। আমি সত্যই তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্যই আল্লার কালাম। এই কালাম গ্রহণ কর, দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের মংগল হইবে।"

আবার সেই পুরাতন কথা! অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিল, কেহ কেহ বলিতে লাগিল: "আচ্ছা, তুমি যদি পয়গম্বরই হইবে, তবে কোন একটা মো'জেজা (অলৌকিক ব্যাপার) দেখাও তো? আমাদের এই

৮

মরুভূমিতে একটা নহর বহাইয়া দাও তো? পর্বতগুলি দূর করিয়া এই মরুপ্রদেশকে শস্যশ্যামল করিয়া তোল তো? আমাদের পূর্বপুরুষ 'কোসাই'কে জিন্দা করিয়া দেখাও তো? এই সব যদি করিতে পার, তবেই বুঝিব তুমি পয়গম্বর।"

হযরত বলিলেন: "এ কাজের জন্য আমি আসি নাই। সব মো'জেজা আল্লার ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা করিলে সব-কিছুই করিতে পারেন। আমি যাদুকর নই। যাদু দেখাইয়া তোমাদিগকে স্বমতে আনিতে ঘৃণা বোধ করি। সত্যের জ্বলন্ত স্পর্শে তোমাদের প্রাণ যদি সাড়া না দেয়, তবে তোমরা আমার কথা শুনিও না।"

কোরেশদিগের ব্যংগ-বিদ্রূপ অবশেষে সেই ভীতি-প্রদর্শনে গিয়া পৌঁছিল! তাহারা এক বাক্যে হযরতকে বলিয়া দিল: "আর নয়! শেষবারের মত তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম। এরপর আমাদিগকে কোন দোষ দিতে পারিবে না।"

"সত্যের সহিত মিথ্যার কখনও আপোষ হয় না"—এই বলিয়া হযরত ফিরিয়া আসিলেন।

পাষাণ হৃদয় কিছুতেই যে দ্রবীভূত হইতেছে না, পথভ্রষ্ট কাফেলা কোন মতেই যে সত্যপথে আসিতেছে না, ইহা লক্ষ্য করিয়া হযরত মর্মাহত হইলেন; ক্রোধ নয়, প্রতিহিংসা নয়—করুণা ও সমবেদনায় মহাপুরুষের অন্তর ভরিয়া উঠিল। না জানি আল্লার কোন্ কঠিন অভিশাপ ইহাদের উপর নামিয়া আসে—এই চিন্তায় তিনি পেরেশান হইয়া পড়িলেন।

—

পরিচ্ছেদ : ২৫

সাহারাতে ফুটল রে ফুল!

কোরেশগণ দেখিল তাহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইতেছে না। ক্ষুব্ধ অভিমানে তাহারা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা পরিষ্কার বুঝিল, মুহম্মদকে দূর করিতে না পারিলে তাহার ধর্মকে দূর করা সম্ভব নয়।

এই উদ্দেশ্যে তাহারা আবার একটি জরুরী সভা ডাকিল। আবুযহল, আবুলাহাব, অলিদ, ওমর প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সমবেত হইল। আবুযহল দৃপ্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল: "হে কোরেশ বীরগণ, আর কতকাল এমন নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিবে? আমাদের কওম, আমাদের দীন্, আমাদের সম্মান, আমাদের প্রতিপত্তি—সবই আজ বিপন্ন। নগণ্য একটি লোক এত বড় বিপ্লব আনিল, অথচ তোমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলে না! তোমাদের বাহুতে কি কুওৎ নাই? প্রাণে কি উৎসাহ নাই? অন্তরে কি ঘৃণা নাই? ক্রোধ নাই? প্রতিহিংসা নাই? ধিক্ তোমাদের বীরত্বে! ধিক্ তোমাদের জীবনে! আজ আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেছি: তোমাদের মধ্য হইতে যে আজ মুহম্মদের মাথা কাটিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে আমি এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং একশত উট বখশিস্ দিব। কে প্রস্তুত আছ, বল?"

উত্তেজিত জনতার মধ্য হইতে উন্নতশির বিশালবক্ষ—তরুণ যুবক মহাবীর ওমর উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিল: "আমি প্রস্তুত। মুহম্মদের শির আমি আনিয়া দিব, মুহম্মদকে কত্ল না করিয়া ফিরিব না—এই পণ করিলাম।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে যাত্রা করিল।

সমবেত জনতার উল্লাস-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলে বুঝিল ওমরের মত বীর যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন এবার আর মুহম্মদের রক্ষা নাই।

ওমর চলিয়াছে এক মনে, এক ধ্যানে মুহম্মদের সন্ধানে। হস্তে নাংগা তলোয়ার, মুখে তেজোদৃপ্ত ভংগি। দেখিলে মনে ত্রাস জন্মে।

হঠাৎ পথিমধ্যে নঈমের সহিত সাক্ষাৎ। নঈম তাহার দোস্ত্। "কি হে ওমর, খবর কি? কোথায় চলিয়াছ এই বীর বেশে?" নঈম জিজ্ঞাসা করে।

ওমর গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়: "মুহম্মদের মুণ্ডপাত করিতে।"

নঈম গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল; ওমরের কথা শুনিয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল: "সর্বনাশ! এতখানি তোমার দুরাশা! ক্ষান্ত হও। এ কার্য কখনও করিতে যাইও না। তুমি ইহা পারিবে না।"

ওমর একটু রুষ্ট হইয়া বলিল: "কেন?"

নঈম জবাব দিল: "ঐ যে একটি মেষশিশু খেলা করিতেছে, উহাকে ধরিয়া দাও তো?"

ওমর মেষশিশুটিকে ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না। তখন নঈম একটু হাসিয়া বলিল: "নিরীহ একটা মেষশিশুকে ধরিতে পারিলে না, আল্লার বাঘকে কেমন করিয়া ধরিবে?"

ওমর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল: "বুঝিয়াছি, হতভাগা! তুই বুঝি মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিস?"

নির্ভীক চিত্তে নঈম উত্তর দিল: "সে কথা পরে হইবে। কিন্তু স্বয়ং তোমার ভগিনী ফাতিমা এবং তাহার স্বামী সঈদ যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তার কী? নিজের ঘর আগে সামলাও, তারপর মুহম্মদের শির নিও।"

"কী! আমার ভগিনী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে? এতবড় স্পর্দ্ধা? আচ্ছা তারই আগে মুণ্ডপাত করিয়া আসি।"

বলিতে বলিতে ওমর ফাতিমার গৃহপানে অগ্রসর হইল।

অস্তগামী সূর্যের রক্ত-আভায় তখন পশ্চিম-গগন রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে; ঊষর প্রকৃতির নিস্তব্ধ নির্জনতা মনের উপর ছায়া ফেলিয়াছে। ভুবনে ভুবনে চিরবিরহের সুর ধ্বনিত হইতেছে। দিনরজনীর এই সন্ধিক্ষণে মানবের মন স্বভাবতঃই যেন কাহার চরণে মাথা নত করিতে চায়, কাহার আকর্ষণ যেন সে অনুভব করে—বহির্জগতের অন্যান্য সকলের ন্যায় মানুষের মনও যেন ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। এই সুন্দর সন্ধ্যায় সঈদ ও ফাতিমা কুরআনের 'তা-হা' সূরা পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় ওমর আসিয়া তথায় উপস্থিত।

ওমর প্রথমেই ভিতরে প্রবেশ করিল না। ধীর পদক্ষেপে গৃহের নিকটে গিয়া কান পাতিয়া রহিল। মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তাহার কানে আসিল। ওমরের সন্দেহ আরও গভীর হইল।

বেশীক্ষণ নীরব থাকা সম্ভব হইল না। ক্রুদ্ধ ওমর সশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল।

ওমরের সাড়া পাইয়াই ফাতিমা তাড়াতাড়ি কুরআনের লিখিত আয়েত-গুলি নিজের বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন। ওমর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল : "কি পড়িতেছিলে তোমরা, বল ?"

ফাতিমা বলিলেন : "কই তুমি কিছু শুনিতে পাইয়াছ ?"

ওমর উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল : "ন্যাকামি রাখ ? আমার বুঝি কান নাই ?" অতঃপর সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিল : "ওরে হতভাগা, তোরা বুঝি মুসলমান হইয়াছিস্ ? তবে ত্থাখ্ মজা"—এই বলিয়াই সে সঙ্গীদকে ভীষণভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ফাতিমা স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। ওমর তখন ফাতিমাকে প্রহার করিতে শুরু করিল। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে রক্ষা করিতে গিয়া উভয়েই প্রহৃত ও আহত হইলেন। ওমর সহসা ফাতিমার অংগে রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইল। প্রহার বন্ধ করিয়া সে বলিল : "বল্ হতভাগিনী, মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিস ?"

ফাতিমা নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিলেন : "হ্যাঁ, করিয়াছি। আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি। জীবন গেলেও আমরা এ-ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তোমার যাহা খুশি করিতে পার।"

ওমর স্বর একটু নরম করিয়া বলিল : "দেখি তোমরা কি পাঠ করিতেছিলে ?"

ফাতিমা বলিলেন : "না, দিব না ; তুমি ছিঁড়িয়া ফেলিবে।"

ওমর বলিল : "বিশ্বাস কর ছিঁড়িব না।"

ফাতিমা বলিলেন : "তবে অযু করিয়া আইস। না-পাক অবস্থায় আল্লার কালাম স্পর্শ করিতে নাই।"

ওমর তাহাই করিল। তখন ফাতিমা কুরআনের সেই লিখিত অংশগুলি ওমরের হস্তে প্রদান করিলেন। ওমর পড়িতে লাগিল :

"আস্‌মান-দুনিয়ার সকল পদার্থই আল্লার গুণগান করে। তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। আকাশ-পৃথিবীর সমুদয় রাজ্য তাঁহার, তিনিই জীবন-মৃত্যু সংঘটন করেন, যাহা খুশি তাহাই করিতে পারেন। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত ; তিনিই প্রকট ; তিনিই গুপ্ত ; তিনি

সমস্তই জানেন। তিনিই আসমান-জমীনকে ছয়টি ভাগে (ঋতুতে) বিভক্ত করিয়া স্বীয় ক্ষমতায় বিরাজমান রহিয়াছেন। ধরণী-গর্ভে যাহা-কিছু প্রবেশ করে এবং তথা হইতে যাহা-কিছু উত্থিত হয় এবং আকাশ হইতে যাহা-কিছু ধরায় নামিয়া আসে এবং ধরাতল হইতে যাহা-কিছু আকাশে উত্থিত হয়—সমস্তই তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সংগে থাকেন এবং যাহাই কর না কেন, তিনি তাহা দেখিতে পান। আস্‌মান-জমীনের তিনিই মালিক এবং সমস্ত পদার্থ তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই দিবসের আলোর মধ্যে রজনীকে প্রবিষ্ট করান এবং রজনীর অন্ধকারের মধ্যে দিবসকে বিলীন করেন। মানুষের অন্তরতলে কি আছে,—তাহাও তিনি জানেন। (অতএব হে মানুষ!) আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূলকে বিশ্বাস কর!"

—(৫৭ : ১-৭)

ওমর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কোন্ এক পবিত্র ভাবের দ্যোতনায় বারে বারে তাঁহার অন্তর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এক নূতন আলোক-লোকের তিনি সন্ধান পাইলেন। অপূর্ব ভাবাবেশের মধ্যে তিনি ঘোষণা করিয়া উঠিলেন : "আশ্‌হাদো আন্‌লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শরীকালাহু অ আশ্‌হাদো আন্না মুহম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রসূলুহু"—আমি সাক্ষ্য দিতেছি : এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নাই ; তিনি এক; তাঁহার কোন শরীক নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি, মুহম্মদ তাঁহার বান্দা ও রসূল।"

মরি! মরি! কি অপূর্ব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল আজ ফাতিমার গৃহে। স্বামী-স্ত্রী আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল: বেহেশ্‌ত্‌ যেন দুনিয়ায় নামিয়া আসিল। মুহূর্ত পূর্বে দারুণ অগ্নিবাণে যেখানে দোযখের দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সহসা সেইখানেই হইল অমৃতবৃষ্টি, আর ফুটিয়া উঠিল একটি অনবদ্য বেহেশ্‌তের ফুল। প্রাণহীণ পাষাণস্তূপের অন্তস্থল হইতে অকস্মাৎ যেন উৎসারিত হইল এক স্নিগ্ধ সুধানির্ঝর।

ওমর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। "কোথায় হযরত? নিয়ে চল আমাকে তাঁহার পবিত্র চরণ-তলে।" আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বার বার তিনি এই কথা বলিতে লাগিলেন।

ওমরকে সংগে লইয়া তৎক্ষণাৎ সঙ্গীন প্রস্থান করিলেন।

হযরত তখন অরকাম নামক এক শিষ্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। আবুবকর, হামজা, আলি প্রভৃতি তাঁহার সংগেই ছিলেন। শিষ্যবৃন্দের মধ্যে বসিয়া হযরত সকলকে নসিহৎ করিতেছিলেন, এমন সময় খবর পৌছিল: ওমর আসিতেছে। ওমরের আগমনের অর্থ বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ হযরতের জীবন-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ওমর সাড়া দিতেই হযরত সকলকে ক্ষান্ত করিয়া বলিলেন: "ওমরকে কিছু বলিও না; তাহাকে ভিতরে আসিতে দাও; আমি একাই তাহার সম্মুখীন হইব।"

ওমর ভিতরে আসিলে হযরত তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল সজোরে আকর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন: "আর কতকাল অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিবে, ওমর? আর কতকাল সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে?"

হযরতের পবিত্র করস্পর্শে ওমরের সর্বাংগ কম্পিত হইয়া উঠিল! অবনত মস্তকে তিনি উত্তর দিলেন: "যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এখন আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছি। দয়া করিয়া এ অধমকে আপনার পাককদমে স্থান দিন।" এই বলিয়া তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রসুলুল্লাহ্!"

ওমরের মুখে আল্লাহ্ ও রসুলের নাম! হযরত ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সমবেত কণ্ঠে সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন: "আল্লাহু আকবর!" সেই তকবীর-ধ্বনিতে মক্কার আকাশ-বাতাস কম্পিত হইতে লাগিল। দূরের পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠিল: "আল্লাহু আকবর!"—আল্লাহু আকবর!

হযরতের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

ওমরের ইসলাম-গ্রহণ বাস্তবিকই এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার! শির লইতে আসিয়া শির দান করিবার দৃষ্টান্ত এমন আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু এ ব্যাপার বিস্ময়কর হইলেও অস্বাভাবিক নয়। সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইসলামকে লইয়া এই সত্য যুগে যুগে প্রকটিত হইয়াছে। যতবারই ইসলামের শিরে আঘাত আসিয়াছে, ততবারই আঘাতকারীই পরাজিত হইয়াছে—ভক্ষক বেশে আসিয়া

রক্ষক বেশে ফিরিয়ে গিয়াছে। কত নমরুদ, কত ফেরাউন, কত আবরাহা, কত এজিদই না ইহার শিরে আঘাত হানিয়াছে! কত নাসারা, কত কোরেশ, কত তাতার, কত সেলজুকই না ইহাকে ধ্বংস করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু ইসলাম কোথাও মরে নাই। প্রতি কারবালায় এজিদই নিহত হইয়াছে, হোসেনের মৃত্যু হয় নাই।

ইহাই ইসলাম। আগুনে পোড়ে না, পানিতে ডোবে না, পিপাসায় কাতর হয় না! দুঃখ-দৈন্য, ঝঞ্ঝা-বিপদের মধ্য দিয়াই তাহার জয়যাত্রা।

———

পরিচ্ছেদ : ২৬

অন্তরীণ বেশে

মুহূর্ত মধ্যে মক্কার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া গেল, ওমর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। ওমর নিজেও কোরেশ দলপতিদিগের বাড়ীতে গিয়া ঘোষণা করিয়া আসিলেন: "আর আমি তোমাদের দলে নাই, এখন আমি মুসলমান! ক্ষোভে দুঃখে অপমানে কোরেশগণ জ্বলিয়া মরিতে লাগিল, কিন্তু সহসা ওমরকে কেহই কিছু বলিতে সাহস করিল না।

এদিকে ওমরকে লাভ করিয়া স্বয়ং হযরত এবং নও-মুসলিমগণ যারপরনাই অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। ওসমান, আলী, হামযা, ওমর প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্যগণ এইবার হযরতের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রচার-কার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ওমর একদিন হযরতকে বলিলেন: "হযরত, আর কতকাল আমরা এমন ভয়ে ভয়ে চলিব? কোরেশগণ আল্লাকে ভুলিয়া মিথ্যা দেবদেবীর পূজা করে, অথচ 'আল্লার ঘরে' তাহাদেরই অধিকার। আর আমরা আল্লার সেবক, অথচ আল্লার ঘরে আমাদের ঠাঁই নাই। কা'বা-গৃহে আমাদেরও তো দাবী আছে। উহা তো কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আমরা কেন তবে ওখানে নামায পড়িতে পারিব না? মরি-বাঁচি, একবার ওখানে নামায পড়িতে হইবে।"

হযরত সন্তুষ্টচিত্তে ওমরের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সাহাবাগণও রাজী হইলেন। তখনই মিছিল করা হইল। দুই কাতারে মুসলমানগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া গেলেন। ওমর ও হামযা দুইদলের পুরোভাগে স্থান লইলেন, হযরত উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইলেন। শোভাযাত্রা 'সাফা' পর্বতের পাদদেশ দিয়া নগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। মুহুর্মুহু "আল্লাহু আকবর" ধ্বনিতে গিরিপ্রান্তর মুখরিত হইতে লাগিল। মুষ্টিমেয় মুসলমানের বুকের বল দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

মিছিল ধীরে ধীরে কা'বা-মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইল। পথে কেহই বাধা দিতে সাহস করিল না। কোন যাদুমন্ত্রে কোরেশগণ আজ যেন হতবল হইয়া পড়িল।

একেই তো কোরেশগণ আল্লাকে মানে না, কা'বা-মন্দিরের দেবদেবী-দিগের বিরুদ্ধে প্রচার করিবার জন্য একেই তো তাহারা হযরত ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের উপর মহা খাপ্পা, তাহার উপর আবার সেই হযরত সেই শিষ্য-বৃন্দের সহিত, সেই কা'বা-মন্দিরে, দেবদেবীদিগের সম্মুখে সেই আল্লার উপাসনা করিতে অগ্রসর! তাহাও আবার সম্পূর্ণ নিরস্ত্রবেশে! কত বড় দুঃসাহস এ! কিসের বলে, কোন্ সাহসে এমন অসম্ভব সম্ভব হয়?

হযরত সকলকে লইয়া কা'বা-মন্দিরে আসিয়া দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামায শেষ করিয়া সকলে ধীরে ধীরে পূর্ববৎ মিছিল করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। কী চমৎকার সেই দৃশ্য! কাহারও মুখে কোন আস্ফালন নাই, বিরোধ বা দাংগা-সৃষ্টির মনোভাব নাই, সীমা-লংঘনের প্রবৃত্তি নাই, প্রতিশোধ গ্রহণের দুরভিসন্ধি নাই, আছে শুধু সত্য-প্রচারের আন্তরিক আগ্রহ, আছে শুধু আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবী। এইখানেই তো ইসলামের বিশেষত্ব। সে কোনদিন সীমা লঙ্ঘন করে না, আপন অধিকার স্বীকৃত হইলেই সে সন্তুষ্ট।

কোরেশগণও প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু করিল। তাহারা শীঘ্রই এক গোপন সভা ডাকিয়া স্থির করিল: মুহম্মদ, তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং শিষ্যবৃন্দকে সর্বপ্রকারে সমাজচ্যুত বা 'বয়কট' করিয়া রাখিতে হইবে, বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয়, কথা-বার্তা, উঠা-বসা, চলা-ফেরা—সমস্তই বন্ধ করিতে হইবে। ইহাই স্থির করিয়া তাহারা এক প্রতিজ্ঞাপত্র সই করিল এবং একটা পবিত্রতার ছাপ দিবার জন্য উহা কা'বা-মন্দিরের দরজায় লটকাইয়া দিল। অতঃপর আঁট-ঘাট বাঁধিয়া তাহারা ভীষণভাবে 'বয়কট' শুরু করিল।

কোরেশদিগের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা এবং বৈরীভাব লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ আবুতালিব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবিলম্বে তিনি বনি-হাশিম ও বনি-মুত্তালিবদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। স্থির হইল, মুহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে লইয়া তাঁহারা 'শেব' নামক একটি গিরি-সংকটে প্রস্থান করিবেন। স্থানটি পূর্ব হইতেই বনি-হাশিম গোত্রের অধিকারভুক্ত ছিল। শহর হইতে উহা কিছু দূরে অবস্থিত এবং বেশ সুরক্ষিতও ছিল। সেখানে সংঘবদ্ধভাবে থাকিতে পারিলে বিপদ অনেক কম হইবে এবং সতর্কতার সহিত বাহির হইতে খাদ্য সরবরাহ করা যাইবে, এইরূপই তাঁহারা মনে করিলেন।

কার্যতঃ ঠিক তাহাই করা হইল। হযরত ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে লইয়া বনি-হাশিম ও বনি-মুত্তালিবগণ সেই গিরি-দুর্গের মধ্যে আত্মনির্বাসিত হইলেন। ঘরবাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই পিছনে পড়িয়া রহিল।

এই সংকীর্ণ গিরি-দুর্গের মধ্যে মুসলমানদিগকে একদিন নয়, দুইদিন নয় —দীর্ঘ দুই বৎসরকাল দারুণ মুসিবতের মধ্য দিয়া কাল কাটাইতে হইয়াছিল। সেই সময় কোরেশগণ মুসলমানদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল। বাহির হইতে তাহারা যাহাতে কোনরূপে আহারাদি না পায়, তাহার জন্য সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সময় সময় এরূপ ঘটিয়াছে যে, ক্ষুধার জ্বালায় সকলকে গাছের পাতা, শুষ্ক চর্ম ইত্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের করুণ ক্রন্দনে আল্লার আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোরেশদিগের পাষাণ হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নাই।

কোরেশগণ মনে করিয়াছিল, মুহম্মদ ও তাঁহার ধর্মের নাম-নিশানা এইবার চিরতরে মিটিয়া যাইবে। একে তো নবদীক্ষিত মুসলমানদিগের সংখ্যা অতি অল্প, তাহার উপর তাহাদের অধিকাংশই আবিসিনিয়ায় নির্বাসিত। অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা এবং সমর্থকবৃন্দও এখন একটা সংকীর্ণ গিরিদুর্গে বন্দী। কাজেই এই সুযোগে তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলেই ইস্‌লামের উপদ্রব হইতে মক্কাভূমি একরূপ মুক্ত হইবে। ইহাই ভাবিয়া তাহারা পূর্ণোদ্যমে মুসলিম দলনে প্রবৃত্ত হইল।

একদিকে তো এই শয়তানী লীলা, কিন্তু অপরদিকে মনুষ্যত্বের কী উজ্জ্বল চিত্র! হযরত মুহম্মদ ও তাঁহার অনুগামীদিগের কী অপূর্ব ত্যাগ, সংযম ও সত্যনিষ্ঠা! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াও ভক্তবৃন্দ অটল, অচল, নির্বিকার! এত বড় ধর্মানুরাগ, এত বড় গুরুভক্তি, আল্লার উপরে এত বড় অবিচলিত নির্ভর জগতের ইতিহাসে আর কোথাও আমরা দেখিতে পাই? মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক একটা আদর্শের জন্য কী কঠোর সংগ্রামই না করিয়া চলিয়াছে। এত যে দুঃখ, এত যে বিপদ, তবু কাহারও মুখে কথাটি নাই, ধৈর্যচ্যুতি নাই, গুরুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নাই, পার্শ্ব পরিবর্তন নাই। জীবন-মরণ পণ করিয়া ক্ষুদ্র একদল লোক কেবলমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করিয়া আছে। বাহিরের কোন চিন্তাই তাহার মনে

জাগে নাই ; একমাত্র আল্লাকেই তাহারা জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞানে অকূল সমুদ্র পাড়ি দিতেছে। ঈমানের কী উজ্জ্বল চিত্র এইখানে।

ঠিক এই সংকট-মুহূর্তেই হযরতের নিকট আল্লার আশ্বাস-বাণী নামিয়া আসিল :

"নিশ্চয়ই তোমাদিগকে ভীতি দ্বারা, ধনপ্রাণ ও শস্যহানি (সময়ে সময়ে) আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব। হে রসুল, তুমি সেই ধৈর্যশীলদিগকে সুসংবাদ দাও—যাহারা বিপদে আপতিত হইলে বলিয়া থাকে যে, আমরা তো আল্লারই দান, তাঁহারই দিকে তো আমরা প্রত্যাবর্তন করিব। ইহারাই তাহারা—যাহাদের উপর আল্লার অসীম করুণা বর্ষিত হয় এবং ইহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।" —(২ : ১৫৫-৫৬)

এই অমৃত পান করিয়াই তো মুসলমানেরা অমর হইয়াছিল। ইসলামের বিশ্ববিজয় এত সহজে হয় নাই। তাহার পশ্চাতে ছিল একটা সাধনা, একটা বিপুল আত্মত্যাগ, একটা আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রেরণা।

আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় দুর্দিনেও হযরত তাঁহার সত্যপ্রচার হইতে বিরত হন নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে আরবে জিলহজ্ মাস পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। এই সময়ে কা'বা-মন্দিরে হজ করিবার জন্য নানা দেশ হইতে তীর্থযাত্রীরা সমবেত হইত। তখন আরবগণ নরহত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি পাপকার্য হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিত। অস্থির অবস্থায় যখন এই পবিত্র মাস উপস্থিত হইল, তখন হযরত এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং সমবেত যাত্রীদিগকে নানা স্থানে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট সত্যবাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। কোরেশগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মনে হইল হযরতকে তাহারা খুন করে! কিন্তু উপায় নাই। পবিত্র মাস! মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিয়া অন্য উপায়ে তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। হযরত যেখানেই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেইখানেই একদল লোক তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া হযরতের নামে নানারূপ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল : এই লোকটি যাদুকর। কেহ বলিতে লাগিল : এ একটা ভণ্ড তপস্বী। কেহ বলিতে লাগিল : এটা একটা আস্ত পাগল! কেহ বলিতে লাগিল : এ একজন মায়াবী কবি। এর কথায় তোমরা কান দিও না।" হযরত নীরবে সমস্তই সহ্য করিতে লাগিলেন।

দিন যায়। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে থাকে।

ঠিক এমন সময় অদ্ভুত উপায়ে এই নিরীহ মযলুমদিগের উপরে আল্লার রহমৎ নামিয়া আসিল। স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া মানুষ বেশী দিন টিঁকিতে পারে না। প্রতিক্রিয়া আপনা-আপনিই আরম্ভ হয়। কোরেশদিগের মধ্যে অনেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিল—এতখানি নির্মমতা কিছুতেই তাহাদের শোভা পাইতেছে না। ধর্মমত পৃথক হইতে পারে, কিন্তু সকলেই তো মানুষ। সকল দ্বন্দ্বের অতীতে একটা নিভৃত স্থানে যে তাহাদের পরস্পরের জন্য একটা মিলন-মঞ্চ আছে একটা গোপন যোগসূত্র আছে,—প্রাণে প্রাণে একটা আত্মীয়তা আছে, সে কথা আজ কাহারও কাহারও মনে জাগিল। ভিতরে ভিতরে দুই-একজন হৃদয়বান ব্যক্তি ইতঃপূর্বেই এই নিষ্ঠুর কার্যের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেছিলেন; এইবার প্রকাশ্যভাবে তাঁহারা প্রতিবাদ শুরু করিয়া দিলেন। হাশিম ও মুত্তালিব বংশের সহিত অনেকের আত্মীয়তাও ছিল; তাঁহারাও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের জন্য গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

একদিন কা'বা-গৃহে ইহাই লইয়া কোরেশদিগের মধ্যে এক তুমুল কাণ্ড ঘটিয়া গেল। জোহায়ের নামক এক ব্যক্তি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "হে কোরেশগণ, তোমাদের এ কেমন বিচার? আমরা ভাল ভাল জিনিস খাইব, ভাল ভাল কাপড় পরিব, আর হাশিম বংশ না খাইতে পারিয়া মারা যাইবে? ইহা হইতেই পারে না। আমরা এরূপ নিষ্ঠুর কার্য সমর্থন করিতে পারি না। আজই আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিব।"

জাম্‌আ, আবুল বাখতারী প্রমুখ কোরেশগণ জোহায়েরের এই কথা সমর্থন করিলেন। আবুযহল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল: "কখনই নয়। এ প্রতিজ্ঞাপত্র কিছুতেই নষ্ট করিতে দিব না।"

দুই দলে তুমুল বচসা আরম্ভ হইল।

ঠিক এই সময় একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। হযরতের পরামর্শক্রমে বৃদ্ধ আবুতালিব গিরি-সংকট হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ উক্ত সভায় উপস্থিত হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন: "তোমাদের ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র আল্লার মনোনীত নয়। বিশ্বাস না হয়, গিয়া দেখ, কীটেরা উহা কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এ কথা যদি সত্য না হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি মুহম্মদকে

তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে রাজী আছি। আর যদি সত্য হয়, তবে তোমাদের উচিত আমাদের সংগে এরূপ শত্রুতা না করা।"

কোরেশগণ কৌতূহল অনুভব করিল। অনেকে বলিল: "ইহা যদি সত্য হয় তবে মুহম্মদ যে আল্লার রসুল, তাহাও সত্য।"

মোতাএম নামক এক সাহসী ব্যক্তি তখন লম্ফ দিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রখানি ছিঁড়িয়া আনিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, একমাত্র আল্লার নামটি ছাড়া আর সমস্ত স্থানই কীটদষ্ট হইয়া পাঠের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে।

কোরেশগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। তখন জোহায়ের ও মোতাএম প্রমুখ বীরগণ অধিকতর উৎসাহিত হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তৎক্ষণাৎ শের-দুর্গে গমন পূর্বক বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিলেন।

দীর্ঘ দুই বৎসর পর হযরত ও তাঁহার অনুসংগীবৃন্দ নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পরিচ্ছেদ : ২৭

সর্বহারা

হযরত যখন মুক্তিলাভ করিলেন, তখন তাঁহার নবুয়তের দশম বৎসর।

মুক্তিলাভের পর কিছুদিন বেশ শান্তিতেই কাটিল। কোরেশগণ ভিতরে ভিতরে কেমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কোন চেষ্টাই তাহাদের ফলবতী হইতেছে না, কোথা হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা-না-একটা বাধা আসিয়া তাহাদের সব আয়োজনকে পণ্ড করিয়া দিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা অনেকটা দমিয়া গেল। তবুও উৎকট অভিমান ও বদ্ধমূল কুসংস্কারের মোহে কিছুতেই তাহারা নবাগত সত্যকে বরণ করিয়া লইতে পারিল না।

হযরত একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন, এই বুঝি বিপদের মেঘ কাটিয়া গেল। কিন্তু হায়! একটা গভীরতর আঘাত এবং একটা কঠোরতর পরীক্ষা যে তখনও তাঁহার জন্য সঞ্চিত হইয়া ছিল, তাহা কি তিনি জানিতেন!

গিরিগুহা হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পরেই আবুতালিব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কারা-জীবনের কঠোরতা তাঁহার সহ্য হয় নাই। হযরত আশংকা করিলেন, বুঝি বা তাঁহার ইহজীবনের এই মূল্যবান অবলম্বনটুকু এইবার হারাইয়া যায়!

ঘটিলও তাহাই। আবুতালিব ৮০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করিলেন।

মৃত্যুকালে কোরেশ দলপতিগণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। আবুতালিব গোষ্ঠপতি ছিলেন, কাজেই কোরেশগণ তাঁহাকে সম্ভ্রম না করিয়া পারিত না। আবুতালিবের জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া কোরেশগণ মুহম্মদকে স্ববশে আনিবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে মনস্থ করিল। আবুযহল প্রমুখ প্রধান ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিল: "আবুতালিব, আপনাকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি, তাহা আপনি জানেন। মৃত্যুর পূর্বে আপনি মুহম্মদকে শেষবারের মত নিষেধ করিয়া দিয়া যান, যেন সে আর আমাদের দেবদেবীদিগের নিন্দা না করে।"

আবুতালিব মুহম্মদকে কাছে ডাকিয়া কোরেশদিগের প্রস্তাবের কথা তাঁহাকে শুনাইলেন। হযরত উত্তর দিলেন: "চাচাজান, সত্য চিরদিনই সত্য। মিথ্যার সহিত তাহার কোনদিন আপোষ চলে না। কাজেই যে-সত্য আমি লাভ করিয়াছি, তাহা প্রচার করিবই।" অতঃপর তিনি আবুতালিবকে সম্বোধন করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন: "চাচাজান, এখনও সময় আছে। বলুন: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রসুলুল্লাহ্।"

কোরেশগণ দেখিল বেগতিক। তাহারা বাধা দিয়া আবুতালিবকে বলিতে লাগিল: "মৃত্যুর ভয়ে কি শেষকালে আপনি আপনার পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করিবেন?"

আবুতালিব ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন: "মুহম্মদ, আমি তোমার ধর্মকে গ্রহণ করিতাম, কিন্তু তাহা করিলে কোরেশগণ আমাকে কাপুরুষ বলিবে। আমি আমার পূর্বপুরুষদিগের ধর্মেই স্থির রহিলাম।"

কিন্তু পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম কী? হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসমাইল—ইহারাই তো কোরেশদিগের পূর্বপুরুষ! তাঁহাদের ধর্ম তো ইসলাম! আবুতালিবের এই দ্ব্যর্থবোধক উক্তিতে হযরত সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, অথচ একেবারে নিরাশও হইলেন না। ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন: "হে পিতৃব্য, আল্লাহ্‌তালা নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য বেহেশ্‌ত্ প্রার্থনা করিব।"

আবুতালিব শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ঠোঁট দুইটি ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। মনে হইল তিনি যেন চুপে চুপে কী বলিতেছেন।

'বায়হাকী' প্রমুখ কতিপয় প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, আবুতালিব এই সময় মনে মনে "লা-ইল্লাল্লাহ" কলেমাই পাঠ করিতেছিলেন।

কিন্তু 'বাখারী' ও 'মোসলেম' হাদিস গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, কাফির অবস্থাতেই আবুতালিবের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময়ে কুরআনের যে আয়াত নাযিল হয়, তাহা হইতেও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আবুতালিব তৌহিদ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও, আবু-

---

* "নিশ্চয়ই তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহাকে (ইচ্ছা করিলেই) সুপথে আনিতে পার না। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে খুশী সুপথে আনিতে পারেন এবং তিনিই উত্তমরূপে জানেন কাহারা সৎপথপ্রাপ্ত।—(২৮: ৫৬)

তালিবকে নানা কারণে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। অবিশ্বাসী হইয়াও তিনি সারাজীবন মুহম্মদের প্রতি যেরূপ স্নেহমমতা ও সহানুভূতি দেখাইয়া গিয়াছেন, আপদে-বিপদে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, কোরেশদিগের অন্যায় আচরণকে যেরূপভাবে বাধা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ব, উদারতা পরমতসহিষ্ণুতাই প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে হযরতের নিষ্কলংক চরিত্র এবং উদ্দেশ্যের সততাও ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। হযরত যদি কপট হইতেন, মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা যদি তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেন, তাঁহার সততা ও সাধু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আবুতালিব সারাজীবন তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত থাকিতে পারিতেন না। আপন চরিত্র-মাধুর্য ও অকৃত্রিমতার বলেই হযরত মুহম্মদ আবুতালিবের অন্তরে এতখানি স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

আবুতালিবের এক ছিল অদ্ভুত চরিত্র। সত্য ও সংস্কারের এমন দ্বন্দ্ব বড় একটা দেখা যায় না। প্রকাশ্যে তিনি কোন দিন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, অথচ ইসলামের প্রতি কোন দিন অশ্রদ্ধাও দেখান নাই। প্রাণ চায় সত্যকে আঁকড়িয়া ধরিতে, কিন্তু সমাজভীতি ও বদ্ধমূল কুসংস্কার আসিয়া বাধা দেয়। সত্যকে স্বীকার করিবার মত নির্ভীকতা ও সৎসাহসের অভাবই হইতেছে আবুতালিবের চরিত্রে প্রধান দুর্বলতা। অন্যথায় তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল বলিষ্ঠ ও উদার। হযরতের পয়গম্বর-জীবনের সফলতার জন্য তাঁহার দান তুচ্ছ নহে। আবুতালিব না থাকিলে হযরতের জীবনধারা কোন্ পথে কেমন করিয়া প্রবাহিত হইত, ভাবিবার কথা। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ইসলাম ও তাহার পয়গম্বরের জন্য এত করিয়াও প্রকাশ্যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। হায়! যাঁহার বংশ-প্রদীপে দীন-দুনিয়া আজ উজালা, তাঁহারই আপন অন্তরে এমন অন্ধকার রহিয়া গেল! এ যে প্রদীপের নীচের অন্ধকার। দীপ-শিখার জ্যোতিকে সে অস্বীকার করিল বটে, কিন্তু তাহারই নীচে বুক পাতিয়া দিয়া তাহার দীপ্তিকে অধিকতর উজ্জল করিয়া দিল।

আবুতালিবকে হারাইয়া হযরত অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। জীবনের একটা প্রকাণ্ড অংশ যেন শূন্য হইয়া গেল।

কিন্তু বিপদ কখনও একা আসে না। পিতৃব্যের শোক ভুলিতে না ভুলিতে বিবি খাদিজাও হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। হযরত বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জীবন-সংগিনীও এইবার তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন।

এক সুন্দর প্রভাতে বিবি খাদিজা চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

হযরত অন্তরে ভীষণ আঘাত পাইলেন। দুনিয়ার এক শ্রেষ্ঠ নিয়ামৎ আজ তিনি হারাইলেন। অতীত জীবনের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের সকল স্মৃতি আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। বিবি খাদিজা যে তাঁহার জীবনে কত বড় একটা স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাঁহার দান যে কত অপরিসীম ছিল, আজ তিনি তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেন। নিঃসহায় অবস্থায় সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যখন তিনি রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার যখন কোনই উপায় দেখিতেছিলেন না, তখন এই মহীয়সী নারীই তাঁহাকে স্বামীরূপে বরণ করিয়া সামাজিক সম্ভ্রম ও পারিবারিক সুখশান্তি দান করিয়াছিলেন এবং নিজের মনপ্রাণ ও ধনসম্পত্তি অকাতরে তাঁহার চরণে লুটাইয়া দিয়া স্বামীভক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। শুধু কি তাই? হযরতের আধ্যাত্মিক বা পয়গম্বর-জীবনের বিকাশের পরেও তিনি সেবিকা ও সংগিনী হইয়াছিলেন। হেরা গিরি-গুহায় হযরত যখন কঠোর তপস্যায় মগ্ন থাকিতেন, তখন বিবি খাদিজাই তাঁহার তত্ত্ব লইতেন। হযরতের প্রচ্ছন্ন পয়গম্বর রূপটিকে সর্বপ্রথম তিনিই সত্যিকারভাবে চিনিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ খাদিজা ছিলেন হযরতের মর্মমুকুর। হযরতের চিত্তে যখনই যে-ভাবের উদয় হইত, খাদিজার চিত্তেও তাহার ছায়া পড়িত। এই জন্যই হযরত যখন আল্লার প্রথম বাণী লাভ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে ফিরিলেন, তখন খাদিজাই সর্বাগ্রে ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পরিয়াছিলেন এবং সকলের আগে তিনিই হযরতের ধর্মে ঈমান আনিয়াছিলেন। চতুর্দিকে যখন নিরাশার ঘন অন্ধকার, অবিশ্বাস, ব্যংগ-বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের বিষবাষ্পে যখন মক্কার আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন, তখন এই নারীই মুহম্মদকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া আদর্শ সহধর্মিণীর কার্য করিয়াছিলেন। তারপর সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে কি বিশ্বস্তভাবেই না সারাজীবন তিনি ছায়ার মত স্বামীকে অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এমন আদর্শ সহধর্মিণী

ও সহকর্মিণী না হইলে কাহারও জীবনই সার্থক ও সুন্দর হয় না। এই জন্যই তো হযরত খাদিজাকে এত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি ছিলেন তাঁহার সান্ত্বনা, প্রেরণা, বল ও ভরসা। দিনের শেষে ক্লান্ত বিহঙ্গ যেমন অলস পাখা মেলিয়া আপন নীড়ে ফিরিয়া আসে এবং নবজীবন লাভ করিয়া পরদিন প্রভাত বেলায় পুনরায় বহির্জগতে ঝাপাইয়া পড়ে, হযরতও ঠিক তেমনি করিয়া প্রতিদিন বিবি খাদিজার নিকট হইতে জীবনের নবচেতনা লাভ করিতেন।

এহেন আদর্শ জীবন-সংগিনী হযরতকে ছাড়িয়া আজ জান্নাতবাসিনী হইলেন।

হযরত নীরবে এই বেদনার দান মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন।

পরিচ্ছেদ : ২৮

তায়েফ গমন

আবুতালিব ও খাদিজার মৃত্যুতে কোরেশদিগের শয়তানি খেয়াল আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহারা দেখিল, পথ এখন পরিষ্কার। এতদিন আবুতালিবের ভয়ে তাহারা বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই; এখন সে বাধা দূর হইয়াছে। মুহম্মদ এখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, তাহাকে লইয়া যাহাখুশি করা যায়। ইহাই ভাবিয়া কোরেশগণ দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

একদিন হযরত একটি স্থানে নামায পড়িবার জন্য নতজানু হইয়াছেন, এমন সময় পিছন দিক হইতে ওকাবা নামক এক পাষণ্ড আসিয়া একখানি চাদর দিয়া হযরতের গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিয়া পিছন দিক হইতে ধীরে ধীরে চাদরখানি মোচড়াইতে লাগিল। ফলে শীঘ্রই হযরতের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। ঘটনাক্রমে ঠিক এই সময় হযরতের শিষ্য আবুবকর সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কোনক্রমে রক্ষা করিলেন। কিন্তু আবুবকরকে ইহার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইল প্রচুর। দুর্বৃত্তদের হস্তে তিনি ভীষণভাবে প্রহৃত হইলেন।

এইরূপভাবে প্রতিদিন লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ চলিতে লাগিল। কখনও একদল লোক তাঁহার পিছনে পিছনে থাকিয়া নানা ব্যংগ-বিদ্রূপ ও গালাগালি দেয়, কখনও বা তাহারা হযরতের চলার পথে কাঁটা পুঁতিয়া রাখে, কখনও বা তাঁহার খাদ্যদ্রব্যে মলমূত্র মিশাইয়া দেয়, কখনও বা ঘৃণ্য আবর্জনাদি তাঁহার অংগে নিক্ষেপ করে। এমনিভাবে তাহারা হযরতকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

আফ্‌সোস্‌! দুনিয়ায় আজ এমন দরদী কেহ নাই—যে এই দুর্দিনে হযরতকে দুটি সান্ত্বনার কথা শুনায়। পিতৃব্য নাই, স্ত্রী নাই; অসহায় পুত্রকন্যারা পিতার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল। শিষ্য-মণ্ডলীও আজ তাঁহারই মত লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। কার মুখের দিকে কে তাকায়! কে কাহাকে সান্ত্বনা দেয়! কিন্তু কী আশ্চর্য! এই মুসিবতের দিনেও হযরত বিচলিত হইলেন না। আল্লার উপর তাঁহার নির্ভর আরও গভীর হইল। নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি অন্যান্য সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন সংগীন হইয়া পড়িল যে, হযরতের মক্কায় অবস্থান করা একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। হযরত বাধ্য হইয়া স্থানান্তরে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি দেখিলেন, মক্কায় ইসলাম প্রচারের আর কোন সম্ভাবনাই আপাততঃ নাই।

কিন্তু যাইবেন কোথায়! এমন কোন্ স্থান আছে যেখানে তিনি সাদরে গৃহীত হইবেন? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি তায়েফ গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

মক্কা হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে তায়েফ নগরী অবস্থিত। মক্কার পরেই ইহার স্থান। তায়েফবাসীদিগের সহিত কোরেশদিগের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। তা ছাড়া তায়েফবাসীরাও কোরেশদিগের ন্যায় মূর্তিপূজা করিত এবং কা'বা-মন্দিরই ছিল তাঁহাদের সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র। একই দেবদেবীকে তাহারা পূজা করিত এবং একই রীতিনীতি ও কুসংস্কার মানিয়া চলিত।

তবু তায়েফকেই হযরত আশ্রয়ের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে করিলেন। হযরতের মাতুল বংশীয়েরা বাস করিতেন তায়েফে। হযরতের চাচা আব্বাসেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল তায়েফবাসীদের উপরে। তায়েফবাসী সওদাগরদের সঙ্গে তাঁহার লেনদেন চলিত। এই সব কারণেই হযরত আশা করিয়াছিলেন তায়েফে হয়ত কিছুটা সাহায্য ও সহানুভূতি তিনি পাইবেন।

দুর্গম গিরি-কান্তার পার হইয়া হযরত পদব্রজে তায়েফে উপনীত হইলেন। সঙ্গে একমাত্র অনুরক্ত ভক্ত ও পালিত পুত্র জায়েদ।

তায়েফে উপনীত হইয়াই তিনি আল্লার নামে সকলকে আহ্বান করিলেন এবং সত্য প্রচারে তাহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সে আহ্বানে সাড়া দিল না, এমন কি তাঁহার মাতুলকুলও বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। তখন তিনি তায়েফের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বানু-সকীর বংশই তখন ধনেমানে তায়েফের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। হযরত তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। কিন্তু হায়! পাষাণের ন্যায় তাহারা অটল হইয়া রহিল। কেহ কেহ এমনও বলিতে লাগিল: "হুঁ! আল্লাহ্ বুঝি খুঁজিয়া খুঁজিয়া আর লোক পাইল না! তোমাকেই পয়গম্বর করিল!" কেহ বলিল: "ভাল দেখেছ! আল্লার পয়গম্বর কখনও এমন করিয়া পায়ে হাঁটিয়া আসে?" কেহ বলিল: "ওহে মুহম্মদ,

তোমার সংগে কথা বলিয়া আমাদের কোন লাভ নাই, তোমারও কোন লাভ নাই। তুমি যদি সত্যই আল্লার পয়গম্বর হও, তবে তোমার কথার প্রতিবাদ করিলে বা বাধা দিলে তুমি আমাদের অকল্যাণ ঘটাইবে; আবার যদি ভণ্ড তপস্বী হও, তবে আমরাই তো তোমার পরম শত্রু হইব। কাজেই তুমি ফিরিয়া যাও।"

এমনিভাবে তিনি নিগ্রহ ভোগ করিতে লাগিলেন।

এই নিগ্রহের গূঢ় কারণ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কোরেশদিগের সহিত তায়েফবাসীদিগের অনেক বাধ্য-বাধকতা ছিল। মক্কা ছিল তায়েফ-দেশের পণ্যদ্রব্যের বিখ্যাত বিক্রয় বাজার। পক্ষান্তরে তায়েফ ছিল কোরেশ-দিগের গ্রীষ্মনিবাস। গ্রীষ্মকালে বহু সম্ভ্রান্ত ধনী কোরেশ তায়েফে হাওয়া বদলির জন্য যাইতেন। তখন তায়েফবাসীরা বহুভাবে লাভবান হইত। আদর্শ ও ধর্মমতের দিক দিয়াও তায়েফবাসীরা কোরেশদিগের অন্ধ অনুকরণ করিত। কাজেই কোরেশগণ পাছে চটিয়া যায়, এই ভয়ে কিছুতেই তাহারা হযরতকে আশ্রয় দিতে রাজী হইল না।

হযরত তবুও নিরস্ত হইলেন না। তায়েফ নগরের পথে পথে, ঘরে ঘরে আল্লার মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। দশ দিন এইভাবে কাটিয়া গেল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। তায়েফবাসীদিগের বৈরীভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। অবশেষে তাহারা একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হযরতকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহারা একদল অর্বাচীন লোককে লেলাইয়া দিল। হযরত যে-পথ দিয়া যান, সেই পথেই তাঁহার পিছনে পিছনে লোকগুলি বিদ্রূপ ও গালাগালি বর্ষণ করিয়া চলে। শুধু তাই নয়, পাষণ্ডেরা হযরতের অংগে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেও ছাড়িল না। প্রস্তরাঘাতে হযরতের দেহ জর্জরিত হইতে লাগিল। ইহাতেও তাহাদের শয়তানি কৌতূহল শান্ত হইল না; তাহারা পথের দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে বসিয়া গেল এবং হযরত সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার চরণ-কমলে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতে লাগিল। সমস্ত পথ এই জাহিল শয়তানদিগের ক্রূর হাসি ও অট্টরোলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

জায়েদ প্রাণপণ করিয়া হযরতকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কতক্ষণ তিনি আর পারিবেন? ক্ষিপ্ত জনতার বিরুদ্ধে দুইটি মাত্র লোক কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারে? হযরত ক্রমশঃ

অবসন্ন ও অচৈতন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন; তাঁহার অংগপ্রত্যংগ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। জায়েদও ভীষণভাবে আহত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি আপন কর্তব্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। হযরতকে কাঁধে তুলিয়া জায়েদ কোনরূপে নগরের বাহিরে আসিলেন। নিকটেই একটি প্রাচীর-বেষ্টিত আঙুর-বাগ ছিল। জায়েদ সেইখানে গিয়া আশ্রয় লইলেন। নিজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি হযরতকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হযরতের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তখন সর্বপ্রথমেই তাঁহার মনে পড়িল নামায পড়িবার কথা। তিনি অযু করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। জায়েদ অতি কষ্টে হযরতের ক্ষতবিক্ষত রুধিরাক্ত স্ফীত পদযুগল পাদুকা হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া জায়েদ কাঁদিতে লাগিলেন। হায়! যে-চরণ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শরণ, সেই পবিত্র চরণের আজ এই দশা!

হযরত নামায সমাধা করিয়া দুই হাত তুলিয়া মুনাজাত করিতে লাগিলেন। অত্যাচারী জালিমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করিবার জন্য অথবা তাহাদের ধ্বংস কামনা করিবার জন্য ইহাই বোধ হয় প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু বিশ্বপ্রেমিক মহামানব কী বলিয়া প্রার্থনা করিলেন? একবার শুনুন:

"হে আল্লাহ্, আমার প্রভু, তোমাকে ডাকি। অবিশ্বাসীরা আজ না বুঝিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে তজ্জন্য দয়া করিয়া তুমি উহাদিগকে শাস্তি দিও না। উহাদিগকে ক্ষমা কর। অবিশ্বাসীরা আজ যে তোমার বাণীকে গ্রহণ করিতেছে না, তাহার জন্য উহাদের দোষ নাই; সে আমারই দুর্বলতা—আমারই অক্ষমতা। এই দুর্বলতার জন্য তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। হে রহমানুর্রহিম, একমাত্র তুমিই দুর্বলের বল, তুমিই অগতির গতি। তুমি ছাড়া আর কোন সহায় নাই, শরণ নাই। প্রভু হে, আমার এ সাধনা কি ব্যর্থ হইবে? তুমি কি আমাকে জয়যুক্ত করিবে না? তুমি কি আমাকে এমন শত্রুর হস্তে অর্পণ করিবে—যাহারা চিরদিনই আমার হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে? তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হউক। একমাত্র তোমার সন্তোষই আমার কাম্য। তুমি সন্তুষ্ট থাকিলে কোন লাঞ্ছনা, কোন গ্লানি, কোন আপদ-বিপদ, কোন দুঃখ-বেদনাকেই আমি ভয় করি না। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।"

কী আবেগ-ভরা আত্মনিবেদন! আল্লার প্রতি কী গভীর নির্ভর, মানুষের প্রতি কী প্রাণঢালা মমতা! সত্যের প্রতি কী অবিচলিত নিষ্ঠা! এমন না হইলে কি মহাপুরুষ হওয়া যায়!

ঠিক এই বিহ্বলতার মুহূর্তে হযরতের নিকট এই অহি নাযিল হইল:

"ধৈর্য ধর চরম ধৈর্য।

নিশ্চয়ই তাহারা (অবিশ্বাসীরা) দেখিতেছে—ইহা (বিজয়)

সুদূরপরাহত, কিন্তু আমরা দেখিতেছি—ইহা নিকটবর্তী।"

—(৭০ : ৫-৭)

গভীর আশ্বাসে হযরতের হৃদয় ভরিয়া গেল। বিজয়ের সুখ-স্বপ্নে সকল দুঃখ-যাতনা তিনি ভুলিলেন। আল্লাহ্‌তালাকে তিনি বারে বারে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

পরিচ্ছেদ : ২৯

আল্-মিরাজ

জায়েদকে সংগে লইয়া হযরত ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন : কোথায় যাইবেন? মক্কায় স্থান নাই, তায়েফে—স্থান নাই; কোথায় তিনি এবার আশ্রয় লইবেন? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে তিনি প্রিয় জন্মভূমির দিকেই অগ্রসর হইলেন।

ষাট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মক্কার নিকটবর্তী নাখলা নামক স্থানে আসিয়া হযরত গতিভংগ করিলেন। যে-মক্কা হইতে তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, সেখানে এরূপ অনাহূতভাবে ফিরিয়া যাওয়া সমীচীন কী না, ভাবিতে লাগিলেন।

হযরত প্রথমেই মক্কা প্রবেশ করিলেন না। মক্কার কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা, জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কেহই প্রথমতঃ হযরতের অনুরোধ রক্ষা করিতে রাজী হইল না। অবশেষে মুতাএম নামক এক হৃদয়বান ব্যক্তি হযরতকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইনি সেই মুতাএম—যিনি কোরেশদিগের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন করিয়া হযরতকে গিরি-সংকট হইতে মুক্ত করিয়া আনিবার সৎসাহস দেখাইয়াছিলেন। হযরতের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহাকে নগরপ্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। সংগে সংগে আপন পুত্রদিগকে এবং স্বগোত্রের অন্যান্য লোকজনকেও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সদলবলে কা'বা-গৃহে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিলেন: "শোন কোরেশগণ, মুহম্মদকে আমি অভয় দিয়াছি; অতএব সাবধান, তাঁহাকে কেহ কিছু বলিও না।"

মুতাএমের এই সৎসাহসকে ধন্যবাদ দিতে হয়। মুতাএম কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই; অথচ হযরতের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না। মানবতার সহজ আহ্বানেই তিনি এতটা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এতটুকু ন্যায়নিষ্ঠা ও ঔদার্য থাকিলেই আর কোন ধর্মবিরোধের আশংকা থাকে না।

হযরত মক্কায় প্রবেশ করিলেন। কোরেশগণ আপাততঃ কোন উচ্চবাচ্য করিল না।

মক্কায় ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পর হযরত 'সওদা' নাম্নী এক বর্ষীয়সী বিধবাকে বিবাহ করিলেন। সওদা ও তাঁহার স্বামী বহু পূর্বেই ইসলামে দীক্ষিত হন এবং আবিসিনিয়ায় হিযরত করেন। কিছুকাল পরে সওদার স্বামীর মৃত্যু হয়। তখন সওদা একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়েন। নিরাশ্রয়া সওদাকে তাই হযরত পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, হযরতের প্রিয় শিষ্য আবুবকরের কন্যা কুমারী আয়েষাকেও তিনি এই সময় বিবাহ করেন। আয়েষা তখন সপ্তমবর্ষীয়া বালিকামাত্র। আবুবকরের সাধ: আল্লার রসূলের সহিত তিনি রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাই বিবাহের বয়স না হইলেও তিন তদীয় কন্যা আয়েষাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য হযরতকে অনুরোধ করেন। হযরত আবুবকরের এ বাসনা পূর্ণ করেন। বিবাহের 'আক্‌দ্' তখনই সম্পন্ন হয়। তিন বৎসর পরে বিবি আয়েষা স্বামীর ঘর করিতে আসেন।

কিন্তু এই সময়ের সর্বপ্রথম ঘটনা: হযরতের মি'রাজ বা নভোভ্রমণ। এমন অলৌকিক ঘটনা বিশ্বজগতে আর কখনও ঘটে নাই। আমরা নিম্ন 'মেশকাত শরীফ' হইতে মি'রাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি:

রজনী দ্বিপ্রহর। ঘন অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন। নিস্তব্ধ নির্জন চারিধার। সেদিন পাখী ডাকে নাই। একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে প্রকৃতি শুব্ধ হইয়া আছে। হযরত কা'বা-গৃহের চত্বরে ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে: "মুহম্মদ!"—হযরতের ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখিলেন, ফিরিশ্‌তা জিব্রাইল শিয়রে দণ্ডায়মান। অদূরে 'বোরাক' নামক একটি অদ্ভুত জ্যোতির্ময় বাহন অপেক্ষা করিতেছে। ডানা-বিশিষ্ট অশ্বের মত তার রূপ, ক্ষিপ্র তাহার গতিবেগ।

জিব্রাইল প্রথমেই হযরতের হৃদয় পরীক্ষা করিলেন। পূর্বের ন্যায় এবারেও তিনি তাঁহার হৃদয়কে শান্তিশালী করিয়া দিলেন। তারপর হযরতকে সেই বোরাকে চড়িবার জন্য ইংগিত করিলেন।

হযরত বোরাকে আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে বোরাক হযরতকে লইয়া জেরুজালেমের শীর্ষদেশে আসিয়া উপনীত হইল। জিব্রাইলের ইংগিতে হযরত সেখানে অবতরণ করিলেন। বোরাককে বাহিরে রাখিয়া

তিনি জেরুজালেমের মস্‌জিদে প্রবেশ করিলেন এবং পরম ভক্তিভরে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। হযরত সোলায়মানের প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র জেরুজালেমের মসজিদ, হযরত মুসা ও হযরত ঈসার স্মৃতি ইহার সহিত চিরবিজড়িত। ইহাকেই কিব্‌লা করিয়া হযরত মুহম্মদ এতদিন নামায পড়িতেন। আজ সেই পবিত্র স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

এখান হইতে জিব্রাইল ফিরিশ্‌তা হযরত মুহম্মদকে সংগে লইয়া ঊর্ধ্ব আকাশপানে উধাও হইয়া চলিলেন। মুহূর্ত মধ্যে তাঁহারা প্রথম আসমানের প্রবেশদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিতেই ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল: "কে তুমি?" জিব্রাইল উত্তর দিলেন: "আমি জিব্রাইল!" পুনরায় প্রশ্ন হইল: "তোমার সঙ্গে উনি কে? উনি কি আল্লার বাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন?" জিব্রাইল উত্তর দিলেন: "ইনি আল্লার রসুল মুহম্মদ।" তৎক্ষণাৎ দুয়ার খুলিয়া গেল। হযরত মুহম্মদ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। জিব্রাইল বলিলেন: ইনিই আপনার আদি পিতা হযরত আদম। ইঁহাকে সালাম করুন।"

হযরত সসম্ভ্রমে সালাম জানাইলেন। তখন হযরত আদম হযরত মুহম্মদকে আলিংগন করিয়া বলিতে লাগিলেন: "মুবারক হো! হে আমার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।"

অতঃপর হযরত মুহম্মদ জিব্রাইল সহ দ্বিতীয় আসমানে উপনীত হইলেন। তথায় হযরত ঈসাকে দেখিতে পাইলেন। যথারীতি সালাম সম্ভাষণের পর হযরত ঈসা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "হে ন্যায়দর্শী ভ্রাতা খুশ্‌-আমদিদ্‌।"

এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আস্‌মানে প্রবেশ করিয়া হযরত মুহম্মদ যথাক্রমে ইউসুফ, হযরত ইদ্রিশ, হযরত হারুণ, হযরত মুসা ও হযরত ইব্রাহিমকে দেখিতে পাইলেন। প্রত্যেককেই তিনি সালাম জানাইলেন এবং প্রত্যেকেই পুলকিত চিত্তে হযরতকে অভিনন্দিত করিলেন।

ইহার পর হযরত মুহম্মদ আরও ঊর্ধ্বে উঠিয়া 'সেদ্‌রাতুল্‌মন্‌তাহা' পর্যন্ত উপনীত হইলেন। এইখানে আসিয়া জিব্রাইল আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু হযরত নিরস্ত হইলেন না; একাই তিনি অগ্রসর

হইতে লাগিলেন। অবশেষে 'বায়তুল্ মামুর' পর্যন্ত গিয়া তিনি থামিলেন। এই 'বায়তুল্ মামুর' আর কিছুই নয়, মক্কার কা'বা গৃহেরই সত্যরূপ (Noumenon); অর্থাৎ মক্কার কা'বা 'বায়তুল্ মামুরের'ই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। বর্তমানে যেখানে কা'বা-গৃহ দণ্ডায়মান, ঠিক তাহারই ঊর্ধ্বদেশে সপ্তম আসমানে 'বায়তুল্ মামুর' অবস্থিত। বাস্তব জগতের সহিত এইখানের কোনই সম্বন্ধ নাই ; ইহা নিছক ধ্যান বা কল্পনার জগৎ (World of Ideas), ফিরিশ্‌তারা প্রতিনিয়ত এখানে আল্লার গুণগানে মশ্‌গুল থাকে। একটা অপূর্ব জ্যোতিতে এ স্থান চিরস্নিগ্ধ—চিরমনোরম। এই খানে আসিয়া হযরত আল্লার নৈকট্য লাভ করিলেন। একটা পর্দার আড়াল টানিয়া আল্লাহ্ তাঁহাকে আত্মরূপ দর্শন করাইলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক গোপন কথা হইল। সৃষ্টি-লীলার যে রহস্য তখনও হযরতের অজানা ছিল, এইবার তাহা সম্যকরূপে তিনি উপলব্ধি করিলেন; স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে তিনি সত্য করিয়া চিনিলেন।

যথাসময় হযরত ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার পথে হযরত মূসার সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। হযরত মূসা জিজ্ঞাসা করিলেন: "আল্লাহ্‌তালা আপনাকে কোন আদেশ করিয়াছেন কি ?" হযরত মুহম্মদ উত্তর দিলেন: "আল্লাহ্‌তালা আমার উম্মতকে প্রত্যহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের বিধান দিয়াছেন।" হযরত মূসা বলিলেন: "নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনার উম্মতেরা এ আদেশ পালন করিতে পারিবে না। আপনার পূর্বে আমি বনি-ইসরাইলদিগকে পরীক্ষা করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা হইতেই এ কথা বলিলাম। যান, আল্লার নিকট ফিরিয়া গিয়া এই গুরুভার লাঘব করিয়া আসুন।" হযরত মুহম্মদ তখন পুনরায় আল্লার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আর্জি পেশ করিলেন। আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চাশ ওয়াক্তের স্থলে চল্লিশ ওয়াক্ত মঞ্জুর করিলেন। তখন হযরত মুহম্মদ হযরত মূসার নিকট সে-কথা জানাইলেন। হযরত মূসা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। বলিলেন: "আবার যান, ওয়াক্তের সংখ্যা আরও কমাইয়া আসুন।" হযরত মুহম্মদ পুনরায় গিয়া আর দশ ওয়াক্ত কমাইয়া আনিলেন। কিন্তু হযরত মূসা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না, বারে বারে হযরত মুহম্মদকে পাঠাইতে লাগিলেন। অবশেষে আল্লাহ্‌তালা প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শেষ বিধান দিলেন। হযরত মূসার মন উঠিল না। পুনরায়

তিনি হযরত মুহম্মদকে পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু হযরত মুহম্মদ এইবার বলিলেন: "না, ইহার কম প্রার্থনা করিতে আমার লজ্জা হয়। আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট।" ইহাই বলিয়া তিনি হযরত মুসাকে সালাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মুহূর্ত মধ্যে হযরত পুনরায় কা'বা-গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, জগৎ যেমন চলিতেছিল, ঠিক তেমনি চলিতেছে।

ইহাই হইল মি'রাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। নবযুগের দশম বৎসরে অর্থাৎ হযরতের পঞ্চাশ বৎসর বয়ক্রমকালে রযব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রে এই মহাঘটনা সংঘটিত হয়।

মি'রাজ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তালা কুর্‌আন-পাকে নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল করিয়াছেন:

"তাঁহারই মহিমা—যিনি তাঁহার দাসকে (মুহম্মদকে) এক রজনীতে পবিত্র মসজিদ (কা'বা) হইতে দূরতম মসজিদ* পর্যন্ত পরিভ্রমণ করাইয়াছিলেন।"

(১৭:১)

অন্যত্র বলিতেছেন:

* 'দূরতম মসজিদ' (মসজিদে-আক্‌সা) অর্থে প্রায় সমস্ত তফসীরকারই 'বায়তুল মুকাদ্দাস' বলিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে তেমন কোন অসংগতি হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভ্রম রাখিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত আমি বলিতে চাই যে, 'দূরতম মসজিদ' অর্থে আল্লাহ্‌তালা 'বায়তুল মামুর'কে উদ্দেশ করেন নাই তো? 'বায়তুল্ মুকাদ্দাস' সম্বন্ধে 'দূরতম' বিশেষণ কেন প্রযোজ্য হইবে, বুঝা কঠিন। বায়তুল্ মামুর'কে দূরতম বলিলেই অর্থের অধিকতর সুসংগতি হয়। এইখানে যখন হযরতের পরিভ্রমণের দূরত্ব নির্দেশ করা হইতেছে, তখন এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের উল্লেখই স্বাভাবিক। হযরত মক্কার কা'বা-গৃহে নিদ্রিত ছিলেন, সেখান হইতে তিনি 'বায়তুল্ মুকাদ্দাস' হইয়া আসমান অতিক্রম করিয়া 'বায়তুল্ মামুর' পর্যন্ত অগ্রসর হন। 'বায়তুল্ মামুরের' অতীতে আর কোন মসজিদ নাই। কাজেই 'দূরতম মসজিদ' অর্থে 'বায়তুল মামুর' হওয়াই সংগত বলিয়া মনে হয়। এরূপ হইলে ইহার অন্তর্নিহিত দার্শনিক তাৎপর্য বুঝাও সহজ হয়। মক্কার কা'বা হইতেছে বস্তু-জগতের (world of phenomena) প্রতীক আর 'বায়তুল্ মামুর' হইতেছে ধ্যান-জগতের (world of noumena) প্রতীক। কাজেই কা'বা হইতে 'বায়তুল্ মামুর' পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছিল বলিলে এই কথাই বুঝা যায় যে বস্তু-জগৎ হইতে হযরতকে ধ্যান-জগতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

"অস্তগামী তারকার শপথ
তোমাদের বন্ধু (মুহম্মদ) ভুল করেন না,
অথবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না ;
অথবা নিজের ইচ্ছাতেও তিনি কিছু বলেন না।
ইহা (কুরআন) তাঁহার নিকট প্রকাশিত পাক-কালাম ছাড়া কিছুই নয় !
অসীম ক্ষমতাশালী প্রভু তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন !
শক্তির অধিকারী (আল্লাহ্), কাজেই তিনি (মুহম্মদ) পূর্ণতা লাভ করিলেন।
এবং তিনি (মুহম্মদ) আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে পৌছিলেন এবং তারপর (আল্লার) নিকটবর্তী হইলেন এবং (আল্লার সমীপে) নত হইলেন।
দুইটি ধনুকের জ্যার মধ্যে যতখানি ব্যবধান
তিনি ততটুকু অথবা তার চেয়েও কম দূরবর্তী ছিলেন।
এবং তিনি (আল্লাহ্) তাঁহার ভৃত্যের (মুহম্মদের) নিকট যাহা প্রকাশ করিবার ছিল, প্রকাশ করিলেন।
যাহা তিনি (মুহম্মদ) দেখিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয় অবিশ্বাসী ছিল না।
তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তোমরা কি অবিশ্বাস করিবে ?
এবং নিশ্চয়ই তিনি দ্বিতীয়বার তাঁহাকে দূরতম সেদ্‌রাতুল মন্‌তাহার নিকটে দেখিয়াছেন—
যাহার নিকট (পুণ্যাত্মাদিগের) বাসস্থানের উদ্যান রহিয়াছে।
যখন সেই সেদ্‌রা (আল্লার জ্যোতিতে) আচ্ছাদিত হইল,
তখন তাঁহার চক্ষু ভ্রান্ত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না।
নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার প্রভুর অনেক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখিলেন।"

—(৫৩ : ১-১৮)

পরিচ্ছেদ : ৩০

অন্ধকারের অন্তরালে

যে-রাত্রে মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহার পরদিন প্রত্যুষে হযরত মসজিদে গিয়া তাঁহার সাহাবা'দিগের নিকট এই কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। ইহাতে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অনেকেই ইহা বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু যাঁহাদের ঈমান দুর্বল ছিল, তাঁহারা ইহা অসম্ভব ও অলীক বলিয়া মনে করিলেন। রসূলুল্লার সততা সম্বন্ধে অনেকের এইবার সন্দেহ জন্মিল। কয়েকজন সাহাবা আবুবকরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন: আবুবকর, এইবার কী বলিতে চাও? মুহম্মদকে খুব তো বিশ্বাস করো। এখন তিনি যে বলিতেছেন যে গতরাত্রে তিনি বায়তুল্‌ মুকাদ্দাসে গিয়া গতরাত্রেই ফিরিয়া আসিয়াছেন, এও কি সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? এও কী সম্ভব? আবুবকর বলিলেন: তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। হযরত এমন কথা বলিতে পারেন না। প্রতিবাদ-কারীরা বলিলেন: বিশ্বাস না হয় এস, তিনি মসজিদেই আছেন। তখন আবুবকর বলিলেন: যদি তিনি বলিয়া থাকেন, তবে সত্য বলিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যদি তিনি একটি দিনের তরেও কোন মিথ্যা না বলিয়া থাকেন বা ছলনা না করিয়া থাকেন, তবে আজ কেন তিনি তাহা করিবেন? কাজেই তিনি বলিয়া থাকিলে মিথ্যা বলেন নাই। জিব্রাইল আল্লার বাণী লইয়া ক্ষণিকের মধ্যে যদি বেহেশ্‌ত্‌ হইতে দুনিয়ায় নামিয়া আসিতে পারে, তবে আল্লার রসুল কেন সেরূপ দ্রুতগতিতে আকাশ-ভ্রমণ করিতে পারিবেন না? আমি তাঁহার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মসজিদের দিকে চলিলেন। রসূলুল্লার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: লোকেরা যাহা বলিতেছে তাহা কি সত্য? আপনি কি এরূপ কথা বলিয়াছেন? হযরত বলিলেন: হাঁ আমি এ কথা বলিয়াছি। তখন আবুবকর বলিলেন: "আমি সাক্ষ্য দিতেছি আপনি সত্যই আল্লার রসুল।" "তুমি সিদ্দীক"—এই বলিয়া রসূলুল্লাহ্‌ আবুবকরকে সম্ভাষণ জানাইলেন। সেই হইতেই আবুবকর 'সিদ্দীক' (বিশ্বাসী) উপাধি লাভ করিলেন।

কিন্তু, কোরেশগণ যখন এ কথা শুনিল, তখন তাহারা ইহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল : সশরীরে বেহেশ্‌ত গমন বা আল্লার দিদার লাভ তো দূরের কথা, একরাত্রে বায়তুল্‌-মকাদ্দাস পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসাও অসম্ভব বলিয়া তাহারা মনে করিল। এ সম্বন্ধে কুরআনের যে আয়াত নাযিল হইল, তাহাতেও তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল না। সকলে বলিতে লাগিল : "মুহম্মদ, তুমি একটি আস্ত পাগল! একরাত্রে কেহ কখনও ৭০ মাইল দূরবর্তী স্থান ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে? আচ্ছা তুমি যদি জেরুজালেমেই গিয়াছ, তবে বল তো জেরুজালেমের মস্‌জিদটি কিরূপ?"

কোরেশদিগের অনেকেই জেরুজালেমে গিয়াছিল, সেখানকার পবিত্র মস্‌জিদের কোথায় কি আছে-না-আছে, সমস্তই তাহারা জানিত। হযরত মুহম্মদ যে জীবনে কখনও জেরুজালেম যান নাই বা সেস্থান চক্ষেও দেখেন নাই, এ কথাও তাহারা অবগত ছিল। কাজেই তাহারা হযরতকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রশ্ন করিয়া বসিল। ভাবিল, এইবার মুহম্মদ নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবে।

কিন্তু তাও কি সম্ভব? হযরতের মানসচক্ষে জেরুজালেমের মস্‌জিদটি তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠিল। হুবহু তিনি তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া চলিলেন। যে যত রকমের প্রশ্ন করিল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন।

কোরেশগণ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু হইলে কী হয়? পাষাণ তো সহজে গলিবার নয়! এতবড় প্রমাণ পাইয়াও কোরেশগণ হযরতকে আল্লার রসুল বলিয়া স্বীকার করিল না; বরং তাঁহার উপর আরও অধিক কুপিত হইয়া উঠিল। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। প্রমাণের অভাবেই যে মানুষ সত্যকে গ্রহণ করে না, তাহা তো নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রমাণ পাইলে আরো জোরের সহিত জিদ করিয়া তাহারা সত্যকে অস্বীকার করে। সত্যকে বর্জন করা সহজ, কিন্তু সেই বর্জিত সত্যকে পুনর্গ্রহণ করা সহজ নহে। মানুষ যেখানে জ্ঞাতসারেই অন্ধ হয়, সেখানে তাহার নয়ন-কোণে বাহির হইতে যতই আলোকপাত কর, সে দেখিবে না। কোরেশদিগের বেলাও ঠিক তাহাই হইল। যতই তাহারা হযরতের সত্যতার প্রমাণ পাইতে লাগিল, ততই তাহারা তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতে লাগিল।

মি'রাজের পর হইতে হযরত প্রকৃতপক্ষে নজরবন্দী অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন। বাহিরে কোথাও প্রচার করা তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। মক্কাবাসীদের নিকট নিতান্ত কৃপার পাত্র স্বরূপ তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে বাৎসরিক হজ্ বা তীর্থ-মেলার সময় উপস্থিত হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সময় মক্কাবাসীরা সকল প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ ও আত্ম-কলহ হইতে বিরত থাকিত। হযরত এই সুযোগে বাহিরে আসিয়া বিভিন্ন দেশবাসীর নিকট সত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। কোরেশগণ হযরতের অংগে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু অন্য উপায়ে তাহারা হযরতের প্রচেষ্টায় বাধা দিতে লাগিল। তিনি যেখানেই যে গোত্রের নিকট যাইতে লাগিলেন, সেইখানেই একদল লোক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল এবং মুহম্মদকে পাগল, ভণ্ড ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় দিয়া সকলকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে পরামর্শ দিল। হযরত প্রতি গোত্রের নিকট হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে লাগিলেন। দিকে দিকে নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

এই অন্ধকারের অন্তরালে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একটি স্থান হইতে সহসা একটা আশার আলো বিকীর্ণ হইয়া উঠিল।

মক্কার অনতিদূরে আল্ আকাবা নামক একটি উপত্যকা আছে। একদিন হযরত বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলেন, ছয়জন যাত্রী সেখানে বিশ্রাম করিতেছেন। হযরত পরিচয় লইয়া জানিলেন, তাঁহারা ইয়াস্রেব বা মদিনা হইতে আসিয়াছেন। হযরত তাঁহাদের নিকট নিজের ধর্মমত প্রচার করিলেন। হযরতের মুখনিঃসৃত অমিয়মাখা বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন: ইনিই কি তবে সেই পয়গম্বর—যাঁহার কথা আমরা শুনিয়া আসিতেছি?

এইখানে মদিনা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। মক্কা হইতে ২৭০ মাইল দূরে মদিনা নগরী অবস্থিত। মদিনায় শুধু যে আরবেরাই বাস করিত, তাহা নহে। জেরুজালেম হইতে বিতাড়িত অনেক ইহুদীও এই অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মদিনাবাসী আরবদিগের মধ্যে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল: আউস্ এবং খাজরাজ। উভয় দলের মধ্যে আদৌ কোন সদ্ভাব ছিল না। পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত।

ইহুদীরা সুযোগ মত কখনও বা এই দলে, কখনও বা অপর দলে যোগ দিত। এই কারণে মদিনাবাসীদের উপর ইহুদীদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল।

মক্কায় যে একজন পয়গম্বরের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তিনি যে কোরেশদিগের মধ্যে ভীষণ এক ধর্মবিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছেন, এ কথা মদিনাবাসীরা নানাসূত্রে অবগত ছিল। ইহুদীরাও এ কথা জানিত। হযরত তাই মদিনাবাসীদিগের একেবারে অপরিচিত ছিলেন না।

যাহাই হউক, আকাবায় সমবেত ছয়জন যাত্রী হযরতের নিকট বয়েত হইয়া সেবারকার মত দেশে ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর হজ্জের সময় তাঁহারা অধিক সংখ্যায় আসিবেন বলিয়া হযরতকে প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন। এইরূপে ইসলামের জ্যোতিঃ সকলের অলক্ষ্যে মদিনা নগরে প্রবেশ করিল।

হযরত নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতার স্বপ্ন একটা ক্ষীণ সূত্রে দুলিতে লাগিল।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া একটি বৎসর কাটিয়া গেল। আবার হজ্জের সময় উপস্থিত হইল। হযরত সতৃষ্ণনয়নে মদিনাবাসীদিগের পথপানে চাহিয়া রহিলেন।

মদিনা হইতে এবার সত্যসত্যই অধিকসংখ্যক লোক হজ্জ করিতে আসিলেন। পূর্বোক্ত আকাবা উপত্যকায় তাঁহারা হযরতের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিলেন। আউস এবং খাজরাজ গোত্রের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত তাঁহাদিগের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইলেন। নূতন আশায় তাঁহার মন দুলিয়া উঠিতে লাগিল! তিনি সকলকে যথারীতি উপদেশ দান করিলেন। উপদেশ শুনিয়া মদিনাবাসীরা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখন যাত্রীদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ দ্বাদশ ব্যক্তি হযরতের হাতে হাত রাখিয়া নিম্নলিখিতরূপ শপথ গ্রহণ করিলেন:

(১) আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌তালার উপাসনা করিব এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার শরীক করিব না।

(২) ব্যভিচার করিব না।

(৩) চুরি করিব না।

(৪) আপন সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করিব না।

(৫) কাহারও বিরুদ্ধে চোগলখোরী করিব না।

(৬) প্রত্যেক সৎকার্যে আল্লার রসুলকে মানিয়া চলিব, ন্যায্য কাজে তাঁহার অবাধ্য হইব না।

ইহাই 'আকাবার প্রথম বাইয়াৎ' নামে পরিচিত।

পাঠক, এই শপথ গ্রহণের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন। হযরত নবদীক্ষিতদিগের নিকট হইতে যে-কোন কার্যের জন্যই তাঁহাকে অন্ধভাবে মানিয়া চলিবার দাবী করেন নাই; 'প্রত্যেক সৎকার্যে আল্লার রসুলকে মানিয়া চলিবে'—ইহাই মাত্র তাঁহার দাবী। কতখানি সততা, সৎ সাহস ও উদারতার পরিচয় এ! আপন প্রচারিত ধর্মমতকে অভ্রান্তরূপে সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিলে, অথবা স্বীয় চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের নিষ্কলংক মাধুর্য দ্বারা শিষ্যের হৃদয়কে বশীভূত করিবার মত যোগ্যতা ও আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে কোন ধর্মগুরু এমনভাবে কাহাকেও শিষ্যত্বে বরণ করিতে সাহস করিবে না। গুরুর কোন্ আদেশ মানা হইবে, কোন্‌টি হইবে না, সে বিচার-ভার শিষ্যের হস্তে! চিন্তা ও কার্যের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া কাহাকেও দীক্ষা দিতে যাওয়া গুরুর পক্ষে নিশ্চয়ই মারাত্মক! যে মুহূর্তে গুরুর কার্যে এবং বাক্যে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে, যে-মুহূর্তে শিষ্যের কাছে গুরুর কোন ভণ্ডামি ধরা পড়িবে, যে-মুহূর্ত গুরু কোন অন্যায় বা জঘন্য আচরণ করিবে, অথবা যে-মুহূর্তে গুরুর কোন কার্যে শিষ্যের প্রাণ সাড়া দিতে চাহিবে না, সেই মুহূর্তেই সে স্বাধীন, সেই মুহূর্তেই সে গুরুকে বর্জন করিতে পারিবে—ইহাই হইতেছে এই শপথের তাৎপর্য। ইহা একদিক দিয়া শিষ্যের বিচার-বুদ্ধির বন্ধন-মুক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যদিক দিয়া গুরুর দুর্জয় আধ্যাত্মিক শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়েরও প্রকৃষ্ট পরিচয়। একদিক দিয়া ইহা বন্ধনের মুক্তি, কিন্তু অপরদিক দিয়া ইহাই মুক্তির বন্ধন। গুরু যদি শক্তিমান হয়, উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তবে শিষ্য কেন তাহার বিধি-নিষেধ মানিবে না? মানিতেই হইবে। আপন চরিত্র দিয়া, আদর্শ দিয়া, প্রভাব দিয়া গুরু শিষ্যকে তাহার বশে আনিবেই—এমনি অটল আত্মবিশ্বাস থাকিলে তবেই গুরু তাহার শিষ্যদিগকে অতখানি মুক্তবুদ্ধির অধিকার দিতে পারে—অন্যথায় নয়। হায়! আজ যদি আমাদের ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্র-গুরুরা হযরতের এই আদর্শ গ্রহণ করিতেন! শিষ্যদিগকে এতখানি অধিকার দিলে গুরুরা নিশ্চয়ই আদর্শস্থানীয় না হইয়াই পারিতেন না। তাঁহাদিগকে ভিতরে ভিতরে আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে সজাগ

থাকিতে হইত, তাঁহাদিগকেও আত্মোন্নতির জন্য সাধনা করিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইহা দ্বারা গুরু-শিষ্য উভয়েই উপকৃত হইতেন, দেশেরও কল্যাণ হইত।

বয়েৎ গ্রহণের পর সকলের প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত হইল। হযরত তখন ভক্ত-প্রবর মোসাএব-বিন-ওমায়েরকে তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন। মোসায়েব ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির পুত্র। চিরদিন তিনি বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তিনি দীনদরিদ্র বেশে কাল কাটাইতেছিলেন। পবিত্র কুরআনে তাঁহার অগাধ অধিকার ছিল। হযরত তাঁহাকেই পাঠাইলেন মদিনায়—ইসলামের আচার্য ও প্রচারক রূপে।

মোসাএব মদিনায় পৌছিয়া নব-দীক্ষিত মুসলমান নরনারীদিগকে ধর্মকর্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে বিভিন্ন গোত্রের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিল।

কিন্তু এখানেও যে বাধার সৃষ্টি হইল না, এমন নয়। মোসাএব মদিনায় আসিয়া আসাদ-বিন-জারারা নামক এক ব্যক্তির বাটিতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কিরূপে ইসলাম প্রচার করা যায়, উভয়ে তাহা পরামর্শ করিতেন। প্রচার-কার্যে আসাদ মোসাএবকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। উভয়ের চেষ্টায় যখন ধীরে ধীরে ইসলাম প্রসার লাভ করিতে লাগিল, তখন আশ্‌হাল গোত্রের দলপতি সাদ-ইবনে মা'আজ এবং বানু-জাফর গোত্রের দলপতি উসায়েব অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মোসাএব এবং আসাদের জন্যই যে মদিনায় ধর্মবিপ্লব দেখা দিতেছে, ইহা তাঁহারা ভালভাবেই বুঝিতে পারিলেন। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য তাই উভয়ে তৎপর হইয়া উঠিলেন।

একদিন আসাদের গৃহে বিশিষ্ট মুসলমানদিগের একটি পরামর্শ-সভা হইতেছিল। সংবাদ পাইয়া সা'দ উসায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন: "বসিয়া বসিয়া কী করিতেছ? দেখিতেছ না মোসাএব ও আসাদ আমাদের কী সর্বনাশ করিতেছে? যাও, তুমি গিয়া ইহাদিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া আইস এবং বলিয়া আইস, আমাদের গোত্রের কাহারও উপর যেন তাহারা হস্তক্ষেপ না করে। আমি নিজেই যাইতাম, কিন্তু

পাজী আসাদটা আমরাই খালাতো ভাই। অন্যথায় ওর মাথাটা আমিই কাটিয়া আনিতাম।"

উসায়েব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের গৃহে উপস্থিত হইল। মোসাএবকে দেখিতে পাইয়া সে কর্কশ ভাষায় তাহাকে গালাগালি দিয়া বলিতে লাগিল: "শীঘ্র মদিনা ছাড়িয়া চলিয়া যাও, নতুবা ভাল হইবে না।"

মোসাএব তদুত্তরে ধীর নম্রস্বরে বলিলেন: "আসুন, বসুন! আমাদের বক্তব্য শুনুন, তারপর যদি কিছু অন্যায় দেখেন, বলিবেন।"

মোসাএবের এইরূপ ভদ্র ব্যবহারে উসায়েব একটু লজ্জিত হইয়া আসন গ্রহণ করিল। মোসাএব তখন ইসলামের মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং সুললিত সুরে মাঝে মাঝে কুরআনের আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ উসায়েবের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল; ফলে সে সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করিল।

এদিকে সা'দ উসায়েবের পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে উসায়েব ফিরিয়া আসিলে তাহার হাবভাব দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল: "কিহে, কতদূর কী করিয়া আসলে?" উসায়েব নিজের ধর্ম পরিবর্তনের কথা আপাততঃ প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন: "আপনার নির্দেশমত সমস্তই আমি উহাদিগকে বলিয়াছি। কিন্তু আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহারা কোন-কিছুই করিতে রাজী নয়। কাজেই আপনার সেখানে একবার যাওয়া নিতান্ত দরকার।"

সা'দ মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেই উত্তেজিত অবস্থাতেই সে আমাদের গৃহপানে ধাবিত হইল।

মোসাএব ও আসাদকে একত্রে দেখিতে পাইয়া সা'দও গালাগালি দিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার বিনিময়ে মোসাএব পূর্ববৎ নম্র ধীরভাবে সা'দকে আহ্বান করিলেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষণকালের মধ্যে সা'দও মন্ত্র-মুগ্ধবৎ বশীভূত হইয়া প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর তিনি আপন লোকদিগের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন: "হে আশ্‌হাল্ গোত্রের লোকগণ, তোমরা আমাকে কী মনে কর, বল?"

সকলে সমস্বরে উত্তর দিল: "আপনি আমাদের গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি,—আপনি আমাদের নেতা।"

"তবে শোন,—আমি মুসলমান হইয়াছি; আমি আর এখন তোমাদের কেউ নই। যে পর্যন্ত না তোমরা মুসলমান হইতেছ সে পর্যন্ত আমার সহিত তোমাদের কোন সংস্রব নাই।"

উসায়েব পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। তিনিও সুযোগ বুঝিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তিনিও মুসলমান হইয়াছেন। উভয় দলের অন্যান্য সমস্ত লোক তখন বিনা বাক্যব্যয়ে আপন আপন নেতাদের অনুসরণ করিলেন। এইরূপে আশ্‌হাল ও জাফর গোত্রের লোকেরা মুসলমান হইয়া গেল।

মক্কায় হযরতের নিকট এই সমস্ত খবর পৌছিতে লাগিল। এই সফলতার সূচনায় মনে মনে তিনি সহস্রবার আল্লাহ্‌তালাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আরও একটি চমৎকার ঘটনা ঘটিল। আকাবা হইতে যে সব মদিনাবাসী বয়েৎ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তরুণ যুবক মা'জ ছিলেন অন্যতম। কিন্তু তাঁহার পিতা (আমর) তখনও ছিলেন ঘোর পৌত্তলিক। মনাৎ ঠাকুরের সুন্দর একটি মূর্তি তিনি গৃহে রাখিয়াছিলেন। মা'জ তখন মহল্লার অন্যান্য তরুণ মুসলিম-যুবকদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন—কি করিয়া তাঁহার পিতাকে এই মূর্তি-পূজা হইতে বিরত করা যায়। সকলে একটা যুক্তি স্থির করিলেন। একদিন রাত্রে গোপনে তাঁহারা সবাই মিলিয়া মূর্তিটিকে নর্দমায় ফেলিয়া রাখিয়া আসিলেন! পরদিন আমর মূর্তি না দেখিয়া মহা খাপ্পা হইয়া খোঁজাখুজি আরম্ভ করিলেন এবং যাহারা এই কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে সমুচিত শাস্তি দিবেন বলিয়া শাসাইলেন। অতঃপর বহু চেষ্টায় তিনি মূর্তিটির সন্ধান পাইলেন এবং নর্দমা হইতে তুলিয়া আনিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া-মুছিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ২।১ দিন পরে আবার মূর্তি চুরি। আবার সেই নর্দমায় পুনঃপ্রাপ্তি। কয়েক দিন এইরূপ হইবার পর আমর একদিন রাত্রিবেলায় নিজের তরবারি দেবমূর্তির পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "হে ঠাকুর, দুষ্কৃতকারীদিগকে তুমি শাস্তি দিও।" কিন্তু তার পরদিনও দেখা গেল, দেবমূর্তি উধাও এবং সেই একই স্থানে তিনি শায়িত। তখন আমরের চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পাষাণ দেবতার কোনই শক্তি নাই। থাকিলে নিশ্চয়ই সে তরবারি তুলিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত। এই উপলব্ধির ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

পরিচ্ছেদ : ৩১

হিযরতের পূর্বাভাস

দেখিতে দেখিতে আরও একটি বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় হজের সময় আসিল।

এবার মদিনা হইতে প্রায় ৫০০ শত যাত্রী হজ করিতে আসিলেন। সেই সংগে ৭৩ জন মুসলিম পুরুষ ও ২ জন নারীও মক্কায় আসিয়া পৌঁছিলেন।* ইতিপূর্বে মক্কা হইতে হযরতের যে-কতিপয় শিষ্য মদিনায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, আগন্তুক দলের মধ্যে তাঁহাদেরও কেহ কেহ ছিলেন। হযরতের উপর, যে কোরেশগণ অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে এবং মক্কায় তাঁহার জীবন যে অতিষ্ঠ হইয়াছে, এ কথা মদিনাবাসী মুসলমানেরা অবগত ছিলেন। তাই তাঁহারা হযরতকে মদিনায় লইয়া যাইবার জন্য মক্কায় আসিলেন।

হযরত মদিনাবাসীদিগের আগমন সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। স্থির হইল, সেই আকাবা পর্বতের নির্জন পাদদেশে তিনি গোপনে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

জিল্‌হজ্জ্‌ মাসের ১২ই তারিখে গভীর রাত্রে হযরত আকাবার উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সংগে চলিলেন হযরতের অন্যতম পিতৃব্য আব্বাস। আবুতালিবের মৃত্যুর পর আব্বাসই ছিলেন হযরতের নিকটতম আত্মীয়। আবুতালিবের ন্যায় তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, অথচ হযরতের প্রতি তাঁহার স্নেহের অন্ত ছিল না। পাছে কোরেশগণ এই

* এই দুইজন নারীর নাম নুসাইবা ও আস্‌মা। নুসাইবা বীর-রমণী ছিলেন। পরবর্তী-কালে রসুলুল্লার সহিত তিনি যুদ্ধে গিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল দুই পুত্র : হাবীব ও আবদুল্লাহ্। ইয়ামামার ভণ্ড নবী মুসাইলিমা ঘটনাক্রমে হাবীবকে বন্দী করে এবং তাঁহার ইসলাম-প্রীতির জন্য তাঁহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলে। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুসলিম সেনাদল যখন মুসাইলমার বিরুদ্ধে ইয়ামামায় অভিযান করেন, তখন নুসাইবাও তাহাদের সংগে যান এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুসাইলিমা নিহত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করিতে থাকেন। যুদ্ধ শেষে যখন তিনি মদিনায় ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার অংগে তরবারি ও বর্শার বারটি আঘাত দৃষ্ট হইয়াছিল। —(ইবনে-ইস্‌হাক)

গোপন বৈঠকের কথা জানিতে পারিয়া হযরতের কোন অনিষ্ট সাধন করে, অথবা অন্য কোন আপদ-বিপদ ঘটে, এই আশংকাতেই আব্বাস হযরতের সংগে গিয়াছিলেন।

আকাবা উপত্যকায় উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হইল। মদিনাবাসীরা হযরতকে সংগে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তখন আব্বাস তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "আপনারা মুহম্মদকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু ইহা খুব সহজ ব্যাপার নহে। আগাগোড়া ভাবিয়া দেখুন। মুহম্মদকে লইতে গেলে আপনাদিগকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। মক্কাবাসীরা আপনাদের উপর ক্ষেপিয়া যাইবে এবং খুব সম্ভব আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। তখন যদি আপনারা বিপদ দেখিয়া পশ্চাদপদ হন?"

আব্বাসের কথাগুলি কাহারও ভাল লাগিল না। সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন: "রসুলুল্লাহ নিজে কী বলেন, তাহাই আমরা জানিতে চাই।"

তখন হযরত প্রথমে কুরআন পাঠ করিয়া সকলের অন্তর আল্লার দিকে রুজু করাইয়া দিলেন। তারপর ইসলামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ দিয়া বলিতে লাগিলেন: "আমি তোমাদের সংগে যাইতে প্রস্তুত। তবে একটি কথা। আমার সংগে আমার শিষ্যদিগের কথাও তোমাদিগকে ভাবিতে হইবে। মক্কায় আমার যে-সমস্ত শিষ্য আছে, তাহাদিগকে ফেলিয়া আমি একা যাইতে পারি না। তাহাদিগকেও তোমাদের আশ্রয় দিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে। তোমাদের ন্যায় তাহারাও যখন সত্যের সৈনিক, তখন তোমাদের সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য নাই। আমার নিজের জন্য আমি বেশী কিছুই বলিতে চাহি না। আমি যখন তোমাদেরই একজন হইয়া যাইতেছি, তখন তোমরা নিজের পরিজনবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর, আমার প্রতিও সেইরূপ করিবে। স্বগোত্রের বা স্বজনগণের কেহ যদি বিপদে পড়ে, তখন তোমরা যেরূপ তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাক, আমাকেও ততটুকু করিবে,—এর বেশী নয়। আমিও তোমাদের সহিত ঠিক তদ্রূপই ব্যবহার করিব। তোমাদের বন্ধুর আমি বন্ধু হইব, শত্রুর আমি শত্রু হইব। সর্বোপরি যে-আল্লার পাক-কালামকে তোমরা গ্রহণ করিলে, প্রাণপণে তাহা রক্ষা করিবে এবং সত্যপ্রচারে যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করিবে—ইহাই আমার প্রস্তাব।"

তখন সকলে উল্লসিত হইয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন: "প্রস্তুত, আমরা প্রস্তুত! জীবন-মরণে আমরা আপনার চিরসঙ্গী হইয়া রহিব, কোন বাধা, কোন বিপদকে আমরা মানিব না। আপনার জন্ম—ইসলামের জন্য—সত্যের জন্য—আল্লার জন্য আমরা আমাদের জান্ ও মাল কুরবান করিব। মক্কায় আপনার যে সকল শিষ্য আছেন, তাহাদিগকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। সকলকে ভাইয়ের মত ভালবাসিব। প্রয়োজন হইলে কোরেশদিগের সহিত আমরা যুদ্ধ করিব। হে রসূলুল্লাহ্, আমাদিগকে বাইয়াৎ করুন।"

হযরত তখন মদিনাবাসীদিগকে বাইয়াৎ করিলেন। হযরতের হাতে হাত মিলাইয়া সকলে দীক্ষা লইলেন। নীরব আকাশের তলে নির্জন মরুপ্রান্তরের পাদদেশে অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সত্যের জন্য একদল লোক এইরূপে শপথ গ্রহণ করিল। কল্যাণ-বুদ্ধির এমন শুভ উন্মেষ খুবই বিরল।

ইহাই আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াৎ।

শপথ গ্রহণ শেষ হইলে হযরত বলিলেন: তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া দাও। হযরত ঈসার দ্বাদশ শিষ্যের ন্যায় তাহারা আমাকে কেন্দ্র করিয়া সত্য প্রচার করিবে।*

হযরতের আদেশক্রমে তখন আউস্ ও খাজরাজ গোত্র হইতে নিম্ন-লিখিত দ্বাদশ ব্যক্তি মনোনীত হইলেন: (১) আবু ঈমামা আসাদ বিন্ জোরারা, (২) সা'দ বিন্ রাবী, (৩) আবদুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা, (৪) রাফী

* যিশুখৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের নাম: Simon (Peter), Andrew, James (son of Zebedee), John, Philip, Bartholomew, Thomas, Mathew, James, (son of Alphaeus), Labbaeus, Simon (the Cauaanite), এবং Judas Iscariot. ইঁহারা যিশুর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। কিন্তু ইঁহারাই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যিশুকে ইহুদিদের হস্তে ধরাইয়া দেন। Judas Iscariot মাত্র ত্রিশটি টাকার লোভে আপন ধর্মগুরুকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করেন। এই বিপদের দিনে অন্যান্য শিষ্যেরাও যিশুকে কোনরূপ সাহায্য না করিয়া পালাইয়া যান: ফলে যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু হযরত মুহম্মদের দ্বাদশ শিষ্য সম্বন্ধে (শুধু দ্বাদশ কেন, কোন শিষ্য সম্বন্ধেই) বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আজ পর্যন্ত কেহ দিতে পারে নাই। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের প্রায় সকলকেই আল্লাহ্, রসূল এবং ইসলামের জন্য শহীদ হইয়াছিলেন।

বিন্ মালিক, (৫) বারা বিন্ মারুর, (৬) আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর, (৭) ওবাদা বিন্ সামিত, (৮) সা'দ বিন্ ওবাদা, (৯) মোনজার বিন্ আমর, (১০) উসায়েদ বিন্ হুজায়ের, (১১) সা'দ বিন্ খাইসামা, (১২) রিফা বিন্ আবুল মন্‌জির।

হযরত সকলকে উপদেশ দিবার পর সভা ভঙ্গ হইল। মদিনাবাসীরা সতর্কতার সহিত আপন তাঁবুতে ফিরিয়া গেলেন। হৃষ্টচিত্তে হযরতও গৃহে ফিরিলেন।

আ'কাবার এই দ্বিতীয় শপথ জগতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই-দিন এইখানে পাপ-পুণ্যের এক জীবন-মরণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং জগতের চিরাচরিত রীতি অনুসারে পুণ্যেরই জয় হইয়াছে। যদি এইদিন মদিনাবাসী মুসলমানেরা হযরতকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য এমন আগ্রহ প্রকাশ না করিতেন, যদি তাঁহারা সত্যের জন্য এমন করিয়া যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত না হইতেন, তবে ইসলামের বিজয়-অভিযান কেমন করিয়া, কোন্ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইত, বুঝা কঠিন। জগতের সমস্ত কল্যাণ ও মুক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, পাপ ও অনাচারের স্রোতে ধরণী ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল; পুণ্যভূমি মদিনা সেই চরম অভিশাপ হইতে নিশ্চয়ই সেদিন পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছে।

বস্তুতঃ মদিনাবাসী মুসলমানদিগের 'আনসার' (মিত্র) নাম সত্যই সার্থক হইয়াছে। তাঁহারা শুধু হযরতেরই মিত্র নন, পুণ্য ও কল্যাণেরও মিত্র।

পরিচ্ছেদ : ৩২

শিষ্যদিগের প্রস্থান

কাফেলা মদিনায় ফিরিয়া গেল।

কোরেশগণ গুপ্তচরদিগের মুখে শুনিতে পাইল, মদিনাবাসীদিগের সহিত মুহম্মদের একটি গোপন চুক্তি হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা মুহম্মদকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এই সংবাদে কোরেশগণ আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মদিনাবাসীদিগের উপরেও এবার তাহাদের আক্রোশ ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা স্থির করিল, তীর্থমাস উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই ইহার একটা বুঝাপড়া করিবে।

এদিকে হযরত তাঁহার শিষ্যদিগকে আপন-আপন সুবিধা মত গোপনে গোপনে মদিনায় প্রস্থান করিতে উপদেশ দিলেন। গৃহ-সুখ, আত্মীয়স্বজন, ধন-সম্পদ ও জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া সত্যের সেবকগণ অম্লান বদনে তাহাই করিতে প্রস্তুত হইলেন। মুসলমানের স্বদেশ যে ভৌগোলিক নয়—আদর্শ-ভিত্তিক, এই সত্যেরই সেদিন রেখাপাত করা হইল।

মুসলমানগণ মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে কোরেশ দলপতিগণ প্রথমতঃ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল না। তাহারা মনে করিল, আপদ দূর হইয়া যায়, ভালই। শিষ্যগুলি দেশ ত্যাগ করিলে মক্কাভূমি অধিকতর নিরাপদ হইবে এবং মুহম্মদ সহায়হীন হইয়া পড়িবে। তখন তাহাকে দমন করা কষ্টকর হইবে না। ইহাই মনে করিয়া তাহারা মুসলমানদিগকে বাধা দিবার সেরূপ কোন ব্যাপক চেষ্টা করে নাই। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা মত পরিবর্তন করিল। শিকারকে ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্বে লোকে যেমন তাহার প্রতি অহেতুক নির্যাতন করিয়া আনন্দ পায়, কোরেশগণ সেই নিষ্ঠুর আনন্দের লোভে মাতিয়া উঠিল। ভাবিল, ধর্মদ্রোহীরা যখন চলিয়াই যাইতেছে, তখন যাহাকে যেরূপ পারা যায়, একটু শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিলে ক্ষতি কী? ইহাই ভাবিয়া তাহারা মুসলিম দলনে প্রবৃত্ত হইল।

তখনকার নির্যাতন কাহিনী শ্রবণ করিলে একদিকে যেমন মুসলমানদিগের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়, অপরদিকে তেমনি তাঁহাদের সত্যাগ্রহ, কষ্টসহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ও মহত্ত্ব দেখিয়া গৌরবে বুক ভরিয়া উঠে। আমরা নিম্নে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:

(১) সোহায়েব রুমী নামক এক ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ মক্কায় বাস করিতেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া তিনি প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সোহায়েব মদিনা যাত্রা করিতেছেন শুনিয়া কোরেশগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল: "তুমি আমাদের দেশে আসিয়া ব্যবসা করিয়া আমাদেরই অর্থে বড়লোক হইয়াছ। সেই অর্থ লইয়া এখন তুমি মদিনায় পালাইয়া যাইবে, তাহা হইবে না। যদি যাও, তবে তোমার সমস্ত অর্থ আমাদিগকে দিয়া যাইতে হইবে।"

কোরেশগণ ভাবিল, আজীবন পরিশ্রম করিয়া সোহায়েব যে-অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই সে রিক্ত হস্তে মদিনায় যাইতে রাজী হইবে না।

সোহায়েব উত্তর দিলেন: "বুঝিতে পারিয়াছি। এই অর্থের জন্যই তোমাদের আপত্তি?"

কোরেশগণ বলিল: "হাঁ।"

সোহায়েব তদুত্তরে বলিলেন: "বেশ। যদি আমি এই অর্থের দাবী না করি?"

কোরেশগণ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল: "তাহা হইলে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই।"

"তথাস্তু।" বলিয়াই সোহায়েব শূন্য হস্তে উটের পিঠে চাপিয়া বসিয়া উটকে যাইবার ইংগিত করিলেন। উট ধীরে ধীরে মদিনার পানে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাশিকৃত অর্থ ও আসবাবপত্র পিছনে পড়িয়া রহিল।

(২) আবু-সাল্‌মা নামক এক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রী উম্মে-সাল্‌মাকে সংগে লইয়া মদিনায় যাইতেছিলেন। উম্মে সাল্‌মার কোলে ছিল একটি শিশুপুত্র। সংবাদ পাইয়া উভয় কুলের আত্মীয়স্বজন আসিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিল। উম্মে সাল্‌মার পিতৃকুলের লোকেরা আবু-সাল্‌মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল: "নরাধম, তুই জাহান্নামে যাবি, যা—; কিন্তু আমাদের বংশের একটি কন্যাকে তোর সংগে যাইতে দিব কেন?" এই বলিয়া তাহারা উম্মে সাল্‌মার হস্ত আকর্ষণ করিল। ঠিক সেই সময় আবু-সাল্‌মার স্বগোত্রের লোকেরাও বলিয়া উঠিল, "হতভাগা, তোর কপাল পুড়িয়াছে, তুই দূর হ; কিন্তু আমাদের কুলপ্রদীপ এই শিশুটিকে আমরা ছাড়িব কেন?"

এই বলিয়া উম্মে-সাল্‌মার বুক হইতে তাহারা শিশুটিকে ছিনাইয়া লইতে উদ্যত হইল। তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই হৃদয়-বিদারক। স্বামীগতপ্রাণা উম্মে-সাল্‌মা একদিকে স্বামীর বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া ধরিয়াছেন, অপরদিকে প্রাণ-প্রতিমা শিশুপুত্রকে আঁকড়িয়া আছেন, আর আবু-সাল্‌মা উভয়কে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পাষাণ-হৃদয় কোরেশগণ কিছুতেই বিচলিত হইল না। স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে, এবং মাতার বক্ষ হইতে সন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া বীভৎস আনন্দরোলের মধ্য দিয়া তাহারা স্ব-স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। আবু-সালমা একা নির্বাক, নিস্পন্দ হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একদিকে স্ত্রী পুত্রের আকর্ষণ, অপরদিকে সত্যের আহ্বান; একদিকে মিথ্যার ঘন-অন্ধকার, অপরদিকে সত্যের আলো। কোন্ দিকে যাইবেন? কোন্ পথ বরণ করিবেন?

মুহূর্তমধ্যে আবু-সাল্‌মা নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া লইলেন। 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি উটের পিঠে চড়িয়া মদিনার দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া দিলেন। উট মরুপথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে উম্মে-সাল্‌মার যে-দশা হইল তাহা বর্ণনাতীত। স্বামী-পুত্রের বিয়োগ-বেদনায় তিনি একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেন। যে-স্থানে এই হৃদয়-বিদারক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেই স্থানে আসিয়া তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। নরাধমগণের অন্তরে তবুও দয়ার উদ্রেক হইল না। তাহারা বলিল: "মুহম্মদের ধর্ম পরিত্যাগ কর, তবে তোমার পুত্রকে ফিরাইয়া দিব।" কিন্তু উম্মে-সাল্‌মা তাহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন না।

প্রায় এক বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। তখন উম্মে-সাল্‌মার এক নিকট-আত্মীয়ের মনে কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হইল। তাহার অনুরোধক্রমে উম্মে-সাল্‌মার আত্মীয়গণও শিশুপুত্রটিকে তাহার সঙ্গে দিতে রাজী হইল। উম্মে-সাল্‌মা তখন কোনমতে একটি উট সংগ্রহ করিয়া শিশুপুত্রসহ নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই মদিনা যাত্রা করিলেন।

কী অত্যুজ্জ্বল দৃশ্যই না ফুটিয়া উঠিল নিস্তব্ধ মরুর বুকে! একটি তরুণী তাহার শিশুপুত্র কোলে লইয়া উটের পিঠে চড়িয়া একাকী মরুভূমি পার হইয়া চলিয়াছে—সাথী নাই, পাথেয় নাই, পথ জানা নাই। জন্মভূমির প্রেম, আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতা, অত্যাচারীর উৎপীড়ন ও বাধাদান—সব আজ ব্যর্থ।

পথের দুঃখকষ্ট ও ভীষণতার কথাও আজ তুচ্ছ। উম্মে-সাল্‌মাকে কেহই আজ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কোন্ যেন চেনা বাঁশির সুর শুনিয়া আজ তাহার মনের হরিণ অশান্ত আবেগে ছুটিয়া চলিল। ধ্রুবজ্যোতির সন্ধান সে আজ পাইয়াছে, পথের অন্ধকারে তাহার আজ ভয় নাই। শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও রসুলের প্রেম সম্বল করিয়া সে আজ পথে বাহির হইল।

কিছুদূর অগ্রসর হইলে ওসমান-বিন-তালহা নামক এক আরব যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ওসমান তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। একটি নারী ও তাহার শিশুপুত্র মরুপথে একাকী যাইতেছে দেখিয়া ওসমানের মনে কৌতূহল জাগিল। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যখন তিনি সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি উম্মে-সাল্‌মাকে বলিলেন, "বহিন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব।" উম্মে সাল্‌মা আপত্তি করিলেন না। মানবতার সহজ ধর্মেই একজন বিপন্না নারীর সাহায্যার্থ একজন পুরুষ ভাইয়ের মত তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তের সম্পর্ক উল্লংঘন করিয়া মানবতার সম্পর্ক আজ বড় হইয়া দেখা দিল।

উভয়ে তখন মদিনার পথে অগ্রসর হইলেন। ওসমান উটের লাগাম ধরিয়া হাঁটিয়া চলেন। এক এক মঞ্জিলের পথ যান আর তাঁহারা বিশ্রাম করেন। বিশ্রামের সমস্ত ব্যবস্থা ও খাদ্যপানির আয়োজন ওসমানই করেন। পথের দুঃখকষ্ট ও বিপদ হইতে ওসমান উম্মে-সাল্‌মাকে বাঁচাইয়া এমনি করিয়া মদিনা পৌঁছান। তারপর কোবা-পল্লীতে আসিয়া আবুসাল্‌মাকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং উম্মে সাল্‌মাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া আবার তিনি মক্কায় ফিরিয়া আসেন।

কী সুন্দর এই চিত্রটি! বীরধর্মী নারীমর্যাদার কী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ!

এমনি করিয়া শত বিপদের মধ্য দিয়া শত অত্যাচার সহ্য করিয়া ইসলামের অনুরক্ত ভক্ত মদিনায় গিয়া পৌঁছিলেন।

ওমর, হারিস প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্যগণও হযরতের আদেশে মদিনায় প্রস্থান করিলেন। হযরত নিজে মক্কায় রহিয়া গেলেন। সংগে রহিলেন কেবলমাত্র ওসমান ও আলি।

এইরূপে শিষ্যদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ না করা পর্যন্ত হযরত স্বস্থান পরিত্যাগ করিলেন না। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি রহিলেন শত্রুপুরীতে। আদর্শ গুরুই বটে!

পরিচ্ছেদ : ৩৩

হিযরৎ

দেখিতে দেখিতে তীর্থমাস শেষ হইয়া গেল।

অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে কোরেশদিগের মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। তাহারা দেখিল, মক্কার মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। এই বেকুফির ফলেই অপ্রত্যাশিতভাবে মুহম্মদের ধর্ম মদিনায় গিয়া দৃপ্ত তেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল। ইহার উপর আবার মুহম্মদও তাহাদের সংগে গিয়া যোগ দিতে উদ্যত। এইরূপ হইলে তো সবই মাটি। ইসলামের তো ধ্বংস হইলই না, পক্ষান্তরে সে আরও অধিকতর শক্তিশালী হইবার সুযোগ পাইল; সংগে সংগে মদিনাবাসীরাও তাহাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। কালে যে এই মদিনাবাসীরা তাহাদের সংগে যুদ্ধ করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কী?

ইহাই ভাবিয়া কোরেশ-নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। অচিরে তাহারা পরামর্শ-সভা আহ্বান করিল। মুহম্মদকে এখন কী করা হইবে, ইহাই হইল সভার আলোচ্য বিষয়। কেহ কেহ বলিল: মুহম্মদ যদি তাহার শিষ্যবৃন্দের সহিত মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কী? মক্কাভূমি তো পবিত্র হইবে! কিন্তু অনেকে বাধা দিয়া বলিল: না, মুহম্মদ চলিয়া গেলে মদিনাবাসী এবং আরও অনেকেই তাহাকে সাহায্য করিবে, তখন বিপদ ঘটিবে। আর একজন বলিল: তবে তাহাকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখ। ইহাও অনেকের মনঃপূত হইল না, কেননা বন্দী করিয়া রাখিলেও কোন-না-কোন সময় নিজেদের মধ্যেই আত্মকলহ জাগিয়া উঠিবে এবং তাহাতে উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যাইবে। শের গিরি-সংকটে যখন মুহম্মদকে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হইয়াছিল, তখনকার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তাহাদের মনে পড়িল। কাজেই কারারোধের কথা অগ্রাহ্য হইয়া গেল। তখন গম্ভীরভাবে আবুযহল উঠিয়া প্রস্তাব করিল: আমি বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম মুহম্মদকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। তাহাকে হত্যা করিলেই ইসলামকে হত্যা করা হইবে; ইসলামের প্রাণশক্তির উৎস-মুখ তখন রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই পথ ছাড়া

কিছুতেই আমাদের কল্যাণ নাই।" সকলেই একবাক্যে এ-প্রস্তাব সমর্থন করিল; কিন্তু কে মুহম্মদকে হত্যা করিবে—তাহাই লইয়া পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইল। কোন বিশেষ গোত্রের কোন বিশেষ ব্যক্তি যদি এ-কার্য সাধন করিয়া আসে তবে চিরদিন হাশিম ও মুত্তালিব বংশের লোকেরা সেই ব্যক্তি বা গোত্রের উপর হিংসা ও বৈরীভাব পোষণ করিয়া চলিবে। কাজেই কেহ তাহাতে রাজী হইতে চাহিল না। তখন আবুযহল পুনরায় প্রস্তাব করিল: প্রত্যেক গোত্র হইতে এক-একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হউক এবং তাহারাই একযোগে মুহম্মদকে হত্যা করুক।

এই প্রস্তাব সকলেরই মনঃপূত হইল। প্রতিনিধি নির্বাচনও হইয়া গেল। স্থির হইল গভীর রাত্রে সকলে গিয়া মুহম্মদের গৃহ ঘেরাও করিয়া রাখিবে, প্রত্যূষে মুহম্মদ যেই বাহিরে আসিবে, অমনি সকলে একযোগে তাহাকে হত্যা করিবে।

রাত্রি আসিল। গৃহে গৃহে সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। আবুযহল প্রমুখ কোরেশ দুর্বৃত্তগণ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হযরতের গৃহ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

এদিকে হযরতের কিছুই জানিতে বাকী রহিল না। জিব্রাইলের মারফৎ কোরেশদিগের এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হইয়া তিনিও প্রস্তুত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তরুণ যুবক আলিকে ডাকিয়া যথারীতি উপদেশ দিলেন; অতঃপর সকলের অলক্ষ্যে খিড়কি দরজা দিয়া কখন যে বাহির হইয়া গেলেন, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। আলি নির্বিকারচিত্তে একখানি চাদর মুড়ি দিয়া হযরতের শয্যায় শুইয়া রহিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। মুহম্মদ তবুও গাত্রোত্থান করিতেছেন না কেন? কোরেশ দুর্বৃত্তগণ বিস্ময় মানিল। ক্রমেই তাহারা উদ্বগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে সকলে জোর করিয়া গৃহে ঢুকিয়া হযরতের শয্যার চতুর্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। প্রথমতঃ তাহারা বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থাতেই হযরতকে হত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছিল, কিন্তু আবুযহল দেখিল, ওরূপ কাপুরুষতার কোনই প্রয়োজন নাই। শিকার যখন একেবারে হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন একটু খেলাইয়া হত্যা করাই তো বেশী কৌতুকপ্রদ। ইহাই ভাবিয়া হযরতের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে আবুযহল কল্পিত মুহম্মদের অংগ হইতে চাদরখানি হেঁচকা

টান দিয়া সরাইয়া ফেলিল। সুভানাল্লাহ্! এ কি! মুহম্মদ কোথায়? এ যে আলি! সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল বেচারা আলির উপর। আবুযহলের ইচ্ছা হইল, আলিকে খুন্ করে। ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সে বলিল: "বল্ দুরাচার, মুহম্মদ কোথায়?"

বলদৃপ্ত কণ্ঠে আলি উত্তর দিলেন: "আমি তার কী জানি! তোমরা কী আমাকে তোমাদের চর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলে নাকি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? নিজেরাই খুঁজিয়া বাহির কর না।" বলিতে বলিতে তিনি নির্ভীক চিত্তে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

আলিকে পীড়ন করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া ঘাতক-দল মুহম্মদের সন্ধানে বাহির হইল। হযরত যে মদিনায় প্রস্থান করিবেন, এ কথা তো পূর্ব হইতেই তাহাদের জানা ছিল। সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা সন্ধান-কার্য আরম্ভ করিল।

এদিকে রসুলুল্লাহ্ বাটির বাহির হইয়া সর্বপ্রথম আবুবকরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব হইতেই মদিনা যাত্রা সম্বন্ধে তিনি আবুবকরের সহিত গোপন পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কী করিতে হইবে, না-হইবে সমস্তই সুস্থির করা ছিল। হযরত তাড়াতাড়ি আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। স্থির হইল, মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী সওর পর্বতের গুহায় গিয়া তাঁহারা আত্মগোপন করিবেন; তারপর সুযোগ ও সুবিধামত সেখান হইতে মদিনা রওনা হইবেন। যাইবার সময় আবুবকর আপন পুত্র আবদুল্লা এবং কন্যা আস্‌মা ও আয়েষাকে বলিয়া গেলেন, তাহারা যেন প্রতিদিন সন্ধ্যারাত্রে চুপে চুপে কিছু খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দেয়।

তারার আলোকে পথ দেখিয়া উভয়ে অগ্রসর হইলেন। প্রভাতকালে তাঁহারা সওর পর্বতে উপনীত হইলেন।

ওদিকে কোরেশগণ আলিকে ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ আবুবকরের গৃহদ্বারে আসিয়া ভীষণ বেগে করাঘাত করিতে লাগিল। তখন আস্‌মা ও আয়েষা গৃহে উপস্থিত ছিলেন। আস্‌মা যুবতী, আয়েষা কিশোরী। ব্যাপার বুঝিতে তাহাদের বিলম্ব হইল না। আস্‌মা আপন বস্ত্রাদি সুবিন্যস্ত করিয়া নির্ভীক চিত্তে দুয়ার খুলিয়া দিলেন। খুলিতেই দেখিতে পাইলেন দুর্বৃত্ত আবুযহল মূর্তিমান শয়তানের মত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ক্রোধ-

কুঞ্চিত নেত্রে সে জিজ্ঞাসা করিল: "বল্, তোর পিতা কোথায়?" আসমা উত্তর দিলেন: "জানি না।" এই কথা বলার সংগে সংগে নরদানব আসমার গণ্ডে ভীষণ এক চপেটাঘাত করিয়া চলিয়া গেল।

'মুহম্মদ পলায়ন করিয়াছে'—কোরেশদিগের এই ঘোষণা-বাণী বনাগ্নির মত চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা ইহাও ঘোষণা করিয়া দিল: মুহম্মদ বা আবুবকরকে জীবন্ত অথবা মৃত—যে-কোন অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিলে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই ঘোষণা-বাণী কোরেশদিগের মধ্যে এক নব উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। হযরতকে ধরিবার জন্য সর্বত্র বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল।

এদিকে আবুবকর ও নূরনবী সওর গিরিগুহায় প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, কোরেশগণ তাঁহাদের পানে ছুটিয়া আসিতেছে। আবুবকর একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন: "হযরত, এখন উপায়? শত্রুগণ সংখ্যায় অনেক, আমরা মাত্র দু'জন।" শুনিয়া হযরত শান্ত স্বরে বলিলেন: "ভুল করিতেছ, আবুবকর! আমরা দু'জন নই; আরও একজন আমাদের সংগে আছেন।" আবুবকর অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

সেই নিভৃত গুহার মধ্যে মাত্র দুইটি মানুষ। পলায়নের পথ নাই, মুক্তির আশা নাই, ঘাতকদল পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে—মৃত্যু একরূপ অবধারিত; কিন্তু সেখানেও হযরত সমুদ্রের মত গভীর—পর্বতের মত অটল—আকাশের মত নির্বিকার। প্রশান্ত চিত্তে তিনি এই ভয়ংকরের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত। তখনও তাঁহার বিশ্বাস, আল্লার করুণা নিশ্চয়ই নামিবে, নিশ্চয়ই তাঁহারা রক্ষা পাইবেন।

কার্যতঃ হইলও তাহাই। কোরেশগণ এদিক-ওদিক অনুসন্ধান করিবার পর যখন গুহার মুখে আসিয়া পড়িল, তখন দেখিল, গুহামুখে একটি মাকড়সা প্রকাণ্ড এক জাল বুনিয়া বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া সকলে আর গুহা মধ্যে প্রবেশ করিল না; ভাবিল এ গুহায় নিশ্চয়ই কোন লোক প্রবেশ করে নাই, করিলে মাকড়সার জাল এমন অক্ষত অবস্থায় থাকিতে পারিত না। এই ভাবিয়া তাহারা অন্যত্র চলিয়া গেল।

আল্লার কী কুদ্রৎ! সর্বাপেক্ষা নাজুক ও দুর্বল যে উপকরণ, তাহাই দিয়া তিনি এমন দুর্ধর্ষ শত্রুদিগের সমুদয় অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অশনিসম্পাত দ্বারা নয়, ভয় দেখাইয়া নয়, প্লাবন, ভূমিকম্প

বা অন্য কোন অলৌকিক কাণ্ডের দ্বারা নয়, সামান্য একখানি মাকড়সার জালের আড়াল দিয়া আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় রসুলকে পাষণ্ডদিগের কবল হইতে রক্ষা করিলেন।

এই গুহার মধ্যে সেদিন হযরত মানুষের জন্য সত্যই এক চরম ভরসা রাখিয়া গিয়াছেন। আল্লার করুণার উপর এমন ঐকান্তিক নির্ভরতার দৃষ্টান্ত আর কোথায় আমরা দেখিতে পাই? বিশ্বের মানুষ সেদিন বুঝিয়াছে: আল্লার করুণা হইতে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বিপদে ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে আল্লাহ্ যে মুহূর্তমধ্যে তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিতে পারেন, এই সত্যই সেদিন প্রতিপন্ন হইয়াছে। কুরআন তাই সত্যই ঘোষণা করিয়াছে:

"লাতাকনাতু মির রহমতুল্লাহ্"

(আল্লার করুণা হইতে নিরাশ হইও না)

পক্ষান্তরে ভক্তপ্রবর আবুবকরও কী উজ্জ্বল বেশেই না আমাদের সম্মুখে দেখা দিতেছেন! ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা ও গুরুভক্তির তিনি এক অনন্ত নিদর্শন। আবুবকর চিরদিনই হযরতকে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়াছেন এবং ধন-জন সুখসম্পদ সমস্তই হযরতের জন্য—ইসলামের জন্য—কুরবান করিয়া দিয়াছেন। যে শয্যায় রসুলুল্লার মৃত্যু একরূপ অবধারিত হইয়া ছিল, সেই শয্যায় স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দেহ পাতিয়া দিয়া আলি যেমন আত্মত্যাগের ও সৎ সাহসের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, হযরতের নিরাপত্তার জন্য অসহায় স্ত্রী-পুত্রকন্যাদিগকে শত্রুর মুখে ফেলিয়া আসিয়া আবুবকরও তেমনি ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গুহামধ্যে অবস্থানকালেও আর একটি ঘটনাতে তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইয়াছে। হযরত ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আবুবকর গুহামুখে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছেন। গুহার ভিতরে ছিল কয়েকটি সাপের গর্ত। হযরতের অনিষ্ট-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তিনি আপন শিরস্ত্রাণ ছিঁড়িয়া কয়েকটি গর্তের মুখ বন্ধ করিলেন। অবশিষ্ট একটি মুখের উপরে পা রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিবার পর পদনিম্নের গর্ত হইতে একটি সর্প তাঁহাকে দংশন করিল। আবুবকর ইহাতে না চীৎকার করিলেন, না গর্তমুখ হইতে আপন পদ সরাইয়া লইলেন। পাছে পরিশ্রান্ত রসুলের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে এই চিন্তাতেই তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল, তবুও

ভক্তপ্রবরের মুখে কথাটি নাই। এমন সময় সহসা হযরতের নিদ্রাভঙ্গ হইল; ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে আবুবকরের জীবন রক্ষা হইল।

এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নিতান্তই বিরল।

আবুবকরের সহিত হযরত তিন দিন যাবৎ এই গুহার মধ্যে কাটাইলেন। চতুর্থ দিবসে উভয়ে গুহা হইতে বাহির হইলেন। আবুবকরের পুত্র আবদুল্লাহ্ এবং ভৃত্য আমর আসিয়াও তাঁহাদের সংগে যোগ দিলেন। মদিনা যাত্রার জন্য প্রয়োজন হইবে ভাবিয়া আবুবকর পূর্ব হইতেই দুইটি দ্রুতগামী উটের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই দুইটি উটের একটিতে রসুলুল্লাহ্ চড়িলেন, অপরটিতে আবুবকর ও তাঁহার ভৃত্য আমর চড়িলেন। আবদুল্লাহ্ তাঁহার নিজের উটটি লইলেন। চারজন যাত্রীর এই ক্ষুদ্র কাফেলা তখন আল্লার নামে মদিনার পানে অগ্রসর হইল।

মদিনা যাত্রার এই আয়োজনকে যাঁহারা নীরবে সফল ও সম্ভব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখানে মনে পড়ে। হযরত আলি, হযরত আবুবকর, কুমারী আস্‌মা, আবদুল্লাহ্ আমর এবং তাহাদের উট—প্রত্যেকের ভূমিকাই গৌরবময়। আত্মত্যাগ, লক্ষ্য ও আদর্শের একমুখিতা, মনোবল, কর্মকৌশল এবং বিশ্বস্ততা—সবগুলি গুণের সমাবেশেই এতবড় একটা কঠিন কার্য সম্ভব হইয়াছিল। ঘুণাক্ষরে কোথাও যদি কাহারও কোন ত্রুটি ঘটিত, তবেই সব আয়োজন ব্যর্থ হইত। রসুলুল্লার মদিনা-যাত্রা হয়ত মোটেই সম্ভব হইত না। কী অদ্ভুত সুন্দর যোগাযোগ!

যাত্রা করিবার পূর্বে হযরত তাঁহার প্রিয় জন্মভূমির পানে একবার করুণ নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। নয়ন তাঁহার অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। গভীর মমতায় তিনি বলিতে লাগিলেন: "মক্কা! আমার প্রিয় জন্মভূমি মক্কা! আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকিতে দিল না। বাধ্য হইয়া তাই তোমাকে ছাড়িয়া চলিলাম। বিদায়!"

লোহিত-সাগরের উপকূল ধরিয়া সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে পথ দিয়া সব লোকে মদিনা যায়, সে-পথ তাঁহারা বর্জন করিলেন।

কিছুদূর যাইতে না যাইতেই এক বিপদ ঘনাইল। সুরাকা নামক এক অশ্বারোহী কোরেশবীর হযরতের সন্ধান পাইয়া সদলবলে তাঁহাদিগকে

আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কী আশ্চর্য! সুরাকা যেই নিকটবর্তী হইয়াছে, অমনি তাহার অশ্বের সম্মুখের পদদ্বয় ধূলিগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল। অশ্ব ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। সুরাকার কুসংস্কারাচ্ছান্ন মন ইহাতে দমিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তীর নিক্ষেপ করিয়া সে তাহার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিল। তীরে 'না' সূচক ইংগিতই প্রকাশ পাইল। ইহাতে তাহার মনের আতংক আরও গভীর হইল। আল্লার রসূলকে হত্যা করিতে গেলে হয়ত আরও বিপদ ঘটিবে, এই আশংকায় সে ভীত হইয়া পড়িল। তখন সে চীৎকার করিয়া উঠিল: "হে মক্কার যাত্রিগণ, একটু দাঁড়াও। আমি তোমাদের শত্রু নই।" হযরত তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সুরাকা বিনীতভাবে হযরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। হযরত হাসিমুখে তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং কয়েকটি সদুপদেশ দান করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। সুরাকা অনুতপ্ত হৃদয়ে ফিরিয়া গেল।

কাফেলা যখন মদিনার নিকটবর্তী হইল তখন আর একটি বিপদ আসিল। হযরতকে হত্যা করিতে পারিলে একশত উট পুরস্কার' মিলিবে এই প্রলোভনে আস্‌লাম গোত্রের বারিদা নামক এক দলপতি ৭০ জন রণদুর্মদ বেদুঈন বীর সংগে লইয়া হযরতের পথ আগুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। হযরতকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল।

হযরত তখন সুললিত কণ্ঠে গম্ভীরভাবে কুরআন পাঠ আরম্ভ করিলেন। বারিদা ও তাহার সংগীগণ হযরতের নিকটবর্তী হইতেই সেই অপূর্ব সুর-লহরী তাহাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না। চরণ যেন ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, হস্ত যেন শিথিল হইয়া গেল। হযরত একবার বারিদার মুখের দিকে তাকাইলেন। বারিদা সেই তীক্ষ্ম জ্যোতির্দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না। ভিতর হইতে তাহার অন্তর যেন দ্রবীভূত হইয়া গেল। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হযরতের নিকটে আসিয়া বিনীতভাবে সে বলিল: "হযরত, ক্ষমা করুন! না বুঝিয়া এই দুষ্কর্ম করিয়াছি।"

হযরত সন্তুষ্ট হইলেন। বারিদাকে তিনি ক্ষমা করিলেন এবং সকলকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। বারিদা অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল,

"হযরত, আমরাও আপনার সংগে যাইব। আমাদিকেও আপনার চরণে স্থান দিন। আমরাও কলেমা পড়িতেছি: 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রসুলুল্লাহ্'।"

তৎক্ষণাৎ ৭০ জন দস্যু মুসলমান হইয়া গেল। বারিদা মহা উৎসাহে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। আপন আপন শিরস্ত্রাণ ছিঁড়িয়া বর্শাফলকে জড়াইয়া তাহারা জয়পতাকা প্রস্তুত করিল। এক অপূর্ব মিছিল গড়িয়া উঠিল। ৭০টি আরবী অশ্ব বীরপদভরে দুলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল; ৭০ খানি নাংগা তলোয়ার রৌদ্র-কিরণে ঝলসিয়া উঠিল; ৭০ খানি বর্শা-ফলকে ইসলামের বিজয়-নিশান উড়িতে লাগিল; ৭০টি কম্প্রকণ্ঠে দিগঞ্চল মুখরিত করিয়া ধ্বনি উঠিল: আল্লাহু-আকবর।

কোন্ যাদুমন্ত্রে এমন হইল? একজন নয় দুইজন নয়—৭০ জন রক্ত-মাতাল নর-শার্দুল মুহূর্তমধ্যে কিরূপ বশ হইয়া গেল? হযরতকে হত্যা করিতে আসিয়া নিজেদের ঘৃণিত পশু-জীবনকেই হত্যা করিয়া বসিল?

এমনি মধুর বেশে হযরত চলিলেন মদিনা পানে। সকল নিগ্রহ, সকল অত্যাচারের মধ্য দিয়া শত্রুদলের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া হযরত ভাসিয়া উঠিলেন আজ এক অপূর্ব মহিমার বেশে। আকাশে-ভরা অন্ধকার ও ঝঞ্ঝামেঘের সহিত যুদ্ধ করিয়া সূর্য যেন বিজয়-গৌরবে হাসিয়া চাহিল আজ বিশ্বধরণীর পানে।

পরিচ্ছেদ : ৩৪

আল্-মদিনায়

রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ।* সোমবার। বেলা দ্বিপ্রহর। মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্ত দহনে মরুপ্রকৃতি খা-খা করিতেছে। এমন সময় মদিনা হইতে দুই মাইল দূরবর্তী কোবা গিরির শীর্ষে দাঁড়াইয়া একজন ইহুদী দেখিতে পাইল : একদল পথিক মদিনা পানে অগ্রসর হইতেছে। ব্যাপার বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। তৎক্ষণাৎ সে উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল : "মদিনাবাসী মুসলমানগণ, প্রস্তুত হও, তোমাদের চির-বাঞ্ছিত মহানবী আসিতেছেন।"

হযরত মক্কা হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, এ সংবাদ মদিনাবাসীরা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রসুলুল্লার শুভাগমন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মুসলমানেরা তাই প্রতিদিন প্রত্যুষে কোবা-প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইতেন এবং সূর্য-কিরণ অসহনীয় রূপে প্রখর না হওয়া পর্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিতেন, তারপর বাধ্য হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেন। সেদিন তাঁহারা এমনিভাবে হযরতের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া সবেমাত্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, এমন সময় ইহুদীর এই আহ্বান তাঁহাদের নিকট গিয়া পৌঁছিল।

সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র নগরবাসী মুসলমানেরা দলে দলে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে আজ অফুরন্ত পুলক ও কৌতূহল। দীর্ঘদিনের ধ্যানের ছবি আজ বাস্তব হইয়া দেখা দিবে, আল্লার রসুলকে আজ তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পাইবেন, এ কি সহজ আনন্দ! উল্লাস ও উদ্দীপনায় সকলের হৃদয় আজ একেবারে ভরপুর।

হযরত ধীরে ধীরে কোবা-পল্লীতে উপনীত হইলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন বেহেশ্‌তের একখানি স্বপ্ন মূর্তি ধরিয়া ধরার ধূলায় নামিয়া আসিতেছে।

কোবা একটি সুন্দর গিরি-উপত্যকা। ইহার চতুর্দিকে আঙ্গুর-বেদানা-কমলালেবুর বাগান, কোথাও বা পুষ্পল কুঞ্জবিতান। স্থানটি অত্যন্ত মনোরম

* খৃষ্টান পঞ্জিকা অনুসারে এ তারিখটি ছিল ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর।

মদিনাবাসীদিগের ইহা একটি স্বাস্থ্যনিবাস। ইহারই মধ্য দিয়া মক্কা-মদিনার রাজপথ।

হযরত ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ আসিয়া একটি বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিলেন। মুসলমানগণ দলে দলে আসিয়া হযরতকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। মদিনাবাসীরা অনেকেই হযরতকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাই আবুবকরকে রসুলুল্লাহ্ মনে করিয়া অনেকে তাঁহাকেই তস্‌লিম জানাইতেছিলেন। আবুবকর ইহা বুঝিতে পারিয়া কৌশলক্রমে সকলের এই ভুল ভাঙিয়া দিলেন। সূর্য সরিয়া যাওয়ায় বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া রৌদ্রকিরণ আসিয়া হযরতের মুখে পড়িতেছিল; আবুবকর সেই সুযোগে আপন বস্ত্রাঞ্চল দিয়া হযরতকে ছায়া করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন—কে প্রভু, কে সেবক।

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর হযরত কোবা-পল্লীর বনি-আম বংশের কুলসুমের গৃহে গিয়া আশ্রয় হইলেন।

ঠিক ইহার দুই-তিন দিন পরে মক্কা হইতে আলি আসিয়া হযরতের সহিত যোগ দিলেন। শত্রুদিগের দৃষ্টি এড়াইয়া অতি কষ্টে তিনি মদিনায় পৌঁছিয়াছিলেন।

আলিকে কি অবস্থায় রসুলুল্লাহ্ মক্কায় ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, পাঠকের তাহা স্মরণ আছে। কিন্তু আর একটি গূঢ় কারণও ছিল। মুহম্মদকে সকলে পয়গম্বর বলিয়া না মানুক, পরম বিশ্বাসী (আল-আমিন্) বলিয়া মানিত। বহুলোক বহু মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভার তাই তাঁহার নিকট আমানত রাখিত। সেইসব দ্রব্যাদি গচ্ছিতকারীদিগকে ফেরৎ দিবার জন্যই তিনি আলিকে রাখিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাপুরুষের কী অপূর্ব চরিত্র মাধুর্য!

হযরত কোবা-পল্লীতে ১২ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তথায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মুক্ত ইস্‌লামের ইহাই প্রথম মসজিদ। পবিত্র কুরআনে এই মসজিদের উল্লেখ রহিয়াছে। এই মসজিদ নির্মাণের সময় হযরত তাঁহার ভক্তবৃন্দের সংগে নিজহস্তে ইষ্টক ও মাল-মশলা বহন করিয়া শ্রমের মর্যাদা দেখাইয়াছিলেন—তাহা সত্যই অনুকরণীয়।

দ্বাদশ দিবসের শেষে হযরত মদিনা যাত্রা করিলেন।

সেদিন ছিল শুক্রবার। হযরতের মদিনা-যাত্রার সংবাদে সর্বত্র আবার একটা উন্মাদনার সাড়া পড়িয়া গেল। দলে দলে ভক্তবৃন্দ আসিয়া সমবেত হইলেন। মদিনা নগরে নূতন করিয়া অভ্যর্থনার আয়োজন চলিতে লাগিল।

আল-কাসোয়া নামক উটের পিঠে হযরত সওয়ার হইলেন। হযরতের পশ্চাতে বসিলেন আবুবকর। উট অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল, ভক্তবৃন্দ শ্রেণীবদ্ধভাবে মিছিল করিয়া চলিলেন। আবার গগনে গগনে বাঁশি বাজিয়া উঠিল, নিশান উড়িল, 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া হযরত বনি-সালেম মহল্লায় আসিয়া উপনীত হইলেন। এইখানে তিনি ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া জুমার নামায পড়িলেন। ইহাই ইসলামের প্রথম জুমার নামায।

নামায শেষ করিয়া হযরত পুনরায় যাত্রা করিলেন। যতই শহরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, ততই দর্শকবৃন্দের ভিড় জমিতে লাগিল। মদিনার আবালবৃদ্ধবনিতা আজ রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেরই বুকে আজ নব কৌতুহল, মুখে আজ আনন্দোচ্ছ্বাস, চোখে আজ বিহিশ্‌তী রঙিন স্বপ্ন।

ধীরে ধীরে হযরত নগর প্রবেশ করিলেন। অমনি শতকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল :

শান্তির রাজা এস!
আল্লার রসুল এস!
বিহিশ্‌তের নিয়ামৎ এস!
আমরা তোমায় বরণ করি!

গৃহের আঙিনায় পুরমহিলারা অপেক্ষা করিতেছিলেন। হযরতকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারাও আনন্দে এই কাসিদা গাহিয়া উঠিলেন :

"দেখ চেয়ে চাঁদ উঠেছে
গগন কিনারায়
তার, হাসির আভা ছড়িয়ে গেল
নিখিল দুনিয়ায়।"

বালক-বালিকারা দফ্ বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে হযরতকে ঘেরিয়া ধরিল এবং সুললিত কণ্ঠে "ইয়া মুহম্মদ, ইয়া রসূলুল্লাহ্।" বলিয়া গান

গাহিতে লাগিল। হযরতের সব চেয়ে ভালো লাগিল এই বালক-বালিকাদের নির্দোষ নৃত্য সংগীত। উটের পিঠ হইতে নূরনবী নামিয়া আসিলেন; সকলের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন: "তোমরা আমাকে ভালোবাসো?" একসংগে উত্তর আসিল: "আলবৎ। আলবৎ।" হযরত তখন সকলের চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া হাসিমুখে বলিলেন: "আমিও তোমাদিগকে ভালোবাসি।"

খুশিভরে বালক-বালিকারা জোরে জোরে দফ্ বাজাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সবার আগে বালক-বালিকাদের সংগে হযরতের এইরূপ আত্মীয়তা জন্মিল। শিশুরা এককণা প্রীতি ও একটুক্রা হাসি দিয়া বিশ্বনবীকে কিনিয়া লইল।

মদিনায় প্রবেশ করিয়া রসূলুল্লার মনে এক নূতন সমস্যার উদয় হইল। কোথায় কাহার গৃহে গিয়া তিনি উঠিবেন? নানা গোত্র, নানা দল। সকলেই হযরতকে আপন গৃহে স্থান দিতে লালায়িত। এরূপ ক্ষেত্রে একজনকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে আর দশজন অসন্তুষ্ট হয়। কাহার অনুরোধ তিনি রক্ষা করিবেন? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। স্থান নির্বাচনের ভার নিজের উপর না রাখিয়া তাঁহার উটের উপর ছাড়িয়া দিলেন। ঘোষণা করিলেন: উট যেখানে গিয়া স্বেচ্ছায় থামিয়া যাইবে, সেইখানেই তিনি অবস্থান করিবেন। সকলেই এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইলেন; কাহারও আর কিছু বলিবার রহিল না। উৎসুক নয়নে সকলেই উটের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন।

উটের নাকাল ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উট স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে শহরের দক্ষিণ ভাগে বানু-নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় আসিয়া একটি স্থানে সে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। নিকটেই ছিল আবু-আইউবের বাসগৃহ। হযরত তখন আবুবকরের সহিত উট হইতে নামিয়া আসিয়া সেই গৃহে পদার্পণ করিলেন। আবু-আইউব সসম্ভ্রমে সম্মানিত অতিথিদ্বয়কে সাদর সম্ভাষণ করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আবু-আইউবের গৃহ ছিল দ্বিতলবিশিষ্ট, তিনি সপরিবারে উপরের তলায় বাস করিতেন। হযরতের জন্য তিনি সেই উপর তলা ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু হযরত তাহাতে রাজী হইলেন না। অন্যান্য শিষ্যবৃন্দের সহিত

দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-অপ্যায়নের সুবিধার জন্য তিনি নীচের তলাই পছন্দ করিলেন।

উত্তেজনা ও কোলাহলের অবসান হইল। শান্ত নীরব আকাশের তলে সূর্য অস্ত গেল।

হযরতের মনে আজ নিশ্চয়ই ভাবান্তর উপস্থিত হইবার কথা। অতীত দিনের কত স্মৃতি, কত কথা আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সুদীর্ঘ তেরটি বৎসরের দুঃখের কাহিনী সে। সেই মক্কা, সেই কা'বা, সেই হেরা, সেই খাদিজা, সেই আবুতালিব, সেই শেব-গিরির বন্দীজীবন, সেই তায়েফ-নগরীর ভীষণ সংকট-মুহূর্ত—সমস্তই আজ তাঁহার মনের আঙিনায় ছায়া ফেলিল। এতদিন তিনি যেন ঈমানের একখানি স্বর্ণতরীতে কতিপয় যাত্রী লইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছিলেন। যুলমাৎ-রাতের অন্ধকারে উত্তাল তরংগের মধ্য দিয়া ছিল সেই আলোক-তরীর অভিযান। চারিপাশে হাংগর-কুমীরের সন্ত্রাস, ঝঞ্ঝাবায়ুর দাপটে মুহুর্মুহুঃ নৌকাডুবির আশংকা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ-কোণ হইতে ভীমরবে অশান-সম্পাত, তাহারই মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল এই তরী। দাঁড়ীরা টানিতেছিল দাঁড়, মুর্শিদ ধরিয়াছিলেন হাল। আজ সেই তরণী কূলে ভিড়িল। দুর্যোগ রাত্রির অবসান হইল। সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হযরত দেখা দিলেন বিজয়ী বীরের বেশে। আল্লার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া বারে বারে তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আজ হইতে মদিনা তাঁহার স্বদেশ হইল, মদিনাবাসীরা তাঁহার ভাই হইল। বিশ্বনবীর স্বদেশ কোথায়? তাঁহার স্বদেশ ভৌগোলিক নয়, তাঁহার স্বদেশ তমদ্দুনিক ও আদর্শভিত্তিক।

———

পরিচ্ছেদ : ৩৫

প্রেমের বন্ধন

হযরতের সর্বপ্রথম চিন্তা হইল : আল্-কাস্‌ওয়া যেখানে বসিয়া পড়িয়াছিল, সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা। তখনকার দিনে এই স্থানের কোনই গুরুত্ব ছিল না, নানা লতাগুল্মে ইহা ভর্তি ছিল। উট বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই স্থানটি ব্যবহৃত হইত। হযরত অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, দুইটি এতিম বালক এই স্থানটির মালিক। অনতিবিলম্বে তিনি বালক দুটিকে ডাকাইলেন এবং উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করিয়া ঐ জমি তাঁহাকে দান করিতে বলিলেন। বালকেরা কিছুতেই মূল্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না। তাহারা বিনামূল্যেই হযরতকে এই জমি দান করিতে চাহিল। কিন্তু পরিণামে এই নজির দেখাইয়া সুবিধাবাদীরা আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইতে পারে, এই আশংকায় হযরত কিছুতেই বালকদিগের প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তখন অগত্যা তাহাদিগকে মূল্য গ্রহণ করিতেই হইল। জমির মূল্য দশ স্বর্ণমুদ্রা নির্ধারিত হইল। হযরতের আদেশক্রমে আবুবকর ঐ মূল্য বালকদ্বয়কে দান করিলেন।

অতঃপর তথায় একটি মসজিদ নির্মাণের আয়োজন চলিতে লাগিল। মসজিদের পার্শ্বেই রসুলে-করিমের বাসভবনও নির্মিত হইবে, স্থির হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই কার্য আরম্ভ হইয়া গেল। গাছ কাটিয়া মাটি ফেলিয়া স্থানটিকে ভরাট করা হইল। ইঁট ও মাল-মশলারও যোগাড় হইয়া গেল। হযরত নিজেও এই নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত তিনিও প্রতিদিন মজদুরের কার্য করিতে লাগিলেন। বিশ্বমুসলিমের মিলনকেন্দ্র এইরূপে স্থাপিত হইল।

নিজের এবং শিষ্যবৃন্দের নির্বিঘ্নতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া রসুলুল্লাহ্ এইবার আপন পরিবারবর্গের কথা চিন্তা করিলেন। মক্কায় তাঁহার স্ত্রী এবং দুই কন্যাকে তিনি শত্রুদের মধ্যে ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। আবুবকরের পরিবারবর্গও ঠিক একই অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত তাঁহাদিগকে আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি আপন পালিত পুত্র জায়েদ এবং আবু রফী নামক আর একটি মুক্ত

ক্রীতদাসকে দুইটি উট ও পাঁচ শত দেরহেম সংগে দিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন।

হযরতের পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী বিবি সওদা এবং দুই কন্যা: ফাতিমা ও উম্মে-কুলসুম। ফাতিমা তখনও অবিবাহিতা। উম্মে-কুলসুমের বিবাহ হইয়াছিল আবু-লাহাবের বংশে। কিন্তু ধর্ম ও মতবৈষম্যের জন্য এ মিলন সুখের হয় নাই। এই কারণে উম্মে-কুলসুম স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পিতৃগৃহে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা জয়নব মক্কায় তাঁহার স্বামী আবুল আ'সের সংগেই বাস করিতেছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যা রোকেয়া পূর্বেই তাঁহার স্বামী ওসমানের সংগে মদিনায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

আবুবকরের পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী উম্মে রুমান এবং কন্যা আস্‌মা, আয়েষা ও অন্যান্য সকলে।

যথাসময়ে হযরত ও আবুবকরের পরিবারবর্গ মদিনায় আসিয়া পৌছিলেন; এবার আর কোরেশগণ বিশেষ কোন বাধা দান করে নাই।

হযরত আপন পরিবারবর্গের এবং শিষ্যদিগের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিলেন। কাহারও কোনই অসুবিধা রহিল না। আনসার ও মোহাজের-দিগের মধ্যে ক্রমেই প্রীতি, প্রেম ও মমতার বন্ধন সুদৃঢ় হইতে লাগিল।

মদিনাবাসীরা ছিলেন কৃষিজীবী, কিন্তু মক্কাবাসীরা ব্যবসাজীবী। কাজেই, মদিনায় আসিয়া মক্কীয়গণ দারুণ অসুবিধায় পড়িলেন। কিন্তু আনসারদিগের কী সহৃদয়তা! নবাগত অতিথিদিগের সুখ-সুবিধার জন্য তাঁহারা যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। পক্ষান্তরে মোহাজেরগণও অলস ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল, উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। তাঁহারা দেখিলেন, শুধু কৃষি দ্বারা কোন জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হইতে পারে না; বাণিজ্যই দেশের ধনাগমের প্রকৃষ্ট উপায়। এই জন্যই তাঁহারা জাতীয় জীবনের এই নূতন দিকটা গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইলেন। ফলে মদিনা নগরে কৃষির পাশাপাশি বাণিজ্যও প্রসারলাভ করিতে লাগিল।

এই সময় আনসারগণ মোহাজেরদিগের প্রতি যে আদর্শ ব্যবহার দেখাইয়াছিলেন, সত্যই তাহার তুলনা হয় না। জগতের ইতিহাসে মানুষ

বুঝিবা আর কোনদিন মানুষকে এমন করিয়া ভালোবাসে নেই। একেইত মক্কাবাসীদিগের প্রতি মদিনাবাসীদিগের স্বতঃউৎসারিত প্রেম বিশ্বমানবতার এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আবার হযরতের মধ্যবর্তিতায় এ আদর্শ আরও মহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন আনসার ও মোহাজেরদিগের মধ্যে এত যে প্রেম, এত যে মিলন, তবুও একটা জায়গায় এমন একটা শূন্যতা আছে, যাহা সহজে দূর হইবার নয়। আনসারগণের সেবাযত্নের মধ্যে থাকে একটা সুজনতা, পাছে কোন ত্রুটি না ঘটে এমনই একটা সদাসতর্ক ভাব। আবার মোহাজেরদিগের সেবা গ্রহণের মধ্যেও থাকে সংকোচ ও কুণ্ঠা। গৃহস্বামী এবং অতিথি—উভয়ের পক্ষেই অনেক সময় ইহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। হযরত এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান দূর করিতে চাহিলেন। তিনি একদিন আনসার ও মোহাজেরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"শোন মদিনাবাসী আনসারগণ। শোন মক্কাবাসী মোহাজেরগণ। ইসলামের আদর্শ: প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। কাজেই আমি চাই যে, তোমরা প্রত্যেকে জোড়ায় জোড়ায় ভাই বনিয়া যাও। প্রত্যেকে অপরের মধ্য হইতে একজন ভাই বাছিয়া লও।"

হযরতের আদেশ শ্রবণ মাত্র আনসার-মোহাজেরদিগের মধ্যে একটা নূতন উন্মাদনার সঞ্চার হইল। সকলে নিজের নিজের পছন্দমত 'ভাই' বাছিয়া লইতে লাগিল। হযরত নিজেও এই নির্বাচনে সহায়তা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও মানসিকতার প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। বাহিরে কেহই পড়িয়া থাকিল না। দুই-এ মিলিয়া এক হইয়া গেল। রক্তের সম্বন্ধকে অতিক্রম করিয়া এইরূপে ধর্ম ও মানবতার সম্বন্ধ স্থাপন হইল।

এই নূতন সম্বন্ধ কতদূর গড়াইতে পারে, পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারেন কি? শুনিলে বাস্তবিকই বিস্ময় লাগে, এই সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া আনসারগণ নিজেদের জমাজমি, ধনদৌলত ও ঘরবাড়ি—সমস্তই নূতন ভাইদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন। মোহাজেরগণ কৃষিকর্ম জানিতেন না বলিয়া আনসারগণ নিজেরাই তাহাদের অংশের জমাজমি চাষবাস করিয়া ফসল উৎপাদন করিয়া দিতে লাগিলেন। মোহাজেরগণও যাহা উপার্জন করিতে লাগিলেন, আনসারদিগকে তাহার ন্যায্য অংশ দিতে লাগিলেন।

কখনও কাহারও মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার 'ধর্ম-ভাই'ও রীতিমত হিস্‌সা পাইতে লাগিলেন।

শুধু কি তাই? আনসারগণ কেবল যে আপন ধনসম্পত্তিই ধর্মভাইদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন, তাহা নহে। যাঁহাদের দুইটি স্ত্রী ছিল তাঁহাদেরও কেহ কেহ একটিকে বর্জন করিয়া নূতন ভাইকে দিতে প্রস্তুত হইলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়: সা'দ ইবনে রাবীর কথা। আব্দুর রহমান নামক জনৈক মোহাজেরকে তিনি ভ্রাতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সা'দের ছিল দুই স্ত্রী। সা'দে আব্দুর রহমানকে এতই ভালবাসিতেন যে, একদিন তিনি বলিলেন: "প্রিয় ভ্রাতঃ, আমার দুই স্ত্রী; তুমি কোন্‌টিকে পছন্দ কর, বল? তাহাকেই আমি সানন্দচিত্তে তালাক দিয়া তোমার সাথে বিবাহ দিব।" যে কথা সেই কাজ। সা'দের একান্ত অনুরোধে আব্দুর রহমান তাঁহার স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন।

মহামানবতার ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের এমন অত্যুজ্জ্বল আদর্শ আর কোথায় আমরা দেখিতে পাই?

আনসার মোহাজের সমস্যা যে মক্কা-মদিনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। মানব-গোষ্ঠীর এ এক চিরন্তন সমস্যা। যুগে যুগে প্রত্যেক জাতিই এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়। রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে একদেশের অধিবাসী আর একদেশে স্বজাতীয় ভাইদের স্মরণ লইতে বাধ্য হয়। আনসার-মোহাজের সমস্যা তখনই জাগিয়া উঠে। আনসারদিগের উচিত—মোহাজেরদিগের দুর্দিনে তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা এবং নিজেদের মধ্যে তাহাদিগকে মিশাইয়া লওয়া। মোহাজেরদিগের উচিত—আনসারদিগের সুখ-দুঃখের সাথে নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া এবং মোহাজের রূপে অধিকদিন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করা। নূতন দেশের নাগরিক অধিকার লাভ করিবার পর উভয়ের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে নূতন দেশের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। পুনর্বাসন সমস্যাও জটিল হয় না।

পরিচ্ছেদ : ৩৬

ইসলামিক রাষ্ট্র-রচনা

মদিনার মসজিদ নির্মিত হইয়া গেল। মসজিদটির বিশেষ কিছুই আড়ম্বর ছিল না; আকারেও তখন ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল। ইহার পরিমাণ ছিল: দৈর্ঘ্য ১০০ হাত, প্রস্থ ১০০ হাত। মাটি হইতে তিনি হাত উঁচু করিয়া প্রস্তর দিয়া ইহার ভিত্তিমূল গঠিত হইয়াছিল; তারপর ইষ্টক দ্বারা ইহার দেওয়াল তোলা হইয়াছিল। চারি কোণে চারিটি মিনার ছিল, কিন্তু ছাদ ছিল না। খর্জুর বৃক্ষের খুঁটির উপরে তক্তা আঁটিয়া ইহার ছাদ নির্মিত হইয়াছিল; তখন ইহার কিবলা ছিল জেরুজালেমের দিকে।

এমনই নিরাভরণ ছিল এই মসজিদুন্নবী। কিন্তু হইলে কি হয়। মধ্যযুগে এই ক্ষুদ্র মসজিদটিই ছিল ইসলামের শক্তিনিকেতন (Power House)। কত রাজদূত এইখানে গৃহীত হইয়াছে, কত সন্ধিপত্র এইখানে স্বাক্ষরিত হইয়াছে, কত বিজয়-অভিযানের পরিকল্পনা এইখানে বসিয়া করা হইয়াছে। এখান হইতে যে পরিকল্পনা গৃহীত হইত, যে আদেশ-নিষেধ প্রচারিত হইত, তাহাতেই জগতের বড় বড় সম্রাটের সিংহাসন টলিয়া যাইত। এখানে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি একসংগে আলোচিত হইত। ইসলামে ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ যে পরস্পর পরস্পরের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে অন্তর্বিজড়িত, মদিনার মসজিদই ছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শিল্পের দিক দিয়াও এই মসজিদটি গুরুত্বপূর্ণ। সারাসিনিক স্থাপত্যকলার ইহাই ছিল আদিম আদর্শ। ইহার সুউন্নত মিনার তখনকার দিনে বাস্তবিকই এক নূতন শিল্পসৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইত। পরবর্তীকালে এই আদর্শে মুসলিম-জাহানের সর্বত্র মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। আগ্রার মতি মসজিদ ও তাজমহলে মূলতঃ এই আদর্শেরই অনুকৃতি রহিয়াছে।

মসজিদ নির্মিত হইলে হযরত তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত নির্বিঘ্নে জামাত করিয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! প্রতিদিন পাঁচবার আল্লার গুণগানে মদিনার আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল। এ দৃশ্য আরও মধুর হইয়া উঠিল সেইদিন—যেদিন আযান-প্রথা প্রবর্তিত হইল। মুসলমানদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে কিরূপ করিয়া

মসজিদে সমবেত করা যায়, হযরত তাহা চিন্তা করিতেছিলেন। খৃষ্টান-দিগের ঘণ্টাধ্বনি, ইহুদীদিগের শৃঙ্গ-নিনাদ, পারশিকদিগের অগ্নিপ্রজ্জলন —কোনটাই তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। অনেক চিন্তার পর তিনি বিধান দিলেন আযানের। তৌহিদের মূলমন্ত্র প্রচার, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীদিগকে আল্লার উপাসনায় যোগদান করিবার জন্ম উদাত্ত আহ্বান—ইহাই হইল আযানের প্রাণবাণী।

এ শুভ আহ্বানের ভার পড়িল ভক্তপ্রবর বেলালের উপর। বেলাল হযরতের নিকট হইতে আযান-পদ্ধতি শিখিয়া লইলেন, তার পর এক সুন্দর প্রভাতে মসজিদের মিনারে দাঁড়াইয়া উদাত্ত গম্ভীর স্বরে আযান ফুকারিলেন :

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর।
আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর॥
আশ্‌হাদ্‌ওয়াল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।
আশ্‌হাদ্‌ওয়াল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌॥
আশ্‌হাদ্‌ওয়ান্না মুহম্মদর রসুলুল্লাহ্‌।
আশ্‌হাদ্‌ওয়ান্না মুহম্মদর রসুলুল্লাহ্‌॥
হা-ইয়া আলাস্‌ সালাহ্‌।
হা-ইয়া আলাস্‌ সালাহ্‌॥
হা-ইয়া আলাল ফালাহ্‌।
হা ইয়া আলাল ফালাহ্‌॥
আস্‌সালাতু খায়রুম্‌ মিনান্নৌম্‌।
আস্‌সালাতু খায়রুম্‌ মিনান্নৌম্‌॥
আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর।
লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।

(আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ্‌ মহান! সাক্ষ্য দিতেছি : তিনি ছাড়া আর কেহ উপাস্য নাই। সাক্ষ্য দিতেছি : মুহম্মদ তাঁহার প্রেরিত রসুল। নামাযের জন্ম আইস; শুভকর্মে আইস! নিশ্চয়ই নিদ্রা হইতে নামায শ্রেয়ঃ। আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ্‌ মহান। তিনি ছাড়া আর কেহ উপাস্য নাই।)

লা-শরীক আল্লার উপাসনার জন্ম উপযুক্ত আহ্বানই বটে। তন্দ্রাচ্ছন্ন মদিনাবাসীর কর্ণকুহরে যখন এই অপূর্ব জাগরণের বাণী প্রবেশ করিল, তখন

তাঁহাদের মনঃপ্রাণ এক নবছন্দে ঝংকৃত হইয়া উঠিল। অন্ধকার হইতে আলোকের পথে—মৃত্যু হইতে জীবনের পথে সে কী প্রাণস্পর্শী আহ্বান! চুম্বক-শলাকার মত সেই অগ্নিবাণী মুহূর্তমধ্যে দিশি হইতে ভক্তবৃন্দকে একই লক্ষ্যে একই মিলনকেন্দ্রে আনিয়া সম্মিলিত করিয়া দিল।

সেইদিন বেলালের কণ্ঠে পবিত্র আযানের যে অপূর্ব ধ্বনি তরঙ্গ আকাশ-পথে উত্থিত হইয়াছিল আজও তাহার কম্পন থামিয়া যায় নাই। বিশ্বের মিনারে মিনারে সেই আযানের প্রতিধ্বনি আজও আমরা শুনিতে পাই।

ইহার কিছুদিন পরে মুসলিম উপাসনায় আর একটি নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। এতদিন জেরুজালেমের দিকেই কিবলা করিয়া নামায পড়া হইত, কিন্তু সহসা একদিন আল্লাহ্ তা'লা হযরতের নিকট এই আয়াত নাযিল করিলেন:

> "নিশ্চয় আমি তোমাকে ঊর্ধ্ব দিকে মুখ তুলিয়া প্রার্থনা করিতে দেখিয়াছি। সেজন্য আমি তোমাকে এমন একটি কিবলার দিকে মুখ ফিরাইব—যাহাতে তুমি খুশি হইবে। অতএব তোমার মুখ পবিত্র মক্কার মসজিদের দিকে ফিরাও। যে কেহই হও না কেন, যখন প্রার্থনা করিবে, একই দিকে মুখ ফিরাইবে।"
>
> —(২ : ১৩৯)

সেই হইতে কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিশ্বের সকল মুসলমান নামায পড়িয়া আসিতেছেন। মুসলিমের ধ্যানে ধারণায়, কর্মে চিন্তায়, ঐক্য সাধনার এ এক অব্যর্থ প্রক্রিয়া। একই উদ্দেশ্যে একই দিকে মুখ করিয়া একই সময় একই পদ্ধতিতে বিশ্বের সমগ্র মুসলমান এক-আল্লার এবাদত করে। এই-কে কেন্দ্র করিয়াই মুসলমানের সকল চিন্তা, সকল অনুভূতি পরিক্রমণ করে। হৃদয়ে-বাহিরে একেরই স্বর নিশিদিন ধ্বনিত হয়। সকলে মিলিয়া তাহারা এক—অখণ্ডরূপে এক। মুসলমানের স্বদেশ ও সমাজ তাই কোন ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নিখিল বিশ্বই তাহার স্বদেশ—নিখিল মুসলমানই তাহার ভাই। এইজন্যই তো প্রাণ খুলিয়া সে গাহিতে পারে:

> "চীন ও আরব হামারা
> হিন্দুস্তাঁ হামারা।
> মুসলিম হাঁয় হাম ওতান হ্যয়
> সারা জাহাঁ হামারা।"

এই সময়কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা: হযরতের ইসলামিক রাষ্ট্র-রচনা। হযরত দেখিলেন, মদিনায় প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর লোক বাস করে: (১) মদিনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়, (২) বিদেশী ইহুদী সম্প্রদায়, (৩) নবদীক্ষিত মসলিম সম্প্রদায়। ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও আদর্শের মিল তো ছিলই না, তাহার উপর আবার ছিল দলগত হিংসা-বিদ্বেষ। হযরত যখন মদিনায় শুভাগমন করেন তখন ইহুদীরা ভাবিয়াছিল তাহাদের 'মসিহ্' আসিতেছেন। শিক্ষাদীক্ষা ও ধনবলে তাহারাই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। কাজেই তাহাদের বিশ্বাস ছিল, হযরতকে তাহাদের দলে ভিড়াইয়া লইতে পারিবে। কিন্তু ইসলামের ধ্যান-ধারণা ও রসূলুল্লার আত্মরূপের সহিত যতই তাহারা পরিচিত হইতে লাগিল, ততই বুঝিতে পারিল—তাহাদের আশা সফল হইবার নয়। কাজেই হযরতের উপর হইতে তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমেই চলিয়া যাইতে লাগিল। পৌত্তলিক মদিনাবাসীরাও প্রথমে কোনই উচ্চবাচ্য করে নাই, কারণ তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হইতে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইসলামকে এখন একটা স্বতন্ত্র শক্তিরূপে দেখিতে পাইয়া মনে মনে তাহারাও হযরতের উপর ঈর্ষা পোষণ করিতে লাগিল।

দেশবাসীর মনোভাব বুঝিতে হযরতের কষ্ট হইল না। তিনি দেখিলেন, ধর্মমত যাহার যাহাই থাকুক না কেন, তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য না থাকিলে মদিনার কল্যাণ নাই। প্রত্যেক দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ও মংগল নির্ভর করে তাহার অধিবাসীবৃন্দের সংহিত ও একাত্মবোধের উপর। যে দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বাস, সে দেশে পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। "নিজে বাঁচ এবং অপরকেও বাঁচিতে দাও"—ইহাই হইল নাগরিক জীবনের সর্বপ্রথম নীতি। মক্কায় অবস্থানকালে হযরত কোরেশদিগের নিকট হইতে এই মৌলিক অধিকারটুকু চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই। মদিনায় আসিয়া সেইজন্য তিনি ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিলেন। পৌত্তলিক এবং ইহুদীদিগের সহিত বন্ধুভাবে বাস করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত লালায়িত হইয়া উঠিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সকল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দকে ডাকিয়া একটি বৈঠক করিলেন এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়। একটি সনদ বা আন্তর্জাতিক

সন্ধিপত্রও (International Magna Charta) তিনি প্রস্তুত করিলেন। সেই সন্ধিপত্রে পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইল। সকলেই সেই সন্ধিপত্র মানিয়া লইয়া স্বাক্ষর করিলেন। নিম্নে আমরা সেই সনদপত্রের প্রধান সর্তগুলির উল্লেখ করিতেছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন, ষষ্ঠ শতাব্দীর সেই সনদপত্রে ইসলামের মহাপয়গম্বর কী অপূর্ব ন্যায়নিষ্ঠা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবনের কী মহান অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

সনদ

"বিসমিল্লাহির্-রহ্‌মানির-রহিম—

রসুল মুহম্মদ বিশ্বাসীদিগকে এবং যাহারাই তাঁহার সহিত যোগ দিবে সকলকে এই সনদ দিতেছেন :

মদিনার ইহুদী, পৌত্তলিক এবং মুসলিম সকলেই এক দেশবাসী ইহুদী, পৌত্তলিক এবং মুসলমান—সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করিবে, কেহই কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কেহই হযরত মুহম্মদের বিনানুমতিতে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবে না। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে আল্লাহ্‌ ও রসুলের মীমাংসার উপর সকলকে নির্ভর করিতে হইবে। বাহিরের কোন শত্রুর সহিত কোন সম্প্রদায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না। মদিনা নগরীকে পবিত্র মনে করিবে এবং যাহাতে ইহা কোনরূপ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। যদি কোন শত্রু কখনও মদিনা আক্রমণ করে, তবে তিন সম্প্রদায় সমবেতভাবে তাহাকে বাধা দিবে। যুদ্ধকালে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করিবে। নিজেদের মধ্যে কেহ বিদ্রোহী হইলে অথবা শত্রুর সহিত কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে তাহার সমুচিত শাস্তি-বিধান করা হইবে—সে যদি আপন পুত্র হয়, তবুও তাহার ক্ষমা করা হইবে না। এই সনদ যে বা যাহারা ভংগ করিবে, তাহাদের উপর আল্লার অভিসম্পাত।"

ইহাই হইল সনদের সারমর্ম।

এই ঘটনার পর হইতে ইসলাম এক নূতন বেশে দেখা দিল। এতদিন সে ছিল কতিপয় বিধি-নিষেধ ও নীতিবাক্যের সমষ্টি মাত্র, রাষ্ট্র রচনায়,

সমাজ-ব্যবস্থায়, আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে বা ব্যবহারিক জীবনে সে কী বেশে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহা বুঝা যায় নাই। মদিনায় আসিয়া রসুলুল্লাহ্‌ ইসলামের পরিকল্পনাগুলিকে এই প্রথম বাস্তব রূপ দিলেন। রাষ্ট্র ও সমাজের এক নূতন আদর্শ তিনি জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। রাষ্ট্র ও সমাজ-বিজ্ঞানের এইখানেই সূত্রপাত হইল।

এই ঘটনার চৌদ্দশত বৎসর পরে আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি সেদিন মদিনায় মহামানবতার যে বীজ প্রোথিত হইয়াছিল, আজ তাহা মহীরুহে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আজকার পৃথিবীর মানুষ একই কথা চিন্তা করিতেছে। লীগ অফ নেশন্‌স্ (League of Nations), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U. N. O.), আটলাণ্টিক সনদ (Atlantic Charter), মানবীয় অধিকারের ঘোষণা (Declaration of Human Rights)—এ সমস্তই বিশ্বনবীর চিন্তা, ধ্যান ও স্বপ্নের অমৃতময় ফল। আজ যদি এক পৃথিবী (One World) রচিত হয়, বা বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠিত হয়, তবে রসুলুল্লার নির্দেশিত নীতিতেই তাহা সম্ভব হইবে।

———

পরিচ্ছেদ : ৩৭

মদিনার আকাশে কালোমেঘ

কিন্তু মহানবী মদিনায় আসিয়াই বা শান্তিতে থাকিতে পারিলেন কৈ? নূতন করিয়া আবার আগুন জ্বলিল।

মদিনায় আসিয়া ইসলাম নবরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, মক্কার কোরেশগণ তাহা লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। হযরত তথায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছেন, ইহাও তাহারা জানিতে পারিয়াছে। এই শিশুরাষ্ট্র যদি ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়, তবে মক্কাবাসীদের সমূহ অকল্যাণ ঘটিবে—এ দূরদৃষ্টিও তাহাদের ছিল। কাজেই তাহারা আবার নব উদ্যমে হযরত ও তাঁহার শক্তিকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ইহার জন্য সুযোগ মিলিতেও বিলম্ব ঘটিল না। হযরতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিবার উপকরণ তাহারা মদিনা নগরেই লাভ করিল প্রচুর। এই সময়ে আব্দুল্লাহ্ বিন্-উবাই নামক খাজরাজবংশীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী পৌত্তলিক মদিনায় বাস করিতেছিলেন। মদিনাবাসীদিগের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল খুবই। রসুলুল্লার মদিনায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মদিনাবাসীরা আব্দুল্লাকেই তাহাদের রাজা করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছিল। কিন্তু হযরতের শুভাগমনে সমস্তই ওলট-পালট হইয়া গেল—মদিনাবাসীদের সে মনোভাব আর রহিল না। হযরতের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আব্দুল্লার স্বপ্নসাধ কোথায় মিলাইয়া গেল। এজন্য স্বভাবতঃই তাঁহার ক্রোধ গিয়া পড়িল নিরপরাধ হযরতের উপর। হযরতকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মনে করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, কোরেশগণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিল। তাহারা গোপনে গোপনে পত্র লিখিয়া আব্দুল্লাকে হযরতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল।

এদিকে ইহুদীরাও সন্ধিশর্ত মানিল না। সর্বপ্রকার ধর্মস্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার দান করা সত্ত্বেও তাহাদের চিরবিশ্বাসঘাতক মন হযরতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ফিরিতে লাগিল। কোনও পয়গম্বরকেই যখন তাহারা ছাড়ে নাই, মুহম্মদকেই বা কেন ছাড়িবে? তাহারা তলে তলে কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল।

কোরেশগণ এবার ভাল করিয়াই বুঝিল, এবার যদি হযরতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়, তবে রীতিমত প্রস্তুত হইয়াই দাঁড়াইতে হইবে। ছোট-খাটো আঘাতে এবার কোনই ফল হইবে না, এবারও চাই রীতিমত যুদ্ধ—চাই মদিনা আক্রমণ: কোরেশ নেতৃবৃন্দ এই সংকল্প লইয়াই এবার অগ্রসর হইল।

মদিনা আক্রমণের সংবাদে মুসলমানগণের মনে একটু আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। একেই তো মদিনার পৌত্তলিক ও ইহুদীদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, তাহার উপর আবার কোরেশদিগের অভিযান,—দুশ্চিন্তার কথাই বটে! কিন্তু হযরত পূর্বের মতই আপন বিশ্বাসে অটল। আসুক বিপদ, আসুক ঝঞ্ঝা,—আল্লাহর নামে—ইসলামের নামে জীবনপাত করিতে তিনি একটুও কুণ্ঠিত নন।

হযরত এবার নূতন মূর্তিতে দেখা দিলেন। এতদিন তিনি বিধর্মীদিগের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন—নিষ্ক্রিয়ভাবে তাহাদিগকে বাধা দিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এবার তিনি এই নীতি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি দেখিলেন: নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ একটা সাময়িক প্রক্রিয়া মাত্র, উহা দ্বারা স্থায়ী কোন সুফল ফলে না; জীবন সংগ্রামে উহা পশ্চাদপসরণ বা আত্মগোপনেরই নামান্তর মাত্র। বলিষ্ঠ জাগ্রত জীবনের উহা লক্ষণ নহে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অত্যাচারী জালিমকে সক্রিয়ভাবে বাধা দেওয়াও মানব-জীবনের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। ইহাই ভাবিয়া তিনি এবার সক্রিয়ভাবে শত্রুর সম্মুখীন হইতে মনস্থ করিলেন।

কিন্তু নরহত্যা করিতে বিশ্বনবীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। একটা দ্বিধা আসিয়া তাঁহার মনের চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কী করিবেন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময় কুরআনের এই কয়েকটি আয়াত নাযিল হইয়া হযরতের মনের সকল সংশয় দূর করিয়া দিল:

> "আল্লার পথে তাহাদের সংগে যুদ্ধ কর—যাহারা তোমার সংগে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করিও না, কারণ আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে ভালোবাসেন না। যুদ্ধকামী শত্রুদিগকে যেখানে পাও হত্যা কর এবং যেখান হইতে তোমাকে তাহারা বিতাড়িত করিয়াছে, তুমিও সেখান হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত কর। পৌত্তলিকতা হত্যা অপেক্ষাও ভয়াবহ। পবিত্র কা'বা-গৃহের মধ্যে যুদ্ধ করিও না—যতক্ষণ না তাহারা

(শত্রুরা) যুদ্ধ করে। কিন্তু যদি তাহারা যুদ্ধ করে, তবে তাহাদিগকে সেখানেও হত্যা কর, কারণ কাফিরদিগের কৃতকর্মের ইহাই পুরস্কার। কিন্তু যদি তাহারা ক্ষান্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, এবং তাহাদের সংগে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তাহাদের অত্যাচার নিবারিত হয়, কেন না ধর্ম কেবল মাত্র আল্লার জন্য। কিন্তু যদি তাহারা ক্ষান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত আর কোন শত্রুতা করিও না—অবশ্য অত্যাচারীদিগের কথা স্বতন্ত্র।" —(২ : ১৯০-৯৩)

"যদিও তোমার নিকট ইহা অপ্রীতিকর (কঠোর) বিবেচিত হইবে, তবুও যুদ্ধ তোমার জন্য জায়েজ (সিদ্ধ) করা হইল। হয়ত তোমার জন্য যাহা মংগল, তাহাই তুমি পছন্দ করিতেছ না, আবার যাহা তোমার পক্ষে অমংগল, তাহাই তুমি ভালোবাসিতেছ। কিন্তু আল্লাহ্ (সমস্তই) জানেন—তুমি জান না।" —(২ : ২১৬)

হযরত এইবার ইসলামের শক্তিমন্ত্র খুঁজিয়া পাইলেন। এতদিন বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, অহিংসা, প্রেম, ক্ষমা, আত্মত্যাগ ইত্যাদিই ছিল মানুষের পরম ধর্ম, সংঘর্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিকে লোকে অধর্ম বলিয়াই এড়াইয়া চলিত। এমন কি এই সমস্ত কুপ্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া জিতেন্দ্রিয় হওয়াই ছিল তখনকার দিনে মানব-ধর্ম। কিন্তু ইসলাম আসিয়া প্রচার করিল জীবনের এক নূতন দর্শন। সে বলিল: সুপ্রবৃত্তি বা কুপ্রবৃত্তি বলিয়া কোন কথা নাই, সব প্রবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে। প্রেম-ক্ষমারও যেমন প্রয়োজন, যুদ্ধ-বিগ্রহেরও ঠিক তেমনি প্রয়োজন। কোন প্রবৃত্তিকেই আল্লাহ্ সমর্থন বা অসমর্থন করেন নাই। ব্যবহারের তারতম্যেই প্রতিটি জিনিস সু বা কু হইয়া দাঁড়ায়। হিংসা-বিরোধ, যুদ্ধ, নরহত্যা ইত্যাদি কায তাই সব অবস্থাতেই পাপ নহে, ব্যবহার করিতে জানিলে পাত্রবিশেষে উহারাই হয় অশেষ কল্যাণের কারণ। প্রবৃত্তিনিচয়ের শুদ্ধিকরণ (Sublimation) তাই একান্ত প্রয়োজন। জিহাদ এই ধরণেরই একটি শুদ্ধিকৃত সংগ্রাম। ইহাকে ধর্মযুদ্ধ বলা যায়। আল্লার জন্য (ফি সবিলিল্লাহ্) যে যুদ্ধ—তাহাই জিহাদ। সত্য সুন্দর ও মংগলের জন্য, ধর্ম ও আদর্শের জন্য, আর্ত পীড়িত ও ব্যথিতকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টার নামই হইল জিহাদ। এহেন যুদ্ধ-বিগ্রহ দোষের নয়। বরং এইখানেই হইতেছে মনুষ্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। জিহাদ তাই ইস্লামের সর্বাপেক্ষা

পুণ্য কার্য। বস্তুতঃ জিহাদ ইসলামের অপরিহার্য অংগ। তাহাকে না বুঝিলে ইসলামকে বুঝা যায় না।*

এই নূতন শক্তিমন্ত্র হযরত সেদিন মুসলমানদিগের কর্ণে দিলেন।

যুদ্ধের কৃষ্ণমেঘ মদিনার আকাশে ক্রমেই ঘনায়মান হইয়া উঠিতে লাগিল। মক্কা হইতে কোরেশগণ অতর্কিতে মদিনার উপকণ্ঠে আসিয়া কয়েকবার লুট-তরাজ করিয়া গেল।

এই সময় এমন একটি কাণ্ড ঘটিল—যাহাতে যুদ্ধের আবহাওয়া আরও ঘোরতর হইয়া উঠিল। কোরেশদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া হযরত আব্দুল্লাহ্-ইবনে-জাহশ নামক জনৈক প্রবাসী মুসলমানের নেতৃত্বাধীনে একটি গোয়েন্দাদল গঠন করিয়া মক্কার উপকণ্ঠে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদিগকে এই উপদেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা সেখানে থাকিয়া কোরেশদিগের গতিবিধি ও সমরায়োজন সম্বন্ধে গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিবে। এই দলের লোকসংখ্যা ছিল আট জন। সন্ধানী দল মক্কার নিকটবর্তী নাখলা নামক স্থানে উপনীত হইলে তাহাদের সংগে একটি ক্ষুদ্র কোরেশ বণিকদলের মোকাবেলা হইয়া গেল। তাহারা সংখ্যায় ছিল মাত্র সাত জন। বণিকদল অপ্রত্যাশিত ভাবে মদিনাবাসী মুসলমানদিগকে মক্কার এত নিকটবর্তী দেখিতে পাইয়া বিচলিত হইয়া পড়িল। সন্ধানীদলও হঠাৎ শত্রুর সম্মুখীন হওয়ায় আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। উভয় দলে তখন সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া গেল। ফলে একজন কোরেশ বণিক নিহত ও দুইজন বন্দী হইল; অবশিষ্ট চারিজন তাহাদের বাণিজ্য-সম্ভার ফেলিয়া প্রাণভয়ে পালাইয়া গেল।

আব্দুল্লাহ্ ও তাঁহার সংগীগণ সেই সব পরিত্যক্ত মালপত্র ও বন্দীদ্বয়কে সংগে লইয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। ভাবিয়াছিলেন, হযরত তাঁহাদের এই কৃতিত্বে খুব খুশিই হইবেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া হযরত তাঁহাদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। এত কাণ্ডের জন্য নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পাঠান হয় নাই। অনতিবিলম্বে হযরত বন্দীদ্বয়কে মুক্তি দিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বন্দীদ্বয়ের একজন মক্কায় ফিরিয়া

* জিহাদকে না বুঝিলে সত্যই ইসলামকে বুঝা যাইবে না। জিহাদ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানা তাই পাঠকের একান্ত প্রয়োজন। জিহাদের অর্থ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আরও নানাদিক সম্বন্ধে জানিতে হইলে মৎপ্রণীত 'ইসলাম ও জিহাদ' পুস্তকখানি পাঠ করুন।

গেল, অন্য জন হযরতের চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম কবুল করিয়া মদিনাতেই রহিয়া গেল।

এই ব্যাপারে কোরেশদিগের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা আরও বাড়িয়া গেল। পূর্ণোদ্যমে তাহারা যোদ্ধা হাতিয়ার, রসদপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দিক হইতে চাঁদা আসিতে লাগিল। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং এক হাজার উট লইয়া আবুসুফিয়ান সিরিয়া যাত্রা করিল।

যথাসময়ে হযরতের কর্ণে এ সংবাদ পৌছিল। ইচ্ছা করিলে তিনি আবু-সুফিয়ানের প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্য হইতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ কাড়িয়া লইতে পারিতেন; যুদ্ধের নীতি অনুসারে ইহা অন্যায়ও হইত না; কিন্তু হযরত তাহা পছন্দ করিলেন না। সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হইয়া বীরের মতন যুদ্ধ করিতেই তিনি মনস্থ করিলেন।

আবুসুফিয়ান সিরিয়া হইতে যুদ্ধের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নির্বিঘ্নে মক্কায় ফিরিয়া গেল। মক্কার তোরণে তোরণে ভেরী বাজিতে লাগিল; প্রত্যেক কোরেশ নরনারী যুদ্ধমনাঃ হইয়া উঠিল।

অনতিবিলম্বে আবুযহলের নেতৃত্বে নয় শত সুসজ্জিত পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী মদিনাপানে অগ্রসর হইল। মুহম্মদ এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে এবার ধ্বংস না করিয়া তাহারা ফিরিবে না, ইহাই হইল তাহাদের জীবন-মরণ পণ।

পরিচ্ছেদ : ৩৮

বদর-যুদ্ধ

যুদ্ধ আসন্ন দেখিয়া হযরত মদিনাবাসীগিকে অস্ত্রধারণ করিতে আহ্বান করিলেন। ইতঃপূর্বে যে-সনদপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহার একটি শর্ত এই ছিল যে, যদি কখনও বহিঃশত্রু দ্বারা মদিনা আক্রান্ত হয়, তবে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলে মিলিয়া দেশরক্ষা করিবে। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল, পৌত্তলিক ও ইহুদীরা সরিয়া দাঁড়াইল—হযরতের আহ্বানে সাড়া দিল না। নূরনবীর অখণ্ড মদিনার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। একটা নূতন সত্য তিনি উপলব্ধি করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, দেশের মুক্তি-সাধনায় অন্য কেহ যদি যোগ না-ই দেয়, তবে এ গুরুভার মুসলমান-দিগকেই বহন করিতে হইবে। মুসলমানেরা আন্তর্জাতীয়তার প্রয়াসী, কাজেই তাহাদেরই উচিত সর্বাগ্রে দেশের রাজনৈতিক সংহাত ঘোষণা করা এবং দেশের সকল সম্প্রদায়কে তাহাদের সহিত যোগ দিতে আহ্বান করা। যদি কেহ এ আহ্বানে সাড়া না দেয়, তখন সেই মুক্তিসংগ্রামে নিজেদেরই অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই ভাবিয়া তিনি আপন ভক্তবৃন্দকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করিলেন। সকলেই একমত হইলেন। আবুবকর ও আলি বলিলেন: কালবিলম্ব না করিয়া মদিনার বাহিরে গিয়া কোরেশ-দিগকে বাধা দান করাই যুক্তিসংগত। হযরত আনসারদিগের মনোভাবও জানিতে চাহিলেন। আনসারনেতা-সা'দ বিন্-মা'জ তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন: "হে রসুলুল্লাহ্, আনসারদিগের সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন না। জীবনে-মরণে সুখে-দুঃখে তাহারা আপনাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিবে। আমাদিগকে যেদিকে যাইতে বলিবেন, সেই দিকেই যাইব; যেখানে থামিতে বলিবেন সেইখানেই থামিব।"

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলমানদিগের মধ্যে দুইটি দল দেখা গেল: একদল মদিনার বাহিরে গিয়া শত্রুদিগকে বাধা দিবার পক্ষপাতী, অপরদল মদিনাতে থাকিয়াই যুদ্ধ করিতে অভিলাষী। প্রথম দল বলিল: শত্রুকে বিনা বাধায় নগর-সীমান্তে আসিতে দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। দ্বিতীয় দল বলিল: নগরের মধ্যেই যখন পৌত্তলিক ও ইহুদীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, তখন

সমস্ত মুসলমানের একযোগে নগর ছাড়িয়া যাওয়া যুক্তিসংগত নয়। হযরত দেখিলেন, কাহারও কথাই যুক্তিহীন নহে। তাছাড়া তিনি মানুষের মনের খবর জানিতেন। মুসলমানদিগের মধ্যে কতকগুলি মুনাফিকও ছিল; দুরভিসন্ধি লইয়াই তাহারা মুসলমান হইয়াছিল। ইহুদী ও পৌত্তলিকদের সহিত তাহাদের গোপন সংযোগ ছিল। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দূরদর্শী হযরত ভক্তবৃন্দকে দুই দলে বিভক্ত করিলেন। যাঁহারা মদিনায় থাকিতে চাহিলেন, তাঁহাদিকে মদিনাতেই রাখিয়া দিলেন। আর যাঁহারা অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হইলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি একটি সেনাবাহিনী গঠন করিলেন। কেবলমাত্র সেই সব জিন্দাদিল্ সাচ্চা বীরবৃন্দকেই তিনি গ্রহণ করিলেন—যাঁহারা আল্লার নামে—ইসলামের নামে শহীদ হইতে সর্বদা প্রস্তুত। এরূপ মুসলমানের সংখ্যা মিলিল মাত্র ৩১৩ জন। তাঁহাদেরও আবার অস্ত্রশস্ত্র নিতান্ত মামুলী ধরণের। অশ্বারোহী সৈন্য হইল মাত্র একজন।

হযরত ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিলেন: বিজয়লাভের প্রধান উপকরণ সংখ্যাবল নহে—মনোবল।

এই ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়াই হযরত আজ বাহির হইলেন সেনাপতির বেশে। তিনশত তেরজন বীরের তিনশত তেরখানি নাঙা তলোয়ার রৌদ্রকিরণে ঝলমল করিয়া উঠিল। 'আল্লাহু-আকবর' ধ্বনিতে মরু-গগন প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

ইসলাম আজ সর্বপ্রথম দৃপ্ত তেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। তাহার প্রচ্ছন্ন রণমূর্তি আজ প্রথম জগতে আত্মপ্রকাশ করিল। তুমি অন্যায় করিয়া আমার গালে চড় মারিবে, আর আমি তোমার পায়ে লুটাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিব, অথবা অন্য গালটি ফিরাইয়া দিব—ইসলাম তাহা নহে। দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট ঝামেলা হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইব—ইসলাম তাহাও নহে। ইসলাম জীবনের ধর্ম। আত্মবিলুপ্তি বা পশ্চাদপসরণ তাহার বাণী নহে। সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হও—ইহাই তাহার বাণী। জালিমকে বাধা দাও, মযলুমকে রক্ষা কর, সত্য ও আদর্শের জন্য তরবারি ধর, প্রয়োজন হইলে মার, প্রয়োজন হইলে মর—ইহাই ইসলাম। ইসলামের তরবারি নিরপরাধকে আঘাত করিবার জন্য নহে—আত্মরক্ষার জন্য, ন্যায়-নীতি ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য—অন্যায়ের যথাযোগ্য প্রতিকারের

জন্য। ভীরু হৃদয়ের মিনতি অথবা কাপুরুষতা ইসলামে নাই। ইসলাম বলিষ্ঠ ধর্ম—স্বভাবের পটভূমিতে তাহার প্রতিষ্ঠা। স্বভাবে যাহা আছে, ইসলামেও তাহা আছে।

এই মহাসত্যকেই হযরত আজ প্রথম রূপ দিলেন। এতদিন তাঁহার একহাতে ছিল কুরআন, অপর হাত ছিল শূন্য; সেই শূন্য হাতে এবার তিনি তুলিয়া লইলেন তরবারি। 'এক হাতে কুরআন, অন্য হাতে তরবারি'—মানুষের এই মহিমময় মূর্তি দেখিয়া কোন্ অর্বাচীন ইহাকে নিন্দা করে? এর চেয়ে মানুষের সুন্দরতর মূর্তি আর কি হইতে পারে? সত্যের সহিত শক্তির এই যে মিলন—এ কি ঘৃণার? এ কি নিন্দার? কিছুতেই নয়। শক্তি ছাড়া সত্য দাঁড়াইতেই পারে না। পক্ষান্তরে শক্তি যদি সত্যাশ্রয়ী না হয়, তাহা হইলেও মানুষের অশেষ দুর্গতি ও অকল্যাণ ঘটে। সত্যহীন শক্তি জুলুমে রূপান্তরিত হয়। জগতে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সত্য ও শক্তির সমন্বয়ের তাই একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে শক্তিও সুনিয়ন্ত্রিত হয়, সত্যও উন্নতশিরে তাহার পথ কাটিয়া চলে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে তাই চাই সত্য ও শক্তির যুগপৎ সাধনা। সত্যের আলো যদি আমাকে পথ দেখায়, সকল মিথ্যা—সকল ভ্রান্তি—সকল অসুন্দর হইতে আমাকে বাঁচাইয়া চলে, সংগে সংগে আমার তরবারি যদি আমাকে দেয় সকল বাধা-বিঘ্নকে জয় করিবার বিপুল প্রেরণা, সকল ভীরুতা ও অবিশ্বাসকে দূর করিয়া সে যদি দেয় আমার অন্তরে অসীম সাহস ও মনোবল, তবে আমার ভয় কী? লক্ষ্যস্থানে আমি পৌঁছিবই।

ইসলামের সহিত তরবারির এমনই সম্বন্ধ।

কুরআন ও তরবারি তাই আদৌ অসমঞ্জস নহে।

বস্তুতঃ ইসলাম মুসলমানকে দুইটি জিনিসই দান করিয়াছে: একটি কুরআন, আর-একটি তলোয়ার। ত্যাগ ও ভোগের—সত্য ও শক্তির—দীন্ ও দুনিয়ার—দুই চমৎকার প্রতীক এই কুরআন ও তলোয়ার।

ইহাই মুসলমানের সাচ্চা চেহারা—ইহাই তাহার সত্যিকার পরিচয়। এই এক হাতে তরবারি অপর হাতে কুরআনধারী নওমুসলিমকেই আজ আবার আমরা সারা প্রাণ দিয়া কামনা করি।

এমনই আদর্শ একদল মুসলমানকে লইয়া সেনাপতি মুহম্মদ মদিনা হইতে যাত্রা করিলেন।

দুইদিন পথ-প্রবাস করিবার পর, তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে হযরত সদল-বলে বদর-প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

সেদিন বৃহস্পতিবার। দ্বিতীয় হিযরীর রমযান মাস।

বদর-প্রান্তরের তিনদিকে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। পূর্বদিকের একটি পাহাড় হইতে একটি ক্ষীণ ঝর্ণাধারা সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ওয়াকিফহাল ব্যক্তিদিগের পরামর্শে হযরত সেই ঝর্ণার উৎস-মুখ অধিকার করিয়া তথায় ঘাঁটি গাড়িলেন। খর্জুর-শাখা ও পত্রাদি দ্বারা হযরতের জন্য একটি ছাউনী প্রস্তুত করা হইল। সেই ছাউনির মধ্যে হযরত রাত্রিযাপন করিলেন। সা'দ-বিন্-ম'আজ সারারাত্রি সেই ছাউনি পাহারা দিলেন।

নামায ও প্রার্থনার মধ্য দিয়া সারারাত্রি কাটিয়া গেল।

ভোর হইতে না-হইতেই বেলালের সুমধুর আযানের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুসলমানগণ সৈনিকবেশে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া হযরতের পিছনে নামায পড়িলেন।

নামায শেষে হযরত সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হুকুম দিলেন। যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপভাবে ব্যূহ রচনা করিলেন। তারপর সকলকে উপদেশ দিয়া বলিলেন: "সাবধান, কেহ স্থানত্যাগ করিও না। আমার বিনানুমতিতে কেহ অগ্র-আক্রমণ করিও না। যদি অশ্বারোহী সেনাদল দ্বারা শত্রুরা আক্রমণ করে, তবে তীর মারিয়া তাহাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিও।"

ইহাই বলিয়া হযরত আপন শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন। এই সংকটমুহূর্তে জীবনের চরম এবং পরম বন্ধু আল্লাহ্‌তালার শরণ লইলেন। প্রাণের সকল আবেগ মিশাইয়া প্রার্থনা করিলেন: "প্রভু হে, এই মুষ্টিমেয় সত্যের সৈনিক দলটিকে তুমি কি বাঁচাইয়া রাখিবে না? ইহারা যদি আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তবে দুনিয়ায় তোমার নামের মহিমা-প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে। বলিতে বলিতে হযরত একেবারে ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া পড়িলেন।

এই প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ্‌ তাঁহার রসুলকে এই আশ্বাসবাণী শুনাইলেন:

"ন্যায়বানদিগকে সুসংবাদ দাও। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু বিশ্বাসীদিগের

নিকট হইতে শত্রুদিগকে দূরে রাখিবেন, কারণ আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদিগকে ভালোবাসে না।" —(২২ : ৩৮)

হযরত উৎফুল্ল হইয়া বাহিরে আসিলেন। আবুবকরকে ডাকিয়া বলিলেন : "সুসংবাদ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। ভয় নাই, যুদ্ধে আমরা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইব।"

ওদিকে আবুযহল মুসলমানদিগের সংখ্যানির্ণয় করিবার জন্য ওমায়ের নামক জনৈক আশ্বারোহীকে আদেশ দিলেন : ওমায়ের দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া মুসলমানদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিল : মুসলমানেরা সংখ্যায় তিন শতের বেশী হইবে না।

শুনিয়া আবুযহল নিশ্চিত বিজয়ের গর্বে একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া সে যুদ্ধারম্ভের আদেশ দিল।

কিন্তু কোরেশ নেতৃগণ একমত হইতে পারিল না। চিন্তাশীল কোন কোন নেতা আবুযহলকে বুঝাইয়া বলিল : "এই যুদ্ধে আমাদের কী লাভ হইবে? তিনশত মুসলিম যোদ্ধাকে নিহত করিতে হইলে আমাদের মধ্য হইতে অন্তত: তিনশত বাছা-বাছা কোরেশ বীরকে প্রাণ হারাইতে হইবে। কোরেশ গোত্রের শ্রেষ্ঠ নেতা বা যোদ্ধাদিগকে হারাইয়া বিজয়লাভ করিলেই বা আমাদের এমন কী গৌরব বাড়িবে? আর বিজয়লাভ যে করিবই, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? কাজেই, যুদ্ধ না করিয়া আমাদের ফিরিয়া যাওয়াই সমীচীন।"

কিন্তু আবুযহল এ যুক্তি মানিবে কেন? মুহম্মদ এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দকে ধ্বংস করিবার যখন এমন সুযোগ মিলিয়াছে, তখন সে তাহা হেলায় হারাইতে রাজী নয়। যুক্তিদাতাদিগকে সে 'ভীরু', 'কাপুরুষ' বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে সুফল ফলিল। ঘুমন্ত কোরেশ-অভিমান জাগ্রত হইয়া উঠিল। যুদ্ধের জন্য সকলেই একমত হইয়া গেল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখনকার রীতি অনুসারে প্রথমে যুগ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরেশদিগের মধ্য হইতে ওৎবা, তাহার ভ্রাতা শোয়েবা এবং পুত্র অলিদ বাহির হইয়া আসিয়া আস্ফালন করিতে করিতে বলিতে লাগিল : "ওরে কাপুরুষ মুসলমানগণ, কার এমন বুকের পাটা, আয় তো দেখি! যুদ্ধ কারে বলে একবার দেখে যা' এখানে!"

এই আহ্বান শুনিয়া আনসারদিগের মধ্য হইতে তিনজন বীর লাফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু মহানুভব রসুলুল্লাহ্ তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তিনি

ভাবিলেন: প্রথমেই যদি আনসারগণ যুদ্ধে নামে এবং যদি তাহাদের কেহ নিহত হয়, তবে লোকে বলিবে মোহাজেরদিগকে নিরাপদে রাখিয়া হযরত আনসারদিগের দ্বারাই যুদ্ধ চালাইতেছেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি আপন পরমাত্মীয় হামজা, ওবায়দা ও আলিকে আহ্বান করিলেন। আদেশক্রমে তৎক্ষণাৎ বীরত্রয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ওৎবার সহিত হামজার, শোয়েবার সহিত ওবায়দার এবং আলিদের সহিত আলির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুহূর্তমধ্যে বীরকেশরী আলির এক আঘাতেই আলিদের শির ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তদ্দৃষ্টে ওৎবা অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া ভীমবিক্রমে হামজাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই হামজা তাহাকে জাহান্নামে পাঠাইয়া দিলেন। পঁয়ষট্টিবর্ষ বয়স্ক ওবায়দাও শোয়েবাকে নিহত করিলেন বটে, কিন্তু শোয়েবার তরবারির আঘাতে তিনিও গুরুতররূপে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই শাহাদাৎ লাভ করিলেন।

ওৎবাকে এত শীঘ্র সবংশে নিহত হইতে দেখিয়া কোরেশগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে কোন ফল হইবে না ভাবিয়া এইবার তাহারা সমবেত আক্রমণ আরম্ভ করিল। এদিকে মুসলমানগণও বিজয়ের প্রথম সূচনায় অধিকতর অনুপ্রাণিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রু নিপাতে অগ্রসর হইলেন।

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় ও সৈন্যদিগের রণহুংকারে বদর-প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল।

অপূর্ব এই সংগ্রাম। নব অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক হাজার যোদ্ধার বিরুদ্ধে মামুলি হাতিয়ারধারী মাত্র ৩১৩ জনের যুদ্ধ! এমন অসম যুদ্ধ কে কোথায় দেখিয়াছে? কোন্ বলে বলীয়ান হইয়া মহানবী আজ এমন দুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর? যুক্তিজ্ঞান যাহাতে সায় দেয় না, তেমন কার্য করিতে তিনি কেন এত লালায়িত?

এর একমাত্র কারণ: হযরতের শক্তি বাহিরে ছিল না, ছিল তাঁহার অন্তরের গোপন-গহনে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ যুদ্ধ মক্কা-মদিনার যুদ্ধ নয়—কোরেশ-মুসলমানের যুদ্ধ নয়,—ইহা অন্ধকার ও আলোকের যুদ্ধ, মিথ্যা ও সত্যের যুদ্ধ—অবিশ্বাস ও ঈমানের যুদ্ধ।

প্রচণ্ডবেগে যুদ্ধ চলিতেছে। দূর হইতে হযরত এই যুদ্ধের ভীষণতা লক্ষ্য করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ

করিয়া কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন : "হে আমার প্রভু, আমার সহিত তুমি যে ওয়াদা করিয়াছ, তাহা পূর্ণ কর।" বলিতে বলিতে তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। দেহের উত্তরীয়খানি স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। তদ্দৃষ্টে আবুবকর তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া উত্তরীয়খানি তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে আলিংগন করিয়া বলিতে লাগিলেন : "হযরত, যথেষ্ট হইয়াছে ; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিবেন।"

আল্লার নিকট হইতে অভয় বাণী আসিল। হযরত আশ্বস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন।

মুসলিম বীরবৃন্দ তখন বিপুল বেগে যুদ্ধ করিতেছেন। দুর্বার গতিতে তাঁহারা ব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রুদিগকে নাস্তানাবুদ করিয়া চলিয়াছেন। এক-একজন বীর চার-পাঁচজন শত্রুকে নিপাত করিয়া তবে শহীদ হইতেছেন।

এই সময়ে মো'আজ ও আবদুল্লাহ্ নামক দুইজন মুসলিম তরুণ আপন ত্যাগ ও অসামান্য বীরত্ব দ্বারা এই যুদ্ধকে আশু পরিসমাপ্তির দিকে আগাইয়া দিলেন। আবুযহলকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহারা জীবন-পণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। আবুযহল তখন ব্যূহবেষ্টিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। যুবকদ্বয় বিদ্যুৎগতিতে সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া অতর্কিতে আবযুহলকে আক্রমণ করিলেন। মো'আজের এক আঘাতে আবুযহলের একটি পদ ছিন্ন হইয়া গেল। বাধ্য হইয়া সে ভূতলশায়ী হইল। পিতার এই মারাত্মক বিপদ দেখিয়া একরামা ছুটিয়া আসিয়া মো'আজকে আঘাত করিল ; সেই আঘাতে মো'আজের একটি বাহু ছিন্নপ্রায় হইয়া ঝুলিতে লাগিল। মো'আজ দেখিলেন, তাঁহার আপন বাহুই তাঁহার শত্রু হইয়াছে ; তৎক্ষণাৎ তিনি দোদুল্যমান বাহুটিকে পদতলে চাপিয়া ধরিয়া এমন জোরে ঝটকা টান দিলেন যে, বাহুটি ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন মো'আজ স্বচ্ছন্দচিত্তে অপর হস্ত দ্বারা তরবারি চালনা করিতে লাগিলেন। মো'আজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আবদুল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আবুযহল তখনও জীবিত ছিল, আবদুল্লার এক আঘাতে তাহার ছিন্ন মস্তক ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

আবুযহলের মৃত্যুর সংগে সংগে কোরেশ সেনাদল ছত্রভংগ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মুসলিমগণ সাফল্যের সূচনায় দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া কোরেশদিগের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। অনেককে নিহত

করিলেন, অনেককে বন্দী করিলেন। মুসলিম সৈন্যরা ইচ্ছা করিলে এই সুযোগে আরও বহু শত্রুকে নিহত করিতে পারিতেন; কিন্তু প্রেম-করুণার মূর্ত ছবি মুহম্মদ। বাহিরে কঠোর হইলেও অন্তর তাঁহার হতভাগ্য মানুষের বেদনায় কাঁদিয়া ফিরিতেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন: "উহাদিগকে মারিও না; বেচারীদের অনেকেই অনিচ্ছাসত্ত্বে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে।"

হযরতের আদেশ শুনিয়া মুসলিমদিগের অনেকেই বিস্ময় মানিল। এমন সুযোগও কেহ হারায়! কিন্তু উপায় নাই। নেতার আদেশ।

এই যুদ্ধে কোরেশদিগের ৭০ জন নিহত আর ৭০ জন বন্দী হইল। যে কয়জন কোরেশ নেতা হযরতের প্রধান বৈরীরূপে এতকাল তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের অধিকাংশই এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইল।

মুসলমানদিগের পক্ষে মাত্র ১৬ জন শহীদ হইলেন। বহু অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। বদর-প্রান্তর আবার শান্ত ভাব ধারণ করিল। সত্যের বিজয় ও মিথ্যার পরাজয়ে সারা প্রকৃতি যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

হযরত ও তাঁহার শিষ্যগণ এই বিজয়ের মধ্যে আল্লার মহিমা ও করুণারই মূর্ত প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় সকলের মস্তক বারে বারে আল্লার উদ্দেশ্যে নত হইয়া পড়িতে লাগিল।

বদর-যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। এই মহাযুদ্ধ ইতিহাসে এক যুগ-প্রবর্তক ঘটনা। যে সমস্ত মুসলিম বীর বদর-যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁহারা আরও অনেক বড় বড় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অনেক দেশ জয়ও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে জয়গৌরবকে কোন মূল্য না দিয়া বদর-যুদ্ধে জড়িত থাকাকেই তাঁহারা জীবনের পরম সৌভাগ্য ও গৌরব বলিয়া মনে করিতেন। ইরাকের শাসনকর্তা কুফা-নগরীর স্থাপয়িতা পারস্য-বিজয়ী মহাবীর সা'দ অশীতিবর্ষ বয়সে মরণ-শয্যায় শুইয়া বলিয়াছিলেন: "বদর-যুদ্ধের পরিহিত বর্ম আমাকে পরাইয়া দাও; এই বেশে মরিব বলিয়া আমি উহা এতদিন তুলিয়া রাখিয়াছি।" বাস্তবিকই বদর-যুদ্ধের গুরুত্ব এবং গৌরব মিথ্যা নয়। ইসলামের অগ্রগতি এইখান হইতেই শুরু হইয়াছে। এতদিন সে ছিল নিরীহ, এখন সে হইল নির্ভীক।

এতদিন যে ছিল শান্ত ও সংযত, এখন সে হইল দুর্বার—প্রাণ-মাতাল ও গতিশীল। আল্লাহ্‌তালা এই জন্ম কুরআন শরীফে বদর-বিজয়ের দিনকে 'মুক্তির দিন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সত্যই ইহা মুক্তির দিন। বিধর্মীরা ইসলামকে কবলিত করিবার জন্ম সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু ইসলাম সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া এইদিন বিজয় বেশে বাহির হইয়া আসিল।

বস্তুতঃ বদর-যুদ্ধের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছিল। হযরত যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিতেন, তবে ইসলামের ইতিহাস অন্তরূপেও লিখিত হইতে পারিত। কোরেশগণ তো মদিনা আক্রমণ করিতই, অধিকন্তু নগরের পৌত্তলিক, ইহুদী ও মুনাফিকগণও তাহাদের সহিত যোগ দিত। ফলে ইসলাম ও তাহার মহাপয়গম্বরের ভাগ্যে কি ঘটিত, কে বলিবে ?

পক্ষান্তরে বদর-বিজয়ে মুসলমানগণ এক নূতন জীবনের সন্ধান পাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে অসীম শক্তি লুকাইয়া আছে, অগণিত শত্রুর সংগে যুদ্ধ করিয়াও তাঁহারা যে জয়ী হইতে পারেন, শত্রুসেনার সংখ্যা দেখিয়া তাঁহারা যে মোটেই শংকা মানেন না, তাঁহারা যে দুর্বার—দুর্দমনীয়, এই বিশ্বাস তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। ইসলাম যে আল্লার মনোনীত ধর্ম, হযরত যে সত্য সত্যই আল্লার প্রেরিত রসুল, আল্লাহ্‌ যে মুসলমানদিগের সহায়—এ কথা সকলের মনেই দাগ কাটিয়া বসিল। হযরত এতদিন যে-দাবী করিয়া আসিতেছিলেন এবং যে আশার বাণী শুনাইতেছিলেন, বদর-যুদ্ধে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইল। আরও একটি সত্য মুসলমানেরা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সেটি হইতেছে : সংগ্রাম না করিলে জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না।

পরিচ্ছেদ : ৩৯

বদর-যুদ্ধের পরে

বিজয়লব্ধ রণসম্ভার ও বন্দীদিগকে লইয়া সত্যের সৈনিকদল মদিনায় ফিরিয়া চলিলেন। আবার গগন-পবন প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল : "আল্লাহু আকবর !"

ওসায়েল নামক স্থানে আসিয়া বীরদল রাত্রিপ্রবাস করিলেন। কিন্তু মদিনাবাসী মুসলমানদিগের উৎকণ্ঠার কথা ভাবিয়া হযরত সেখান হইতে জায়েদ এবং কবি আবদুল্লাকে বিজয়বার্তা ঘোষণা করিবার জন্য সত্বর মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন। আল-আকিক উপত্যকা পর্যন্ত দূতদ্বয় একসংগেই আসিলেন ; তারপর ঘোষণা করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া দুইজন দুইপথ দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। আবদুল্লাহ্ কোবা এবং পার্বত্য মদিনার দিকে চলিয়া গেলেন ; জায়েদ সোজা নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। হযরতের প্রিয় উট 'আল-কাসোয়া'র উপরে জায়েদ উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইহাতে এক বিপরীত ফল ফলিল। ইহুদী ও কোরেশগণ যখন দেখিল, হযরতের উট লইয়া জায়েদ ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; ভাবিল মুহম্মদের দফা রফা হইয়াছে, নতুবা তাঁহার উট এরূপভাবে ফিরিয়া আসিবে কেন ? কিন্তু জায়েদ যখন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া উঠিলেন : "হে মদিনাবাসীগণ ! আনন্দ কর ! কোরেশদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে ; আবুযহল ও অন্যান্য কোরেশনেতা নিহত হইয়াছে ; হযরত শীঘ্রই সেনাদলের সংগে ফিরিয়া আসিতেছেন," তখন তাহারা "হায় ! হায় !" করিয়া উঠিল। মনে হইল সমস্ত আকাশ ভাঙিয়া তাহাদের মাথায় পড়িল।

পক্ষান্তরে মুসলমানগণ এই বিজয়বার্তা শ্রবণে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। যুবক ও বৃদ্ধেরা মুহুর্মুহুঃ তকবীরধ্বনি করিতে লাগিলেন, বালক-বালিকারা দফ বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিল ; সমস্ত মুসলিম-মদিনা হযরতকে অভিনন্দিত করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিল।

পরদিন হযরত মদিনায় পৌঁছিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতার মুবারকবাদ ও আনন্দ-কলরবে মদিনা আবার মুখর হইয়া উঠিল।

যুদ্ধলব্ধ যাবতীয় সম্পদ পথিমধ্যে সাফ্‌রা নামক স্থানে সকলের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ভাগবাটোয়ারা লইয়া একটু বিভ্রাট ঘটিল। যাঁহারা নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যুদ্ধে দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে থাকিয়া অন্য কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই সমান অংশ দেওয়া হইবে কিনা, ইহাই লইয়া একটা মতবিরোধ দেখা দিল। কিন্তু অচিরেই সব গণ্ডগোল মিটিয়া গেল। হযরত এ সম্বন্ধে আল্লার নির্দেশ লাভ করিলেন। তদনুসারে এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌ এবং রসুলের জন্য রাখিয়া বাকী সমস্তই সৈন্যদিগের মধ্যে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। আবুযহলের ব্যবহৃত বিখ্যাত 'জুলফিকার' তরবারিখানিও যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত নিজে সেখানি গ্রহণ করিলেন।

হযরত মদিনায় পৌঁছিয়াই শুনিতে পাইলেন, তাঁহার প্রিয় দুহিতা রোকাইয়া আর এই দুনিয়ায় নাই। রোকাইয়ার পীড়া গুরুতর জানিয়াই তাঁহার স্বামী ওসমান বদর-যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। হযরত জানিতেন, রোকাইয়ার পীড়া মারাত্মক; কিন্তু বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বান যখন আসে, মানুষ তখন ব্যক্তিগত কর্তব্য বা সুখসুবিধার দিকে তাকাইতে পারে কৈ? হযরতকে তাই বাধ্য হইয়াই মৃত্যুকাতর কন্যার মায়া পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল।

যথাসময়ে বন্দীগণ মদিনায় আসিয়া উপনীত হইল। এসব বন্দীদিগের প্রতি হযরত যে-আদর্শ ব্যবহার দেখাইলেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলা ভার। হযরতের আদেশে মদিনার আনসার এবং মোজাহেরগণ সাধ্যানুসারে বন্দীদিগকে নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন গৃহে স্থান দিলেন এবং আত্মীয়-কুটুম্বের মতই তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পরবর্তীকালে এই বন্দীদিগের একজন প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন: "মদিনাবাসীদিগের শিরে আল্লার রহ্‌মৎ নাযিল হউক। তাঁহারা আমাদিগকে উটে চড়িতে দিয়া নিজেরা পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছে; নিজেরা শুষ্ক খেজুর খাইয়া আমাদিগকে রুটি খাইতে দিয়াছে।"

বলা বাহুল্য, এই মহানুভবতা বিফলে গেল না। বন্দীদিগের মধ্যে অনেকেই হযরত এবং তাঁহার শিষ্যদিগের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিল এবং এইরূপে অন্তরে-বাহিরে মুক্ত হইল। যাহারা ইসলাম

গ্রহণ করিল না, তাহাদিগের প্রতিও কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করা হইল না। মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত তাহারা একইভাবে আদৃত হইতে লাগিল। পরাজয়ের কলংক ও গ্লানি ভুলিয়া বন্দীদিগের মুক্তির জন্য মদিনায় দূত পাঠাইতে কোরেশদিগের অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া বন্দীগণ সমান-ভাবে মুসলমানদিগের সেবাযত্ন পাইতে লাগিল।

বন্দীদিগের মুক্তিদান ব্যাপারেও হযরত কম সহৃদয়তা দেখান নাই। বন্দীদিগের সাধ্যানুসারে তিনি মুক্তিপণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন। যাহারা সংগতিসম্পন্ন, তাহাদের প্রত্যেককে ২০০০ হইতে ৬০০০ দেরহেম দিতে হইয়াছিল; কিন্তু দরিদ্র লোকদিগের জন্য তিনি মাত্র ৪০০ দেরহেম পণ ধার্য করিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা নিতান্তই অক্ষম ছিল, হযরত তাহাদিগকে বিনাপণেই মুক্তি দান করিয়াছিলেন। আবার বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেককে মদিনার দশটি বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিতে বলা হইয়াছিল এবং উহাই তাহাদের মুক্তিপণরূপে গণ্য হইয়াছিল। শিক্ষার প্রতি হযরতের এই অনুরাগ সত্যই প্রশংসার্হ। অবশ্য সকলের প্রতিই যে নির্বিচারে সমান ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা নহে। বন্দীদিগের মধ্যে দুই জন পাষণ্ডকে তাহাদের দুষ্কৃতির জন্য কিছুতেই ক্ষমা করা সম্ভব হয় নাই। তৎকালীন যুদ্ধরীতি অনুসারে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

বদর-যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরতের পারিবারিক জীবনের প্রধান ঘটনা আলির সহিত ফাতিমার বিবাহ। বদর-যুদ্ধে বীরবর আলিই সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধশেষে তাই যেন তিনি তাঁহার সেই কৃতিত্বের পুরস্কার লাভ করিলেন। হযরতের প্রিয় দুলালীকে লাভ করা সত্যই কি মানব-জীবনের একটা চরম পুরস্কার নয়? আর আলি ছাড়া এই দুর্লভ রত্ন লাভ করিবার যোগ্যতা কাহারই বা ছিল! যোগ্য পাত্রে যোগ্য পুরস্কারই অর্পিত হইয়াছিল। হযরত নিজে খুৎবা পড়িয়া আলি ও ফাতিমাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমের মূর্তিমান আদর্শ—হযরত হাসান হোসেন—ইঁহাদেরই সন্তান।

বদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া হযরত ইহুদীদিগের ক্রিয়াকলাপ ও গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি দিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহুদীরা মক্কায়

কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। উভয়ের মধ্যে বহু গোপন পত্রবিনিময় হইত। খাজরাজ-বংশীয় আবদুল্লাহ্ কোরেশদিগের সহায়তায় হযরতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, এইরূপ ছিল তাহাদের মতলব এবং সেজন্য তাহারা সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। কিন্তু বদর-যুদ্ধে কোরেশদিগের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটায় ইহুদীরা একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল।

হযরতের সহিত ইহুদীদিগের বিরোধের প্রধান কারণ ছিল: উভয়ের আদর্শগত পার্থক্য। ইহুদীরা ছিল সুদখোর, হযরত ছিলেন সুদের ঘোর বিরোধী; ইহুদীরা ছিল পরস্বাপহরণকারী, নির্মম ও শোষণ-প্রয়াসী, হযরত ছিলেন মানুষের দরদী এবং দুর্গতদিগের সাহায্যকারী; ইহুদীরা ছিল মানুষে-মানুষে ভেদবুদ্ধিদাতা, হযরত ছিলেন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার উদ্গাতা। এহেন মুহম্মদকে তাহারা সহ্য করিবে কিরূপে? ইহুদীরা তাই ভাবিল: মুহম্মদের জন্যই যখন তাহাদের সমস্ত স্বার্থ ও সুবিধা হাত হইতে চলিয়া যাইতে বসিয়াছে, তখন তাহাদের পথ হইতে এই কণ্টকটিকে সরাইয়া ফেলিতেই হইবে।

বদর-যুদ্ধে মুসলমানদিগের অপ্রত্যাশিত বিজয়ে ইহুদীরা নিজেদের পরিণাম চিন্তা করিয়া আরও বিচলিত হইয়া উঠিল। হযরতকে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে যে তাহাদের সমূহ অকল্যাণ ঘনাইয়া আসিবে, এ কথা তাহারা মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিল।

ইহুদীদিগের মধ্যে কা'ব নামক একজন কবি ছিল। বদর-যুদ্ধে কোরেশদিগের শোচনীয় পরাজয়ের কথা শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ইহুদীদিগের মধ্য হইতে একদল প্রতিনিধিকে সংগে লইয়া সে মক্কায় গমন করিল এবং নানাবিধ কবিতা ও গাথা রচনা করিয়া বদরের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য কোরেশদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ইহুদীরা যে কোরেশদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এই গোপন বাণীও সে তাহাদিগকে দিল। ইহাতে কোরেশ-প্রধানদিগের মনে আবার নব উৎসাহের সৃষ্টি হইল; উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া তাহারা প্রতিনিধিদিগকে বিদায় দিল।

কা'ব মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া হযরতকে দাওয়াৎ করিয়া আসিল। উদ্দেশ্য নিজগৃহে আনিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে। সুখের বিষয়, হযরত এই ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বেই জানিয়া ফেলিলেন; কাজেই কা'বের উদ্দেশ্য সফল

হইল না। অভিমানক্ষুব্ধ শয়তান-কবি তখন প্রকাশ্যে হযরতের নামে নানাবিধ ব্যংগ-কবিতা রচনা করিয়া মদিনাবাসীদিগের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, অন্যভাবেও ইহুদীরা হযরতকে জ্বালাতন করিতে ছাড়িল না। মুসলমানগণ পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম জানায়; ইহার অর্থ "আল্লার আশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হউক।" ইহুদীরা ইহারই অনুকরণে হযরতকে "আস্‌সামু আলাইকা" অর্থাৎ "তুমি ধ্বংস হও" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। দিনে দিনে এমন হইল যে, হযরতের বাটির বাহির হওয়াই দায় হইয়া উঠিল।

বিভিন্ন মুসলিম গোত্রের মধ্যে কলহ সৃষ্টির জন্যও ইহুদীরা প্রয়াস পাইল। বদর-যুদ্ধে কে কেমন বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, এই অহেতুক আলোচনার ভিতর দিয়া বিভিন্ন গোত্রের লোকদিগের মধ্যে তাহারা হিংসা-বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি আনিয়া দিতে লাগিল। বস্তুতঃ ইহুদীরা হযরতের উচ্ছেদ সাধনের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল।

শুধু যে ইহুদীরাই কোরেশদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য মক্কায় গিয়াছিল তাহা নহে; কোরেশগণও ইহুদীদিগকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য মদিনায় আসিয়াছিল। স্বয়ং আবুসুফিয়ানের দ্বারাই এ কার্য সাধিত হইয়াছিল। দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য সংগে লইয়া, সে একদিন মদিনা যাত্রা করে, তারপর মদিনার উপকণ্ঠে একটি গুপ্তস্থানে সৈন্যদের লুকাইয়া রাখিয়া রাত্রের অন্ধকারে নগরপ্রবেশ করে এবং ইহুদী দলপতিদিগের সহিত সলাপরামর্শ করিয়া প্রভাত হইতে না হইতেই আবার সৈন্যদের সহিত আসিয়া মিলিত হয়। ফিরিয়া যাইবার কালে দুইজন মদিনাবাসী কৃষককে মাঠে কাজ করিতে দেখিয়া তাহারা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া এবং তাহাদের ফলশস্যাদি পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়। এই সংবাদ মদিনায় পৌঁছিলে হযরত একদল মুসলিম সেনাকে সংগে লইয়া দ্রুতবেগে কোরেশদিগকে অনুসরণ করেন, কিন্তু তাহাদের নাগাল ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসেন।

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া হযরত পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন যে, ইহুদী ও কোরেশ একত্র মিলিয়া একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছে; যে-কোন সূত্রে ইহুদীরা তাই মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ বাধাইতে

হযরতের আদেশে মুসলমানগণ এতদিন ধৈর্যধারণ করিয়াই ছিলেন, কিন্তু একটি ব্যাপারে তাঁহাদের সে ধৈর্যের বাঁধ টুটিল। ইহুদীদিগের মধ্যে বনি-কাইনোকা গোত্রই ছিল তখনকার দিনে ধনেমানে ও প্রতিপত্তিতে মদিনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বদর-যুদ্ধের পূর্ব হইতেই ইহারা বহু অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের দুর্গে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রয়োজন হইলেই ইহাদের মধ্য হইতে শত শত যোদ্ধা যুদ্ধে নামিতে পারিত। ইহারা প্রধানতঃ স্বর্ণকার ছিল। একদিন একটি অবগুণ্ঠিতা মুসলিম যুবতী আবশ্যক বোধে ইহাদের একটি অলংকারের দোকানে গিয়াছিলেন। ইহুদীরা ইহাকেই একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া মহিলাটিকে নানাপ্রকার ব্যংগ-বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে উত্যক্ত হইয়া তিনি অন্য আর-একটি স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইলেন না। মহিলাটি বসিয়া আছেন, এমন সময় জনৈক দুর্বৃত্ত গোপনে গোপনে পিছনদিক হইতে তাঁহার ওড়নার এক কোণা একটি খুঁটির সহিত বাঁধিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি যেই গাত্রোত্থান করিতে গিয়াছেন, অমনি তাঁহার অংগাবরণখানি খসিয়া গিয়া তিনি লোকচক্ষে উন্মুক্ত হইয়া পড়িলেন। দুর্বৃত্তদিগের কুৎসিৎ হাসি-তামাসায় তখন স্থানটি সরগরম হইয়া উঠিল। মহিলাটি লজ্জায় ও ক্রোধে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন: "কে আছ মুসলিম বীর! বিপন্না নারীকে রক্ষা কর।" জনৈক মুসলমান পথিকের কর্ণে এই আহ্বান প্রবেশ করা মাত্র তিনি উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ছুটিয়া আসিয়া মহিলাটিকে রক্ষা করিলেন এবং পাষণ্ডদিগের একজনকে তরবারির এক আঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ফলে ইহুদীরাও সংঘবদ্ধভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মুসলিম বীর প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সংখ্যাধিক্যের বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নিহত হইলেন।

এই সংবাদ যখন মুসলমানদিগের কর্ণে পৌছিল, তখন তাঁহারা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু হযরত তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া নিজেই বনি-কাইনোকা সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন: "হে ইহুদীগণ, তোমরা যে জঘন্য কুকর্ম করিয়াছ, তাহার যথাযোগ্য প্রতিকার করিতে আমরা প্রস্তুত। আমার উপদেশ এই: তোমরা বশ্যতা স্বীকার কর, নতুবা কোরেশদিগের দশাই তোমাদের ঘটিবে।"

কিন্তু ইহুদীরা হযরতের এই উপদেশ মানিল না; নানারূপ টিট্‌কারী দিয়া তাঁহাকে আরও শাসাইতে লাগিল। বলিল: "বদরের একটা সামান্য যুদ্ধ জিতিয়া তোমাদের খুব গর্ব হইয়াছে, না? আমাদের সহিত যদি যুদ্ধ লাগে, তবে দেখাইয়া দিব যুদ্ধ কাহাকে বলে।" হযরত তখন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বাধ্য হইয়া ইহুদীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য মুসলমানদিগকে আদেশ দিলেন।

ইহুদীরা ফেরেববাজিতে পাকা হইলেও ভিতরে ভিতরে খুবই ভীরু ছিল। মুসলমানদিগের সমরায়োজনের সংবাদ শুনিয়া তাহারা সকলে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। মুসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। ইহুদীদিগের বিশ্বাস ছিল, কোরেশগণ শীঘ্রই মদিনা আক্রমণ করিবে, কাজেই অল্প কয়েকদিন এইভাবে কাটাইয়া দিতে পারিলেই তাহাদের মুক্তির দিন আসিবে। আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-উবাই প্রমুখ খাজরাজদিগের নিকট হইতেও সাহায্য আসিবে বলিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ দুই সপ্তাহের মধ্যে যখন বাহির হইতে কোন সাহায্যই আসিল না, তখন তাহারা ভীত হইয়া পড়িল। তাহাদের রসদপত্রও ফুরাইয়া আসিল। অগত্যা তখন তাহারা হযরতের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সংগে সংগে এই প্রস্তাব করিল: "দয়া করিয়া আমাদিগকে নিহত বা বন্দী করিবেন না। বনি-নাজিরদিগের ন্যায় আমরাও মদিনা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। আমাদিগকে সেই অনুমতি দিন।"

এই বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদিগের প্রতি কী করা উচিত ছিল? ইহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিলেও কি রাষ্ট্রনীতি অনুসারে মুসলমানদিগের পক্ষে কোনরূপ অন্যায় করা হইত? নিশ্চয়ই না। অন্ততঃ ইহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের সন্তানসন্ততিকে দাসদাসীরূপে ব্যবহার করা, অথবা ধনসম্পদ, ঘরবাড়ি ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া সকলকে বন্দী করিয়া রাখা তখনকার দিনে কোনমতেই অসংগত হইত না। কিন্তু ক্ষমাসুন্দর মহামানব মুহম্মদ তাহা করিলেন না। ইহুদীদিগের প্রার্থনানুযায়ী তিনি তাহাদিগকে মদিনা ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। এজন্য তাহারা তিনদিন সময় চাহিয়াছিল, তাহাও তিনি মন্‌যুর করিলেন। শুধু তাই নয়, ইহাদিগের যাত্রার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তিনি একজন সুদক্ষ সাহাবীকেও নিযুক্ত করিলেন।

ইহুদীরা সিরিয়া অঞ্চলে চলিয়া গেল।

অবশ্য ইহুদীদিগের নগর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার ফলে মুসলমানগণ তাহাদের পরিত্যক্ত ধনসম্পত্তি অধিকার করিলেন। তবে ইহার পরিমাণ খুব বেশী নয়। ভূসম্পত্তির দিকে ইহুদীদিগের বিশেষ লোভ ছিল না; নগদ টাকা ও স্বর্ণই ছিল তাহাদের প্রধান সম্পদ। ইহুদীরা যথাসাধ্য তাহা সংগে লইয়া গিয়াছিল। তবে দুর্গাভ্যন্তরে তাহারা যুদ্ধবিগ্রহের জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা লইয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই। মুসলমানগণ সেগুলি লাভ করিয়া নিশ্চয়ই উপকৃত হইয়াছিলেন।

দুষ্ট কবি কা'ব কিন্তু তখনও শান্ত হন নাই। সিরিয়া হইতে সে গোপনে গোপনে মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া কয়েকজন গোত্রপতিকে নিজেদের দলে ভিড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মুসলিম প্রহরীদিগের হস্তে সে অবশেষে ধরা পড়িয়া গেল : হযরত এবার আর তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। এই স্বদেশ-দ্রোহী ভণ্ড নীচমনা ষড়যন্ত্রীকে তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

বনি-কাইনোকাদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া খুবই সময়োচিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা হযরত রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহারা মদিনায় থাকিলে পরবর্তী ওহদ যুদ্ধের সময় মুসলমানদিগের সমূহ বিপদ ঘটিত। ইহারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কোরেশদিগের ষড়যন্ত্রের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছিল।

এই সমস্ত ঘটনা হিযরীর দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়। 'ইদুল-ফিতর' এবং 'ইদুল-আজ্‌হার' উৎসব পর্বও এই বৎসরে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।

———

পরিচ্ছেদ : ৪০

ওহুদ-যুদ্ধ

পরাজিত কোরেশবাহিনী মক্কায় ফিরিয়া গেল। বদরের শোচনীয় পরাজয় এবং কোরেশ-নেতাদের অধিকাংশের মৃত্যুসংবাদ সারাটি দেশ জুড়িয়া শোকের ছায়া ফেলিল। ঘরে-ঘরে কান্নার রোল উঠিল! মক্কার অন্যতম কোরেশনেতা আবুলাহাব এই দুঃসংবাদ শ্রবণে শয্যাগ্রহণ করিল, আর উঠিল না; সাতদিন পরে সে ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের মৃত্যুর পর কোরেশদিগের পরিচালনার ভার পড়িল আবুসুফিয়ানের উপর। বদর-যুদ্ধে সে যোগদান করে নাই, মক্কাতেই রহিয়া গিয়াছিল। কোরেশদিগের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে সে মনে মনে বেদনা অনুভব করিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিল না; কি করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়, ভাবিতে লাগিল। নগরবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল: "ভ্রাতৃগণ, কাঁদিও না; অশ্রুপাতে আমাদের প্রতিহিংসার আগুন নিবাইয়া দিও না। মনকে দৃঢ় কর, নূতন আশায় নূতন উদ্যমে বুক বাঁধো। এই কলংক-কালিমা মুছিয়া ফেলিতেই হইবে। শুধু হা-হুতাশ করিলে চলিবে না। উহাতে আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। শত্রুরা ভাবিবে, আমরা হতাশ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। প্রতিজ্ঞা করা শত্রুকে পরাজিত করিতেই হইবে। আমার সম্বন্ধে বলিতেছি: যতদিন না এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে পারি, ততদিন পর্যন্ত আমি কোন সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিব না, অথবা আমার স্ত্রীকেও স্পর্শ করিব না।"

আবুসুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও কোরেশদিগের স্তিমিত হিংসানলকে জাগাইয়া তুলিতে কম চেষ্টা করে নাই। তাহার পিতা ওৎবার মৃত্যুতে সে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল; পিতৃহন্তা হামজার রক্তপানের জন্য সেও দারুণ পণ করিয়া বসিল।

ওৎবার পুত্র ইকরামা এবং আরও দুই-একজন রক্ত-মাতাল যুবক-বীর আবুসুফিয়ানের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ওদিকে মদিনা হইতে ইহুদীরা আসিয়াও কোরেশদিগকে নব উৎসাহ দান করিয়া গেল।

এই সমস্ত কারণে কোরেশদিগের রণস্পৃহা পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ; নববলে বলীয়ান হইয়া তাহারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে বদর-যুদ্ধের প্রাক্কালে কোরেশগণ রণসম্ভার ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্য হইতে ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা চাঁদা তুলিয়াছিল। সে অর্থ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। তাহাই দিয়া আবুসুফিয়ান নব অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিয়া ৩০০০ সৈন্যের আর এক নূতন বাহিনী রচনা করিল। তন্মধ্যে ৭০০ বর্মধারী, ২০০ অশ্বারোহী, অবশিষ্ট উষ্ট্রারোহী ও পদাতিক। তায়েফ হইতে ১০০ জন সৈন্য আসিয়াও এই সেনাদলে যোগ দিল। এই বিপুল বাহিনী লইয়া আবুসুফিয়ান পুনরায় মদিনাপানে অগ্রসর হইল।

অপূর্ব এই অভিযান। পুরোভাগে কোরেশদিগের জয়পতাকা উড়িতেছে, তদ্‌পশ্চাতে তাহাদের প্রধান দেবতা 'হোবল' ঠাকুরের বিরাট মূর্তি শোভা পাইতেছে, তদ্‌পশ্চাতে হিন্দা ও অন্যান্য রণরংগিণীরা উষ্ট্র-পৃষ্ঠে চড়িয়া ভেরী-নাকারার তালে তালে অগ্নিক্ষরা রণগীতি গাহিয়া চলিয়াছে, তদ্‌পশ্চাতে বীরকেশরী খালেদের নেতৃত্বে দুইশত অশ্বারোহী বীরপদভরে অগ্রসর হইতেছে, সর্বশেষে রসদবাহী ও উষ্ট্রারোহী সেনাদল চলিতেছে। দেখিলে সত্যই মনে ত্রাস জন্মে। মনে হয়, একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি হাওয়া নানাভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া আল্লার সত্যশিখাকে নির্বাপিত করিবার জন্য বিপুল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

হযরতের অন্যতম চাচা আব্বাস তখনও মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি ইসলাম গ্রহণ না করিলেও চিরদিন হযরতের মংগলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কোরেশদিগের এই বিপুল সমরায়োজন দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি গোপন লিপিসহ জনৈক বিশ্বস্ত দূতকে মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন।

হযরত যখন এই কোরেশ-বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি একটুও বিচলিত হইলেন না। সেই চিরবিশ্বাসের বাণীই তাঁহার মুখে ধ্বনিত হইল : "আমাদের পক্ষে এক আল্লাই যথেষ্ট।"

শুক্রবার! শওয়াল মাসের ১৪ তারিখ। জুমার নামায বাদ হযরত সমবেত মুসলিমদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থার গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলেন। আব্দুল্লাহ্-বিন্-উবাই প্রমুখ পৌত্তলিক খাজরাজ প্রধানদিগকেও ডাকা

হইল। নগর রক্ষার উপায় সম্বন্ধে সকলে পরামর্শ করিলেন। হযরত বলিলেন: "এবার আমাদের নগর ছাড়িয়া দূরে যাইয়া যুদ্ধ করা সমীচীন হইবে না, ইহাতে অনেক বিপদ ঘটিতে পারে। কাজেই আমার মত: এবার নগর-প্রাচীরের মধ্যে থাকিয়াই আমরা যুদ্ধ চালাইব। তোমাদের মত কী?"

বয়ঃজ্যেষ্ঠ মোহাজের ও আনসারগণ সকলেই হযরতের মত গ্রহণ করিলেন। আব্দুল্লাহ্-বিন্-উবাইও ইহাতে সম্মতি দিলেন। তখন স্থিরীকৃত হইল: কোরেশদিগকে নগরের বাহিরে গিয়া যুদ্ধদান করা হইবে না, যদি তাহারা মদিনা আক্রমণ করে, তবে প্রাচীরের উপর হইতে এবং দুর্গ হইতে তীর ও লোষ্ট্রবর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেওয়া হইবে।

কিন্তু এই প্রস্তাব তরুণদলের মনঃপূত হইল না। তাহারা বলিল: "আমরা কেন অলস ও নিশ্চেষ্ট হইয়া নগর মধ্যে বসিয়া থাকিব? এরূপ করিলে শত্রুরা আমাদিগকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিবে। তা ছাড়া আমাদের এই দুর্বলতা দেখিলে শত্রুদিগের সাহস আরও বাড়িয়া যাইবে, তাহারা মদিনা আক্রমণ করিবেই। এই সুযোগ কেন তাহাদিগকে দিতে যাই? কাজেই আমাদের মত: নগর হইতে বাহির হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হওয়াই সমীচীন।"

বলা বাহুল্য, অনেকেই তরুণদিগের এই মত সমর্থন করিলেন। বদর-যুদ্ধের জয়লাভের পর নিশ্চয়ই যোদ্ধাগণ একটু বে-পরোয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সংখ্যাধিক্যের ফলে তরুণদিগের মতই বলবৎ হইল দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের প্রস্তাবই গ্রহণ করিলেন। নগর হইতে বাহির হইয়া শত্রুর অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্তই তিনি ঘোষণা করিলেন।

আসরের নামায বাদ মুসলিম বীরবৃন্দ হযরতের আদেশক্রমে সজ্জিত হইয়া মসজিদ প্রাংগণে নামায পড়িতে সমবেত হইলেন। হযরত তখন আবুবকর ও ওমরকে সংগে লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। অপূর্ব সেই রণমূর্তি! অংগে সুদৃঢ় বর্ম, বাম হস্তে ঢাল, দক্ষিণ হস্তে তলোয়ার, কটিবন্ধে 'জুলফিকার', শিরে বাঁধা আমামা। রসূলুল্লার আজ এমনই বীরবেশ! তিনি আজ সেনাপতি।

তিনি আজ যুদ্ধনায়ক। ধর্মের আদর্শের সংগে তিনি আজ কর্মের আদর্শকে আনিয়া একাসনে মিলাইয়া দিলেন। মুসলমানের জীবন-দর্শনের ইহাই তো গূঢ় কথা। ধর্মজীবনের সহিত তাহার কর্মজীবনের বিরোধ কোথায়? ধর্ম ও কর্মকে, দীন ও দুনিয়াকে সে এমনিভাবে মিলাইয়া লয়। ধর্মহীন কর্ম তাহার লক্ষ্য নয়, কর্মহীন ধর্মও তাহার আদর্শ নয়। ভোগের মধ্যে বসিয়া সে ত্যাগের সাধনা করে, বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া মহানন্দময় মুক্তির সংগ্রাম করিতে সে ভালবাসে।

হযরতের এই বীরমূর্তি দেখিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন। তরুণদলের অনেকেই বলিতে লাগিলেন: "হযরত, আমরা যদি ভুল করিয়া থাকি, তবে মাফ করুন; আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতেছি।"

হযরত বলিলেন: "তা হয় না। যে-সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছি, তাহার রদবদল করিতে পারি না। সেনাপতির কর্তব্য তা নয়। সকলে প্রস্তুত হও; বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া যাত্রা কর। ধৈর্য ধরিয়া রাখিতে পারিলে তোমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ইহা বলিয়া তিনি তিনটি বর্শা চাহিয়া লইয়া তিনটি নিশান প্রস্তুত করিলেন। একটিকে দিলেন অধ্যাপক মুসায়েবের হস্তে, অন্য দুইটিকে দিলেন আউস ও খাজরাজ গোত্রের দুই দলপতির হস্তে। তারপর সৈন্য-দিগকে লাইনবন্দী করিয়া কুচ করিবার জন্য হুকুম দিলেন। হযরত নিজে একটি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। মোট ১০০০ সৈন্যের এই বাহিনী। তন্মধ্যে ২ জন মাত্র অশ্বারোহী, ৭০ জন বর্মধারী, ৪০ জন তীরন্দাজ, বাকী সমস্তই নগ্নদেহ পদাতিক। তাহাদের কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে তরবারি।

কিন্তু পথিমধ্যে এই এক হাজারের মধ্য হইতেও তিন শত খসিয়া পড়িল। আবদুল্লাহ্-বিন্-উবাই ৩০০ সৈন্য লইয়া হযরতের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ষড়যন্ত্র করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া নগরাভ্যন্তরে থাকিয়া যুদ্ধ করারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার কথা রক্ষিত হইল না বলিয়া এখন অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কতকগুলি তরলমতি যুবকের কথায় হযরত নগর ত্যাগ করিলেন, এই অজুহাতে তিনি তাঁহার দলবলসহ সরিয়া পড়িলেন। বাকী রহিল মাত্র ৭০০ সৈন্য। ইহাদের সকলেই মুসলিম।

আবদুল্লার দলত্যাগে হযরত বিচলিত হইলেন না। এই মুনাফিক পৌত্তলিকের প্রকৃত স্বরূপ যে এইখানেই ধরা পড়িল, ইহাতে বরং তিনি খুশীই হইলেন। যুদ্ধকালে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে মুসলমানদিগের ভাগ্যে কী দুর্গতিই না ঘটিত! ইহাই ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। ৭০০ মুসলিম বীরকে সংগে লইয়াই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে একটি চমৎকার ঘটনা ঘটিল। মুসলিম সৈন্যদিগকে কুচ-কাওয়াজ করিয়া যাইতে দেখিয়া কতিপয় কিশোর তরুণও যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেনাদলের সংগে সংগে তাহারা অনেক দূর আসিল। হযরত তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলিলেন। কিন্তু তাহারা অবুঝ। যুদ্ধে না যাইয়া তাহারা ছাড়িবে না! অগত্যা তখন হযরত তাহাদিগের দেহের মাপ লইতে হুকুম দিলেন। উদ্দেশ্য: মাপে ছোট হইলে সেই অজুহাতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া সহজ হইবে। মাপ লইবার সময় রাফে নামক একটি বালক পায়ের বৃদ্ধাংগুলির উপর ভর দিয়া যথাসম্ভব উঁচু হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অন্যান্য সকলে বলিতে লাগিল: "রাফে বেশ তীর ছুঁড়িতে উস্তাদ!" এই সুপারিশ করিবার ফলে তাহাকে যুদ্ধে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। তখন সামরা নামক অন্য একটি বালক ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতে লাগিল: "রাফেকে যদি লওয়া হয়, তবে আমাকে হইবে না কেন? আমি কুশ্‌তি লড়িয়া অনায়াসে রাফেকে হারাইয়া দিতে পারি।" হযরত হাসিয়া বলিলেন: "বেশ, কুশ্‌তি লড় তো!" এই কথা বলামাত্র সামরা তাল ঠুকিয়া রাফের সহিত কুশ্‌তি লড়িতে প্রবৃত্ত হইল। ইচ্ছাকৃতভাবেই এই শক্তি-পরীক্ষায় রাফে পরাজয় বরণ করিল, তখন হযরত সন্তুষ্ট চিত্তে সামরাকেও যুদ্ধে যাইবার অনুমতি দিলেন।

শনিবার প্রভাতে হযরত ওহদ পর্বতের পাদদেশে আসিয়া পৌছিলেন। পথিমধ্যে 'শেখায়েন' নামক স্থানে তাহারা রাত্রি যাপন করিলেন।

মদিনা হইতে তিন মাইল দূরে ওহদ পর্বত। সেই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গিয়া হযরত একটি সুবিধাজনক উন্নত স্থান দেখিয়া ঘাঁটি গাড়িলেন। সম্মুখে রহিল উন্মুক্ত ময়দান, পিছনে পাহাড়।

ওদিকে আবুসুফিয়ানও তাহার বিরাট বাহিনী লইয়া পূর্বেই ওহদ প্রান্তরে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মুসলমানদিগের আগমনে তাহাদের

মধ্যে উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া গেল। বীভৎস আনন্দ-রোলে তাহারা আকাশ ফাটাইতে লাগিল।

বেলালের কণ্ঠে যহরের আযান ধ্বনিত হইল। মুসলমানগণ হযরতের সহিত নামায পড়িয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বদর-যুদ্ধে হযরত সৈন্য-চালনা করেন নাই, এবার তিনি নিজেই এ-কার্যে অগ্রসর হইলেন। মুসলমানদিগের বাম পার্শ্বে পর্বতগাত্রে একটি সুড়ঙ্গ ছিল। দূরদর্শী হযরত দেখিলেন, এই স্থানটি ভালরূপে রক্ষা না করিলে শত্রুরা এই পথ দিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। এইজন্য তিনি একদল সুদক্ষ তীরন্দাজকে এই সুড়ঙ্গ পথ রক্ষার জন্য নিয়োজিত করিলেন। তাহাদিগকে কড়া হুকুম দিলেন "সাবধান, এই সুড়ঙ্গ সর্বদা রক্ষা করিবে। যদি দেখ যে, আমরা শত্রুসেনাকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছি, অথবা তাহাদের পরিত্যক্ত রণসম্ভার লুট করিয়া লইতেছি, তবুও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত যোগ দিও না।" অতঃপর তিনি অন্যান্য সৈন্যদলকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া কখন কিরূপে কী করিতে হইবে, উপদেশ দিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

প্রথমেই কোরেশদিগের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ বীর তাল্‌হা অগ্রসর হইয়া ব্যাংগস্বরে মুসলমানদিগকে আহ্বান করিল। বীরকেশরী আলি তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া এক আঘাতেই তাল্‌হার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া তাল্‌হার ভ্রাতা ওসমান ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। বীরবর হামজা আসিয়া তাহাকেও জাহান্নামে পাঠাইলেন। মুহূর্তমধ্যে দুইজন বীরের এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া কোরেশগণ আর যুগ্মযুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না, তাহারা সমবেতভাবে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। সংগে সংগে মক্কার রণরংগিণীরা দফ্ বাজাইয়া গাহিয়া উঠিল :

প্রভাতী তারার দুলালী আমরা, পুষ্পপেলব মুখ,
গুলাবী রঙীন্ শিরীন্ শারাবে ভরা আমাদের বুক।
কালো কুন্তলে কস্তুরী মাখা. কণ্ঠে মুক্তামালা
খঞ্জনসম নৃত্যচরণা নয়নে বহ্নি-জ্বালা।
ওগো বীরদল, হও আগুয়ান, রাখ স্বদেশের মান,
বিজয়ীর বেশে ফিরে এস, দিব মিলন-মালিকা দান।

কাপুরুষ সম পালাইয়া যদি আস আমাদের মাঝে,
ধিক্কার দিব, চিরদিন তরে মুখ ফিরাইব লাজে।"

আরব-তরুণীদের রূপ-শারাবের রঙীন্ স্বপ্ন কোরেশ বীরদিগের অন্তরতলে আগুন জ্বালিল। ভীম-ভৈরবে তাহারা নগণ্য মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কিন্তু মুসলিম বীরদল তাহাতে একটুও বিচলিত হইলেন না। প্রচণ্ড বেগে তাঁহারাও শত্রুসেনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এই সময়ে রসুলুল্লার একটি কার্যে মুসলিম বীরদিগের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। হযরত একখানি তরবারি তুলিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন: "কে এই তরবারির মর্যাদা রক্ষা করিবে?—এস।" তরবারির গাত্রে এই বীরবাক্য খোদিত ছিল:

"পলায়ন—সে যে ঘৃণ্য ভীরুতা, অগ্রসরেই মান,
পালাবি কোথায়? তকদির হ'তে নাহিক পরিত্রাণ।"

কতিপয় তরুণ বীর তরবারিখানি গ্রহণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু হযরত সেখানি অন্য কাহাকেও না দিয়া বীরবর আবু দোজানার হস্তে সমর্পণ করিলেন। গৌরবে আবু দোজানার অন্তর ভরিয়া গেল; বীরবিক্রমে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে [illegible] হইলেন। হামজা, আলি, আবু-দোজানা, জিয়াদ, জুবায়ের প্রভৃতি বীরগণ যেন দৈবীশক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। বহু কোরেশ সৈন্য ইঁহাদের হস্তে প্রাণ হারাইল। ইঁহাদের অলৌকিক শৌর্যবীর্য ও রণ-চাতুর্যে কোরেশদিগের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার হইল। ইঁহারা যেদিকে যাইতে লাগিলেন, সেই দিকেই কোরেশদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। কোরেশবীর খালেদ তাহার অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া দুইবার পূর্বোক্ত সুড়ঙ্গ-পথ ভেদ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সুদক্ষ মুসলিম ধানুকীরা দুইবারই তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। অবশেষে মুসলমানদিগের বীরবিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কোরেশগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। উহুদ ক্ষেত্রে যেন বদরের পুনরভিনয় হইল।

কোরেশগণ পলাইতেছে দেখিয়া মুসলমানগণ তাহাদিগকে তাড়া করিয়া লইয়া চলিলেন এবং তাহাদের পরিত্যক্ত রসদপত্র লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। এই আশাতীত সাফল্য লক্ষ্য করিয়া সুড়ঙ্গ-পথে নিয়োজিত ধানুকীরা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। হযরতের আদেশ ভুলিয়া গিয়া

তাঁহাদের প্রায় সকলেই শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ৫০ জনের মধ্যে মাত্র ১২ জন হযরতের আদেশমত সুড়ঙ্গ পাহারায় নিযুক্ত রহিলেন, অবশিষ্ট সকলেই লুণ্ঠনকার্যে যোগ দিবার জন্য ছুটিয়া গেলেন।

সুচতুর খালিদ দূর হইতে মুসলমানদিগের এই মারাত্মক ভ্রম লক্ষ্য করিল। মুহূর্তমধ্যে সে তাহার অশ্বারোহী সেনাদলকে ঘুরাইয়া আনিয়া সেই অরক্ষিত গিরিবর্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুষ্টিমেয় মুসলিম তীরন্দাজকে অনায়াসে সে পরাজিত ও নিহত করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। "ওলো ওজ্জা!" "ওলো হোবল!" বলিয়া কোরেশগণ বিকট জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া পলায়নপর অন্যান্য কোরেশ সৈন্যও ফিরিয়া দাঁড়াইল। ভূলুণ্ঠিত কোরেশ পতাকা আবার তাহারা তুলিয়া ধরিল। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মুসলমানদিগের তখন কী ভীষণ অবস্থা! একে তো শৃঙ্খলাহীন; তাহাতে আবার উভয় দিক হইতে আক্রান্ত। বীরদল দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। যিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে থাকিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাও কি হয়! বহু বীর নিরুপায় হইয়া প্রাণ হারাইলেন। অধ্যাপক মোসায়েব ও বীরবর হামজা এইবার শহীদ হইলেন।

হযরত দূর হইতে এই বিপদ লক্ষ্য করিয়া মুসলমানদিগকে পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সে আহ্বান কাহারও কর্ণে পৌঁছিল, কাহারও পৌঁছিল না। অনেকে পর্বতোপরি উঠিয়া আশ্রয় লইলেন। এদিকে হযরতের জীবন বিপন্ন দেখিয়া একদল বিশ্বস্ত ভক্ত দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। কোরেশগণ তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকেই তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিল। চারিদিক হইতে তীর, তরবারি, বর্শা এবং লোষ্ট্র বর্ষিত হইতে লাগিল। মুষ্টিমেয় মুসলিম বীর সকল ভুলিয়া প্রাণপণে হযরতকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ঘন দুর্যোগে—এই কঠিন সংকটমুহূর্তে ভক্তবৃন্দ কী অনুপম আত্মত্যাগই না দেখাইলেন! নিজেদের দেহকে ঢাল করিয়া তাঁহারা হযরতের জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু সাহাবা এই সময় মরিয়া অমর হইলেন।

কিন্তু এত করিয়াও হযরতকে তাঁহারা অক্ষত রাখিতে পারিলেন না। শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ও লোষ্ট্রনিক্ষেপে হযরতের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। শিরস্ত্রাণের এক স্থানে কাটিয়া লহু ঝরিতে লাগিল। সম্মুখের চারিটি দাঁত

ভাঙিয়া গেল। এইখানেই শেষ নয়। হামজার হত্যাকারী দুরাত্মা ইবনে-কামিয়া ছুটিয়া আসিয়া হযরতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ভীম বেগে তরবারির আঘাত করিল। তাল্‌হা-বিন্‌-ওবাইদুল্লাহ্‌ সে আঘাত আপন হস্ত দ্বারা রোধ করিলেন। ফলে তাঁহার অংগুলিগুলি কাটিয়া তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। হযরতের শিরস্ত্রাণেও সে আঘাত লাগিল। শিরস্ত্রাণ কাটিয়া গিয়া তদ্‌সংলগ্ন দুইটি লৌহকড়া হযরতের কপালে গভীরভাবে ঢুকিয়া গেল। হযরত হতচেতন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সেই পতন দেখিয়া উৎসাহের আতিশয্যে 'মুহম্মদ নিহত হইয়াছে' বলিয়া ইবনে-কামিয়া উল্লাসধ্বনি করিতে করিতে কোরেশদলে ফিরিয়া গেল।

'মুহম্মদ নিহত হইয়াছে' এই সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দিকে এক বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টি করিল। মুসলিম সৈন্যদিগের মধ্যে অনেকে নিরুৎসাহ ও নিরাশ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। আবার অনেকে মনে করিতে লাগিলেন: "আল্লার রসুলই যদি কাফিরদিগের হস্তে প্রাণ হারাইলেন, তবে আর আমাদের এ-জীবন রাখিয়া লাভ কী? যে-সত্য, যে-আদর্শের জন্য তিনি শহীদ হইলেন, সেই সত্য ও সেই আদর্শের জন্য আমরাও তাঁহার অনুগমন করিব।" এই বলিয়া অধিকতর দৃঢ়তার সহিত তাঁহারা শত্রুনিপাতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহাবাদিগের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধ, তাঁহারা এ সংবাদে আদৌ বিচলিত হইলেন না। বলিলেন: "ইহাতে আর আশ্চর্যের কী আছে? হযরত একজন প্রেরণাপ্রাপ্ত রসুল বৈ তো নন। তাঁহার পূর্ববর্তী অন্যান্য সমস্ত নবী-রসুলেরও তো মৃত্যু হইয়াছে। সত্যের যে আলো তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আমরা এখন পথ চলিব।" ইহাই বলিয়া তাঁহারা অন্যান্য সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

পক্ষান্তরে এই মিথ্যা ঘোষণার চমৎকার একটি সুফলও ফলিল। হযরতের মৃত্যু-সংবাদই হযরতের জীবন-রক্ষার উপায়স্বরূপ হইল। কোরেশগণ যে মুহূর্তে এই সংবাদ শুনিল, সেই মুহূর্ত হইতেই তাহাদের আক্রমণের ক্ষিপ্রতা কমিয়া গেল। মুহম্মদই তো তাহাদের সকল অনিষ্টের মূল। তাহার জীবনই তো তাহাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। সেই যখন নিহত, তখন আর যুদ্ধ কিসের? শত্রুতা কিসের? ইহাই ভাবিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে আপন শিবিরপানে ফিরিয়া চলিল।

এদিকে হযরত ক্ষণকাল পরে চৈতন্যলাভ করিলেন। তাল্‌হা নিজে ভীষণভাবে আহত হইলেও রসূলুল্লাকে ধরিয়া তুলিলেন। অন্যান্য সাহাবারাও হযরতের সেবায় ছুটিয়া আসিলেন। সকলে মিলিয়া হযরতকে শোয়াইয়া দিয়া তাঁহার মাথা হইতে কড়াদ্বয় টানিয়া বাহির করিলেন। দ্রুতবেগে রুধির ধারা বহিতে লাগিল। সেই পবিত্র রক্তে হযরতের মুখখানি রঙিন হইয়া উঠিল। আলি তাড়াতাড়ি নিজের ঢাল ভরিয়া ঝরণা হইতে পানি লইয়া আসিলেন। হযরত তাহা পান করিতে পারিলেন না। সেই পানি দিয়া তাঁহার মুখখানি ধোয়াইয়া দেওয়া হইল। এই অবস্থায় তিনি কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন: "হায়! যাহারা তাহাদের কল্যাণকামী পয়গম্বরকে এমন করিয়া আঘাত হানিতে পারে, তাহারা কী করিয়া জগতে উন্নতি করিবে? হে আমার প্রভু, আমার জাতিকে ক্ষমা কর। তাহারা অজ্ঞ, তাহারা ভ্রান্ত।"

কী বিরাট মহানুভবতা! নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য নাই, আপন সেনাদলের কথা মনে নাই, শত্রুর প্রতি অভিশাপ নাই, প্রতিহিংসার বাসনা নাই। সকল আঘাত, সকল বেদনা, সকল গ্লানি ভুলিয়া গিয়া মহামানব অজ্ঞ মানুষের দুষ্কৃতির জন্য চিন্তাকুল। পাছে আল্লার কোন অভিশাপ এই মহাপাতকীদের শিরে নামিয়া আসে, এই ভয়ে তিনি ব্যাকুল! এমন না হইলে কি 'রহমতুল্লিল্ আলামিন' হওয়া যায়?

কোরেশ দলপতিগণ এইবার হযরতের মৃতদেহের সন্ধান করিতে ব্যস্ত হইল। ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাহারা মুসলমানদিগের লাশ পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে কোরেশগণ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল। বহু মুসলিম শহীদের পবিত্র দেহকে তাহারা নানাভাবে বিকৃত করিয়া নিজেদের পৈশাচিক হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। বীরবর হামজার মৃতদেহ পাইয়া আবুসুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিকট হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। পিশাচিনী হামজার অংগপ্রত্যংগ কাটিয়া গলার মালা করিল, তারপর বুকের উপর বসিয়া হৃৎপিণ্ডটি টানিয়া বাহির করিয়া চিবাইতে লাগিল।

হযরতের মৃতদেহের কোন সন্ধান না পাইয়া কোরেশ নেতৃবৃন্দ তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল। অবশেষে আবুসুফিয়ান পর্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া "মুহম্মদ আছ? আবুবকর আছ? ওমর আছ?" বলিয়া বারে বারে উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিল। মুসলমানগণ পর্বতের উপর

হইতে সে ডাক শুনিতে পাইলেন বটে, কিন্তু কোন জবাব দিলেন না। তখন আবুসুফিয়ান আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল: "সবগুলি নিপাত হইয়াছে।" ওমর এই কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন: "ওরে হতভাগা, তুই মিথ্যা কথা বলিতেছিস্। তোকে শাস্তি দিবার জন্য ইহাদের সকলকেই আল্লাহ্ বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।" কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর আবুসুফিয়ান বলিতে লাগিল: "আচ্ছা থাকো, আগামী বৎসর বদর-প্রান্তরে আবার তোমাদের সংগে বুঝাপড়া হইবে।" ওমর বলিলেন: "বেশ, তাহাই হইবে, আমরা ইহার জন্য প্রস্তুত আছি।"

শাসাইতে শাসাইতে আবুসুফিয়ান সদলবলে মক্কার দিকে ফিরিয়া চলিল।

শত্রুগণ দৃষ্টিসীমার বাহিরে গেলে হযরত অনুচরবৃন্দের সহিত নিম্নে অবতরণ করিলেন। মুসলমানদের ক্ষতির পরিমাণ এই সময় সঠিকভাবে নিরূপিত হইল। দেখা গেল: ৭০ জন বীর শহীদ হইয়াছেন। কোরেশ-দিগের নিহতের সংখ্যা ২৩।

পরিচ্ছেদ : ৪১

জয় না পরাজয় ?

ওহুদ যুদ্ধে কাহারা জয়ী হইল ? কোরেশ, না মুসলমান ?

বাহ্যদৃষ্টিতে তো মনে হয়, মুসলমানদেরই পরাজয় ঘটিয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি তাই ?

না। আমাদের মতে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে নাই। তাহাদের কোন ক্ষতিও হয় নাই।

এ কথা বুঝিতে হইলে আর একটি কথা আগে বুঝা দরকার। আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, হযরতের জীবনে যতগুলি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটির মূলেই আছে আল্লার একটা প্রচ্ছন্ন ইংগিত—একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রেরণা। কোনও ঘটনাই বিফলে যায় নাই—প্রত্যেকটিই একটা চরম লক্ষ্যের দিকে হযরতকে আগাইয়া দিয়াছে। কাজেই, কোন ঘটনাকেই সম্পূর্ণ পৃথক বা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় আমাদের নাই। সেই চরম লক্ষ্য এবং পরিণতির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াই প্রতিটি ঘটনার ফলাফল আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, হযরতের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া সত্যের সহিত মিথ্যার, আলোকের সহিত অন্ধকারের একটা ধারাবাহিক সংগ্রাম চলিয়াছে। এর পশ্চাতে রহিয়াছে একটা বিরাট পরিকল্পনা—একটা বিরাট আদর্শের প্রেরণা। এ সংগ্রামের শেষ পরিণতি কোথায় কিরূপ করিয়া হইল, সত্য জিতিল কি মিথ্যা জিতিল, হযরতের জীবন-সাধনা সার্থক হইল কি বিফলে গেল,—ইহাই হইবে আমাদের সকল বিচারের মাপকাঠি। মাঝখান হইতে কোন একটা ঘটনাকে তুলিয়া লইয়া বিচার করিতে গেলে হযরতের সত্য স্বরূপ পাঠকের চোখে ধরা পড়িবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, বদর-যুদ্ধের সংগে সংগে ইসলাম নূতন পথে চলিয়াছে। এ-পথ সংঘর্ষের পথ—অগ্রগতির পথ—আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ। এ-পথের এক প্রান্তে বদর, অপর প্রান্তে বায়তুল্লা—কা'বা। সেই শেষ মঞ্জিলে না পৌঁছিয়া—আল্লার বাণীকে সুপ্রতিষ্ঠিত না করিয়া হযরত কিছুতেই শান্ত হন নাই। কাজেই, আমরা হযরতের জীবনের সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহকেই

একটা অখণ্ড রূপ দিয়া দেখিতে চাই। একটা মহাযুদ্ধের মধ্যে ছোটখাটো পরাজয় বা ভাগ্যবিপর্যয় থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না। সমগ্রের ফলাফল দেখিয়াই তাহার চূড়ান্ত ফল নিরূপিত হয়। হযরতের জীবন-সংগ্রামকেও সেই দৃষ্টিভংগিতে দেখিতে হইবে।

অতএব, ওহুদ যুদ্ধের ফলাফল ওরূপভাবে বিচার করিলে চলিবে না। ওহুদ-যুদ্ধের উদ্দেশ্য কী ছিল এবং সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে, তাহাই আমাদিগকে সর্বপ্রথম বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস: কোরেশদিগকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করিবার জন্য আল্লাহ্ মুসলমানদিগকে ওহুদ-প্রান্তরে টানিয়া আনেন নাই। মুসলিম বীরবৃন্দের শৌর্যবীর্য পরীক্ষারও এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না; সে পরীক্ষা বদর-যুদ্ধেই হইয়া গিয়াছে। আল্লার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। মুসলমানদিগের ঈমান পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপে গঠন করিয়া দেওয়াই ছিল এ-যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য। শত্রুজয় অপেক্ষা তাহারা আত্মজয় করিতে পারে কিনা, বিপদের দিনে ধৈর্য ধরিয়া আপন কর্তব্য পালন করিতে সক্ষম কিনা, জয়ের সংগে পরাজয়কেও তাহারা সঠিকভাবে গ্রহণ করিতে জানে কিনা—সত্যের জন্য সত্যই তাহারা মরণ-বরণ করিতে প্রস্তুত কিনা—ইহারই পরীক্ষা ছিল এ-যুদ্ধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। ওহুদ-যুদ্ধে মুসলমানগণ নিজেদের আত্মরূপ দেখিতে পাইয়াছে। কোথায় তাহাদের গলদ আছে, কোথায় তাহাদের দুর্বলতা আছে, এই যুদ্ধে পাওয়া গিয়াছে তাহারই সন্ধান। বদর-বিজয়ের পর হইতে মুসলিম গাজীগণের অনেকে নিশ্চয়ই খানিকটা বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল—যাহার সংশোধনের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। পাঠক জানেন বদর ও ওহুদ-যুদ্ধের গাজীগণই পরবর্তীকালে ইসলামের বিশ্ববিজয়-অভিযান চালনা করিয়াছিলেন। সিরিয়া, পারস্য, মিশর, স্পেন প্রভৃতি দেশসমূহ ইঁহাদের হস্তেই বিজিত হইয়াছিল। ভবিষ্যতের সেই বীরবাহিনী ওহুদের ময়দানে অগ্নিস্নান করিয়াই শুদ্ধ-বুদ্ধ ও পবিত্র হইয়াছিলেন। এই দুঃখদহন না ঘটিলে এই নৈতিক পাঠ তাঁহারা আর কোথা হইতে গ্রহণ করিতেন?

বস্তুতঃ ওহুদ-যুদ্ধ মুসলমানদিগের পক্ষে বিফলে যায় নাই। মুসলমান-দিগের নবীন জাতীয় জীবন গঠনের যথেষ্ট উপকরণ ছিল এইখানে। অনেক

কিছু নৈতিক শিক্ষা তাঁহারা এই যুদ্ধে লাভ করিয়াছিলেন। আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :

(১) প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, তরুণদল হযরত ও অন্যান্য সাহাবাদিগের অভিমতকে অগ্রাহ্য করিয়া মদিনার বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। যুদ্ধজয় অপেক্ষা লুণ্ঠনের লোভই ছিল অনেকের মধ্যে প্রবল। হযরতের কড়া হুকুম সত্ত্বেও তীরন্দাজদিগের স্থানত্যাগই তাহার প্রমাণ। এই দুইটি কার্যই তারুণ্যের উগ্র উচ্ছ্বাসের কুফল। নেতার আদেশ ও অভিমতের প্রতি এহেন অশ্রদ্ধা যে ভয়ংকর দোষের, ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানগণ তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ হইতে তাঁহারা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালের কোন যুদ্ধে আর তাঁহাদের এরূপ ভুল হয় নাই। কাজেই, অমংগলের মধ্য দিয়া মুসলমানদিগের মংগলই সাধিত হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে।

(২) যুদ্ধজয়ের আগের দিন অপেক্ষা পরের দিন অত্যন্ত কঠিন। যুদ্ধজয়ের পরে সেনাপতি ও সৈন্যদিগকে তাই অধিকতর সতর্ক থাকিতে হয়। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতার সৈন্যদল যুদ্ধকালে গোপন থাকে, জয়ের পরে তাহারা যুদ্ধে নামে। এই গুপ্ত শত্রুকে শেষ না করা পর্যন্ত কোন জয়ই সুনিশ্চিত নয়। ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানেরা এ সত্য তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

(৩) নেতার আদেশ-নিষেধ পালন করিলে যে কী সুফল ফলিতে পারে এবং লংঘন করিলে যে কী অমংগল নামিয়া আসে, মুসলমানগণ যুগপৎভাবে তাহা এখন দেখিতে পাইয়াছেন, বিজয় তো তাঁহাদের হাতের মুঠার মধ্যেই আসিয়াছিল, কিন্তু নিজেদের দুষ্কৃতির ফলেই সে তাঁহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

(৪) বদর-যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ীর ভূমিকায় দেখা দিয়াছিলেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বিজয়লাভ কোন মানুষের বা কোন জাতির ভাগ্যেই ঘটে না। জীবনে জয়-পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদ ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াই জাতিগঠন সম্পূর্ণ হয়। কাজেই দুঃখ-দুর্দিন দেখিয়া ভয় করিলে চলে না। এহেন দুঃসময়ে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, কেমন করিয়া কর্তব্য পালন করিতে হয়, কেমন করিয়া ধৈর্য ধারণ

করিতে হয়, এ শিক্ষা গঠনোন্মুখ মুসলমান জাতি সর্বপ্রথম ওহদ-ক্ষেত্রেই লাভ করিয়াছিলেন। চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও মুষ্টিমেয় মুস্লিম সৈন্য কী চমৎকারভাবেই না অগণিত ও সুসজ্জিত শত্রুসেনার সকল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এই অগ্নি-পরীক্ষার ফলে শুধু যে মুসলিম গাজীগণ নিজেরাই উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। পরাজয় বা ভাগ্য-বিপর্যয়ের দিনে পরবর্তীকালে মুসলমান জাতি কেমনভাবে আত্মস্থ হইবে, কেমন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনকে পুনর্গঠিত করিবে—সে আদর্শও আমরা পাই এইখানে। সব যুদ্ধেই হযরত যদি জয়ী হইতেন, তবে সংকট-দিনের আদর্শ আমরা কোথায় পাইতাম?

(৫) হযরত নিজেও এই দুর্যোগের মধ্যে নেতৃত্বের এক অতুলনীয় আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছিলেন। সংকটমুহূর্তে তিনি একটুও বিচলিত হন নাই। সমগ্র জীবনের মধ্যে এই ওহদ যুদ্ধেই বোধ হয় তিনি সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। শত্রুর শানিত তরবারি তো তাঁহার মস্তকে নিক্ষিপ্তই হইয়াছিল। শিরস্ত্রাণ কাটিয়া গিয়া দুইটি লৌহ-কড়াও তাঁহার কপালে ঢুকিয়া গিয়াছিল। আবুদোজানা আপন হস্ত দ্বারা সে আঘাতকে বাধা না দিলে তখনই হয়ত হযরতের জীবন-লীলার অবসান হইত। এমনভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াও হযরত আপন কর্তব্য পালন করিতে ভুলেন নাই। বিক্ষিপ্ত মুসলিম সৈন্যদিগকে তিনিই পুনরায় একত্রিত করিতেছিলেন এবং সেনাদলের নৈতিক বল (morale) তিনিই রক্ষা করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় পড়িলে কিরূপ ধৈর্য ও তিতিক্ষার প্রয়োজন, হযরত সেদিন তাহা মুসলমানদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

শুধু তাই নয়। জীবন-স্বপ্নকে সফল করিতে হইলে—আদর্শকে জয়যুক্ত করিতে হইলে—মানুষকে যে মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্তও পৌছিতে হয়, ইঞ্চ-পরিমাণ ব্যবধানে দাঁড়াইয়াও যে জীবনকে মৃত্যুর কবল হইতে ছিনাইয়া আনিতে হয়, এই বাণীই হযরত সেদিন আমাদিগকে দিয়াছেন। জীবন-সংগ্রামে যখনই মন আমাদের নিরাশার আঘাতে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিবে, তখনই মনে পড়িবে আমাদের ওহদ ময়দানে হযরতের এই অতুলনীয় ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠার কথা—সত্য ও আদর্শের জন্য এই জীবন-মরণ সংগ্রামের কথা—আল্লার উপর তাঁহার এই অবিচলিত বিশ্বাস ও ঈমানের কথা। হযরত না হারিলে কেমন করিয়া আমরা এই সম্পদ পাইতাম?

(৬) আক্রমণকারীর ভূমিকা হইতে যখন মুসলমানগণ অকস্মাৎ আক্রান্তের ভূমিকায় নামিলেন, তখন তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য ও লক্ষ্য হইল আত্মরক্ষা করা। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা শীঘ্রই তাঁহাদিগকে ভুলিতে হইল। পরীক্ষা আরও কঠোর ও সূক্ষ্মতর হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা দেখিলেন, শুধু আত্মরক্ষা করিলেই চলিবে না, তাঁহাদের প্রাণপ্রতিম রসুলকেও বাঁচাইতে হইবে। ইহার জন্য চাই আত্মবিসর্জন। কাজেই তাঁহাদিগকে যুগপৎভাবে আত্মরক্ষাও করিতে হইল, আবার সংগে সংগে আত্মত্যাগও করিতে হইল। এ-বড় কঠোর পরীক্ষা। কিন্তু এতবড় পরীক্ষাতেও মুসলমানগণ বিভ্রান্ত হন নাই। সকলে না হউক, অন্ততঃ একদল মুসলমান এ-পরীক্ষায় যোগ্যতার সাহিতই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা পলায়ন করেন নাই বা ভীত হন নাই; নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া তাঁহারা হযরতের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। কাজেই বলা যাইতে পারে; মুসলমানদিগের ঈমানের পরীক্ষার এখানে একেবারে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।

(৭) হযরতের যদি মৃত্যুই ঘটে, তবে মুসলমানগণ কোন্ আলোকে ইহা গ্রহণ করিবে—তাঁহার নির্দেশিত পথেই চলিবে, অথবা উদ্ভ্রান্ত হইয়া সে-পথ পরিত্যাগ করিবে—মুসলমানদিগকে এ-পরীক্ষাও এখানে দিতে হইয়াছে। হযরতের মৃত্যুসংবাদ যখন প্রচারিত হইল, তখন যাঁহারা দুর্বলচিত্ত, তাঁহারা যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু যাঁহারা আদর্শ মুসলমান, তাঁহারা একটুও বিচলিত হইলেন না। হযরতের প্রদত্ত বাণী, আদর্শ ও আলোকেই তাঁহারা আঁকড়িয়া ধরিয়া আপন কর্তব্য পালন করিতে লাগিলেন।

বস্তুতঃ ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানদিগের নিরাশ হইবার কোনই কারণ ছিল না। এইখানে তাঁহারা অনেক ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন। ওহদ-যুদ্ধে যাত্রা করিবার সময় তাঁহারা যেরূপ মুসলমান ছিলেন, ফিরিবার সময় তদপেক্ষা সুন্দর ও উন্নত মুসলমান হইয়া ফিরিয়াছিলেন।

এ তো গেল যুদ্ধের ভিতরকার দিক। বাহিরের দিকটাও দেখা যাউক। এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও দেখা যাইবে, কোরেশগণ এ-যুদ্ধে প্রকৃত জয়লাভ করে নাই।

৩০০০ সুসজ্জিত কোরেশ সৈন্যের মুকাবেলায় মাত্র ৭০০ মুসলিম সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছে। তাহার মধ্যেও আবার মাত্র ২ জন অশ্বারোহী

আর ৭০ জন বর্মধারী, অস্ত্রশস্ত্রও নিতান্ত মামুলী ধরণের। অনুপাত ধরিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ১ জন মুসলমানকে প্রায় ৫ জন কোরেশের বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, কোরেশগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারে নাই। রণে ভংগ দিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বিজয়ের লক্ষণ নহে।

মুসলমানদিগের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সময়েই বা কোরেশগণ কী বাহাদুরী দেখাইল? মুসলমানদিগের নির্বুদ্ধিতার ফলে ৭০ জন বীর অকারণে প্রাণ হারাইলেন বটে, কিন্তু কোরেশদের কোন্ উদ্দেশ্য ইহাতে সফল হইল? না তাহারা হযরতকে বধ করিতে পারিল, না আবুবকর, ওমর, আলি বা অন্য কোন মুসলিম বীরকে বন্দী করিতে সক্ষম হইল, না ভক্তগণের উপর হইতে হযরতের অসাধারণ প্রভাবকে তাহারা ক্ষুন্ন করিতে পারিল। ওহদ-যুদ্ধের পূর্বেও হযরত যেমন শক্তিমান ছিলেন, পরেও ঠিক তেমনি শক্তিমান রহিলেন; বরং মনোবল আরও বলিষ্ঠ হইল।

মুসলমানগণ যদি পরাজিতই হইবে, তবে কোরেশগণ মদিনা আক্রমণ করিল না কেন? মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যেই তো তাহারা এই বিরাট অভিযান আনিয়াছিল। ওহদ-যুদ্ধে এরূপ আশাতীত সাফল্য লাভের পরেও তাহারা তবে মক্কায় ফিরিয়া গেল কেন?

কোরেশগণ সত্যই যে মুসলমানদিগের উপর বিজয়লাভ করিতে পারে নাই, কোরেশ-নেতা আবুসুফিয়ান তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল, নতুবা যুদ্ধশেষে ওহদ পর্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া সে কেন ওমরকে এই কথা বলিয়া শাসাইবে: "আচ্ছা, আগামী বৎসর পুনরায় বদরে তোমাদের সংগে বুঝাপড়া হইবে।"

ঐতিহাসিকগণ কোরেশদিগের নিহতের সংখ্যা মাত্র ২৩ জন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। একা হামজার হস্তেই তো ৩১ জন কোরেশ সেনা নিহত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বীরবর আলি একাই ৮ জন কোরেশ সৈন্যকে নিহত করেন। সাদ্-বিন্ রাবী, নযর-বিন্-আউস প্রমুখ বীরগণের হস্তেও বহু কোরেশ নিহত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বীরকেশরী আবু-দোজানা— যিনি হযরত-প্রদত্ত অসিহস্তে অনিরুদ্ধ গতিতে শত্রুনিপাত করিতেছিলেন— তাঁহার হস্তেই বা কত না শত্রু নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল! দূর হইতে আবু-

দোজানার অসাধারণ বীরত্ব ও শত্রুনিপাতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া স্বয়ং হযরত বলিয়াছিলেন: যদি জিহাদ না হইয়া অন্য কোন ব্যাপার হইত, তবে আল্লাহ্‌তালা আবু-দোজানার এরূপ ভীষণ নরহত্যা দেখিয়া নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইতেন।

যুদ্ধের প্রথমার্ধে ৩০০০ কোরেশ সৈন্য যখন পালাইতে আরম্ভ করিল, তখন নিশ্চয়ই মাত্র ২৩ জন কোরেশকে (তখনকার হিসাব মতে তাহারও কম) নিহত দেখিয়াই তাহারা রণে ভংগ দেয় নাই। তাহাদের হতাহতের সংখ্যা নিশ্চয়ই এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার দরুণ তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের শেষাংশে যে সমস্ত মুসলিম বীর নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও যে এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই মরণ-বরণ করিয়াছিলেন, এমনও নয়। অনেক শত্রুকে হতাহত করিবার পরই তাঁহারা শহীদ হইয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এই যুদ্ধ অলিদ, আবু উমায়া, তাল্‌হা, হিশাম, উবায়া বিন্ খালাফ, আবদুল্লাহ্-বিন্ হামিদ, আবু সৈয়দ বিন্-আবুতালহা, মাসাফী, জালাস প্রমুখ ১৭ জন নেতৃস্থানীয় কোরেশবীর নিহত হইয়াছিলেন। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে সাধারণ সৈন্য যে কত মরিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বদর যুদ্ধে মুসলমান ও কোরেশদিগের সংখ্যার অনুপাত ছিল ১:৪। ওহদ-যুদ্ধের অনুপাতও তদ্রূপই ছিল। কিন্তু বদরে নিহতের অনুপাত ছিল ১৪:৭০ অর্থাৎ ১:৫। বদরের সেই সব যোদ্ধাই ওহদে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই ৭০ জন মুসলিম বীর শহীদ হইয়া থাকিলে হিসাব মত ইহার ৫ গুণ কোরেশ সৈন্য নিহত হইবার কথা। সে ক্ষেত্রে কমসে কম ইহার দ্বিগুণ যে নিহত হইয়াছিল, এ অনুমান অনায়াসেই করা যায়।

কিন্তু তবু বলিতেই হইবে, ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানদিগের পরাজয়ই ঘটিয়াছিল। এ কথা স্বীকার করায় কোন অগৌরব নাই। এ-পরাজয় আল্লার ইচ্ছাকৃত। অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি এই বিধান করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের অনুমান নয়। নিম্নে আমরা পবিত্র কুরআন হইতে ওহদ-যুদ্ধ সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি; তাহা হইতেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে সূরা "আলে-ইমরানে" আল্লাহ্‌তালা অনেক-কিছু বলিয়াছেন।

সেখান হইতে কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করিতেছি। সেই সব আয়াত হইতেই ওহদ যুদ্ধের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও জয়পরাজয় সম্বন্ধে পাঠক একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন।

ওহদ-যুদ্ধের প্রারম্ভে মুসলমানদিগের মধ্যে যে সত্যই মতানৈক্য ঘটিয়াছিল এবং অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জনাই যে যুদ্ধে আসিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন:

"এবং যখন তুমি প্রত্যুষে আপন পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলে এবং যুদ্ধের জন্য মুসলমানদিগকে সজ্জিত করিলে—এবং আল্লাহ্ শ্রোতা এবং জ্ঞাতা—যখন তোমাদের মধ্য হইতে দুইটি দল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল যে, তাহারা কাপুরুষতা দেখাইবেই এবং আল্লাহ্ উভয়েরই অভিভাবক এবং আল্লার উপরেই বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস স্থাপন করিবে।" —(৩: ১১০-১১১)

ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে এবং যথাযথ কর্তব্য পালন করিলে যে আল্লাহ্ মুসলমানদিগকে সাহায্য করিবেন, সে কথা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন:

"যদি তোমরা ধৈর্য ধরিয়া থাক এবং (স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে) সজাগ থাক, এবং তাহারা (শত্রুগণ) যদি হঠাৎ তোমাদের উপর আসিয়া আপতিত হয়, তবে তোমাদের প্রভু পাঁচ হাজার ধ্বংসকারী ফিরিশ্‌তা পাঠাইয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।" —(৩: ১১৮)

করুণাময় আল্লাহ্ কোরেশদিগকে যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে চান নাই, শুধু সামান্য একদলকে ধ্বংস করিয়া অবশিষ্ট সকলকে সুপথে আনাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন:

"যাহাতে তিনি (আল্লাহ্) অবিশ্বাসীদিগের মধ্য হইতে একটি দলকে (দলপতিদিগকে) নিপাত করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাহারা নিজেদের অভীষ্ট সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে।"

—(৩: ১২৬)

বলা বাহুল্য, বদর এবং ওহদ যুদ্ধে ঠিক আল্লার এই উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়াছে। যে সমস্ত কোরেশ নেতা হযরতকে হত্যা করিবার জন্য বিশেষভাবে ষড়যন্ত্র করিতেছিল এবং হযরতের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে যাহারা প্রধান পাণ্ডা ছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই বদর ও ওহদ-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। বাকী ছিল আবুসুফিয়ান, জবায়ের-বিন্ মুতাএম, হাকিম-বিন্ হিজাম। ইহারা

তিনজন পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানগণ যে প্রথমতঃ কোরেশদিগের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন :

"কি আশ্চর্য! যখন তোমাদের উপর মুসিবৎ আসিল—এবং তোমরাও বিধর্মীদিগকে দুইবার অনুরূপ মুসিবতে ফেলিয়াছিলে—তখন তোমরা বলিতে লাগিলে : কোথা হইতে এই মুসিবৎ আসিল? বল (হে মুহম্মদ) ইহা তোমাদের হইতেই আসিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" —(৩ : ১৬৩)

কোরেশদিগকে পরাজিত করিবার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াও যে মুসলমানগণ তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই, বরং উল্টা তাহাদের হাতে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে হয়ত মুসলমানগণের মনে খানিকটা ক্ষোভের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। ন্যায়বিচারক আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে মুসলমানদিগকে বলিয়া দিতেছেন :

"যদি আঘাত পাইয়া তোমরা দুঃখ পাইয়া থাক, তবে মনে রাখিও তোমরাও বিধর্মীদিগকে অনুরূপ আঘাত দিয়াছ; এবং আমরা পর্যায়ক্রমে মানুষের মধ্যে এই (ভাগ্য বিপর্যয়ের) দিনগুলি আনিয়া থাকি যাহাতে আল্লাহ্ জানিতে পারেন কাহারা প্রকৃত বিশ্বাসী; এবং আল্লাহ্ অত্যাচারীদিগকে ভালবাসেন না, এবং যাহাতে তিনি বিশ্বাসীদিগকে খাঁটি করিয়া লইতে পারেন এবং অবিশ্বাসীদিগকে মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।" —(৩ : ১৩৯-৪০)

মুসলমানদিগের ঈমান পরীক্ষা করাও যে এই যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ্ তা'লা তাহাও স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছেন :

"তোমরা কি মনে কর যে তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করিবে—যতক্ষণ না আল্লাহ্ (তোমাদের মধ্য হইতে) সেই সব লোককে চিনিয়া লন—যাহারা কঠোর কর্তব্যপরায়ণ এবং ধৈর্যশীল?" —(৩ : ১৪১)

"এবং নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুকে না দেখিয়াই মুখে মৃত্যুকামনা করিয়াছিলে; তাই তোমরা যখন মৃত্যুকে দেখিলে, তখন তাকাইয়া রহিলে।" —(৩ : ১৪২)

হযরতের নিহত হইবার সংবাদে মুসলমানদিগের অনেকের মধ্যেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে কী সুন্দর শিক্ষাই না দিতেছেন :

"এবং মুহম্মদ একজন প্রেরিত পুরুষ বৈ তো নন। তাঁহার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও মারা গিয়াছেন। অতএব তিনি যদি মারাই যান বা নিহত হন, তবে কী তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে?" —(৩ : ১৪৩)

মুসলমানদিগের মধ্যে সকলেই নিষ্কাম খোদা-প্রেমের তাড়নায় ওহুদ-যুদ্ধে আসেন নাই এবং অনেকের মনেই যে 'দুনিয়ার পুরস্কার' লাভের চিন্তাই প্রবল হইয়া জাগিয়া ছিল, আল্লাহ্ সে গোপন কথাও প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন:

"এবং যে-কেহ এই দুনিয়ার পুরস্কার চায়, তাহাকেও আমরা তাহাই দেই এবং যে কেহ পরকালের পুরস্কার চায়, তাহাকেও আমরা তাহাই দেই। আমরা কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিব।" —(৩ : ১৪৪)

উপরে যে সমস্ত আয়াত উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতে পাঠক নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন, ওহুদ-যুদ্ধের অনেকগুলি উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আল্লাহ্ মুসলমানদিগের এইরূপ ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটাইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ ওহুদ-যুদ্ধ সত্যই মুসলমানদিগের এক কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা। এই যুদ্ধে মুসলমানদিগের কোনই ক্ষতি হয় নাই; বরং এক বিরাট নৈতিক সম্পদ তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। যুদ্ধের দ্বারা যে জাতি-গঠন হয় এবং পরাজয়ের মধ্যেও যে জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিহিত থাকে, ওহুদ-যুদ্ধে আমরা তাহাই দেখিলাম।

পরিচ্ছেদ : ৪২

ওহদ-যুদ্ধের শেষে

হযরতের নিহত হইবার সংবাদ যখন মদিনায় পৌঁছিল, তখন সর্বত্র একটা শোকের মাতম উঠিল। গৃহ ছাড়িয়া সকলে ওহদের দিকে ছুটিয়া চলিল। মুসলিম নারীরা পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। উম্মে-আয়মান নাম্নী জনৈক মহিলা একজন মুসলিম সৈন্যকে নগরাভিমুখে আসিতে দেখিয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন: "কাপুরুষ! তোমাদের রসুল মারা গিয়াছেন, আর তোমরা গৃহে ফিরিতেছ? দাও তোমার অস্ত্র, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছি?"

বনি-দিনার গোত্রের একটি মহিলা উন্মাদিনীর বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। কতিপয় মুসলমানের সাক্ষাৎ পাইয়া ব্যগ্র কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: "খবর কী?"

"কি আর বলি, তোমার ভ্রাতা শহীদ হইয়াছেন।"

"সোভান আল্লাহ্! তাঁহার আত্মার কল্যাণ হউক! তারপর?"

"তোমার স্বামী শহীদ হইয়াছেন!"

"ইন্নালিল্লাহে! তাঁহার আত্মার কল্যাণ হউক!"

"তোমার পিতাও শহীদ হইয়াছেন!"

"স্নেহময় পিতাও?——তারপর?——হযরতের খবর কী, তাই বল না?"

"হযরত জীবিত আছেন।"

"জীবিত আছেন? কই, কোথায় তিনি? আমাকে একবার দেখাও!"

অগত্যা তাঁহাকে হযরতের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। হযরতকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া তিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: "আল্‌হামদু-লিল্লাহ্! হে রসুলুল্লাহ্, তোমাকে পাইলে আর সকলকেই হারাইতে পারি।"

হযরতের স্নেহময়ী কন্যা বিবি ফাতিমাও পিতার মৃত্যুসংবাদে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। হযরতের ক্ষতস্থান হইতে শোণিতপাত হইতেছে

দেখিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছে না দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি এক টুকরা চাটাই পুড়াইয়া সেই ভস্ম ক্ষতস্থানে প্রদান করিলেন। ইহাতেই রক্ত বন্ধ হইয়া গেল।

অন্যান্য মহিলারাও আহত মুসলিম সৈন্যদিগকে যথাসাধ্য সেবা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

একটু সুস্থ হইলে হযরত শহীদদিগের লাশ দাফন-কাফন করিবার ব্যবস্থা করিলেন; খুনরঙীন্ লেবাস পরিয়া বীরদল শেষের শয়ন গ্রহণ করিলেন। দুই-তিন জন শহীদকে একত্রে একটি কবরে স্থাপন করা হইল।

সন্ধ্যার পূর্বেই হযরত সকলকে লইয়া মদিনায় পৌঁছিলেন।

মদিনার প্রতিঘরে কান্নার রোল উঠিল। আল্লার অভয়-বাণী শুনাইয়া হযরত সকলকে শান্ত করিলেন।

দূরদর্শী হযরত মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে একটি বিষয় ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছিলেন। মদিনা নগরী তখন অরক্ষিত। যদি কোরেশগণ ফিরিয়া আসিয়া মদিনা আক্রমণ করে, তখন কী হইবে? ইহাই ছিল তাঁহার চিন্তার কারণ। হযরত এজন্য সা'দ নামক জনৈক সাহাবীকে কোরেশদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য চর নিযুক্ত করিয়া আসিলেন।

কোরেশগণ যখন আল্ খাকিক উপত্যকায় পৌঁছিল, তখন তাহাদের মাথায় এক নূতন খেয়াল চাপিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল: আমরা কী করিতেই বা আসিলাম, আর কী করিয়াই বা চলিলাম। আসিলাম মদিনা আক্রমণ করিতে, কিন্তু তাহা হইল কৈ? এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? মদিনা তো এখন অরক্ষিত। কেন তবে আমরা ফিরিয়া যাইতেছি?

কিন্তু অনেকে আবার এ কথায় সায় দিল না। তাহারা বলিল: "মদিনা আক্রমণ করিতে গেলে বিপদ আছে। দেখ নাই মুসলমানদিগের শৌর্যবীর্য? সংকীর্ণ স্থানে একবার পাইলে তাহারা আমাদিগকে একদম শেষ করিবে। কাজেই যাহা পাইয়াছ, তাহা লইয়াই সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিয়া চল।"

কিন্তু এ-প্রস্তাব সকলের মনঃপূত হইল না। মদিনা আক্রমণ করার দিকেই অধিকাংশ লোকের ঝোঁক দেখা গেল। কোরেশবাহিনী পুনরায় মদিনার পানে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

হজরত মদিনায় বসিয়া রাত্রে এ-সংবাদ জানিতে পারিলেন। ওমর ও আবুবকরের সহিত তিনি পরামর্শ করিলেন। কোরেশদিগের অগ্রগতিকে বাধা দিতে হইবে, ইহাই হইল তাঁহাদের মত।

কোনরূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাত হইতেই বেলালের কণ্ঠে ফযরের আযান ধ্বনিয়া উঠিল। মুসলিম বীরবৃন্দ হযরতের সহিত নামায পড়িলেন। অমনি হযরত ঘোষণা করিলেন: "এখনই সকলে প্রস্তুত হও, কোরেশদিগের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। অন্য কাহাকেও আমি চাই না, গতকল্য যে সমস্ত বীর ওহুদে যুদ্ধ করিয়াছে, কেবল তাহারাই সজ্জিত হইয়া আইস।"

ঘরে ঘরে তখনও কান্নার রোল থামিয়া যায় নাই। বীরবৃন্দের অনেকেই তখন অল্পবিস্তর আহত এবং সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত, ইহারই মধ্যে আসিল আবার এই নূতন আহ্বান।

কিন্তু কি আশ্চর্য! সেই আহত ও পরিশ্রান্ত বীরদলই হযরতের আদেশে মুহূর্তমধ্যে রণসাজে সজ্জিত হইয়া আসিল কত বড় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই মহাপুরুষের! কী অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভর তাঁহার উপর তাঁহার ভক্তবৃন্দের। কী অপূর্ব মনোবল ও নিয়মানুবর্তিতা এই মুসলিম বীরবৃন্দের! ওহুদের অগ্নি-পরীক্ষার পর সত্যের সৈনিকদল যেন ঈমানের তেজে ও দেহের শক্তিতে অধিকতর প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল।

হজরত তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া অনতিবিলম্বে নগর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এদিকে আবুসুফিয়ান মাবাদ নামক জনৈক মদিনাবাসী পথিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, হযরত পুনরায় এক বিরাট বাহিনী সংগে লইয়া কোরেশদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এই সংবাদে সে খুব দমিয়া গেল, মদিনা আক্রমণের সাধ তাহার মিটিয়া গেল। ভীতচিত্তে সে তাড়াতাড়ি মক্কার পথ ধরিল।

হযরত মুসলমানদিগকে লইয়া মদিনার আট মাইল দূরবর্তী 'হামরা-উল্-আসদ' নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শত্রুদিগের কোন সন্ধানই তিনি পাইলেন না। অগত্যা কয়েকদিন সেখানে শিবির স্থাপন করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন। প্রতিরাত্রে পর্বতোপরি অসংখ্য স্থানে এমনভাবে বড় বড় আগুন জ্বালান হইতে লাগিল যাহাতে দূর হইতে

দেখিলে স্বতঃই মনে হয় বহু লোক সেখানে জমায়েৎ হইয়াছে। এইরূপে কয়েক রাত্রি অতিবাহিত করিবার পর তিনি সদলবলে মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

রণকৌশলের দিক দিয়া হযরতের এই কার্য নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য, সন্দেহ নাই। ইহাতে কোরেশগণ ভাবিল, মুসলমানদিগকে পরাজিত করা সহজ নয়। ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাবিল, ওহুদ-যুদ্ধে মুসলমানেরা একটুও কাবু হয় নাই। মুসলমানেরাও ভিতরে ভিতরে নববল ও নবপ্রেরণা লাভ করিল। হযরতের উপর তাঁহাদের যে অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভর আছে এবং তিনিই যে তাঁহাদের অবিসম্বাদিত নেতা অমুসলমানগণ তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিল।

পরিচ্ছেদ : ৪৩

চতুর্থ ও পঞ্চম হিযরীর কয়েকটি ঘটনা

ওহদ-যুদ্ধের পর দুই মাস বেশ শান্তিতেই কাটিল।

কিন্তু চতুর্থ হিযরীর প্রারম্ভের সংগে সংগে আবার বিপদ দেখা দিল। নানাসূত্রে হযরত জানিতে পারিলেন, মরুভূমির মধ্যস্থিত বিন্-আসাদ্ নামক একটি শক্তিশালী গোত্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মদিনা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অনতিবিলম্বে হযরত আবুসাল্মার নেতৃত্বে ১৫০ জন মুসলিম সৈন্যের একটি ক্ষুদ্রবাহিনী তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মুসলমানগণ গোপন পথ ধরিয়া এমন ক্ষিপ্রগতিতে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছিলেন যে, শত্রুগণ প্রস্তুত হইবার অবসর পাইল না। ফলে তাহারা পরাজিত হইল। মুসলমানগণ প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পরের মাসে হযরত কোরেশদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যে আসেম বিন্-সাবেত নামক জনৈক সাহাবীর অধীনে দশ জন মুসলিম গুপ্তচরকে মক্কার দিকে প্রেরণ করিলেন। এই দলটি যখন রাযী নামক স্থানে উপনীত হইল, হোযায়েল বংশের দুইশত লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। মুসলমানদিগকে বন্দী করিয়া কোরেশদের নিকট বিক্রয় করিতে পারিলে প্রচুর অর্থ মিলিবে, ইহাই ছিল তাহাদিগের এই আক্রমণের একমাত্র প্রেরণা। মুসলমানগণ বেগতিক দেখিয়া নিকটস্থ একটি পর্বত শিখরে আরোহণ করিলেন। হোযায়েলগণ দেখিল, মুসলমানেরা প্রাণ থাকিতে আত্মসমর্পণ করিবে না, তাই অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাহাদিগকে নামিয়া আসিতে বলিল। কিন্তু দলপতি আসেম বলিলেন: "তোমাদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকদের কথায় আমরা বিশ্বাস করি না।" পাষণ্ডগণ মুসলমানদিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন মুসলিম বীরগণ তরবারি হস্তে দ্রুতবেগে নিম্নে অবতরণ করিয়া শত্রু-দিগকে আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদের আটজন বীর প্রাণ হারাইলেন। বাকী দুইজন—জায়েদ* ও খোবায়ের আহত অবস্থায় শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন।

---

* এ জায়েদ হযরতের পালিত পুত্র জায়েদ নহেন।

নরপশুগণ বন্দীদ্বয়কে লইয়া মক্কায় পৌঁছিল। বদর-যুদ্ধে নিহত দুইজন কোরেশ যোদ্ধার পুত্রগণ আনন্দের সহিত জায়েদ ও খোবায়েরকে কিনিয়া লইল। তারপর বেচারাদিগের উপর শুরু হইল অমানুষিক অত্যাচার।

মনের সুখে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পর দুর্বৃত্তগণ তাঁহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। অগণিত কৌতূহলী কোরেশ নরনারী ও বালক-বালিকা চলিল তাহাদের পিছনে পিছনে সেই চমকপ্রদ দৃশ্য দেখিবার জন্য। বধ্যভূমিতে উপনীত হইবার পর কোরেশ নেতাগণ বলিতে লাগিল: "যদি ইসলাম পরিত্যাগ করিতে পার, তবে এখনও তোমাদের প্রাণরক্ষা হয়।" মুসলিম বীরদ্বয় ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। বলিলেন: "কিছুতেই না। সমস্ত দুনিয়ার বিনিময়েও না।" দুর্বৃত্তগণ তখন জায়েদকে বলিল: "দেখ জায়েদ, এই ফাঁসিকাষ্ঠে যদি এখন মুহম্মদকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং তদ্বিনিময়েও তুমি মুক্তি লাভ কর, তবে কি তাহা পছন্দ কর না?" জায়েদ বজ্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন: "সাবধান! মুখ সামাল করিয়া কথা বলিস। আমার মুক্তির বিনিময়ে আমার প্রিয় নবীর পায়ে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইতে দিতেও আমি রাজী নই।" তখন কোরেশ নরপিশাচগণ তরবারি হস্তে তাহাদিগের প্রতি অগ্রসর হইল। মুসলিম বীরদ্বয় নির্ভীক নির্বিকার। মুখে তাহাদের ভয়ভীতি বা গ্লানিমার চিহ্নমাত্র নাই। এক অপূর্ব বিহিশ্‌তী নূরে সে মুখ আজ অধিকতর উজ্জ্বল। বারে বারে আঘাত করিয়া পাষণ্ডগণ তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। আল্লার নাম করিতে করিতে বীরদ্বয় হাসিমুখে শহীদ হইলেন।

এই মাসেই আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। আবু-বেরা নামক জনৈক বৃদ্ধ নেজ্‌দবাসী দুইটি অশ্ব এবং দুইটি উট উপঢৌকনসহ হযরতের নিকট আসিয়া বলিল: "আপনি যদি কতিপয় উপযুক্ত লোককে আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দেন, তবে আমাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে।" হযরত বলিলেন: "নেজ্‌দবাসীদের উপর বিশ্বাস কী? নেজ্‌দের বনি-আমির গোত্র তো কোরেশদিগেরই বন্ধু।" তদুত্তরে আবু-বেরা বলিল: "হযরত, সেখানে তো আমরাই নেতৃস্থানীয়। আমরা যাহা বলিব তাহাই হইবে। কাজেই আমি মুসলমানদিগের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।" হযরত বেরার কথা বিশ্বাস করিয়া ৭০ জন বিশিষ্ট মুসলিম উলেমাকে আবু-বেরার সঙ্গে

পাঠাইয়া দিলেন। বনি-আমির গোত্রের প্রতি হযরত একখানি পত্রও সেই সঙ্গে লিখিয়া পাঠাইলেন। বীর-মউনা নামক স্থানে উপনীত হইলে মুসলমানগণ সেই পত্রসহ জনৈক মুসলিম দূতকে বনি-আমিরদিগের নেতা আমির ইব্‌নে-তোফায়েলের নিকট প্রেরণ করিলেন। নেতৃবর পত্রখানি না পড়িয়াই নিকটস্থ জনৈক অনুচরকে ইঙ্গিত করিলেন; তদনুসারে সেই মুহূর্তেই মুসলিম দূতকে নিহত করিয়া ফেলা হইল। শুধু তাই নয়। আমির তাহার দলবল সহ তৎক্ষণাৎ বীর-মউনার দিকে ধাবিত হইলেন এবং মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। আবু-বেরা নিজের শপথের কথা বলিয়া বনি-আমিরদিগকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সে প্রয়াস কার্যকরী হইল না। বনি-সালেম নামক আর একটি গোত্র ইব্‌নে তোফায়েলকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের সহায়তায় তোফায়েল নিরীহ মুসলিম জ্ঞানতাপসদিগকে হত্যা করিয়া নিজেদের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিল।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বড়ই চিত্তাকর্ষক। ওমাইয়া নামক জনৈক মুসলিম বীর-মউনার এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইতে কোনক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। মদিনায় ফিরিবার কালে পথিমধ্যে বনি-আমির বংশের দুইজন লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ওমাইয়া সেই দুইজন লোককে নিদ্রিতাবস্থায় হত্যা করেন। লোক দুইটি হযরতের নিকট হইতে একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশে ফিরিতেছিল। কিন্তু ওমাইয়া তাহা জানিতেন না। ওমাইয়া মদিনায় ফিরিয়া গিয়া হযরতকে সকল কথা বলিলেন। বীর-মউনার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনিয়া যদিও তিনি নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন, তবু ওমাইয়া কর্তৃক দুইজন নিরীহ বনি-আমিরের হত্যা ব্যাপারকে কিছুতেই তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না। এদিকে যে আমির ইব্‌নে-তোফায়েল নিতান্ত অমানুষিকভাবে ৭০ জন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করিল, সেই পাষণ্ডই আরবদিগের চিরাচরিত আন্তর্জাতিক নীতিপদ্ধতির খেলাফ হইবার দোহাই দিয়া মৃত ব্যক্তিদিগের জন্য হযরতের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া বসিল। হযরত এই দাবী স্বীকার করিয়া লইলেন। দুইজন বনি-আমিরের প্রাণহানির জন্য রক্তপণ বাবদ উপযুক্ত অর্থ ও তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী তিনি বনি-আমির নেতাকে পাঠাইয়া দিলেন।

বীর-মউনার হত্যাকাণ্ড শুধু যে বনি-আমিরদিগের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল তাহা নহে, বনি-নাজির গোত্রের ইহুদীরাও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। হযরত ইহা জানিতে পারিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিপূর্বে বনি-কোরাইজা গোত্রের ইহুদীরা হযরতের সহিত সন্ধি করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তাহারা আর কখনও মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না, বা কোন বিশ্বাসঘাতকতার কার্য করিবে না। বনি-নাজির গোত্রের ইহুদীদিগের নিকট হইতেও হযরত সেইরূপ একটি সন্ধির দাবী করিলেন। বনি-নাজিরগণ তখন শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হযরতকে বলিয়া পাঠাইল: সন্ধিপত্রের আর কী প্রয়োজন? ধর্ম লইয়া যখন আমাদের মধ্যে গণ্ডগোল তখন এক কাজ করুন; আমরা আমাদের মধ্য হইতে তিনজন ইহুদী পণ্ডিতকে মনোনীত করিয়া রাখিতেছি, আপনিও আপনার মনোনীত আর-দুইজন মুসলমান পণ্ডিতকে সংগে লইয়া এখানে চলিয়া আসুন। ইসলামের সত্যতা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলেই আমরা মুসলমান হইয়া যাইব।" হযরত প্রথমে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরে তাহাদের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ধার্য দিনে দুইজন সাহাবীকে সংগে লইয়া গন্তব্য স্থানের দিকে তিনি অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সেখানে পৌছিতেই ইহুদীদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিলেন। ইহুদীরা হযরতকে হত্যা করিবার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। হযরত তাহা উপযুক্ত সময়ে জানিতে পারায় ইহুদীদিগের সেই হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। হযরত মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া জনৈক দূতের মারফৎ বনি-নাজিরদিগকে অনতিবিলম্বে মদিনা ত্যাগ করিয়া যাইবার চরমপত্র দান করিলেন। ইহুদীরা ইহাতে দমিয়া গেল। দেশত্যাগ করিবে বলিয়াই তাহারা প্রথমে মনস্থ করিল। কিন্তু আবদুল্লাহ্ বিন্-উবাই ও নেজ্‌দের বনি-আমির প্রমুখ বিভিন্ন মরুগোত্রের সাহায্য পাইবার ভরসায় তাহারা বাঁকিয়া বসিল; হযরতকে তাহারা বলিয়া পাঠাইল: "আমরা তোমার আদেশ মানি না, তুমি যাহা পার কর।" এই বলিয়া তাহারা নিজেদের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল।

অবিলম্বে হযরত একদল মুসলিম সৈন্যকে বনি-নাজিরদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বীরবর আলি ইহার অধিনায়ক হইলেন। মুসলিমগণ

বনি-নাজিরদিগের দুর্গ অবরোধ করিলেন। কয়েকদিন এইভাবে কাটিয়া গেল, কিন্তু ইহুদীদিগের স্বপ্ন সফল হইল না। আবদুল্লাহ্ বিন্-উবাই, অথবা বনি-আমিরগণ কেহই কোন সাহায্য পাঠাইল না। তিন সপ্তাহ এরূপ-ভাবে কাটিয়া যাইবার পর ইহুদীরা প্রমাদ গণিল। তাহাদের রসদপত্রও ফুরাইয়া আসিল। তখন তাহারা হযরতের নিকট দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব করিল: "দয়া করিয়া আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবেন না; আমরা দেশত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।"

এহেন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদিগকে হাতের মুঠার ভিতরে পাইয়াও হযরত কোন শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন না। তিনি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। শুধু এই শর্তটি জুড়িয়া দিলেন: নগর ত্যাগের সময় তাহারা কোন অস্ত্রপাতি সংগে লইয়া যাইতে পারিবে না।

ঠিক তাহাই হইল। বনি-নাজিরগণ তাহাদের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র রাখিয়া মদিনা ছাড়িয়া চলিল। যাইবার সময় ধন-দৌলত, মণি-মাণিক্য ও আসবাব-পত্র যাহা ছিল—সমস্তই সংগে লইয়া গেল; এমন কি দরজা-জানালাগুলি পর্যন্ত উটের পিঠে চাপাইয়া দিল। মুসলমানগণ ইহাতে কোন আপত্তিও করিলেন না, বাধাও দিলেন না।

ইহুদীরা সিরিয়ার দিকে চলিয়া গেল।

বনি-নাজিরদিগকে বিতাড়িত করিবার ফলে মুসলমানদিগের অনেক সুবিধা হইল। ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সরাইয়া দেওয়ায় কোরেশদিগের অসুবিধা ঘটিল। যে-শক্তি ভিতরে ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাহা ভাঙিয়া পড়িল। সাধারণের চক্ষে মুসলমানদিগের প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া গেল। সংগে সংগে ইহুদীদিগের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের অধিকারে আসায় তাঁহারা বেশ লাভবান হইলেন। সমরকৌশলের দিক দিয়া এই বহিষ্করণ খুবই সঙ্গত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

পঞ্চম হিযরীর দুই-একটি ঘটনাও ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পাঠক জানেন: মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপে সমগ্র আরব-দেশ আকণ্ঠ ডুবিয়া ছিল। হযরত ধীরে ধীরে তাঁহার শিষ্যবৃন্দের নৈতিক জীবনকে ক্লেদমুক্ত করিতেছিলেন। হযরত দেখিলেন, কোন মাদক-দ্রব্যের অভ্যাস একদিনে দূর হওয়া অসম্ভব। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানও তাহাই বলে। কোন আফিমখোরকে বা মদখোরকে যদি হঠাৎ বলা যায়,

তুমি আজ হইতেই নেশা-করা বন্ধ কর, তবে তাহার স্বাস্থ্যের উপর একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে পারে; এই মনস্তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হযরত প্রথমতঃ শিষ্যদিগকে বলিয়া দিলেন: তোমরা মদ্যপান করিও না; উহা শয়তানের কাজ। ইহাই বলিয়া তিনি তাহাদের বিবেক ও প্রবৃত্তির মধ্যে একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে তিনি আদেশ করিলেন: "মদ যাহারা পরিত্যাগ করিয়াছ, ভাল, যাহারা করিতে পার নাই, তাহারা এতটুকু যেন কর যে, নেশার ঘোরে যেন নামায না পড়। শরাব-খোরেরা এইবার একটু মুশ্‌কিলেই পড়িল। ভোর হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত প্রত্যেককে পাঁচবার করিয়া নামায পড়িতেই হয়; তাহার মধ্যে মদ্যপান করিবার অবসর কোথায়? নেশা কাটিতে না কাটিতেই যে নামাযের ওয়াক্ত আসিয়া পড়ে। কাজেই সারাদিনমান তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই পবিত্র থাকিতে হয়। এইরূপে প্রবৃত্তির তাড়নাকে অনেকখানি সংযত ও সংহত করিয়া আনিবার পর হযরত একদিন আল্লার এই কঠোর বাণী সকলকে শুনাইয়া দিলেন: "মদ্যপান হারাম।" এইবার সকলে এই পাপকে সহজেই বর্জন করিতে পারিল। সেই হইতে সকল প্রকার মাদকদ্রব্য মুসলমানদিগের নিকটে চিরদিনের জন্য হারাম হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য দুষ্কৃতির পথও রুদ্ধ হইয়া গেল।

পরিচ্ছেদ : ৪৪

আয়েষার চরিত্রে কংলক-দান

এই সময়ে হযরতের ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। জায়েদের স্ত্রী জয়নবকে তিনি বিবাহ করেন। জয়নব ছিলেন তাঁহারই ফুফাতো বোন। হযরত ইচ্ছা করিয়াই জয়নবকে জায়েদের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবাহ সুখের হয় নাই। জয়নবের মনে উচ্চবংশের গর্ব ও অভিমান ছিল। কাজেই ক্রীতদাস স্বামীর সংসর্গ কোনদিনই তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত পয়গম্বরের সহধর্মিণী হইবার জন্য পূর্ব হইতেই তাঁহার মনে দুর্দমনীয় সাধ জাগিয়া ছিল। জায়েদ এই সমস্ত বুঝিতে পারিয়া জয়নবকে তালাক দেন। জয়নব তখন তাঁহার অভিপ্রায় হযরতকে জানান। জয়নবের সাধ পূরণ করিবার জন্য স্বয়ং জায়েদও হযরতকে অনুরোধ করেন। হযরত প্রথমত রাজী হন নাই। আপন পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েজ কি না, সে সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন না। কাজেই তিনি আল্লার আদেশের অপেক্ষা করিতে থাকেন। তখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় :

> "তুমি যে স্ত্রীকে 'আমার মায়ের মত' বলিয়া বর্জন কর, আল্লাহ্ তাহাকে সত্যই তোমার মা করেন নাই, অথবা যাহাকে তুমি আপন পুত্র বলিয়া ঘোষণা কর, তাহাকেও তোমার প্রকৃত পুত্র করেন নাই; এ সমস্ত তোমার মুখের কথা মাত্র: পালিত পুত্রগণ তাহাদের আপন পিতার নামে পরিচিত হউক—ইহাই আল্লার কাছে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত।" —(৩৩ : ৪)

হযরত তখন জয়নবকে নিঃসংকোচে বিবাহ করিলেন। মৌখিক সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া মুসলমানেরা যে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, এই আদর্শ প্রদর্শনই এই বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য।*

---

* এ সম্বন্ধে কুরআনের আল্-আহাজাব' সূরার ৩৭ আয়াতও দ্রষ্টব্য।

জননী আয়েষার চরিত্রে কলংক-দানও এই হিযরীর অন্যতম প্রধান ঘটনা। মক্কার নিকটবর্তী বনি-মুস্তালিক গোত্র মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া হযরত তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। হযরত যখন নিজে কোন অভিযানে যোগদান করিতেন, তখন কোন-না-কোন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এই অভিযানকালে তিনি বিবি আয়েষাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। চতুর্থ হিযরাতে পর্দা-প্রথার প্রবর্তন হওয়ায় হযরতের বিবিগণ আর পূর্বের ন্যায় লোকচক্ষুর সম্মুখে বাহির হইতেন না। একটি স্বতন্ত্র উটে বস্ত্রাচ্ছাদিত সওয়ারীতে বিবি আয়েষা স্বামীর সহগমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র শিবিরের ব্যবস্থা ছিল।

মুস্তালিকদিগকে দমন করিয়া হযরত সদলবলে মদিনায় ফিরিয়া চলিলেন। এক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা সকলে রাত্রিপ্রবাস করিতেছিলেন। শেষ রাত্রে সকলে যখন পুনরায় যাত্রা শুরু করিবেন, এমন সময় বিবি আয়েষা স্বভাবের তাগিদে আপন সওয়ারী হইতে অবতরণ পূর্বক একটু আড়ালে যাইতে বাধ্য হন। প্রয়োজন শেষে ফিরিয়া আসিয়া যখন নিজ সওয়ারীতে উঠিতে যাইবেন, তখন দেখেন যে তাঁহার গলার হার কোথায় ছাড়িয়া আসিয়াছেন। তাড়াতাড়ি হার খুঁজিয়া আনিবার জন্য পুনরায় তিনি পূর্বস্থানে ফিরিয়া যান। এদিকে বিবি আয়েষা ফিরিয়া আসিয়াছেন ভাবিয়া পর্দাবৃত সওয়ারীখানি উটের পিঠে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিবি আয়েষা ক্ষীণকায়া ছিলেন, সওয়ারী বাহকগণ তাই বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি উহার ভিতরে আছেন কি না। সওয়ারী বাঁধা হইয়া গেলে সকলে পুনরায় যাত্রা শুরু করিলেন।

এদিকে বিবি আয়েষা আসিয়া দেখেন, কাফেলা চলিয়া গিয়াছে। চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। কী করিবেন, বুঝিতে না পারিয়া নিজেকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া তিনি সেখানেই শুইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিশ্চয় এ ভুল শীঘ্রই ধরা পড়িবে এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য হযরত একটা-কিছু ব্যবস্থা করিবেন। উদ্বেগের মধ্য দিয়া রাত্রি প্রভাত হইল, এমন সময় সাফওয়ান নামক জনৈক সাহাবী সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অভিযাত্রিগণ ভুলক্রমে কোন-কিছু ফেলিয়া আসিলে তাহা কুড়াইয়া আনিবার জন্যই এইরূপ এক-একজন সমঝদার লোককে সবার

পিছনে আসিবার নিয়ম ছিল। সাফওয়ান বিবি আয়েষাকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন। হযরতের স্ত্রীকে এরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। হযরতের অসাক্ষাতে তাঁহার বিবির সহিত কথোপকথন করাও তিনি বেয়াদবী বলিয়া মনে করিলেন, অথচ তাঁহাকে এরূপ-ভাবে এখানে ফেলিয়া যাওয়াও তিনি সংগত মনে করিলেন না। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি আপন উটের উপর বিবি আয়েষাকে সওয়ার হইতে বলিলেন। আয়েষা পর্দাবৃত অবস্থায় তাহাই করিলেন। তখন সাফওয়ান উটের লাগাম ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলেন। মদিনার উপকণ্ঠে আসিয়া তিনি কাফেলার সহিত মিলিত হইলেন। বিবি আয়েষাকে এইরূপভাবে উটে চড়িয়া আসিতে দেখিয়া সকলে অবাক। হযরত নিজেও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন সাফওয়ান সব কথা খুলিয়া বলিলে সকলে শান্ত হইলেন।

ব্যাপারটা সেখানেই মিটিয়া যাইবার কথা, কিন্তু তাহা হইল না। হযরতের শত্রুগণ এবং মুনাফিক-প্রকৃতির দুই-একজন মুসলমান ইহাই লইয়া কানাঘুষা আরম্ভ করিল। বিবি আয়েষার চরিত্রের উপর তাহারা কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। অবশেষে হযরতের কর্ণেও ইহা পৌঁছিল। তিনিও বিচলিত না হইয়া পারিলেন না। বিবি আয়েষার চরিত্রের স্বচ্ছতা ও নিষ্কলংকতা সম্বন্ধে হযরতের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কিন্তু তাই বলিয়া তো জনমতকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। নিন্দুকের মুখ কে বন্ধ করিয়া রাখিবে! আরব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। কুৎসার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া সে যুগে সহজ ছিল না। অপরের স্ত্রী হইলেও একটা কথা ছিল বটে, কিন্তু নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে তিনি কী করিতে পারেন? তিনি যদি নির্বিচারে তাঁহাকে গ্রহণ করেন তবে লোকে বলিবে: নিজের স্ত্রী কি না তাই। হযরত সত্যই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই শ্রেণীর অভিজ্ঞতা তাঁহার জীবনে এই প্রথম। কত মানুষের পারিবারিক জীবন যে এই সব কারণে তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে, কত সোনার সংসার যে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়, হযরত তাহা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিলেন। আয়েষার চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াও তিনি মানসিক দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাইলেন না।

বাহিরে যে কুৎসিৎ কানাকানি চলিতেছে, হযরত সে কথা বিবি আয়েষাকে জানিতে দিলেন না। পাছে তাঁহার কোমল অন্তরে আঘাত লাগে,

এজন্য তিনি তাঁহাকে কোনরূপ প্রশ্ন পর্যন্ত করিলেন না। শুদ্ধাচারিণী পূতচরিত্রা নারীর পক্ষে স্বামীর বিন্দুমাত্র সন্দেহও অসহনীয়। হযরত তাই বিবি আয়েষার সূক্ষ্ম অনুভূতিতে কোনরূপ আঘাত দিয়া তাঁহার সম্ভ্রম ও মর্যাদার হানি করিলেন না।

কিন্তু হযরতের মনের দ্বন্দ্ব বুদ্ধিমতী আয়েষার নিকট চাপা রহিল না। হযরত যে পূর্বের ন্যায় তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহেন না, হাসেন না, সব সময় বিমর্ষভাবে থাকেন, একটা অন্তর্বিপ্লব যে তাঁহার মধ্যে চলিতেছে, এ সত্য আয়েষা ধরিয়া ফেলিলেন। হযরতের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন কেন দেখা দিল, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ওই সময়ে একদিন রাত্রিকালে বিবি আয়েষা প্রয়োজন বশতঃ বরিরা নাম্নী একজন সহচরীর সহিত বাহিরে যান। যাইতে যাইতে আপন ওড়না পায়ে জড়াইয়া গিয়া বরিরা পড়িয়া যান। তখন তিনি ক্রুদ্ধস্বরে আপন পুত্র মিস্‌তা-বিন্‌-আসামাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন: "মিস্‌তা নিপাত যাউক।" বিবি আয়েষা বিস্মিত হইয়া বলিলেন: "আপন পুত্র সম্বন্ধে কেন এত অভিশাপ দিতেছ?" বরিরা বলিলেন: "তুমি জান না, এই শয়তানটা তোমার নামে কী ভীষণ কুৎসা রটনা করিয়াছে।" বিবি আয়েষা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বরিরা তখন সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। বজ্রাঘাতের ন্যায় আয়েষা মুসড়িয়া পড়িলেন। হযরতের ভাবান্তরের কারণ এইখানেই মিলিল।

আয়েষা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দিবা-রাত্রি তিনি কেবলই কাঁদেন, কেবলই ভাবেন। একে তো তিনি নিরপরাধিনী, তাহাতে আবার পয়গম্বরের সহধর্মিণী। এই নিদারুণ আঘাত কেমন করিয়া তিনি সহ্য করিবেন?

বিবি আয়েষা ভাবিলেন: বাহিরের লোকে যাহা বলে বলুক, স্বয়ং হযরতও কি এ কথা বিশ্বাস করিলেন? তিনিও কি আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করেন? নিশ্চয়ই করেন; নতুবা তিনি প্রাণ খুলিয়া আমার সহিত কথা বলেন না কেন? হাসেন না কেন? তাঁহার ব্যবহারে সেই অকপট আন্তরিকতা দেখি না কেন? যদি তাই হয়, তবে আমার জীবনে ধিক।

এইরূপ ধরণের শত দুশ্চিন্তা আসিয়া আয়েষার মনে ভিড় জমাইল। হযরতের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন।

কুৎসা-রটনাকারীদিগের মধ্যে হাসান্-বিন্-সাবেত, মিস্‌তা-বিন্-আসাসা এবং হাম্‌না-বিন্‌তে-হাজেশ—এই তিনজনই অগ্রণী ছিলেন। হাসান ছিলেন কবি, মিস্‌তা ছিলেন 'বদরী'* এবং হাম্‌না ছিলেন হযরতের স্ত্রী জয়নবের ভগিনী। হযরতের পত্নীদিগের মধ্যে রূপলাবণ্যে বিবি আয়েষার পরেই ছিল জয়নবের স্থান। জয়নবের ভগিনী হাম্‌না তাই এই সুযোগে আয়েষাকে স্থানচ্যুত করিয়া আপন বহিনকে গৌরবান্বিত করিবার মতলব করিয়াছিলেন। একদিন জয়নবকে তিনি বলিলেন: "এই সুযোগ কেন ছাড়িতেছ? তুমিও আয়েষার নামে হযরতের কাছে খানিকটা কুৎসা গাও না?" কিন্তু জয়নবের অন্তঃকরণ ছিল উচ্চ ও মহৎ। তিনি বলিলেন: "আয়েষাও আমার বোন, সেও তো নারী। না জানিয়া-শুনিয়া কেন তাঁহার চরিত্রে কলংক দান করিব?" আদর্শ সপত্নীর যোগ্য কথাই বটে।

বিবি আয়েষা পিত্রালয়ে গমন করায় অবস্থা আরও খারাপ হইল; লোকের মনে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল।

এই গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে হযরত প্রতি মুহূর্তে আল্লার নির্দেশ আশা করিতেছিলেন। কিন্তু কোন 'অহি' এ পর্যন্ত নাযিল হইল না। একদিকে আল্লার এই নীরবতা, অপরদিকে গীবৎকারীদিগের অবাধ কুৎসা-রটনা—ইহার মধ্যে পড়িয়া হযরত সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কী করিবেন তিনি? শত্রুগণ বাহির হইতে কলংকের শর হানিয়া আপন প্রিয়তমা স্ত্রীর অন্তর বিদ্ধ করিবে, অথচ স্বামী হইয়া তিনি তাহার কোনই প্রতিকার করিবেন না, দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে এই দৃশ্য দেখিবেন, এই ভীরুতাও তো তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মসজিদে গিয়া মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া সমবেত সাহাবাদিগকে বলিলেন: "আমি বুঝিতে পারি না, আমার বংশের উপর অযথা কালিমা লেপন করিয়া লোকেরা কী সুখ পায়। তোমরা সাফওয়ানকে ভালোরূপেই চেন, আমি তাঁহাকে

* যে সমস্ত যোদ্ধা বদর-যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'বদরী' বলা হইত। তখনকার দিনে ইহা গৌরবজনক পদবী বলিয়া পরিগণিত হইত।

অতি সচ্চরিত্র বলিয়াই জানি। ভালো ছাড়া তাঁহার মধ্যে কোন-কিছু মন্দ দেখি নাই, তবে কেন এই অন্যায় কুৎসা-রটনা?"

হযরতের এই কথায় আউস-গোত্রের নেতা উসায়েদ অতিমাত্রায় সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন: "হযরত, অনুমতি দিন, যাহারা এই জঘন্য মিথ্যা প্রচার করিতেছে, তাহাদিগকে গর্দান মারি।" কুৎসাকারীদিগের অধিকাংশই ছিল খাজরাজ-বংশীয়; কাজেই উসায়েদের এই আস্ফালন ও ভীতি-প্রদর্শন খাজরাজদিগের মনঃপূত হইল না। তাহারাও ইহার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। তখন ক্রমে ক্রমে উভয় পক্ষ এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, মনে হইতে লাগিল, আউস ও খাজরাজদিগের পূর্বশত্রুতা বুঝিবা আবার গজাইয়া উঠে। হযরত অতি কষ্টে এই বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

অতঃপর তিনি আবুবকরের গৃহে উপস্থিত হইয়া আলি, ওসমান ও ওমরের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন।

হযরত বলিলেন: "তোমরা এ সম্বন্ধে কী মনে কর?"

ওমর বলিলেন: "হযরত, এ অপবাদ সম্পূর্ণ অলীক।"

হযরত তখন ওসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "তোমার মত কী?"

ওসমান বলিলেন: "আমারও ঐ একই মত।"

হযরত অতঃপর আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "আলি, তুমি কি বল?"

আলি বলিলেন: নিশ্চয়ই ইহা মিথ্যা কথা। আপনার স্মরণ আছে, একদিন নামায পড়িবার সময় আপনি হঠাৎ একখানি জুতা খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। নামাযান্তে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আপনি বলিয়াছিলেন: 'ঐ জুতায় কিছু নোংরা জিনিষ লাগিয়াছিল, জিব্রাইল তাই উহা খুলিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।' সামান্য একটু নোংরামি হইতে আপনাকে পবিত্র রাখিবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরিশ্তা যখন এতদূর সজাগ, তখন এত বড় একটা ব্যাপারে যে তাঁহারা চুপ করিয়া রহিবেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।"*

এইরূপ সকলেই এই অপবাদ সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তবে আলি হযরতকে অধিকতর নিশ্চিত হইবার জন্য আয়েষার

* মা'রেজুন-নবুয়ত, ৪র্থ খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দাসীকেও আয়েষা সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পরামর্শ দিলেন। তৎক্ষণাৎ আয়েষার দাসীকে ডাকা হইল। দাসী বলিল, "বিবি আয়েষার চরিত্রে আমি কোনদিন কোন দোষত্রুটি দেখি নাই। একদিন মাত্র একটি দোষ তিনি এই করিয়াছিলেন যে, ময়দার খামির করিয়া আমি তাঁহাকে রাখিয়া বাহিরে গিয়াছিলাম; কিন্তু আয়েষা হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই সুযোগে কয়েকটি বকরী আসিয়া তাহা খাইয়া গিয়াছিল।"

হযরত অবশেষে বিবি আয়েষার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। আয়েষা কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিলেন। আয়েষার জননী কন্যার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শুধুই তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন: "মা, কাঁদিও না, আল্লার উপর সবর দিয়া থাকো, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে সাহায্য করিবেন।" কিন্তু আয়েষার ব্যথিত হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইত না। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল কাঁদিয়া কাটাইতেন। কুসুমের অন্তরে কীট প্রবেশ করিলে যেমন সে শুকাইয়া যায়, বিবি আয়েষাও দিন দিন তেমনি করিয়া দুশ্চিন্তায় শুকাইতে লাগিলেন।

হযরত আয়েষার কামরায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন: "আয়েষা, লোকে তোমার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। যদি এই ব্যাপারে তুমি কোনরূপে দোষী থাকো, আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করিবেন, কারণ তিনি ক্ষমাশীল।" বিবি আয়েষা হযরতের এই কথায় অন্তরে আরও আঘাত পাইলেন। এ কথার অন্তরালে যে একটা সন্দেহের কালো ছায়া লুকাইয়া আছে, বিবি আয়েষার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি দেখিলেন, স্বামীর মনেও সন্দেহ জাগিয়াছে। তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। ক্রোধে এবং বেদনায় তাঁহার মুখে কোন কথা সরিল না। মাতাপিতাকে ডাকিয়া তিনি অতি কষ্টে বলিলেন: "আপনারা উত্তর দিন না?" কিন্তু আবুবকর, এবং তাঁহার স্ত্রীও, বিষণ্ণ-মুখে নীরব হইয়া রহিলেন। কী-ই বা বলিবেন তাঁহারা? তখন বাধ্য হইয়া বিবি আয়েষা বলিলেন: "ইয়া-রসুলুল্লাহ্, আমি ভাল করিয়া কুরআন শরীফ পড়ি নাই। আমি ছেলেমানুষ, আমার জ্ঞান এখনও পরিপক্ক নয়, তবু আমি আপনার কথার তাৎপর্য পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি। আল্লার কসম, আমি এ বিষয়ে আপনার নির্দেশ পালন করিব না।—কিছুতেই আমি আল্লার নিকট অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চাহিব না, কারণ আমি জানি

আমি নির্দোষ। দোষ করিয়া দোষ অস্বীকার করা যেমন অন্যায়, দোষ না করিয়া দোষ স্বীকার করা ঠিক তেমনই অন্যায়। ইহাতে আমি মিথ্যাচারিণী হইব, কারণ আল্লাহ্ জানিতেছেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। পক্ষান্তরে এরূপভাবে ক্ষমা চাহিলে লোকের নিকট আমার মর্যাদা বাড়িবে না; সকলে মনে করিবে দোষ সত্যই করিয়াছিলাম, পরে ক্ষমা চাহিয়া রেহাই পাইয়াছি। আবার যদি বলি যে, আমি মোটেই দোষ করি নাই, তাহাও কেহ বিশ্বাস করিবে না। কাজেই আমি এখন সম্পূর্ণ নিরুপায় ও নিঃসহায়। আমি কিছুই বলিতে চাই না; ইউসুফের পিতা (হযরত ইয়াকুব) বিপদে পড়িয়া যে-কথা বলিয়াছিলেন, আমি শুধু সেই কথাই আজ বলি: আমি ধৈর্য ধরিয়া থাকিব, একমাত্র আল্লাই আমার ভরসা।"

কথাগুলি যেন অন্তরের কোন্ অতল গহন হইতে গৈরিক নিঃস্রাবের মত ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কী তার তেজ, কী তার প্রচণ্ড গতি, কী তার অপরূপ ভঙ্গিমা! এই বলদৃপ্ত উত্তর শুনিয়া হযরত মুগ্ধ হইলেন। ইহার পর তিনি আর-কোন কথা বলিতে পারিলেন না। এই সময় অহি নাযিল হইবার সমস্ত লক্ষণ হযরতের মধ্যে প্রকাশ পাইল; তাড়াতাড়ি তিনি শুইয়া পড়িলেন। সকলে তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া আবুবকর ও তাঁহার স্ত্রী অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। মুহূর্তমধ্যে আয়েষার ভাগ্যে আল্লার কোন্ বিধান নামিয়া আসে কে জানে! একটা সংগিন মুহূর্তের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারা আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিবি আয়েষা তখনও নির্বিকার। তাঁহার মনে কোন ভয় নাই—সন্দেহ নাই, আল্লাহ্ কোনরূপেই যে তাঁহাকে অপদস্থ করিবেন না, এই স্থির বিশ্বাসে তিনি একেবারে নির্ভীক ও অটল।

ক্ষণকাল পরে হযরত আত্মস্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন: "আয়েষা, তোমার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ্ তোমাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।"

আবুবকর ও তাঁহার স্ত্রী তখন আনন্দে অধীর হইয়া আয়েষাকে বলিলেন, "আয়েষা, যাও, হযরতের নিকট শুকরিয়া প্রকাশ কর।"

বিবি আয়েষা অধিকতর দৃপ্তকণ্ঠে অভিমানিনীর মত বলিয়া উঠিলেন: "কিছুতেই না। হযরত আমাকে কী সাহায্য করিয়াছেন যে, আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব? তিনি তো কুৎসাকারীদের কথাই বিশ্বাস করিয়াছেন;

আমার স্বপক্ষে তো কিছু করেন নাই। আমার এই চরম বিপদে যদি কেহ সাহায্য করিয়া থাকেন, তবে সে আল্লাহ্—রহমানুর্ রহিম আল্লাহ্। আমি তাঁহারই নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব—হযরতের নিকট নয়।"

হযরত এ কথায় মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ লোকদিগের নিকট উপনীত হইয়া আল্লার এই বাণী ঘোষণা করিলেন :

"যাহারা সম্রান্ত ঘরে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে কুৎসা রচনা করে, এবং চারিটি প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে না পারে, তাহাদিগকে আশিটি দোর্‌রা মারিবে এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না, কারণ তাহারা সীমালঙ্ঘনকারী।" —(২৪ : ৪)

"নিশ্চয়ই যাহারা (বিবি আয়েষার) এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছে, তাহারা তোমারই দলভুক্ত লোক। ইহাকে তুমি অশুভ বলিয়া মনে করিও না। পরন্তু ইহার মধ্যে তোমার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। অপবাদকারীদিগের প্রত্যেকে তাহাদের কার্যের জন্য যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ করিবে, যে সর্বাপেক্ষা এই কার্যে আগ্রহশীল, তাঁহাকে গুরুতর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হইবে।" —(২৪ : ১১)

কুরআনের এই বিধান অনুযায়ী কবি হাসান এবং মিস্‌তাহ্‌কে ৮০টি দোর্‌রা মারা হইল। এমন কি জয়নবের ভগিনী (হযরতের শ্যালিকা) হাম্‌নাকেও রেহাই দেওয়া হইল না।

বিবি আয়েষার সহিত সুচরিত্র সাফ্‌ওয়ানও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে-ছিলেন। আয়েষার নিষ্কৃতির পর তিনিও দোষমুক্ত হইলেন। কিন্তু কুৎসাকারীদিগের উপর হইতে তাঁহার আক্রোশ দূর হইল না। কবি হাসানকে তিনি তো গুরুতররূপে আহত করিয়াই ছাড়িলেন। এদিকে আবুবকরও কসম খাইয়া বসিলেন। মিস্‌তাকে তিনি আর কোনরূপে সাহায্য করিবেন না। মিস্‌তাহ্ আবুকরেরই আশ্রিত ও প্রতিপাল্য ছিলেন।

কিন্তু এ সম্বন্ধে এমন কয়েকটি আয়াত নাযিল হইল, যাহা দ্বারা বুঝা যায় ব্যাপারটি আগাগোড়াই একটা পূর্ব-পরিকল্পিত উদ্দেশ্যমূলক অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা নিম্নে সেই আয়াতগুলি উদ্ধৃত করিলাম :

"হে বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারীগণ, তোমরা যখন এই কুৎসা-

কাহিনী শুনিলে, তখন আপনার জনদিগের কথা মনে করিয়া কেন বলিলে না: ইহা সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা?

"এবং যদি তোমাদের উপর আল্লার অনুগ্রহই না থাকিত এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁহার করুণাই না প্রকাশ পাইত, তবে তোমরা (বিবি আয়েষার সম্বন্ধে) যে-সব (কুৎসিৎ) আলোচনায় যোগ দিয়াছিলে, তাহার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত।

"তোমরা এমন বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলে যাহার সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জানিতে না; তোমাদের কাছে বিষয়টি খুব হালকা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আল্লার কাছে উহা গুরুতর ছিল।

"এবং যখন তোমরা উহা শুনিলে, তখন কেন বলিলে না যে, এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা আমাদের সাজে না, সমস্ত গৌরব আল্লার, নিশ্চয়ই ইহা একটি মস্ত বড় অপরাধ?

"আল্লাহ্ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে ভবিষ্যতে যেন এরূপ কায আর না কর।"

—(২৪ : ১৩-১৭)

আবুবকর সম্বন্ধেও আল্লাহ্তালা এই আয়াত নাযিল করিলেন:

"এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা সম্পত্তিসম্পন্ন তাহারা যেন তাহাদের আশ্রিতজনকে, দরিদ্রদিগকে এবং যাহারা আল্লার পথে পালাইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা না করে, তাহাদের উচিত সকলকে ক্ষমা করা এবং (প্রতিজ্ঞা হইতে) ফিরিয়া দাঁড়ান। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন, ইহাই কি পছন্দ কর না?

আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" —(ঐ; ২৪ : ২২)

আয়াতগুলি নাযিল হইবার পর হযরত সকলকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় তাহাদের সহিত সম্প্রীতি স্থাপন করিলেন। আবুবকরও তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যতদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন কোন অবস্থাতেই মিস্তাহ্কে সাহায্য করিতে ভুলিবেন না।

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে পাঠকের কিরূপ মনে হয়? আমার প্রিয় নবী কি এই নিগ্রহ ভোগ করিলেন? হযরত ও তাঁহার পরিবারবর্গ

(আহ্‌লে বায়েত) চির-পবিত্র। সর্বপ্রকার কলুষতা হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ মুক্ত। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও সতীসাধ্বী আয়েষার নসিবে কেন এই লাঞ্ছনা ঘটিল? বিবি আয়েষা কেনই বা এরূপভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন, আর হযরত কেনই বা তাহা জানিতে পারিলেন না? জিব্রাইল ফিরিশ্‌তাও তাঁহাকে এই মারাত্মক ভুলের কথা জানাইয়া দিতে পারিতেন। তারপর মাসাধিককাল পর্যন্ত এই ঘটনাটি লইয়া মদিনায় বেশ একটা শোরগোল চলিল, অথচ আল্লাহ্‌ একদম নীরব হইয়া রহিলেন, কোন অহি নাযিল করিলেন না। ইহারই বা হেতু কী? আবার, যদিও আয়াত নাযিল হইল, সংগে সংগে আল্লাহ্‌ হযরত মুহম্মদকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন: "মুহম্মদ, ইহাকে অশুভ বলিয়া মনে করিও না। ইহার মধ্যে তোমার জন্য প্রচুর কল্যাণ নিহিত আছে।" ইহারই বা তাৎপর্য কী?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস: লীলাময় আল্লার ইংগিতেই সমস্ত কিছু সংঘটিত হইয়াছে। হযরত যখন আমাদের সর্ব অবস্থায় আদর্শ তখন তাঁহার জীবনে নব নব সমস্যা-সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই! নূতন নূতন অবস্থায় ফেলিয়া আল্লাহ্‌ তাঁহার রসূলকে দিয়া নূতন নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আলোচ্য ঘটনাটি সেই শ্রেণীর। ইহা পূর্বপরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যমূলক। সেই উদ্দেশ্যটি কী? তাহা এই:

দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতার উপরেই পারিবারিক সুখ ও সামাজিক শৃঙ্খলা নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষ চায়—তাহার পারিবারিক জীবন যৌনকলংক হইতে মুক্ত থাকুক। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন হয় যে এ কলংকের হাত হইতে অনেক সময় রেহাই পাওয়া যায় না। দোষ করিলে তো কলংক রটেই, অনেক সময় সন্দেহ করিয়াও লোকে নানা কথা বলে: তখন নারীর দুর্ভোগই হয় পুরুষের চেয়ে বেশী। পুরুষ দোষ করিলেও সমাজে দণ্ডনীয় হয় না; কিন্তু নারীর যদি একবার পদস্খলন হয়, অথবা যদি কোনরূপে তাহার চরিত্রে একবার সন্দেহের ছায়াপাত হয়, তবে আর রক্ষা নাই। সমাজে সমস্ত নৈতিক নিষ্ঠা ও ন্যায়বোধ তখনই জাগিয়া উঠে, ফলে নারীকে করিতে হয় ভীষণ শাস্তিভোগ। গৃহে বা সমাজে তখন আর তাহার মর্যাদা থাকে না। প্রতি পরিবারে, প্রতি সমাজে এই অপ্রীতিকর ঘটনা কোন-না-কোন সময় ঘটেই। এইরূপ গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে পড়িলে মানুষের কী করা উচিত? এই সমস্যার সমাধানই হইতেছে এই ঘটনার মূল

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আনুপূর্বিক সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিয়াই এই ঘটনা সংঘটিত করিয়াছিলেন এবং ধীরে ধীরে ইহাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন। সতীসাধ্বী স্ত্রীর নামে কুৎসা রটিলে স্বামীর প্রাণে কিরূপ দাবানল জ্বলিয়া উঠে, কিরূপে তিনি মানসিক অশান্তি ভোগ করেন, হযরত তাহা আপন প্রাণে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, নিরপরাধিনী নারীর অন্তরে এইরূপ মিথ্যা অপবাদ কিরূপ শেল বিদ্ধ করে, কিরূপভাবে তিনি কাতর হইয়া পড়েন, তাহার নিদর্শন পাই আমরা জননী আয়েষার মধ্যে। সাধারণ সমাজ এসব ঘটনাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করে এবং কিরূপ করিয়া তাহাদের মন খেলা করে, তাহারও দৃষ্টান্ত পাই মদিনাবাসীদিগের আচরণে। সমাজ-মনের সত্যই একখানি সুন্দর আলেখ্য এ।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিশ্বনবী আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমরা তাঁহার নিকট হইতে আলো পাইতে পারি। এই ব্যাপারেও তিনি আমাদের সম্মুখে চিরন্তন আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র লোকাপবাদের ভয়ে অথবা প্রজারঞ্জনের অনুরোধে নিরপরাধিনী সতীসাধ্বী সীতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া হযরত মুহম্মদ কী করলেন? কলংক-ভয়ে তিনি বিচলিত হইলেন না। ধৈর্যের সহিত ব্যাপারটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তারপর যখন জানিতে পারিলেন যে আয়েষা সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তখন সমস্ত লোকভয় উপেক্ষা করিয়া তিনি আয়েষার সহিত মিলিত হইলেন। নারীর প্রতি কতখানি সম্ভ্রম ও সমবেদনার পরিচয় এ! অসীম মনোবল-সম্পন্ন সত্যাশ্রয়ী আদর্শ পুরুষ না হইলে কেহ এরূপ করিতে পারে না।

এই ঘটনার পর হইতে বহু অকল্যাণের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আমরা আমাদের মা-বোনকে সম্ভ্রম করিতে শিখিয়াছি, মর্যাদা দিতে শিখিয়াছি। অমূলক সন্দেহের বশবর্তী হইয়া বিনা বিচারে আমরা তাঁহাদিগকে আর লাঞ্ছিত করিতেছি না। পক্ষান্তরে, আল্লার কঠোর শাস্তির ভয়ে আমরা পূর্বের ন্যায় অবলীলাক্রমে কোন নারী চরিত্রের উপর কুৎসা-কালিমাও প্রক্ষেপ করিতেছি না। এই জন্যই আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় নবীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন: "মহম্মদ, এই ঘটনাকে তুমি অশুভ বলিয়া মনে করিও না,

ইহার মধ্যে তোমার জন্য অশেষ কল্যাণ নিহিত আছে।" এ কল্যাণ যে কোথায় এবং কিরূপভাবে ঘটিতেছে, পাঠক তাহা নিশ্চয়ই এখন বুঝিতে পারিতেছেন।

এই সংগে লক্ষ্য করিবার বিষয়: বিবি আয়েষার চরিত্র-বল। পুণ্যময়ী সতীসাধ্বী নারীর তিনি একটি জলন্ত আদর্শ। পরিত্যক্ত অবস্থায় বিপদে পড়িয়া তিনি সাফ্‌ওয়ানের উটে চড়িয়া আসিতে কোনই দ্বিধাবোধ করেন নাই। বিপদের দিনে নারীর এরূপ সৎসাহস ও মনোবলের নিতান্ত প্রয়োজন। তারপর মদিনায় আসিয়া যখন তিনি লোকমুখে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের কথা জানিতে পারিলেন, তখনও তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন না; অথবা আত্মহত্যা করিবার দুর্বলতাও দেখাইলেন না। দারুণ অভিমানে তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। অবশেষে হযরত যখন তাঁহাকে আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন, তখন যে নির্ভীক তেজস্বিতার পরিচয় তিনি দিলেন, তাহার তুলনা নাই। পরীক্ষা যত কঠোর হইতে লাগিল, ততই তিনি তাহার উর্ধ্বে উঠিতে লাগিলেন। হযরতের উপদেশ মত তিনি যদি সত্যই আল্লার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, তবে এই কথাই স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত হইত যে, বিবি আয়েষার নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু গলদ ছিল; তাই তওবা করিয়া তিনি রেহাই পাইয়াছেন। লোকে বলুক-না-বলুক, হযরত তাহা মনে করুন বা না করুন, আপনার বিবেকের কাছে এবং সমাজের কাছে তিনি নিশ্চয়ই ছোট হইয়া যাইতেন। তাই এতটুকু সূক্ষ্ম দাগও আয়েষার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন: "আমি এ ব্যাপারে আল্লার কাছে ক্ষমা চাহিতে রাজী নই।" কতখানি নৈতিক বল থাকিলে এরূপ উত্তর দেওয়া যায়, পাঠক তাহা চিন্তা করুন। একে তো লোকচক্ষুর সম্মুখে কলংকভাগিনী, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় একে তো শীর্ণকায়া; স্বামীর সহিত পুনর্মিলনে একে তো আগ্রহান্বিতা, স্বামিকুল, এবং পিতৃকুলকে কলংকমুক্ত করিবার জন্য একে তো তিনি উৎকণ্ঠিতা, সর্বোপরি নিজের নিষ্কলংকতা প্রমাণ করিবার জন্য একে তো তিনি উদ্বিগ্ন, তাহার উপর আবার স্বামীর এই অনুরোধ! সে স্বামীও অন্য কেহ নন—পয়গম্বর! আর সে অনুরোধও অন্য কিছু নয়—আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অনুরোধ। কিন্তু হইলে কী হয়! এই সূক্ষ্ম স্থানের মধ্যেও সে তাঁহার চরিত্রের প্রতি

কটাক্ষপাত রহিয়াছে। সারা পথ তরী বাহিয়া শেষকালে কি ঘাটে আসিয়া তাঁহার ভরাডুবি হইবে? কিছুতেই না। বিবি আয়েষা ক্ষমা চাহিলেন না। আপন মর্যাদা ষোল আনা আদায় না করিয়া তিনি ছাড়িলেন না। মলিনতার এক সূক্ষ্ম বিন্দুও তাঁহার চোখ এড়াইয়া গেল না। এই কঠোরতর পরীক্ষার ফলাফল দেখিবার পর আল্লাহ্ আর নীরব থাকিতে পারেন কি? অমনি আয়াত নাযিল করিয়া তিনি সব সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন।

তারপর? তারপর আসিল ধন্যবাদের পালা। আবুবকর ও তাঁহার স্ত্রী বলিলেন: "আয়েষা, যাও, হযরতকে ধন্যবাদ দাও, তাঁহাকে আলিংগন কর।" কিন্তু আয়েষার চরিত্রে জ্যোতিঃ তখনও জল্‌জল্‌ করিতেছিল। অভিমানের সুরে তিনি বলিলেন: "হযরতকে কেন ধন্যবাদ দিব? তিনি আমার কী উপকার করিয়াছেন? কোন্ সাহায্য করিয়াছেন? তিনি বরং কুৎসাকারীদিগের দলেই আছেন। একমাত্র আল্লাই আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, কাজেই সকল ধন্যবাদ একমাত্র আল্লারই প্রাপ্য।"

এ আদর্শের তুলনা নাই। পুরুষ এবং নারীর চিরন্তন একটি দ্বন্দ্ব ও সমস্যার উজ্জ্বল চিত্র এ।

ধন্য হযরত মুহম্মদ, ধন্য বিবি আয়েষা,—বিশ্বমানুষের কল্যাণের জন্য যাঁহারা এতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

———

পরিচ্ছেদ : ৪৫

খন্দক-যুদ্ধ

ওহদ-যুদ্ধের শেষে আবুসুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল: পরবৎসর বদর-প্রান্তরে আবার তাহারা মুসলমানদিগের সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিবে। কিন্তু এ আস্ফালন কার্যে পরিণত হইল না। আবুসুফিয়ান দেখিল, ওরূপ-ভাবে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া নিছক আহাম্মুকি। মুসলমানদিগকে যে সহজে পরাজিত করা যাইবে না, বদর এবং ওহুদে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই, এখন কোন নূতন প্রচেষ্টা করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও শক্তিশালী অভিযানের প্রয়োজন। এই কথা ভাবিয়া আবুসুফিয়ান সমগ্র আরবময় একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু এত আস্ফালনের পর বদরে না গেলেও আবুসুফিয়ানের মুখ থাকে না। আরব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এই: যাহা বলিবে, তাহা করিবেই; না করিলে তাহা নিছক কাপুরুষতা বলিয়া গণ্য হইবে। নির্দিষ্ট সময়ে যদি মুসলমানগণ বদরে আসিয়া পৌছে, আর কোরেশদিগকে দেখিতে না পায়, তবে সকলে বলিবে: আবুসুফিয়ান ভয় পাইয়া আসে নাই। কাজেই মুসলমানগণ যাহাতে এবার আর বদরে না আসে, সেই চেষ্টা করাই এখন আবুসুফিয়ান কর্তব্য বলিয়া মনে করিল। সে ভাবিল, মুসলমানদিগকে কোনরূপে ভড়কাইয়া দিতে পারিলেই কার্যসিদ্ধি হইবে। এতদুদ্দেশ্যে সে একটা উপায় উদ্ভাবন করিল। নঈম নামক জনৈক নিরপেক্ষ লোককে হাত করিয়া সে তাহাকে মদিনায় পাঠাইয়া দিল। নঈম তথায় গিয়া প্রকাশ করিল: "আবুসুফিয়ান এবার আরও বিপুল ও বিরাটভাবে রণসজ্জা করিয়া বদরে অগ্রসর হইতেছে, সুতরাং তোমরা এবার আর বদরে যাইও না।" এই সংবাদে হযরত মোটেই ঘাবড়াইলেন না। যথাসময়ে তিনি ১৫০০ মুসলিম গাজীকে সংগে লইয়া বদরে উপনীত হইলেন। আট দিন পর্যন্ত তিনি তথায় অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু কোরেশদিগের কোনই সাড়াশব্দ পাইলেন না। তখন বাধ্য হইয়া তিনি মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। লোক দেখিল মুসলমানগণ একটুও দমে নাই, বরং তাহাদের শক্তি ও সাহস আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

ইহার পর প্রায় একটি বৎসর একরূপ নির্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল। আবু-সুফিয়ান ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র পাকাইতে লাগিল। কিন্তু কোরেশদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে হযরতের বাকী রহিল না। একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্র ও আয়োজন যে চলিতেছে হযরত তাহা বুঝিতে পারিলেন। সেজন্য তিনিও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ভিতরে শত্রু, বাহিরে শত্রু, যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন বিপদ ঘটিতে পারে কাজেই তিনি একটা স্থায়ী সেনাদল গঠন করিলেন। তিন হাজার মুসলিম বীর এই সেনাদলে যোগ দিলেন।

এক বৎসর ধরিয়া আবুসুফিয়ান আরবের সর্বত্র সৈন্যসংগ্রহ ও বিদ্রোহ সৃষ্টি ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়া সফলকাম হইল। মরুভূমির মধ্যে যে-সমস্ত স্বাধীন বেদুইন জাতি বাস করিত, তাহারা কোরেশদিগের সহিত যোগ দিল। তা ছাড়া ইহুদীরাও এবার প্রকাশ্যে সমবেতভাবে কোরেশদিগকে সাহায্য করিতে লাগিল। নির্বাসিত বনি-নাজির গোত্রের হুয়াই প্রমুখ ইহুদীরাই এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। মক্কায় গিয়া কোরেশদিগকে তাহারা উৎসাহিত করিতে লাগিল এবং অন্যান্য স্থানেও প্রচারকার্য দ্বারা তাহারা সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ফেলিল। ইতিপূর্বে বনি-কোরাইজা গোত্রের ইহুদীদিগের সহিত হযরত একটি সন্ধি করিয়াছিলেন। বনি-নাজিরগণের চক্রান্তে তাহারাও সে-সন্ধি ভংগ করিয়া গোপনে গোপনে কোরেশদিগের সহিত যোগ দিল: এইরূপে কোরেশ, ইহুদী, বেদুঈন ও অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্র এক সংগে মিলিয়া এবার মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল।

যথাসময়ে মদিনায় এ সংবাদ পৌঁছিল। হযরত বিশিষ্ট সাহাবাদিগকে লইয়া পরামর্শ করিলেন। সিদ্ধান্ত করা হইল: এবার কিছুতেই মদিনার বাহিরে যাওয়া হইবে না। শুধু তাই নয়, এক সম্পূর্ণ নূতন যুদ্ধ পদ্ধতিরও পরিকল্পনা তিনি করিলেন। সাল্‌মন ফারসী নামক জনৈক পারস্যবাসী মুসলমান নগরের চারিপাশে গভীর পরিখা খনন করিবার পরামর্শ দিলেন। এই নবপরিকল্পনা হযরতের খুবই পছন্দ হইল। তিনি পরিখা খনন করিতে প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধের এরূপ প্রক্রিয়া আরববাসীরা কোনদিন শোনেও নাই, দেখেও নাই। সকলে বিস্ময় মানিল।

অনতিবিলম্বে মুসলমানগণ এই পুর-পরিখা খনন-কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। মদিনার পশ্চাদ্দিকে আলওয়া পর্বত অবস্থিত, কাজেই

সেদিকটা একরূপ সুরক্ষিত ছিল। অন্য তিন দিকেরও সর্বত্র পরিখা খননের প্রয়োজন বোধ হয় নাই; দুর্গ ও প্রাচীর দ্বারা কোন কোন স্থান পূর্ব হইতেই সুরক্ষিত ছিল। যে-সমস্ত স্থান উন্মুক্ত ছিল, সেই সমস্ত স্থানেই খনন-কার্য আরম্ভ হইল। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া তিন হাজার মুসলমান মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই সমস্ত মাটি ফেলিয়া খাদের ভিতরকার পার্শ্ব উঁচু করিয়া বাঁধিয়া তুলিতে লাগিলেন। সেই সুউচ্চ প্রাচীরের উপর বড় বড় প্রস্তরখণ্ডও রাখিয়া দেওয়া হইল; উদ্দেশ্য: সময়কালে সেগুলিকে শত্রুদের মাথায় নিক্ষেপ করা চলিবে। এক সপ্তাহের অক্লান্ত চেষ্টায় এই বিরাট কার্য সম্পন্ন হইল। প্রায় দশ হাত গভীর দশ হাত প্রস্থ এবং ছয় হাজার হাত দীর্ঘ পরিখা প্রস্তুত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, হযরত নিজে এই পরিখা খনন-কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীন্ ও দুনিয়ার বাদশাহ কুলিমজুর সাজিয়া ধূলিধূসরিত দেহে মাটি কাটিতেছেন এবং সকলের সংগে মাটির ঝুড়ি মাথায় করিয়া যথাস্থানে তাহা ফেলিয়া আসিতেছেন। এ দৃশ্য নিতান্তই মর্মস্পর্শী। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের জন্য নেতাকে যে ধূলার আসনে নামিতে হয়, এ আদর্শ কী সুন্দরভাবেই না তিনি দেখাইলেন।

দ্রুতগতিতে সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়া গেল। মহিলা ও শিশুদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ একটি দুর্গে সরাইয়া দেওয়া হইল। পরিখার পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদিগকেও স্থানান্তরিত করা হইল। উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদির ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইয়াছিল।

বনি-কোরাইজাদিগের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিতে পারিয়া হযরত আউস এবং খাজরাজ বংশের দুইজন প্রবীণ ব্যক্তিকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "এ কী শুনিতেছি? তোমরা নাকি সন্ধি ভাঙিয়া কোরেশদিগের সংগে যোগ দিয়াছ?" ইহুদীরা উদ্ধত স্বরে উত্তর দিল: "দিয়াছি তাই কী? তোমাদের কোন কথা আমরা শুনিতে চাই না। কে তোমাদের মুহম্মদ? কে তোমাদের রসুল? মানি না আমরা তাহাকে। যাও।"

ইহুদীদিগের এই জঘন্য আচরণে হযরত নিরতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হইলেন। ইহারা যে সময়কালে মুসলমানদিগকে এমন বিপদে ফেলিবে তাহা তিনি ভাবিতেই পারেন নাই। মদিনার উপকণ্ঠে যে দিকটায় তাহাদের

বাস, সেই দিকটাই অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত ছিল। কাজেই তিনি আশংকা করিলেন, যুদ্ধকালে এই দিক দিয়া বিপদ আসিতে পারে। প্রকৃত ব্যাপারও ছিল তাই। কোরেশগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, মুসলমানগণ যখন তাহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবে, তখন ইহুদীরা তাহাদের মহল্লা হইতে বাহির হইয়া মুসলমানদিগের ঘরবাড়ি আক্রমণ করিবে। হযরত কালবিলম্ব না করিয়া ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। তিন হাজার সৈন্যের মধ্য হইতে পাঁচ শতকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং দুই-জন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে তাহাদিগকে স্থাপন করিয়া, ইহুদী-পল্লীর চতুর্দিকে টহল দিবার জন্য আদেশ দিলেন। মুসলমানগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া দিবরাত্র ইহুদী মহল্লার চারিপাশে কুচকাওয়াজ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন এবং মুহুর্মুহু তকবীর-ধ্বনিতে গগন-পবন প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে ইহুদীরা খুব ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা আর নিজেদের মহল্লা ছাড়িয়া বাহির হইতে সাহস করিল না। এদিকে হযরত আড়াই হাজার সৈন্য লইয়া পরিখা-বেষ্টিত মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইলেন। সকলকে যথারীতি উপদেশ দিয়া তিনি শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আবুসুফিয়ান মহা আড়ম্বরে মদিনার পানে অগ্রসর হইতে লাগিল। দশ হাজার সৈন্যের বিরাট অভিযান সে। অগণিত অশ্ব, অগণিত উট, অগণিত লোক-লস্কর ও রসদ-সম্ভার। এই বিপুল অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মাত্র আড়াই হাজার মুসলিম! জীবন-মরণ সমস্যার আজ তাহারা সম্মুখীন। তাঁহাদের নসীবে কী আছে, কে জানে? কিন্তু তবুও মুখে কোন ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র নাই। সকলের মুখে সেই একই নির্ভরতার বাণী: আল্লাই আমাদের যথেষ্ট।

আবুসুফিয়ান প্রথমতঃ ওহদ প্রান্তরে আসিয়া ডেরা ফেলিল। ভাবিয়াছিল, মুসলমানগণ পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও এখানে আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিবে। কিন্তু যখন সে দেখিল, মুসলিম সৈন্যের নাম-নিশানাও সেখানে নাই, তখন অধিকতর উৎসাহিত হইয়া মদিনা অবরোধের জন্য সে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু মদিনার উপকণ্ঠে আসিয়াই চক্ষুস্থির হইয়া গেল। এ কী! পরিখা! এমন ব্যাপার তো তাহারা কখনও কল্পনা করে নাই! কী করিয়া এ পরিখা পার হওয়া যায়? পরিখা-প্রাচীরের উপরে তীরন্দাজ

সৈন্য দণ্ডায়মান; অগণিত প্রস্তরখণ্ডও সেখানে সুবিন্যস্ত। কোরেশগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেইখানেই তাঁবু ফেলিল। বসিয়া বসিয়াই তাহারা দিন গুজরান করিতে লাগিল। কী যে করিবে, ভাবিয়াই পাইল না। প্রথমতঃ তাহারা কয়েকদিন দূর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া তাহারা সমবেত আক্রমণ দ্বারা পরিখা-প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিতে মনস্থ করিল। বহু চেষ্টা করিবার পর তাহারা একটি দুর্বল স্থান দেখিয়া সেইখানে ক্ষিপ্রভাবে আক্রমণ করিল। আবুযহলের পুত্র ইকরামা তাহার অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া এই স্থানের অবরোধ ভেদ করিয়া একটা পথ প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। সেই পথ দিয়া আমর নামক জনৈক কোরেশবীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া মুসলমানদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিল। মহাবীর আলি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া আমরের সম্মুখীন হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; মুহূর্তমধ্যেই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে গগন-পবন কাঁপাইয়া তুলিয়া আলি বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। সকলে বুঝিতে পারিল, আমর নিহত হইয়াছে।

ইহার পর নওফল নামক আর একজন কোরেশবীরও আলির হস্তে নিহত হইল। কোরেশগণ ভয় পাইয়া পালাইয়া গেল। সেদিনকার মত যুদ্ধ এইখানেই শেষ হইল।

রাত্রি আসিল। মুসলমানগণ সারারাত্রি জাগিয়া পরিখা পাহারা দিতে লাগিলেন।

পরদিন ভোরবেলা কোরেশগণ সমুদয় সৈন্য লইয়া পরিখা আক্রমণ করিল। খালিদ ও ইকরামা তাহাদের অশ্বারোহীদল লইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিল। কখনও বা একযোগে, কখনও বা দলে দলে কোরেশগণ আক্রমণ চালাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, পরিখা-প্রাচীর কিছুতেই তাহারা ভেদ করিতে পারিল না। এই রূপে দ্বিতীয় চেষ্টাও তাহাদের ব্যর্থ হইল।

এদিকে বনি-কোরাইজাগণও কোরেশদিগকে নিরাশ করিল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তাহারা মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। তখন আবুসুফিয়ান তাহাদের লোক পাঠাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ইহুদীরা বলিল: "আজ আমাদের Sabbath বা উপাসনার দিন। কাজেই আমরা কোনমতেই যুদ্ধ করিতে পারিব না।" এই বিশ্বাস-

ঘাতকতার দরুণ কোরেশগণ ইহুদীগের উপর মহা খাপ্পা হইয়া পড়িল।

শীতের রাত। উন্মুক্ত প্রান্তর। রসদপত্রও ফুরাইয়া আসিয়াছে। প্রতিদিন দশ হাজার লোকের আহারের ব্যবস্থা করা কম কথা নয়। আবু-সুফিয়ান ভাবিয়াছিল, দুই-এক দিনের মধ্যেই তাহারা মদিনা জয় করিয়া আসিবে; কিন্তু দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তবু কিছুই হইল না। তখন সকলেই মহা দুর্ভাবনায় পড়িল। অবরোধ তুলিয়া লইয়া তাহারা ফিরিয়া যাইবার মতলব করিল।

কিন্তু ফিরিতে চাহিলেই ফিরা যায় না। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের পর সন্ধ্যাবেলা কোরেশগণ যখন শিবিরে আশ্রয় লইল, তখন আকাশে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ মরুঝটিকা উত্থিত হইয়া কোরেশদিগের সমুদয় ছাউনি উড়াইয়া লইয়া গেল। মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। শিবিরের আগুন নিবিয়া গেল। রসদপত্র ও অন্যান্য উপকরণও ভাঙিয়া-চুরিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। কোরেশদিগের দুর্গতির সীমা রহিল না। আল্লার গজব যেন তাহাদের উপর মূর্তি ধরিয়া নামিয়া আসিল। ভীত-ত্রস্ত ও দিশাহারা হইয়া কোরেশগণ সেই রাত্রেই মদিনা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি মক্কার পথ ধরিল।

পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল, ময়দান একদম সাফ। কোরেশদিগের নামগন্ধও নাই, আছে শুধু তাহাদের সকরুণ স্মৃতি, ছিন্ন শিবির, ভগ্ন আসবাবপত্র এবং নির্বাপিত অগ্নিকাণ্ডের সিক্ত ভস্মস্তূপ।

একটি রজনীর এপারে-ওপারে কত পার্থক্য—কত পরিবর্তন! কাল যেখানে জাহান্নামের আগুন জ্বলিতেছিল, আজ সেখানে বিহিশ্‌তের স্নিগ্ধ বারিধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কাল যেখানে মিথ্যা ও ভয়ংকরের অভিনয় চলিতেছিল, আজ সেখানে সত্য ও সুন্দরের মহ্‌ফিল বসিয়াছে। এই অচিন্ত্য পটপরিবর্তন কে করিল? কোন্‌ অদৃশ্য শক্তির ইংগিতে এমন হইল? কার কুদরৎ এ? মুসলমানগণ ভাবেন আর ক্রমেই আল্লার দিকে ঝুকিয়া পড়েন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহাদের অন্তর ভরিয়া যায়।

কোরেশদিগের পরিত্যক্ত আসবাবপত্র লুণ্ঠন করিবার জন্য এবার আর কোন মুসলমানই পরিখা হইতে বাহির হইলেন না। ওহুদের মারাত্মক ভুলের কথা তাঁহাদের হৃদয়ে গাঁথা ছিল। শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতার দিক দিয়া তাই এবার আর তাঁহাদের একটুও ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিল না।

কোরেশগণ সত্যই ফিরিয়া যাইতেছে কিনা, অথবা ইহা তাহাদের রণ-কৌশল মাত্র, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত হযরত একজন গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কোরেশগণ সত্যই মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছে।

হযরত যখন নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিলেন, তখন সকলকে স্ব-স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। মদিনার পথপ্রান্তর আবার বিজয়-নিনাদে মুখরিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু হযরত বসিয়া থাকিলেন না। বনি-কোরাইজাদিগের বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা তিনি ভুলেন নাই। তাহারা যে গোপনে গোপনে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে, এ কথাও তিনি জানিতে পারিলেন। এহেন মুনাফিকদের দ্বারা দুনিয়ার কী মহা অনর্থই না ঘটিতে পারে। ইহারা কথা দিয়া কথা রাখে না, সন্ধি করিয়া মানে না। সমাজের আবেষ্টনের মধ্যে ইহারা সাপের মত বাস করে; কখন কাহাকে দংশন করে, কে জানে। ইহারা সমাজের শত্রু। ইহারা ক্ষমার অযোগ্য।

যুদ্ধের দারুণ ক্লান্তি তখনও মুসলমানদিগের দেহমনে লাগিয়া আছে, এমন সময় পুনরায় হযরতের আহ্বান আসিল, "প্রস্তুত হও, বনি-কোরাইজা-দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইবে।"

আবার বীরদল পরিত্যক্ত অস্ত্র তুলিয়া লইলেন, আবার তাঁহাদের জয়যাত্রা আরম্ভ হইল। বিশাল পতাকা উড়াইয়া 'শেরে খোদা' আলি চলিলেন অগ্রে অগ্রে; তাঁহারই পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন তিন হাজার গাজী—মুখে তাঁহাদের তৌহিদের কলেমা, হাতে তাঁহাদের নাঙা তলোয়ার।

মুসলমানগণ বনি-কোরাইজাদিগের দুর্গ ও বসতি অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। ইহুদীরা কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, এত শীঘ্র তাহাদের দুয়ারে এই বিপদ ঘনাইয়া আসিবে। নিরুপায় হইয়া তাহারা দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল।

কিন্তু এরূপভাবে কয়দিন চলে? ইহুদীদিগের আর কষ্টের অবধি রহিল না। প্রায় দুই সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকিবার পর তাহারা হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। দূত মারফৎ তাহারা হযরতের নিকট বলিয়া পাঠাইল: হযরত যদি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন, তবে বনি-কাইনুকা ও বনি-নাজিরদিগের স্থায় তাহারাও দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু হযরত এবার এই বিশ্বাসঘাতকদিগকে অত সহজে ক্ষমা করিতে চাহিলেন না। পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন, অপরাধীকে সব সময় ক্ষমা করাও এক নৈতিক অপরাধ। ন্যায়নীতি এবং বৃহত্তর মানব-কল্যাণের জন্য দুর্বৃত্তদের সমুচিত দণ্ডবিধানেরও প্রয়োজন আছে। বনি-কাইনুকা ও বনি-নাজিরদিগকে ক্ষমা করিয়া তিনি যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছেন; তাই এবার তিনি ইহুদীদিগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। সকলকে বন্দী করিবার জন্য তিনি হুকুম দিলেন।

ইহুদীদিগের মনে খুব ভয় হইল। তাহারা বুঝিল, তাহাদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়া তাহারা আউস্-গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের শরণাপন্ন হইল। ইসলাম গ্রহণ করিবার পূর্বে এই আউস্-গোত্রের সহিত ইহুদীদিগের খুব মাখামাখি ও বাধ্যবাধকতা ছিল। ইহুদীরা মনে করিল, আউসগণ নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতি এখন একটু সহানুভূতি দেখাইবে। তাই তাহারা প্রস্তাব করিল: আউস্-গোত্রের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উপর তাহাদের বিচারভার ন্যস্ত করা হউক; তিনি যে-দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন, ইহুদীরা তাহাই মানিয়া লইবে।

হযরতও তাহাতেই রাজী হইলেন।

তখন ইহুদীদিগের ইচ্ছানুসারে আউস্-গোত্রের খ্যাতনামা প্রধান-পুরুষ সা'দ বিন-মা'জ এই বিচারের জন্য মনোনীত হইলেন।

কিন্তু সা'দের তখন শোচনীয় অবস্থা। খন্দক যুদ্ধে মুসলমানগণ যদি কিছু হারাইয়া থাকেন, তবে এই উজ্জ্বল রত্নটিকে হারাইয়াছিলেন। যুদ্ধকালে তিনি শোচনীয়ভাবে আহত হওয়ায় শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে মসজিদ প্রাঙ্গণে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইখানে হযরত যুদ্ধে আহত মুসলমান বীরদিগের চিকিৎসা ও সেবাযত্নের জন্য পূর্ব হইতেই একটি হাসপাতাল খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। রুফাইদা নাম্নী জনৈক সুশিক্ষিতা ধাত্রীকেও নিয়োজিত করা হইয়াছিল। এইখানে সা'দ শয্যাশায়ী ছিলেন। হযরত বাধ্য হইয়া সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সা'দকে অতি কষ্টে একটি খাটিয়ায় বহন করিয়া লইয়া আনা হইল। তখন হযরত বলিলেন: "ইহুদীরা তোমাকে বিচারক নিযুক্ত করিয়াছে। তুমি যে-দণ্ডবিধান করিবে, তাহাই তাহারা মানিয়া লইবে। আমিও তাহা মানিতে রাজী আছি।"

সা'দ একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। আসিবার কালে সারা পথ আউস্-গোত্রের অন্যান্য মুসলমানগণও ইহুদীদিগের উপর সদয় ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট সুপারিশ করিতেছিলেন। ইহুদীদিগের সহিত আউস্ গোত্রের সৌহার্দ্যের পূর্বস্মৃতিও তাঁহার মনে জাগিতেছিল। কিন্তু হইলে কী হয়! সেই খাতিরে তো তিনি পক্ষপাতিত্ব করিতে পারেন না। মরণসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া তিনি ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবেন? করিলে তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। অপক্ষপাত বিচার তাঁহাকে করিতে হইবে, তাহাতে যে যাহা বলে বলুক। ইহাই ভাবিয়া সা'দ তাঁহার মনকে দৃঢ় করিলেন।

তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই বড় করুণ। বন্দী ইহুদীগণ একপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে, অন্যপার্শ্বে হযরত ও তাঁহার সাহাবাগণ দাঁড়াইয়া আছেন। আশা-নিরাশার আলো-আঁধারে ইহুদীদিগের ভাগ্য দোল খাইয়া ফিরিতেছে; স্তব্ধ প্রকৃতি এই অভিশপ্তদিগের শেষ পরিণতি দেখিবার জন্য যেন নীরবে অপেক্ষা করিতেছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সা'দ ঘোষণা করিলেন: "ইহুদীদিগের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে লেখা আছে: কোন দলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে প্রথমে তাহাদিগকে সন্ধির জন্য আহ্বান কর, যদি তাহারা সে আহ্বানে কর্ণপাত করে এবং সন্ধি করিতে রাজী হয়, তবে তাহাদিগকে করদমিত্ররূপে ব্যবহার কর; যদি তাহারা না শুনে, তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, যুদ্ধে তাহারা পরাজিত হইলে তাহাদের পুরুষদিগকে হত্যা কর, স্ত্রীপুত্র ও বালক-বালিকাদিগকে দাসদাসীরূপে ব্যবহার কর, এবং তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লও।* সেই শাস্ত্রবিধান অনুসারেই

* তাওরাত গ্রন্থে এইরূপ লেখা আছে :—

"When thou comest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it.

And it shall be, if it make thee answer of peace, and open unto thee, then it shall be that all the people that is found therein shall be tributaries unto thee and they shall serve thee.

And if it will make no peace with thee, but will make war against thee, then thou shalt besiege it.

And when the Lord thy God hath delivered it unto thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the sword.

But the women and the little ones and the cattle and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself, and thou shalt eat the spoil of thine enemies which the Lord thy God hath given thee."

(Deut: 20: 10-14)

আমি এই রায় দিতেছি যে মুসলমানদিগের সহিত সন্ধিসর্ত ভংগ করার দরুণ সমুদয় ইহুদী পুরুষদিগের প্রাণদণ্ড হইবে, স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণ দাসদাসীরূপে পরিগণিত হইবে এবং ইহুদীদিগের সমস্ত সম্পত্তি মুসলিম সৈন্যদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।"

রায় শুনিয়া ইহুদীরা নিরাশ হইয়া পড়িল ; মুখে তাহাদের কথা সরিল না। ম্লানমুখে তাহারা এই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিল। মৃত্যুর কালোছায়া হতভাগ্য-দিগের চোখে-মুখে ঘনাইয়া আসিল। নিজেদের ধর্মশাস্ত্রেই যখন এই ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন তাহারা ইহাকে অন্যায়ও বলিতে পারিল না। তাহাদের ভাগ্যে যে এই, কে জানিত!

সা'দের এই বিচার কোনক্রমেই অসংগত হয় নাই। এইরূপ অপরাধে চিরদিন গুরুদণ্ডই হইয়া থাকে। আধুনিক যুগেও রাষ্ট্রবৈরী ষড়যন্ত্রকারী-দিগের ইহা অপেক্ষা লঘুদণ্ড হয় না। সোভিয়েট রাশিয়াই তার প্রমাণ। অনেক ক্ষেত্রে বিনাবিচারেই শত্রুদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইয়া থাকে বা আটক রাখা হইয়া থাকে। তাহাদের সমস্ত সম্পত্তিও অনেক স্থানে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে হযরত নিজে ইহুদীদিগের বিচার করেন নাই ; ইহুদীদিগের মনোনীত ব্যক্তির হস্তেই তাহাদের বিচারভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। এতখানি অধিকার নিশ্চয়ই কোন অপরাধীকে দেওয়া হয় না,—এই উন্নত ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগেও না। সা'দ যদি ইহুদীদিগকে সম্পূর্ণ মুক্তিও দিতেন, তবু হযরত তাহাই নির্বিবাদে মানিয়া লইতে বাধ্য ছিলেন। কাজেই, এ সম্বন্ধে ইহুদীদিগের পক্ষ হইতে কোন কিছুই আর বলিবার নাই।

রায় অনুসারে ইহুদী পুরুষদিগের প্রাণদণ্ড হইল। নারী ও পুত্রকন্যারা যুদ্ধলব্ধ দাসদাসীরূপে পরিগণিত হইল। সমস্ত সম্পত্তি সৈন্যদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু হইলে কি হয়! বিচার ন্যায্য হইল বটে, কিন্তু ইহার কঠোরতা হযরতের প্রাণ স্পর্শ করিল। দেশের আইনে যাহাই বলুক, স্বাধীন মানুষকে কেমন করিয়া তিনি দাসদাসীতে পরিণত করিবেন? হাজার হইলেও ইহুদীরা তো মানুষ! মানুষের পাপ ও দুষ্কৃতিকে হযরত ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করেন না। অথচ ঘটনাচক্রে আজ তাহাই প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। হযরত কিছুতেই ইহা বরদাশ্‌ত করিতে পারিলেন না।

মানবতার এই গুরুলাঞ্ছনায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বন্দিনীদিগের মধ্যে হইতে 'রায়হানা' নাম্নী জনৈক ইহুদী ললনাকে বিবাহ করিয়া নিজের পরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে সমস্ত ইহুদী সমাজ লাঞ্ছনা ও অমর্যাদার হাত হইতে রক্ষা পাইল। ক্রীতদাসীকে সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়া তিনি মানব-প্রেমের এক নবআদর্শ সৃষ্টি করিলেন। সমগ্র ইহুদী সমাজ বুঝিল: রাজনৈতিক কারণে ইহুদী বন্দীদিগের প্রাণদণ্ড হইলেও, হযরত জাতিগতভাবে ইহুদীদিগকে ঘৃণা করেন না। ক্রীতদাসীরাও হযরতের এ-কার্যে বিস্ময় মানিল। মুক্ত নারীদিগের ন্যায় তাহাদেরও যে পয়গম্বর-গৃহিণী হইবার অধিকার আছে, এ কথা তাহারা এই প্রথম উপলব্ধি করিল। কোন যুদ্ধ-বন্দিনী ক্রীতদাসীকে এতখানি মর্যাদা ইহার পূর্বে আর কেহ দিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

———

পরিচ্ছেদ : ৪৬

ষষ্ঠ হিযরীর কয়েকটি ঘটনা

ইহুদীদিগের বিচার-কার্য শেষ হইবার পর সা'দকে ধরাধরি করিয়া গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার জীবন-প্রদীপ তখন নির্বাপিত হইয়া আসিয়াছিল। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই তিনি জান্নাতলোকে প্রস্থান করিলেন।

খন্দক-যুদ্ধের ফলাফল কী দাঁড়াইল? আসুন পাঠক, এই সুযোগে আমরা তাহা একবার দেখিয়া লই। এই যুদ্ধকেই ইসলামের চূড়ান্ত যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। এই যুদ্ধে কোরেশগণ নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ পাইল যে, ইসলামের গতি দুর্নিবার। তিন তিনবার তাহারা শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। তিন তিনবারই বিফলমনোরথ হইয়াছে। বদরে তাহারা শোচনীয়রূপে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে; ওহুদে তাহারা জয়লাভের পূর্ণ সুযোগ পাইয়াও মুসলমানদিগকে পরাজিত করিতে পারে নাই; খন্দকে তাহারা আরবের সমস্ত শক্তি লইয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে। শুধু কোরেশই বা বলি কেন? কোরেশ, ইহুদী, পৌত্তলিক ও বেদুঈন—সমস্ত গোত্রই বুঝিতে পারিয়াছে: মুহম্মদ অজেয়। খন্দক-যুদ্ধের পরে তাই তাহাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল, একটা হীনতা ও পরাজয়ের মনোভাব এইবার সকলকেই পাইয়া বসিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের বুকে নববল ও নবপ্রেরণার সঞ্চার হইল। নির্ভীক উন্নত শিরে বিশ্বের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন। কোন বাধাই যে তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না, সকল শত্রুই যে তাঁহাদের পদানত হইবে, ইসলাম যে সর্বত্র জয়যুক্ত হইবে—এ কথা এই যুদ্ধের পর হইতেই তাঁহারা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করিলেন। হযরতের মহিমা এবং মর্যাদাও পূর্বাপেক্ষা শতগুণ বর্ধিত হইল। একটা অপূর্ব বিস্ময়ের বস্তুরূপে তিনি সকলের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

খন্দক-যুদ্ধের অবসানের পর ষষ্ঠ হিযরী আসিল। কয়েকটি ছোটখাটো অভিযান ছাড়া এই হিযরীতে উল্লেখযোগ্য আর কোন যুদ্ধবিগ্রহই ঘটে

নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, রাযী-প্রান্তরে ১০ জন মুসলিম সাহাবা হোজায়েল বংশের ২০০ লোক দ্বারা সহসা আক্রান্ত হইয়া শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। সেই দুরাচারদিগকে এইবার শায়েস্তা করিবার জন্য হযরত প্রস্তুত হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি ২০০ মুসলিম বীরকে সংগে লইয়া তাহাদের বাসভূমির দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্তগণ পূর্ব হইতেই এই অভিযানের গন্ধ পাইয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব লইয়া পার্বত্য অঞ্চলে পালাইয়া গিয়াছিল। কাজেই মুসলমানগণ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। মক্কা হইতে একদল বণিক সিরিয়া যাইতেছিল। মুসলমানদিগের সহিত হঠাৎ তাহাদের সংঘর্ষ লাগে। ফলে তাহারা পরাজিত ও বন্দী হইয়া মদিনায় প্রেরিত হয়। এই বন্দীদিগের মধ্যে ছিলেন হযরতের জামাতা—আবুল-আ'স। মক্কায় অবস্থানকালে হযরত তাঁহার কন্যা জয়নবকে আ'সের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। হযরত আ'সকে মদিনায় চলিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা আসেন নাই। ফলে তিনি কোরেশদের খপ্পরে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোরেশগণ জয়নবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন কোরেশ-কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য আ'সকে খুব পীড়াপীড়ি করিয়াছিল; কিন্তু আ'স তাহা করেন নাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা ছিল বলিয়াই এরূপ হইয়াছিল। হযরতের পরিবারবর্গকে যখন মদিনায় লইয়া যাওয়া হয়, তখন জয়নব মক্কাতেই স্বামীর গৃহে রহিয়া গিয়াছিলেন—মদিনায় যান নাই। ইহার পর বদর যুদ্ধের সময় আ'স কোরেশদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়া মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হন। অন্যান্য কোরেশবন্দীর ন্যায় তাঁহারও মুক্তিপণ নির্ধারিত হয়। তখন বিবি জয়নব মক্কা হইতে স্বামীর মুক্তিপণ বাবদ একটি স্বর্ণহার পাঠাইয়া দেন। এই হার বিবি খাদিজা জয়নবের বিবাহের সময় তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। হযরত সেই হার দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সাহাবাদিগকে বলিলেন: "তোমাদের যদি অমত না থাকে, তবে আ'সকে বিনা পণে মুক্তি দাও এবং এই হারও তাঁহাকে ফিরাইয়া দাও।" সকল সাহাবাই ইহাতে রাজী হইলেন। আ'সকে মুক্তি দেওয়া হইল। শুধু একটি

শর্ত এই দেওয়া হইল যে, আ'স ফিরিয়া জয়নবকে একবার মদিনায় পাঠাইয়া দিবেন। আ'স তাহাতেই রাজী হইলেন।

মক্কায় ফিরিয়া গিয়া আ'স তাঁহার ভ্রাতা কেনানার তত্ত্বাবধানে জয়নবকে মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই কতিপয় কোরেশ দুর্বৃত্ত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। আবুযহলের পুত্র ইকরামা ছিল ইহাদের দলপতি। জয়নব যে-উটের পৃষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, ইকরামা বর্শা দ্বারা সেই উটটিকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। জয়নব পড়িয়া গিয়া দারুণ আঘাত পাইলেন। ঠিক এই সময়ে আবুসুফিয়ান তথায় উপস্থিত হইয়া কেনানাকে বলিতে লাগিল: "দেখ কেনানা, এরূপভাবে জয়নবকে মদিনায় পৌঁছাইয়া দেওয়া তোমাদের খুবই অন্যায়। প্রকাশ্যভাবে যদি মুহম্মদের কন্যাকে আমরা যাইতে দেই, তবে সকলে ভাবিবে আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। গোপনে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইবে না। যাও, এখনকার মত মক্কায় ফিরিয়া যাও, তারপর অন্য ব্যবস্থা করিও।

কেনানা তাহাই করিল। আ'সও ইহা যুক্তিসংগত বলিয়া মানিয়া লইলেন। জয়নবকে পাঠান স্থগিত রাখা হইল। ইহার পর জায়েদ আসিয়া জয়নবকে মদিনায় লইয়া গেলেন।

তিন বৎসর পর সেই আ'স পুনরায় বন্দী অবস্থায় মদিনায় নীত হইলেন। স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। জয়নবের মধ্যবর্তিতায় হযরত আ'সকে এবারও মুক্তি দিলেন। তাঁহার সমুদয় লুণ্ঠিত দ্রব্যও তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। আ'সের সংগে সংগে তাঁহার সঙ্গীরাও মুক্তি পাইল। হযরতের এই সদয় ব্যবহার এবং ইহার অন্তরালে জয়নবের একনিষ্ঠ প্রেম বিফলে গেল না। আ'সের পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হইতে আরম্ভ করিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া জয়নবের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়া এইরূপে স্ত্রী তাঁহার আপন স্বামীকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসিলেন।

দুঃখের বিষয়, জয়নব বেশী দিন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে পারেন নাই। উট হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি যে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কাল হইল। এক বৎসর পরেই তিনি ইন্তিকাল করিলেন।

পরিচ্ছেদ : ৪৭

হোদায়বিয়ার সন্ধি

দীর্ঘ ছয় বৎসর হইল, মক্কার মুসলমানগণ স্বদেশ ছাড়িয়া মদিনায় আসিয়া বাস করিতেছেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তাঁহারা একবারও স্বদেশের মুখ দেখিতে পান নাই, প্রিয় তীর্থভূমি কা'বা সন্দর্শনও ঘটিয়া উঠে নাই। মদিনাবাসী মুসলমানেরাও কা'বায় হজ্ করিবার জন্য কম লালায়িত ছিলেন না। আল্লার জন্য, আল্লার রসুলের জন্য, ইসলামের জন্য মুসলমানগণ যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছেন, অকাতরে নিজেদের জান ও মাল কুরবান করিয়া দিতেছেন, অথচ আল্লার ঘরের প্রতি এখনও তাঁহারা দৃষ্টি দিবার অবসর পান নাই। খন্দক-যুদ্ধের পর হইতে মুসলমানদিগের মনে সেই চিন্তা জাগিল। একদিন তাঁহারা হযরতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "হযরত, আমরা কি আর কা'বা শরীফে হজ করিতে পাইব না ?"

এই কথাগুলির অন্তরালে মুসলমানদিগের অন্তরে যে গভীর বেদনা লুকাইয়া ছিল, হযরত তাহা উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার নিজেরও তো এ-সম্বন্ধে উৎসাহ কম ছিল না। তাই তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন: "বিচলিত হইও না: আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

জিল্‌কদ্ মাস আসিল। আরবের পবিত্র মাসগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। এই পবিত্র মাসগুলিতে আরবেরা কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ করিত না। মক্কার চতুঃসীমার মধ্যে এই সময় রক্তপাত একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। যে-কোন গোত্রের যে-কোন ধর্মের যে-কোন লোক আসিয়াই হজের সময় হজ্ করিয়া যাইতে পারিত। এই সুযোগে হযরত শিষ্যবৃন্দসহ মক্কায় হজ্ করিয়া আসিবার ইচ্ছা করিলেন। সকলকে ডাকিয়া বলিলেন: "এবার হজ্ করিতে যাইতে হইবে; যাহারা যাইতে চাও প্রস্তুত হও। এই বলিয়া তিনি হজ্ যাত্রার দিন স্থির করিয়া দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে শিষ্যগণ প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। হযরত নিজেও গোসল্ করিয়া হজের পোশাক পরিয়া বাহির হইলেন।

যথাসময়ে সকলে যাত্রা করিলেন। অল্-কাসোয়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া হযরত আগে আগে চলিলেন; পশ্চাতে ১৫০০ ভক্ত সাহাবী নীরবে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। "লাব্বায়েক! লাব্বায়েক!—আমি হাজির, প্রভু হে, আমি হাজির!" বলিতে বলিতে সকলে সেই পরম প্রভুর গৃহপানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কুরবানির জন্য ৭০টি উট সংগে লওয়া হইল। যাত্রীদল নিরস্ত্র, শুধু পথে আপদ-বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু অস্ত্রবলের প্রয়োজন, মাত্র ততটুকুই তাঁহারা সংগে লইলেন। মনে তাঁহাদের কোন দুরভিসন্ধি নাই; হিংসা-বিদ্বেষের কলুষতা, লাভ-ক্ষতির চিন্তা নাই। হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাইলের পুণ্যস্মৃতি আজ তাহাদের মনে জাগিয়াছে। ভিতরে-বাহিরে আজ শুধু ত্যাগের মন্ত্রই ধ্বনিত হইতেছে, কুরবানির সুরই রণিত হইতেছে। বীরত্বের গৌরব, শৌর্য-বীর্যের অভিমান, ভোগ-বিলাসের লালসা আজ মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে; শুধু জাগিয়াছে আজ নিষ্কাম আল্লা-প্রেম, আর পরকালের চিন্তা। এই ত্যাগী ভক্তদলই দুইদিন আগে রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সিংহবিক্রমে শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং আপন শৌর্য-বীর্য দ্বারা সমগ্র আরবে একটা ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন, কে তাহা এখন বিশ্বাস করিবে? আজ তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। দুনিয়াদারীর পংকিলতা হইতে আজ তাঁহারা মুক্ত।

হযরতের হজ-যাত্রার সংবাদ যথাসময়ে মক্কায় পৌছিল। এই সময় কাহারও মনে দ্বেষ-হিংসা জাগিবার কথা নয়। কিন্তু কোরেশদিগের অন্তর এতই কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মুসলমানদিগের এই তীর্থযাত্রাকেও তাহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিল। মুহম্মদকে কিছুতেই মক্কায় আসিতে দেওয়া হইবে না, ইহাই হইল তাহাদের দৃঢ় পণ; অনতিবিলম্বে কোরেশগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মদিনার পথে অগ্রসর হইল। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও তাহাদের সহিত যোগ দিল। খালিদ ও ইকরামার অধীনে দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য অগ্রেই পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

দুই মঞ্জিলের পথ অতিক্রম করিয়া হযরত ওসফান নামক স্থানে পৌছিতেই সংবাদ পাইলেন, কোরেশগণ যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদে হযরত ভিন্ন পথ ধরিলেন এবং শত্রুসেনার চোখ এড়াইয়া মক্কার উপকণ্ঠে হোদায়বিয়া নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলেন।

কোরেশ-সৈন্য যখন এ কথা জানিতে পারিল, তখন তাহারা নগর রক্ষার জন্য দ্রুতগতিতে পিছাইয়া আসিল। তাহারা ভাবিল, মুহম্মদ বুঝি বা এতক্ষণ মক্কা আক্রমণ করিয়াই বসিল।

মক্কার 'খোজা' সম্প্রদায় পৌত্তলিক হইলেও চিরদিনই হযরতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। হযরতের আগমন-সংবাদে এই খোজা-গোত্রের দলপতি বোদায়েল স্বগোত্রের কতিপয় প্রতিনিধিসহ হোদায়বিয়ায় আসিয়া হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হযরতকে তিনি বলিলেন: 'কোরেশগণ আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে; কিছুতেই তাহারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। এ অবস্থায় কি করিবেন?"

বোদায়েলের কথা শুনিয়া হযরত বিশেষ মর্মাহত হইলেন। বলিলেন: "তুমি গিয়া কোরেশদিগকে বল, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই, হজ্ করিতে আসিয়াছি। কেন তবে তাহারা অকারণে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে? এই পবিত্র মাসে তো কেহ কাহারও সহিত যুদ্ধ করে না। আমরা যুদ্ধ চাই না, চাই শান্তি। কোরেশগণ অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমার সহিত সন্ধি করুক; সেই সময়ের মধ্যে আমার ধর্ম যদি জয়লাভ করে তো ভালই, অন্যথায় তখন তাহারা যাহা ভাল মনে করে করিবে।"

বোদায়েল মক্কায় ফিরিয়া গেলেন। হযরতের মনে কোনরূপ দুরভিসন্ধি নাই, তিনি যে কেবলমাত্র হজ্ করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছেন এবং তিনি যে কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চান না, চান শুধু শান্তি, এ কথা তিনি তাহাদিগকে বলিলেন; কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী! বোদায়েলের কথা কোরেশগণ হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। তখন 'ওরওয়া' নামক জনৈক তায়েফবাসী মোড়লী করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিল: "আচ্ছা, আমি গিয়া একবার মুহম্মদকে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি।" কেহই বাধা দিল না। ওরওয়া হোদায়বিয়া যাত্রা করিল।

হযরতের নিকট পৌঁছিয়া ওরওয়া ধৃষ্টতার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিল। ইহাতে সাহাবাগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। হযরত ওরওয়াকেও একই কথা বলিলেন এবং এ কথাও তিনি বলিয়া দিলেন, কোরেশগণ যদি খামাখা যুদ্ধ করিতে চায়ই, তবে তিনিও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

ওরওয়াও ফিরিয়া গিয়া কোরেশদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিল। মুহম্মদ যে সত্যসত্যই তীর্থ করিতে আসিয়াছেন, সেও তাহা স্বীকার করিল। মুহম্মদের উপর তাঁহার ভক্তবৃন্দের যে অবিচলিত নির্ভর ও শ্রদ্ধা সে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতেও সে ভুলিল না। কিন্তু কোরেশগণ অনমনীয়। কিছুতেই তাহারা যুদ্ধ না করিয়া ছাড়িবে না। শিকার যখন একেবারে হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে তখন কি এ-সুযোগ কেহ ছাড়ে!

ইহার পর 'বেদওয়া' গোত্রের দলপতি হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। মুসলমানগণ যে কুরবানির জন্য বহু উট সংগে লইয়া আসিয়াছেন, ইহা দেখিয়া সেও বুঝিতে পারিল, হযরতের মনে সত্যই কোন কুমতলব নাই।

এইরূপে নানা গোত্রের লোক আসিয়া হযরতের সহিত যতই মুলাকাৎ করিতে লাগিল, ততই তাহাদের মনের বিকার কাটিয়া যাইতে লাগিল। হযরতের শান্তমধুর চরিত্র এবং অকৃত্রিম শান্তির বাণী সকলেরই উপর প্রভাব বিস্তার করিল।

হযরত যে সত্যসত্যই শান্তির প্রয়াসী, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি নিজেও উদ্যোগী হইলেন। খেরাশ নামক জনৈক সাহাবীকে তিনি দূতরূপে কোরেশদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ আপন উট আল্-কাসোয়ার উপর তাঁহাকে সওয়ার করিয়া দিলেন। কিন্তু খেরাশ মক্কায় পৌঁছিতেই কোরেশগণ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার মতলব করিল এবং হযরতের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিরীহ উটটিকে খুঁতা করিয়া দিল। কোরেশদিগের এই অবৈধ আচরণে অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল; খেরাশকে তাহারা কিছুতেই হত্যা করিতে দিল না। খেরাশ নির্বিঘ্নে হযরতের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

হযরত ইহাতেও দমিলেন না। এইবার তিনি তাঁহার অন্তরংগ সাহাবী ওসমানকে পাঠাইলেন। ওসমান মক্কায় পৌঁছিয়া আবুসুফিয়ান ও অন্যান্য কোরেশ নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দলপতিগণ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না, পক্ষান্তরে ওসমানকে আটক করিয়া ফেলিল। ওসমানের প্রত্যাবর্তনের যতই বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, মুসলমান

দিগের মধ্যে ততই উদ্বেগ ও আশংকা বাড়িয়া চলিল। ঠিক এই সময় সংবাদ আসিল, ওসমান কোরেশদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

এই নিদারুণ সংবাদে মুসলমানগণ যারপরনাই মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বলিলেন: "এ তো ওসমানের হত্যা নয়—সত্যের হত্যা। সত্য ও মিথ্যার সেই চিরন্তন বিরোধেরই এ একটা আংশিক প্রকাশ মাত্র। কেন তবে তাঁহারা এই আঘাতকে নীরবে সহ্য করিবেন? কেন তবে তাঁহারা পশ্চাদপদ হইবেন? কিছুতেই না। তখন একটি বাবলা গাছের তলে দাঁড়াইয়া হযরতের হাতে হাত রাখিয়া ১৫০০ ভক্ত মুসলিম প্রতিজ্ঞা করিলেন: "ইসলামের জন্য আমরা প্রত্যেকে জীবন দিতে প্রস্তুত।"

শত্রুর দেশে আসিয়া নিঃসহায় নিরস্ত্র একদল লোক সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য আজ এমনি করিয়া আত্মদান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! ইহাই তো কুরবানি! ইহাই তো হজ্জ! লাব্বায়েক-এর অর্থই তো এই! "প্রভু হে, আমি হাজির।" এ কথা শুধু মুখে বলিলে তো হয় না, কাজেও দেখাইতে হয়। মুসলমানগণ এই চরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কুরবানির জন্য তাঁহারা যে-সব উট সংগে আনিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া রহিল, প্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন না! দ্বেষহিংসাকামক্রোধ প্রভৃতি যে সমস্ত পশু তাঁহাদের মনের আঙিনায় ভিড় জমাইয়াছিল, তাহাদিগকে জবাই করা হইল, তাহাতেও প্রভুর মন উঠিল না। বাকী ছিল নিজেদের প্রাণ, আজ তাহাও তাঁহারা অকাতরে দান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। হযরত ইব্রাহিমের মতই এক মহাকুরবানি এখানে সংঘটিত হইয়া গেল।

দারুণ উত্তেজনার মধ্যে সকলে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় ওসমান ফিরিয়া আসিলেন।

ওসমান মক্কায় গিয়া শান্তির প্রস্তাব করিলে আবুসুফিয়ান বলিয়াছিল: "তুমি যদি কা'বা-মন্দিরে একা হজ্জ করিতে চাও, আমরা তাহাতে রাজী আছি। কিন্তু মুহম্মদ বা অন্য কাহাকেও আমরা কা'বা-ঘরে কিছুতেই ঢুকিতে দিব না।" বলা বাহুল্য, ওসমান এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহাই হইয়াছিল তাঁহার আটকের কারণ। সৌভাগ্যক্রমে ওসমানকে আটক করায় অন্যান্য গোত্রের লোকেরা কোরেশদিগের উপর দারুণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহাদের কেহ কেহ এতদূর পর্যন্ত বলিল:

"ওসমানকে যদি না ছাড় এবং মুহম্মদকে যদি হজ করিতে না দাও, তবে আমরা আমাদের দলবল লইয়া তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব।" এই সব কারণে কোরেশগণ দমিয়া গিয়াই ওসমানকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। অন্যথায় কী মহা অনর্থপাতই না ঘটিত !

যাহাই হউক, অনেক পরামর্শের পর কোরেশগণ সন্ধি করিতে রাজী হইয়া সোহায়েল নামক জনৈক দূতকে হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। সোহায়েল আসিয়া প্রস্তাব করিল: কোরেশগণ সন্ধি করিতে রাজী আছে, তবে এবারকার মত মুহম্মদকে দলবল সহ এখান হইতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে; ইহাই প্রধান সর্ত্ত।

হযরত এ কথা শুনিয়া বলিলেন: "সোহায়েল, শান্তির নামে কোরেশগণ আজ যাহা চাহিবে, তাহাই আমি দিব। তোমাদের সর্তেই আমি সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি।"

মুসলমানগণকে এবার যে হজ না করিয়াই ফিরিয়া যাইতে হইবে, এ কথায় সাহাবাদের অনেকেরই মন উঠিল না। এরূপ হীনতাজনক সর্তে সন্ধি করিতে হযরতকে তাঁহারা নিষেধ করিলেন। কিন্তু হযরত বলিলেন: "তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না; এ আমাদের পরাজয় নয়; ইহার মধ্য দিয়াই আমরা মহাবিজয় লাভ করিব।"

একটি কথায় সমস্ত বিরোধ শান্ত হইল। সাহাবাগণ আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না, হযরতের কথাই তাঁহারা মানিয়া লইলেন।

নেতার প্রতি কী সুগভীর নির্ভর! মতামত প্রকাশেরও পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; আবার নেতৃ-আদেশ শিরোধার্য করিবার মত মনোবলও আছে। এমন না হইলে কি কখনও জাতি গঠন হয়। নেতৃত্ব করিব, আবার প্রয়োজন হইলে নেতৃ-আদেশ মানিয়াও চলিব, ইহাই জীবন্ত জাতির লক্ষণ।

তখন নিম্নলিখিত সর্তে সন্ধি করা সাব্যস্ত হইল:

(১) মুসলমানগণ এবারকার মত হজ না করিয়াই মদিনায় ফিরিয়া যাইবে।

(২) আগামী বৎসর তাহারা তীর্থ করিতে আসিতে পারিবে, কিন্তু সে তিন দিন কোরেশগণ নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইবে।

(৩) আত্মরক্ষার জন্য পথিকদের যেটুকু প্রয়োজন, মুসলমানগণ

মাত্র সেই পরিমাণ অস্ত্রই সংগে আনিবেন, কিন্তু তাহাও থলির মধ্যে বন্ধ করিয়া আনিতে হইবে।

(৪) মক্কায় যে সমস্ত মুসলমান আছে, মুহম্মদ তাহাদিগকে মদিনায় লইয়া যাইতে পারিবেন না।

(৫) মদিনার কোন লোক কোরেশদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসিলে কোরেশগণ তাহাকে মুহম্মদের নিকট ফিরাইয়া দিবে না; কিন্তু মক্কার কোন লোক যদি মদিনায় গিয়া আশ্রয় লয়, তবে তাহাকে কোরেশদিগের নিকট ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(৬) আরবের যে কোন গোত্র কোরেশগণের সহিত অথবা মুহম্মদের সহিত স্বাধীনভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

(৭) দশ বৎসরের জন্য কোরেশ ও মুসলমানদিগের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ স্থগিত থাকিবে।

হযরতের আদেশে আলি এই সন্ধিপত্র লিখিতে বসিলেন। "বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম"—(করুণাময় আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি) এই কথা যেই লেখা হইয়াছে, অমনি সোহায়েল বলিয়া উঠিল: "থামো, থামো! ও কথা লিখিতে পারিবে না। আল্লাকে জানি বটে, কিন্তু তাহার ঐ করুণাময় বিশেষণটি আমরা মানি না। শুধু লিখ: "আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি।" হযরত তাহাতেই রাজী হইলেন।

তারপর যেই লেখা হইল: "আল্লার রসুল মুহম্মদ এবং কোরেশদিগের মধ্যে এই সন্ধি ..," অমনি সোহায়েল পুনরায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল: "থামো, থামো! মুহম্মদ যে আল্লার রসুল, এ কথা যদি আমরা মানিবই, তবে আর যুদ্ধবিগ্রহ কিসের জন্য? ও-কথা লিখতে পারিবে না। 'আল্লার রসুল মুহম্মদ'—ইহা কাটিয়া দিয়া শুধু লিখ: 'আবদুল্লার পুত্র মুহম্মদ'।" হযরত হাসিয়া বলিলেন: "বেশ তাহাই হইবে! আমি যে আবদুল্লার পুত্র, এ কথাও তো মিথ্যা নয়।" ইহাই বলিয়া হযরত 'রসুলুল্লাহ্' শব্দটি কাটিয়া দিয়া 'মুহম্মদ-বিন-আবদুল্লাহ্' কথাগুলি লিখিবার জন্য আলিকে বলিলেন। কিন্তু আলি বলিলেন: "হযরত, মাফ করিবেন, রসুলুল্লাহ্ শব্দ আমি কিছুতেই কাটিতে পারিব না।" তখন হযরত বলিলেন: "আচ্ছা, শব্দটি আমাকে দেখাইয়া দাও, আমিই কাটিয়া

দিতেছি।" আলি দেখাইয়া দিলে হযরত নিজে কলম ধরিয়া উহা কাটিয়া দিলেন। মহাপুরুষের মহত্ত্ব দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া রহিলেন।

সন্ধিপত্র লেখা শেষ হইলে উভয়পক্ষ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন।

ঠিক এই সময়ে এক কাণ্ড ঘটিল। মক্কা হইতে সোহায়েলের পুত্র আবু-জন্দল শৃঙ্খল-বেষ্টিত অবস্থায় হযরতের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে আবু-জন্দলের উপর দীর্ঘদিন ধরিয়া অত্যাচার চলিতেছিল; ইসলাম-ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্য কোরেশগণ তাঁহার উপর খুবই চাপ দিতেছিল, কিন্তু আবু-জন্দল কিছুতেই রাজী হন নাই। এই জন্যই সোহায়েল এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। এখন সুযোগ বুঝিয়া তিনি পলাইয়া হযরতের শরণাপন্ন হইলেন। আবু জন্দলকে দেখিয়াই সোহায়েল বলিয়া উঠিল: "মুহম্মদ! এইবার তোমার আন্তরিকতার পরীক্ষা উপস্থিত। সন্ধির সর্তানুসারে তুমি এখন আবু-জন্দলকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য।"

হযরত বলিলেন: "নিশ্চয়ই আমার কর্তব্য আমি পালন করিব।" এই বলিয়া তিনি আবু-জন্দলকে বুঝাইয়া মক্কায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। আবু-জন্দল নিজ দেহের ক্ষতগুলিকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন: "হযরত, দেখুন আমার অবস্থা। এর উপর যদি আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের হাতে পড়ি, তবে এবার আর আমাকে আস্ত রাখিবে না। দোহাই আপনার, আমাকে আর ফিরিয়া যাইতে বলিবেন না, তাহা হইলে আমি প্রাণে মারা যাইব।"

হযরত বলিলেন: "বৎস, ধৈর্য ধরিয়া থাক, শীঘ্রই তোমার উপর আল্লার রহমত নামিয়া আসিবে। এইমাত্র যে-সন্ধি করা হইয়াছে, তোমার জন্য কিছুতেই আমি তাহার খেলাফ করিতে পারি না।"

আবু-জন্দল তখন বাধ্য হইয়া কোরেশদিগের নিকট ফিরিয়া গেলেন। হযরত শিষ্যবৃন্দকে লইয়া মদিনায় ফিরিয়া চলিলেন। যাইবার পূর্বে হোদায়বিয়াতেই তাঁহারা হযরতের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। উটগুলিকে সেখানেই আল্লার নামে কুরবানি দেওয়া হইল।

মদিনায় পৌঁছিবার পর 'ওৎবা' নামক আর একজন নবদীক্ষিত মুসলমান যুবক কোরেশদিগের কবল হইতে পলাইয়া আসিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। সংগে সংগে মক্কা হইতে দুইজন কোরেশ-দূতও

মদিনায় আসিয়া হাজির। ওৎবা ইসলামের নামে হযরতের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; দূতদ্বয় সন্ধির নামে ওৎবাকে ফিরিয়া পাইবার দাবী জানাইল। হযরত বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ওৎবাকে ফিরিয়া যাইতে বলার অর্থ যে পুনরায় তাহাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা, এ কথা তিনি ভাল করিয়া জানেন। আবার ন্যায়ের খাতিরে তিনি তাহাকে আশ্রয় দিতেও পারেন না। সন্ধির সর্তানুসারে তাই তিনি অম্লানবদনে তাহাকে কোরেশ দূতদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু ওৎবা পথিমধ্য হইতে রক্ষীদ্বয়ের একজনকে নিহত করিয়া অপরজনকে ভাগাইয়া দিয়া পুনরায় হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন: "হযরত, আপনার সন্ধির খাতিরে আমি কেন সত্যের আলোক হইতে গোমরাহীর অন্ধকারে ফিরিয়া যাইব? মাফ করিবেন, আমার প্রাণ কিছুতেই ইহাতে সায় দেয় না। এবার আপনাকে কেহই কিছু বলিতে পারিবে না, কারণ আপনি আপনার সন্ধিসর্ত তো পালন করিয়াছেন। এখনও কি আমি মদিনায় থাকিতে পাইব না?"

হযরত ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া বলিলেন: "না, তোমার এ-কার্যকেও আমি সমর্থন করিতে পারিলাম না।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে পুনরায় কোরেশদিগের হস্তে অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। ওৎবা তখন বেগতিক দেখিয়া মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্রতীরে 'ঈস্' নামক একটি নিভৃত নিরপেক্ষ স্থানে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া মক্কার অন্যান্য উৎপীড়িত মুসলমানও পলাইয়া গিয়া ওৎবার সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে দিনে দিনে তথায় বেশ একটি ছোটখাটো মুসলিম শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। সংখ্যায় যখন পলাতকদল বাড়িয়া গেল, তখন তাহারা কোরেশদিগের সিরিয়াগামী বাণিজ্য-কাফেলাকেও আক্রমণ করিতে লাগিল। কোরেশগণ তাহাতে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। তখন নিজেরাই হযরতকে অনেক ধরাধরি করিয়া সন্ধির এনং সর্তটি বাতিল করাইয়া আনিল। প্রকৃতির কী চমৎকার প্রতিশোধ!

হোদায়বিয়ার সন্ধিকে আল্লাহ্‌তালা পবিত্র কুরআনে 'ফতুহম-মুবীন' অর্থাৎ মহাবিজয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, সত্যসত্যই তাই। এই সন্ধির ফলেই শত্রুদিগের মনে দোলা লাগিল। ভিতর হইতে তাহাদের মধ্যে মস্তবড় একটা ওলট-পালট হইয়া

গেল। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রত্যক্ষ কিরণস্পর্শে দীর্ঘদিনের জমাটবাঁধা পাষাণস্তূপ যেন গলিতে আরম্ভ করিল। মুহম্মদকে প্রত্যাখ্যান করিবার-মধ্য দিয়াই অলক্ষ্যে তাহারা এই প্রথম তাঁহাকে একজন শক্তিমান পুরুষরূপে স্বীকার করিয়া লইল। সমগ্র আরবে হযরত মুহম্মদও যে এখন একজন, এ উপলব্ধি এইবারই তাহাদের প্রথম জন্মিল। পক্ষান্তরে হযরতের অনুপম চরিত্র-মাধুর্যের প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহারা দেখিল, হযরতকে যে-রঙে এতদিন তাহারা চিত্রিত করিয়া আসিয়াছে, তিনি তাহা নন। তিনি যে কোরেশদিগের শত্রু নন, তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলা যে তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির মতলবও যে তাঁহার নাই, এ কথা তাহারা এখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিল। এমন হীনতাজনক সর্তে যিনি সন্ধি করিতে পারেন, তিনি যে সত্যসত্যই শান্তিপ্রয়াসী এ কথা তাহারা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিল না। হযরতের আন্তরিকতা ও মহানুভবতা কোরেশ-দিগের হৃদয়কে সত্যই এবার স্পর্শ করিল। শত্রুদিগের দুর্ভেদ্য তিমির-প্রাচীর ভেদ করিয়া হযরত যেন প্রভাত-সূর্যের ন্যায় এই প্রথম তাহাদের অন্তর্লোকে প্রবেশলাভ করিলেন।

পরিচ্ছেদ : ৪৮

দিকে দিকে গেল আহ্বান

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর হযরত আশ্বস্ত হইলেন। আল্লাহ্‌তালা ইহাকে 'মহাবিজয়' আখ্যা দেওয়ায় এ আশ্বস্তি আরও সুগভীর হইল। হযরত বুঝিলেন তাঁহার সাধনার সিদ্ধি নিকটবর্তী, বুঝিলেন তিনি আর এখন তুচ্ছ নন, ক্ষুদ্র নন, মদিনার নন, মক্কার নন; তিনি এখন সকলের—তিনি এখন বিশ্বের। সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া, শত বাধাবিঘ্নকে জয় করিয়া নদী যখন মহাসাগরের নিকটবর্তী হয়, তখন যেমন বিজয়ের গৌরবে ও সার্থকতার আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠে, সীমাহীন বিশালতার স্বপ্ন যেমন তাহার নয়ন ছাইয়া আসে, হযরতেরও ঠিক তাহাই হইল। মোহনার মুখে আসিয়া তাঁহার সাধনার স্রোতধারা শুনিতে পাইল মহাসাগরের কল-কল্লোল, অনুভব করিল বিরাটের আকর্ষণ, বুঝিতে পারিল সাফল্যের সুস্পষ্ট ইংগিত। এখন আর তাহার মনে কোন সংশয়-দ্বিধা নাই; আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব নাই; আছে শুধু সময়ের প্রশ্ন—আছে শুধু সেই শুভ মিলন-মুহূর্তের ব্যগ্র প্রতীক্ষা।

হযরতের মনের অবস্থা অবিকল এইরূপ। ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত জানিয়া তিনি তাঁহার বাণী দিকে দিকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বনবী যে সত্যের সওগাত বহন করিয়া আনিলেন, তাহা কি চিরদিন সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে? কখনই নয়। এই অমৃতকে জনে জনে পরিবেশন করিতে পারিলে তবেই তো ইহার সার্থকতা! ইহাই ভাবিয়া তিনি বিশ্বের দিকে দিকে তাঁহার সাদর আহ্বান-লিপি পাঠাইতে মনস্থ করিলেন।

তখনকার দিনে জগতের ইতিহাসে যে-কয়টি রাজশক্তি বিদ্যমান ছিল, তাহাদের মধ্যে এশিয়ায় চীন ও পারস্য, ইউরোপে রোম-সাম্রাজ্য (The Holy Roman Empire) এবং আফ্রিকায় হাবশী সাম্রাজ্যই ছিল প্রধান। হযরত প্রথমেই রোমক সম্রাটকে আহ্বান করিলেন।

এইখানে রোম ও পারস্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা জানা দরকার।

বহুদিন হইতেই রোমসাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যে ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়া আসিতেছিল। রোমকগণ পশ্চিম-এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অংশ জয় করিয়া রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় এবং ইহার নামকরণ করে 'বাইজানটিয়াম' বা প্রাচ্য রোম-সাম্রাজ্য (Eastern Roman Empire)। হযরত মুহম্মদের সময় এই বাইজানটিয়ামের শাসনকর্তা ছিলেন হিরাক্লিয়াস। ইনি কনষ্টাণ্টিনোপলে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। ইহাকে 'কাইসার'ও বলা হইত।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্য সম্রাট খসরু রোমকদিগকে পরাজিত করিয়া মিসর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশগুলির উদ্ধার সাধন করেন। কিন্তু বেশী দিন সেগুলিকে স্ববশে রাখিতে পারেন নাই। কিছুদিনের মধ্যেই হিরাক্লিয়াস পারশিকদিগকে পরাজিত করিয়া হৃতরাজ্যগুলি পুনরধিকার করিয়া লন। ঠিক এই সময়ে হযরত মুহম্মদ হোদায়বিয়ায় কোরেশদিগের সহিত সন্ধি করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

হিরাক্লিয়াস মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন : যদি তিনি পারশিক-দিগকে পরাজিত করিয়া প্যালেষ্টাইন পুনরধিকার করতে পারেন, তবে পায়ে হাঁটিয়া জেরুজালেমে তীর্থ করিতে আসিবেন। তদনুসারে তিনি মহা আড়ম্বরে জেরুজালেমে আসিতেছিলেন। এমন সময় অপরিচ্ছন্ন সীলমোহর যুক্ত আরবী-ভাষায় লিখিত একখানি পত্র তাঁহার হস্তে আসিয়া পৌঁছিল। দেহিয়া কল্‌বী নামক জনৈক আরবীয় দূত পত্রখানি প্রথমতঃ বসোরার খৃষ্টান শাসনকর্তা হারিসের নিকট প্রদান করেন। হারিস জনৈক কর্মচারী সংগে দিয়া আরবীয় দূতকে জেরুজালেমে হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠাইয়া দেন।

পত্রখানিতে এই কথা লেখা ছিল :

"বিস্‌মিল্লাহির-রহমানির-রহিম—

আল্লার বান্দা ও তাঁহার রসুল মুহম্মদের পক্ষ হইতে রোমের প্রধানপুরুষ হিরাক্লিয়াস সমীপে—

সত্যের অনুসরণকারীদিগের প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার কল্যাণ হইবে। ইসলাম গ্রহণ করিলে আল্লাহ্‌ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু যদি আপনি ইহাতে অস্বীকৃত হন, তাহা

হইলে আপনার প্রজাসাধারণের পাপের জন্য আপনি দায়ী হইবেন।”

(কুরআনের আয়াত)

“হে গ্রন্থাধারিগণ! এস, আমরা ও তোমরা একযোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি: আমরা কেহই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পূজা করিব না এবং আল্লার সহিত কাহাকেও অংশীদার করিব না। যদি তাহারা ইহাতে সম্মত না হয়, তবে তোমরা তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আমরা মুসলমান; তোমরা এ কথার সাক্ষী থাকিও।” —(৩ : ৬৩)

(মোহর): মুহম্মদ-রসুল-আল্লাহ্।

প্রবল প্রতাপান্বিত রোমের কাইসারের নিকট একজন নিরক্ষর মরুবাসীর পত্র! আর সে-পত্রের পুরোভাগে মর্যাদার ভংগিতে প্রথমেই তাঁহার নিজের নাম লেখা! হিরাক্লিয়াস বিস্ময় মানিলেন। সভাসদগণ পরামর্শ দিলেন: “এই অখ্যাতনামা ভণ্ড কপটাচারীর উদ্ধত স্পর্দ্ধা নিতান্তই অমার্জনীয়। ইহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হউক।” কিন্তু হিরাক্লিয়াস সে-কথা কানে তুলিলেন না। একজন ‘ভাববাদী’ যে আসিবেন, বাইবেল হইতে তাহা তিনি জানিতেন। তাই তিনি পত্রখানিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। মুহম্মদ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য তাঁহার মনে কৌতূহল জন্মিল। মন্ত্রী, পুরোহিত ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে লইয়া তিনি একটি পরামর্শ-সভা ডাকিলেন। আরবীয় দূতকেও সে-সভায় নিমন্ত্রণ করিলেন। সংগে সংগে জেরুজালেমে যে-সমস্ত প্রবাসী আরব ছিল, তাহাদিগকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘটনাচক্রে এই সময়ে ইসলামের সর্বপ্রধান দুষমন্ আবুসুফিয়ানও বাণিজ্য উপলক্ষে জেরুজালেমে অবস্থান করিতেছিল। সম্রাটের আদেশক্রমে সেও রাজ্যসভায় উপস্থিত হইল।

দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। সম্রাট আরবীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন: “মুহম্মদের সর্বাপেক্ষা নিকট-আত্মীয় তোমাদের মধ্যে কেহ আছে?”

আবুসুফিয়ান উত্তর দিল: “আমি আছি। মুহম্মদ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।”

তখন সম্রাট আবুসুফিয়ানকে নিকটে ডাকিয়া অন্যান্য আরবদিগকে

বলিতে লাগিলেন: "এই ব্যক্তিকে আমি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। সে যদি মিথ্যা উত্তর দেয়, তবে তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিও।"

আবুসুফিয়ান মহাসংকটে পড়িল। ভাবিয়াছিল, প্রাণ ভরিয়া সে হযরতের কুৎসা গাহিবে, কিন্তু তাহা হয় কৈ? মিথ্যা কথা কহিলেই তো সকলে তাহার প্রতিবাদ করিবে, ফলে এই রাজদরবারে তাহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে। এ কী গ্রহের ফের! বাধ্য হইয়াই যে আজ তাহাকে হযরত সম্বন্ধে সত্য কথা বলিতে হয়! আবুসুফিয়ান এই চিন্তায় একেবারে জর্জরিত হইয়া পড়িল।

সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন: যে ব্যক্তি নবী বলিয়া দাবী করিতেছেন, তাঁহার বংশ কিরূপ?

আবু-সু। বংশ সম্ভ্রান্ত।

সম্রাট। তাহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ কোন দিন রাজা ছিলেন কি?

আবু-সু। না।

সম্রাট। কোন্ শ্রেণীর লোক তাঁহার শিষ্য হইতেছে?

আবু সু। দরিদ্র শ্রেণীর লোকই বেশি করিয়া তাঁর ধর্ম গ্রহণ করিতেছে।

সম্রাট। তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে?

আবু-সু। বাড়িতেছে।

সম্রাট। এই ব্যক্তি কোনদিন মিথ্যা কথা বলিয়াছেন কি?

আবু-সু। না, জীবনে কোনদিন তিনি মিথ্যা কথা বলেন নাই।

সম্রাট। কোনদিন তিনি প্রতিজ্ঞা বা সন্ধিসর্ত ভংগ করিয়াছেন কি?

আবু-সু। না, আজ পর্যন্ত তো দেখি নাই।

সম্রাট। তাঁহার সহিত তোমাদের কোন যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে কি?

আবু-সু। হইয়াছে।

সম্রাট। কে জিতিয়াছে?

আবু-সু। কোনটায় তিনি জিতিয়াছেন, কোনটায় আমরাও জিতিয়াছি।

সম্রাট। লোকটি কী শিক্ষা দিতেছেন?

আবু-সু। তিনি বলেন: এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই উপাস্য নাই, দেবদেবী মিথ্যা। আরও বলেন: নামায পড়, সত্য কথা

বল, সুপথে চল, সচ্চরিত্র হও, পরস্পর মারামারি করিও না, মিলিয়া-মিশিয়া থাকো—ইত্যাদি।

সম্রাট তখন আরবীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "দেখ, এই ব্যক্তি যে সত্যসত্যই নবী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তোমাদের কথা হইতেই জানিলাম, তিনি সদ্বংশজাত। নবীরা চিরদিনই সদ্বংশজাতই হন। তোমরা বলিয়াছ: তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কোনদিন রাজা ছিলেন না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি, পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য নবী সাজিয়া তিনি কোন ছলনা করিতেছেন না। তোমরা বলিতেছ: দীন্-দরিদ্রেরাই বেশির ভাগ তাঁহার শিষ্য হইতেছে। যে-কোন সত্যধর্ম সম্বন্ধে চিরকাল ইহাই ঘটিয়া আসিতেছে। তোমরা বলিতেছ: জীবনে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই বা কোন প্রতিজ্ঞা ভংগ করেন নাই। ইহাই নবীর লক্ষণ। ভাবিয়া দেখ, জীবনে যিনি মানুষ সম্বন্ধে কোন মিথ্যা কথা বলিলেন না, আল্লাহ্ সম্বন্ধে তিনি কেন মিথ্যা বলিতে যাইবেন? ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদিগকে মহৎ উন্নত জীবন যাপন করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, ইহা নিশ্চয়ই সেই ভাববাদী পয়গম্বর—সারা ধরণী যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমার সুযোগ ও শক্তি থাকিলে আমি সেই মহাপুরুষের নিকট পৌছিয়া তাঁহার পদ ধৌত করিয়া দিতাম।"

হিরাক্লিয়াসের এই কথায় সভাস্থলে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। খৃষ্টান পাদ্রীদিগের নিকট কথাগুলি আদৌ ভাল লাগিল না। সম্রাটের উপর তাহারা খুব অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। হিরাক্লিয়াস ইহা বুঝিতে পারিলেন। সাম্রাজ্যের ভাবী বিপদ আশংকা করিয়া তাড়াতাড়ি তিনি এই কথার একটা কূট রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়া সকলকে শান্ত করিলেন।

বিশ্বনবীর আহ্বান-বাণী এইরূপে খৃষ্টান-জগতে প্রবেশ লাভ করিয়া দোল খাইয়া ফিরিতে লাগিল।

পারস্য-সম্রাট খসরুর নিকটেও হযরত মুহম্মদ অনুরূপ একখানি পত্র পাঠাইলেন। সে পত্রের এবারত ছিল এইরূপ:

"বিস্‌মিল্লাহির-রহমানির-রহিম—

আল্লার রসুল মুহম্মদের নিকট হইতে পারস্য সম্রাট খসরু-সমীপে—যাহারা আল্লার বিধান মানে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলকে বিশ্বাস করে

তাহাদিগকে সালাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেহই উপাস্য নাই এবং আমি তাঁহার প্রেরিত রসুল। জীবন্ত লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য আল্লাহ্ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হইবে। যদি না করেন, তবে আপনার প্রজাদিগের পাপের জন্য আপনি দায়ী হইবেন।"*

মহাপ্রতাপান্বিত পারস্য সম্রাট। তাঁহার নিকটে এমন করিয়া কে পত্র লিখিল? কার এতখানি বুকের পাটা? মুহম্মদ? কে সেই কপটাচারী? কে তাহাকে চিনে? কেই-বা তাহাকে মানে? সম্রাট ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। টুকরা টুকরা করিয়া তিনি হযরতের পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। শুধু তাই নয়, তৎক্ষণাৎ তিনি এয়মনের শাসনকর্তা 'বাজান'কে হুকুম দিয়া পাঠাইলেন: "অনতিবিলম্বে মুহম্মদকে গ্রেফতার করিয়া আমাদের দরবারে হাজির কর।"

সম্রাটের আদেশক্রমে বাজান মুহম্মদের নিকট গ্রেফতারী পরোয়ানা সহ দুইজন রাজকর্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। কর্মচারীদ্বয় হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন: "সম্রাটের আদেশ পালন করুন, অন্যথায় তাঁহার সেনাদল আসিয়া আরব দখল করিয়া লইবে।"

হযরত এ কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন: "আজ আমি কিছুই বলিব না। কাল আসিও, জবাব দিব।" এই বলিয়া সেদিনের মত তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

পরদিন কর্মচারীদ্বয় উপস্থিত হইলে হযরত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "কাহার পরোয়ানা এ?"

কর্মচারীদ্বয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন: "কেন, সম্রাট খসরুর।"

হযরত বলিলেন: "সম্রাট খসরু? তিনি তো জীবিত নাই। যাও, তোমাদের প্রভুকে গিয়া বল, খসরু যেমন করিয়া আমার পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়াছেন, আল্লাও তাঁহার রাজ্যকে ঠিক তেমনি করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবেন। দেখিবে, শীঘ্রই ইসলামের রাজ্য পারস্যের রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে।"

* সরকারী পত্রে এই কায়দা এখনও অনুসৃত হয় From······To·····এই-ভাবেই সরকারী পত্র লেখা হয়। আগে To······পরে From······এ-রীতি নাই। বলা বাহুল্য এ-রীতি হযরত মুহম্মদ হইতেই আসিয়াছে।

কর্মচারীযুগল স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অগত্যা তাঁহারা ফিরিয়া চলিলেন। যাত্রাকালে হযরত তাহাদিগকে পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন: "বাজানকে গিয়া বলিও, সে যেন ইসলাম গ্রহণ করে। তাহা হইলে আমি তাহাকে পূর্বপদে বহাল রাখিব।"

দূতদ্বয় অবাক হইয়া এয়মনে ফিরিয়া গেলেন। যাইয়াই শুনিতে পাইলেন, সম্রাট খসরু তৎপুত্র শেরওয়াঁ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। নূতন সম্রাট বাজানকে ইহাও লিখিয়া পাঠাইয়াছেন: "সেই আরবীয় নবী সম্বন্ধে দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই করিবেন না।"

কর্মচারীদিগের মুখে হযরত মুহম্মদ সংক্রান্ত সমস্ত কথা অবগত হইয়া বাজান অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন: "পারস্ত-সম্রাট সম্বন্ধে যখন মুহম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, তখন পারস্ত-সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার কথাই বা কেন না ফলিবে? নিশ্চয়ই তবে ইনি একজন পয়গম্বর! ইনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন; বলিয়া পাঠাইয়াছেন যদি আমি মুসলমান হই, তবে এয়মনের শাসনকর্তার পদে আমি বহাল থাকিব। এ কথা আমাকে মানিতেই হইবে, না মানিলে কল্যাণ নাই।" ইহাই ভাবিয়া তিনি অনতিবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও অনেক অগ্নি-উপাসকও মুসলমান হইয়া গেল।

হযরতকে গ্রেফতার করিতে গিয়া বাজান এইরূপে নিজেই গ্রেফতার হইয়া পড়িলেন।

হযরতের তৃতীয় পত্র প্রেরিত হইল আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকটে। নাজ্জাশী হযরতের নিকট, অথবা হযরত নাজ্জাশীর নিকট অপরিচিত ছিলেন না। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, কোরেশদিগের অত্যাচারে মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানেরা যখন জর্জরিত হইতেছিলেন, তখন হযরত এই ন্যায়পরায়ণ হাবসী সম্রাটের নিকটেই দুই দল মুসলমানকে পাঠাইয়াছিলেন। নাজ্জাশীও সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া মুসলমানদিগকে সাদরে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এমন কি হযরতের পত্রপ্রেরণের সময় পর্যন্তও একদল মুসলমান আবিসিনিয়াতেই অবস্থান করিতেছিলেন। যাহাই হউক, নাজ্জাশী হযরতের পত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরতকে বিনীতভাবে লিখিয়া জানান যে, নানা

রাজনৈতিক কারণে নিজে আসিয়া তাঁহার পতাকা-তলে দাঁড়াইতে না পারায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত।

হযরত নাজ্জাশীকে আর-একখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে আবিসিনিয়ার প্রবাসী মুসলমানদিগকে মদিনায় পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ ছিল। নাজ্জাশী হযরতের এ অনুরোধও রক্ষা করিয়াছিলেন। একখানি জাহাজ ভর্তি করিয়া তিনি মুসলমানদিগকে মদিনায় পৌছাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রত্যাবৃত্ত মুসলিম নরনারীর মধ্যে আবুসুফিয়ানের কন্যা উম্মে-হাবিবাও ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ্ নামক জনৈক মুসলমানের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ওবায়দুল্লাহ্ উম্মে-হাবিবাকে সংগে করিয়াই আবিসিনিয়ায় গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়; ফলে উম্মে হাবিবা নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। মদিনায় আসিলে হযরত উম্মে-হাবিবাকে বিবাহ করিয়া আপন পরিবারভুক্ত করিয়া লন। এই বিবাহের মূল হযরতের মহাপ্রাণতা তো ছিলই, সংগে সংগে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও অনাবিল মানবপ্রীতিও ছিল। জীবন পথের সর্বপ্রধান শত্রু যে, তাহার কন্যাকে এত সহজে কেহ বিবাহ করিতে পারে? কোরেশদিগের সহিত হযরত যে শুধু একটা আদর্শের জন্যই যুদ্ধ করিতেছেন, অন্যথায় তিনি যে তাহাদিকে অন্তর দিয়া ভালবাসেন এবং কোন শত্রুতা পোষণ করেন না, এই বিবাহ দ্বারা তিনি তাহাই প্রমাণ করিলেন। ইহার পর হইতে আবুসুফিয়ানের মনের গ্লানি ও বিকার বহু পরিমাণে কাটিয়া গেল। প্রতিহিংসা-বাসনার সেই তীব্রতা আর রহিল না। কাহার সহিত সে আর এখন যুদ্ধ করিবে? কাহাকে হত্যা করিবে? মুহম্মদ যে এখন তাহার জামাতা। কাজেই বলা যাইতে পারে, প্রেম দিয়াই হযরত কোরেশদিগের চিত্ত জয় করিয়া লইলেন। উত্তরকালে আবুসুফিয়ান ও অন্যান্য কোরেশগণ যে হযরতের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে, এ কথা এখন হইতেই অনুমান করা যায়।

মিশরের রোমান শাসনকর্তা মুকাউকিসের নিকটেও হযরতের আহ্বানলিপি গিয়াছিল; তিনিও সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। মুকাউকিস প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাঁহার মন যে ভিতরে ভিতরে হযরতের চরণে আত্মনিবেদিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিনয়নম্র-ভাষায় তিনি হযরতের পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন

এবং বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ হযরতের নিকট মেরী ও শিরীঁ নাম্নী দুইটি সম্রান্তবংশীয়া খৃষ্টান মহিলা* ও দুষ্প্রাপ্য শ্বেতবর্ণের অশ্বতর উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। হযরত এই উপহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ইতিপূর্বে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্র হইতে বিভিন্ন অবস্থায় কতিপয় নারীকে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া সার্বজনীন প্রীতি ও বিশ্বপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন খৃষ্টান নারীকে বিবাহ করেন নাই। এইবার সেই সুযোগ জুটিল। হযরত নিজে মেরীকে বিবাহ করিলেন এবং শিরীঁকে কবি হাসানের সহিত বিবাহ দিলেন। এইরূপে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া খৃষ্টান জগতের দিকে মহানবী তাঁহার হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া ধরিলেন; প্রেমকে তিনি সত্যের বাহন করিলেন।

এই মেরীর গর্ভেই তাঁহার প্রথম পুত্র ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেন।

শ্বেতবর্ণ অশ্বটিকেও হযরত সাগ্রহে নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই ইহাতে সওয়ার হইয়া চড়িয়া বেড়াইতেন। ইহার নাম ছিল 'দুলদুল'। হযরতের মৃত্যুর পর ইমাম হোসেন ইহাকে ব্যবহার করিতেন।

এইরূপে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার দিকে দিকে ইসলামের অগ্নিবাণী বিঘোষিত হইল। মহানবীর মহা আহ্বানে তিনটি মহাদেশেই এক অপূর্ব স্পন্দন ও আলোড়নের সৃষ্টি হইল—সম্রাটদিগের রাজসিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। পৃথিবীর খ্যাতনামা সম্রাট ও বীরগণ যুদ্ধ করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, নিঃস্ব নিরক্ষর মরুবাসী অলক্ষ্যে থাকিয়া শুধু তাঁহার বাণী দ্বারা তাহাই সম্পন্ন করিলেন।

---

* এই দুইজন মহিলা কুমারী ছিলেন কিনা, নিশ্চিত বলা যায় না।

পরিচ্ছেদ : ৪৯

খায়বার বিজয়

সিরিয়া প্রান্তের এক বিশাল শ্যামল অংশের নাম ছিল খায়বার। ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু দুর্গ দ্বারা এই স্থানটি সুরক্ষিত ছিল। পূর্ব হইতেই এইখানে ইহুদীরা বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মদিনার বনি-কাইনুকা ও বনি-নাজির গোত্রের ইহুদীরা এইখানে আশ্রয় লইয়াছিল।

মদিনা হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিয়া ইহুদীরা যে শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের মত বসিয়া ছিল, পাঠক তাহা মনে করিবেন না। তাহাদের মনে ছিল গভীর দুরভিসন্ধি। হযরতের উপরে—তথা মুসলমানদিগের উপরে—তাহাদের জাতক্রোধ তো ছিলই, সংগে সংগে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও তাহারা তলে তলে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল: মুসলমান ও কোরেশদিগের মধ্যে যুদ্ধ লাগাইয়া দিয়া উভয়কে দুর্বল করিয়া ফেলিবে এবং সেই সুযোগে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবে।

খন্দক-যুদ্ধের পর ইহুদীরা মনে করিল: কোরেশগণ নিশ্চয়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, মদিনা আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষে আর এখন সম্ভবপর নয়। মুসলমানদিগের শক্তিও ওহদ-যুদ্ধে অনেকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাছাড়া এখনও তাহারা তত বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই; চেষ্টা করিলে অনায়াসেই এখন তাহাদিগকে পরাজিত করা যায়: বেশি বিলম্ব করিলে সব সুযোগ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে—কারণ শক্তিসঞ্চয়ের জন্য তাহারা সময় পাইবে। অতএব, যদি কিছু করিতে হয় তবে এখনই।

বনি-কায়নুইকা ও বনি-নাজির গোত্রের ইহুদীরা খায়বারে তাহাদের জ্ঞাতিভাইদিগের সহিত যোগ দিবার পর তাহাদের দুষ্ট মনোভাব আরও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। ইহুদীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিরাট ও ব্যাপকভাবে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে মনস্থ করিল। মদিনা আক্রমণ করিবার জন্য তাহারা তলে তলে সমস্ত আয়োজন করিয়া ফেলিল। ইসলামের চিরশত্রু গৎফান গোত্রও ইহুদীদিগের সহিত যোগ দিল।

সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে ইহুদীরা ছোটখাটো আক্রমণ দ্বারা মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। একবার তাহারা মুসলিম বণিকদিগের একটি কাফেলাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া বহু মুসলমানকে হত্যা করিল এবং তাহাদের ধনসম্পদ লুটিয়া লইল। আর একবার তাহারা মদিনা সীমান্তে অতর্কিতে আসিয়া হযরতের কতিপয় উট ও একটি মুসলিম নারীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই ধরনের অত্যাচার-উপদ্রবের প্রতিকারকল্পে হযরত অভিযান প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। জায়েদের নেতৃত্বে ওয়াদিল্-কোরা অভিযান এবং আলির নেতৃত্বে 'ফদক' অভিযান এই কারণেই প্রেরিত হইয়াছিল।

কিন্তু এরূপ ধরনের ছোটখাটো অভিযানে ইহুদীরা ভয় পাইবে কেন? বরং তাহাদের মদিনা আক্রমণের সংকল্প ইহাতে আরও দৃঢ় হইতে লাগিল। 'আসির' নামক জনৈক ব্যক্তি ইহুদীদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিল: "এতদিন আমরা মুহম্মদ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলাম, আজ হইতে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। মদিনা আক্রমণই হইবে এখন আমাদের লক্ষ্য।"

ইহুদীদিগের এই চক্রান্তের কথা হযরতের নিকট পৌছিতে বিলম্ব হইল না। গুপ্তচর পাঠাইয়া সন্ধান লইয়া তিনি জানিলেন, ইহুদীরা মদিনা আক্রমণের জন্যই আয়োজন করিতেছে।

হযরত তখন আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা সমীচীন মনে করিলেন না। অনতিবিলম্বে তিনি ১৪০০ পদাতিক এবং দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া খায়বার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মদিনা হইতে খায়বার প্রায় একশত মাইল পথ। হযরত এত দ্রুতবেগে সৈন্যচালনা করিলেন যে, ইহুদীরা কোন সন্দেহই করিল না। হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে খায়বারের কৃষকগণ মাঠে আসিয়া দেখিতে পাইল, সম্মুখে তাহাদের বিরাট মুসলিম সেনাদল। ভয়ে তাহারা দৌড়াইয়া গিয়া নগরবাসীকে এই সংবাদ দিল।

ইহুদীরা হতভম্ব হইয়া পড়িল। গৎফান বা অন্যান্য গোত্রের সাহায্য বা সহযোগিতা লাভের আর কোন অবসর তখন রহিল না। ইহুদীরা ভীত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল।

এদিকে গৎফানীরাও ভীত হইয়া পড়িল। এত অল্পসংখ্যক মুসলিম

সৈন্যকে দেখিয়া তাহারা মনে মনে ভাবিল: মুসলমানদিগের ইহা ছলনা মাত্র; মুহম্মদ নিশ্চয়ই আরও বহু সৈন্য পিছনে রাখিয়া আসিয়াছেন। এ অবস্থায় আমরা যদি খায়বারের ইহুদীদিগকে সাহায্য করিতে যাই, তবে নিশ্চয়ই মুসলমানগণ পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া আমাদের ঘরবাড়ী ও স্ত্রী-পুত্রদিগকে আক্রমণ করিবে; তখন আমরা দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া একেবারে মারা পড়িব। ইহাই ভাবিয়া তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীয় পল্লীতে বসিয়া রহিল।

হযরত প্রথমে ইহুদীদিগের সহিত সন্ধির চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইহুদীরা সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। তখন বাধ্য হইয়া তিনি মুসলমানদিগকে যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। আদেশক্রমে মুসলিম বীরগণ প্রস্তুত হইলেন। প্রথমেই তাঁহারা নায়েম দুর্গ আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণেই দুর্গটি মুসলমানদিগের অধিকারে আসিল। আরও কয়েকটি ছোটখাটো দুর্গ ও গ্রাম অধিকারের পর মুসলমানগণ বিখ্যাত 'কামুস' দুর্গের সম্মুখীন হইলেন। কিনানা নামক দলপতির অধীনে ইহুদীরা এই দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। মুসলমানদিগকে এইখানে তাহারা প্রাণপণে বাধা দিবে বলিয়া পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

মুসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিতেই দুর্গাভ্যন্তর হইতে মোরাহাব নামক বিখ্যাত ইহুদী বীর বাহিরে আসিয়া মুসলমানদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল। আমের নামক জনৈক সাহাবী হযরতের অনুমতি লইয়া মোরাহাবের সম্মুখীন হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমের নিজের তরবারীর আঘাতে নিজেই মারাত্মকরূপে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া মাসলামা নামক আর একজন বীর অগ্রসর হইয়া মোরাহাবকে আক্রমণ করিলেন। মোরাহাব সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। ঠিক এই সময়ে বীরকেশরী আলি ছুটিয়া গিয়া মোরাহাবকে আযরাইলের হস্তে সোপর্দ করিলেন।

মোরাহাবকে নিহত হইতে দেখিয়া তাহার ভ্রাতা ছুটিয়া আসিয়া পুনরায় মুসলমানদিগকে সদর্পে আহ্বান করিল। এবার বীরবর জুবায়ের অগ্রসর হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ইহুদী বীরপুঙ্গবের যুদ্ধসাধ মিটাইয়া দিলেন।

প্রথম দিন সৈন্যচালনার ভার পড়িল আবুবকরের উপর। ইসলামের

হিলালী ঝাণ্ডা তাঁহারই হস্তে অর্পণ করা হইল। দ্বিতীয় দিন ওমর নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। দুইদিনের আক্রমণে শত্রুগণ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইল বটে কিন্তু দুর্গের পতন হইল না। তৃতীয় দিন শেরে-খুদা আলির নেতৃত্বে মুসলমানগণ প্রচণ্ড বেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ইহুদীরা সেই দুর্বার শক্তিবেগ সহ্য করিতে পারিল না। কামুস দুর্গের পতন হইল।

যুদ্ধ শেষে দেখা গেল ইহুদীদিগের নিহতের সংখ্যা মোট ৯২ জন এবং মুসলমানদিগের ১৯ জন।

প্রায় তিন সপ্তাহ কাল অবরুদ্ধ থাকার পর খায়বারের সমস্ত ইহুদী-দুর্গ মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। তখন নিরুপায় হইয়া ইহুদীরা হযরতের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিল।

কিন্তু এহেন বিশ্বাসঘাতক মারাত্মক শত্রুকে পরাজিত করিয়াও হযরত তাহাদিগকে কী শাস্তিবিধান করিলেন? তিনি তাহাদিগকে একেবারে নির্মূল করিয়াও ফেলিলেন না, অথবা জোর করিয়া কাহাকেও মুসলমানও করিলেন না। নিম্নলিখিত সর্তে তিনি ইহুদীদিগের সহিত শান্তিস্থাপন করিলেন।

(১) ইহুদীরা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্মপালন করিতে পারিবে, কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না।

(২) মুসলমানদিগের ন্যায় তাহাদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য বাধ্য করা হইবে না।

(৩) তাহাদিগের বাড়ীঘর ও ধনসম্পত্তি পূর্ববৎ তাহাদেরই স্বত্বাধিকার থাকিবে, তবে এখন হইতে তাহাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি মদিনার মুসলিম-সরকারের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ রাজস্ব-স্বরূপ মদিনায় পাঠাইতে হইবে।

(৫) অন্য কোন কর তাহাদিগকে দিতে হইবে না।

শুধু কি ইহাই? ইহুদীদিগের সহিত সম্প্রীতি-স্থাপনের জন্য হযরত আরও এক ধাপ অগ্রসর হইলেন। কামুস-দুর্গের অধিপতি কিনানা মাহ্‌মুদ নামক জনৈক মুসলমানকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হন এবং বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। কিনানার স্ত্রী সফিয়া পূর্ব হইতেই ইসলামের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি হযরতের সহধর্মিণী হইবার সাধ প্রকাশ করেন। হযরত তাঁহার

এ সাধ অপূর্ণ রাখেন নাই। সফিয়াকে তিনি বিবাহ করিয়া আপন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

কিন্তু এত করা সত্ত্বেও ইহুদীদিগের খাস্‌লাৎ বদ্‌লাইল কই? বিশ্বাসঘাতকতা যাহাদের রক্তমাংসে জড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে কে সুপথে আনিবে? হযরত ইহুদীদিগের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য বারেবারে বুক পাতিয়া দিতেছেন, অথচ প্রতিবারেই তাহারা সেই বুকে ছোরা বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। শুনিলে সত্যই দুঃখ হয়, ইহুদীদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দান করা সত্ত্বেও এবং তাহাদের সহিত নানাভাবে হৃদ্যতা দেখান সত্ত্বেও এই মুনাফিকগণ হযরতকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে কুণ্ঠিত হইল না। খায়বারের যুদ্ধ শেষে ইহুদীদিগের সহিত যখন শান্তিস্থাপন হইয়া গেল এবং হযরত যখন সফিয়াকে বিবাহ করিয়া তাহাদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় দিলেন, ঠিক সেই সময়েই এক নিদারুণ আঘাত আসিল। জয়নব নাম্নী এক ইহুদী রমণী হযরতকে দাওয়াৎ করিল। হযরত সে-দাওয়াৎ কবুল করিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবাকেও সেই সঙ্গে দাওয়াৎ করা হইল। ইহুদিনী অতি সুন্দর গোশ্‌ত রাঁধিয়া হযরতের সম্মুখে আনিয়া ধরিল। হযরত সরল বিশ্বাসে খানা খাইতে বসিলেন। এক টুকরা গোশ্‌ত খাইয়াই তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন: "সাবধান! এই গোশ্‌ত কেহ খাইও না, ইহাতে বিষ মিশানো আছে।" বশর নামক জনৈক সাহাবী পূর্বেই খানিকটা গোশ্‌ত ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কাজেই অল্পক্ষণ পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কিন্তু আল্লার কী কদরৎ। হযরতের কিছুই হইল না, তিনি বাঁচিয়া গেলেন। পাপিষ্ঠা ইহুদিনীকে ডাকা হইল। পিশাচিনী দোষ স্বীকার করিয়া বলিতে লাগিল: "এ কাজ ইচ্ছা করিয়াই আমি করিয়াছি। মুহম্মদ, তোমার জন্য আমার পিতা, পিতৃব্য এবং স্বামী যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে। তুমি নিজেকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করাতেই আমাদের এই সর্বনাশ ঘটিয়াছে। আমার সাধ জাগিল—তোমাকে একবার পরীক্ষা করিব। তুমি যদি সত্যই পয়গম্বর হও, তবে তো পূর্ব হইতেই বিষের কথা জানিতে পারিয়া এই মাংস ভক্ষণ করিবে না; আর যদি তুমি ভণ্ড হও, তবে নিশ্চয়ই তুমি এই মাংস ভক্ষণ করিবে এবং এই বিষে তোমার মৃত্যু ঘটিবে, তখন আমরাও তোমার জ্বালাতন হইতে রক্ষা পাইব। ইহাই

ছিল আমার মতলব। এখন দেখিতেছি—তুমি পয়গম্বর নও, তুমি ভণ্ড কারণ খাদ্যে যে বিষ মিশানো আছে, তাহা তো জানিতে পারিলে না। তোমার মৃত্যু অনিবার্য।"

হযরত স্মিতমুখে বলিলেন: "জয়নব, তোমার আশা পূর্ণ হইবার নয়! আল্লার অনুগ্রহ থাকিলে, বিষ খাইয়াও আমি বাঁচিতে পারি। এই দেখ না, আমি মরি নাই।"

জয়নব দেখিল, সত্যই তো তাই! গোশ্‌তে বিষ মিশানো আছে জানিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে সে এক পরীক্ষা হইত বটে, কিন্তু এ পরীক্ষাও তো তার চেয়ে কম নয়। একই বিষ দুইজনে খাইল; একজন মরিল, একজন মরিল না। বিষ খাইলেও যার মৃত্যু হয় না, সেও তো সাধারণ মানুষ নয়! তবে কি মুহম্মদ সত্যসত্যই পয়গম্বর? জয়নবের মনে দোলা লাগিল।

মুহূর্তমধ্যে জয়নব হযরতের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বারে বারে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল!

হযরত ব্যক্তিগতভাবে জয়নবকে ক্ষমা করিলেন; কিন্তু ইচ্ছা পূর্বক বশরের মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধে বাধ্য হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইল। বলা বাহুল্য, এ বিধান খুবই সংগত হইয়াছিল। হযরতের দুইটি সত্ত্বা ছিল; এক সত্ত্বা তাঁহার ব্যক্তিগত, আর এক সত্ত্বা তাঁহার জাতিগত। ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু একটা জাতির নেতা বা প্রতিনিধি হিসাবে যাহা খুশি করা যায় না। সেখানে দেশের বা জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাবিতে হয়। বশর ছিলেন একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক। বিষদানে তাঁহাকে হত্যা করা নিশ্চয়ই ইহুদিনীর পক্ষে গুরুতর অপরাধ। রসুলুল্লাহ্ আরব রাষ্ট্রের প্রধান পুরুষ হইয়া এই ইচ্ছাকৃত অপরাধকে ক্ষমা করিতে পারেন না। তাই ন্যায়সংগতভাবেই ইহুদিনীর প্রাণদণ্ড হইল। অতি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনেও ইহার সমর্থন মিলিবে।

পরিচ্ছেদ : ৫০

মুলতবী হজ

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল। আকাশ-কোণে আবার জিল্‌হজ্জের চাঁদ দেখা দিল। সন্ধির সর্তানুসারে হযরত তাঁহার ভক্তবৃন্দকে লইয়া এইবার তাঁহাদের মুলতবী হজ সমাপন করিতে মনস্থ করিলেন।

আদেশক্রমে ২০০০ মুসলিম মক্কায় হজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নির্দিষ্ট দিনে হযরত ভক্তবৃন্দসহ যাত্রা করিলেন। কুরবানির জন্য ৬০টি উট সংগে লওয়া হইল।

সন্ধির সর্তানুযায়ী প্রত্যেক মুসলমান মাত্র একখানি করিয়া তরবারি সংগে লইলেন; তাহাও কোষাবদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে হযরত এবার একটু পাঠগ্রহণ করিলেন। পাছে কোরেশগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে, এই আশংকায় তিনি ২০০ মুসলিম বীরকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রসহ মক্কার বাহিরে একটি নিভৃত উপত্যকায় পূর্বেই পাঠাইয়া দিলেন। হযরতের আদেশের অপেক্ষায় তাহাদিগকে তথায় মোতায়েন থাকিতে বলা হইল।

হযরত ধীরে ধীরে ভক্তবৃন্দসহ নীরবে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। আল্‌ কাসোয়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে তিনি চলিলেন, পশ্চাতে ২০০০ ভক্ত শিষ্য অনুগমন করিতে লাগিলেন। পবিত্র কা'বা-গৃহ দৃষ্টিপথে পতিত হইতেই হযরত সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন: "লাব্বায়েক! লাব্বায়েক!" সংগে সংগে দুই হাজার কণ্ঠে সে-কথার প্রতিধ্বনি উঠিল: "লাব্বায়েক! লাব্বায়েক!—প্রভু হে, আমরা হাজির!"

হযরতের মনে আজ কত ব্যথা—কত আনন্দ! দীর্ঘ সাত বৎসর পরে তিনি আজ জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। সেই মক্কা, সেই কা'বা, সেই হেরা, সেই আবদুল মুত্তালিব, সেই খাদিজা—সব কিছুই তাঁহার মনে পড়িল। প্রাণের দুলালকে বুকে পাইয়া বিমর্ষ মক্কানগরী যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

এদিকে কোরেশ প্রধানগণ হযরতের আগমন সংবাদে পূর্ব হইতেই নগর ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহা ছাড়া আর উপায় কী? যে-মুহম্মদকে সদলবলে তাহারা একবার দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, সেই আজ তাহার সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া সকল শিষ্যকে সংগে লইয়া সেই কা'বা-গৃহে আসিয়া হজ্জ করিবে! এ দৃশ্য কেমন করিয়া তাহারা দেখিবে? এ তো দস্তুরমত তাহাদের পরাজয়। হাজার লোকের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে এই কাণ্ড ঘটিবে। লোকে কী বলিবে? নিশ্চয়ই তাহাদের মুখ ছোট হইয়া যাইবে—মাথা হেঁট হইয়া পড়িবে। তার চেয়ে মানে মানে সরিয়া পড়াই ভাল নয় কি?

এইরূপই একটা মানসিকতার ফলে তাহারা নগর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হযরত শিষ্যবৃন্দকে লইয়া নগরপ্রবেশ করিলেন। মক্কার মুসলমানগণ তাঁহাদের পরিত্যক্ত গৃহ ও পরিচিত স্থানগুলি দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই গৃহে প্রবেশ করিলেন না; বাহিরে তাম্বু ফেলিয়াই বাস করিতে লাগিলেন।

তবু তাঁহাদের কত আনন্দ। আজ তাঁহারা সত্যই কি বিজয়ী নন? ইসলাম কি আজ জয়যুক্ত নয়? হোদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব ও সার্থকতা আজ সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

হযরত ভক্তবৃন্দকে লইয়া কা'বা গৃহে প্রবেশ করিলেন। ছাদের উপর উঠিয়া বেলাল উচ্চকণ্ঠে আযান ফুকারিলেন। দলে দলে মুসলমানগণ ছুটিয়া আসিয়া একত্রিত হইলেন। হযরত সকলকে লইয়া জোহরের নামায পড়িলেন। চতুর্দিকে পাষাণ প্রতিমাগুলি যেমন ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

দূর হইতে কোরেশগণ এ দৃশ্য দেখিতে পাইল। ভিতরে ভিতরে তাহাদের রক্ত টগবগ করিতে লাগিল। অনেকে মুসলমানদিগকে উত্যক্ত করিয়া খামাখা বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হযরতের সহনশীলতার গুণে তাহা ঘটিতে পারিল না।

হযরত যথারীতি হজ্জ সমাপন করিলেন। সাফা ও মারওয়া পর্বত সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া উটগুলিকে সেইখানে কুরবানি দিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিন দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেল। চতুর্থ দিনে

কোরেশগণ আসিয়া হযরতকে নগর ত্যাগ করিতে বলিল। হযরত তাহাই করিলেন।

কী অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা! কোরেশদিগের নিকট হযরত যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। আপন বাসভূমি, আপন আত্মীয়স্বজন কোথায় দূরে দূরে পড়িয়া রহিল, হযরত এবং তাঁহার শিষ্যগণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে তাঁহার আপন জন্মভূমিতেও প্রবাসীর মত তিন দিন কাটাইয়া গেলেন। গৃহের মায়া, আত্মীয়স্বজনের প্রেম তাঁহাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিল; আকাশ তাঁহাদিগকে নীল নয়ন মেলিয়া মমতা জানাইল; বাতাস তাঁহাদিগকে স্নেহের পরশ বুলাইয়া গেল। কত স্মৃতি, কত আকর্ষণ তাঁহাদের অন্তরকে বারে বারে দোলা দিয়া গেল। কিন্তু হযরত ও তাঁহার শিষ্যগণ একেবারে নির্বিকার। ইচ্ছা করিলেই হযরত একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না। সত্য ও স্থায়ের পাষাণ-প্রাকারে ঘা খাইয়া অনুভূতির সকল আবেদন নিষ্ফল হইয়া গেল।

কিন্তু এই অল্পপরিসর সময়ের মধ্যে আর একটি কাণ্ড ঘটিল। হযরত যে-তিনদিন মক্কায় ছিলেন, সে-তিনদিন কাহারও গৃহে প্রবেশ করেন নাই বটে, কিন্তু কোন কোন কোরেশ নাগরিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। সেই সূত্রে মায়মুনা নাম্নী তাঁহারই জনৈক দূরসম্পর্কীয়া বিধবা রমণী হযরতের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রস্তাব পাঠাইয়া দেন। হযরত তাঁহার এ বাসনা পূর্ণ করেন। মায়মুনাকে তিনি সংগে করিয়া মদিনায় লইয়া যান।

এই বিবাহের এক আশ্চর্য ফল ফলিল। বীরেন্দ্র খালিদ ছিলেন মায়মুনার আপন ভগিনীর পুত্র। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে: এই খালিদের অসাধারণ বীরত্ব ও রণ চাতুর্যের ফলেই ওহদ যুদ্ধে মুসলমানদিগের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। মায়মুনার বিবাহের পরেই খালিদ অপ্রত্যাশিতভাবে মদিনায় গিয়া হযরতের হাতে হাত রাখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। শুধু কি খালিদ? আরও দুইজনকে তিনি সংগে লইয়া গেলেন; একজন মক্কার প্রসিদ্ধ কবি আমর, অন্যজন কা'বা-গৃহের কুঞ্জি-রক্ষক ওসমান-বিন্-তাল্‌হা। এই তিন-জন শক্তিমান পুরুষের ইসলাম গ্রহণে কোরেশদিগের মেরুদণ্ড যে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল সে কথা বলাই বাহুল্য।

হযরত মক্কায় গিয়া কোরেশদিগের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা নিজেও লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। একমাত্র আবুসুফিয়ান ছাড়া এখন যে তাহাদের মধ্যে আর কোন উল্লেখযোগ্য নেতা নাই এবং তাহাদের বিষদন্ত যে প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে, এ সত্য আর গোপন রহিল না। চরম বিজয়ের অপেক্ষায় তিনি প্রহর গণিতে লাগিলেন।

———

পরিচ্ছেদ : ৫১

মুতা-অভিযান

মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হযরত বনি-সালেম গোত্রের নিকট একটি প্রচার-সংঘ পাঠাইয়া দিলেন। গোত্রের নেতা ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরতের নিকট আসিয়া বলেন যে, যদি একদল মুসলমানকে বনি সালেম গোত্রের নিকট পাঠান যায়, তবে হয়ত তাহারা মুসলমান হইতে পারে। তদনুসারেই হযরত ৫০ জন মুসলমানকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা গিয়া বনি-সালেমদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু বনি-সালেমগণ মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া সে আহ্বানের জবাব দেয়। অধিকাংশ মুসলমানই তাহাদের হস্তে শহীদ হন। অবশ্য এই শহীদদিগের পবিত্র রক্ত বিফলে যায় নাই। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই বনি-সালেমগণ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারে এবং সকলে মুসলমান হইয়া তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

ইহার পর ১৪ জন মুসলমানের আর একটি শান্তি-সংঘ প্রেরিত হয়—সিরিয়া প্রান্তের জাৎ-আৎলা নামক একটি স্থানে। এখানেও একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটে। মুসলমানগণ ইসলামের নামে অধিবাসীবৃন্দকে আহ্বান করিতেই তাহারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। মুসলমানগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু একজন ব্যতীত সকলেই শহীদ হন।

এই সময়ে আর একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটে। ইসলামের দাওয়াৎপত্র সংগে দিয়া হারেস-বিন্-ওমায়ের নামক জনৈক প্রিয় শিষ্যকে হযরত বসোরার শাসনকর্তার নিকট পাঠাইয়া দেন। ওমায়ের মুতা নামক স্থানে উপনীত হইলে শোরাহ্‌বিল নামক জনৈক খৃষ্টান-প্রধান তাঁহাকে আটক করিয়া ফেলে এবং অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করে। কোন দূতকে এরূপভাবে হত্যা করা সকল দেশের আন্তর্জাতিক নীতিরই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য হযরত বদ্ধসংকল্প হন।

শুধু দূতকে হত্যা করিয়াই যে খৃষ্টানগণ ক্ষান্ত রহিল, তাহাও নয়। রোমক-সম্রাট হিরাক্লিয়াস প্রথমতঃ হযরতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি

দেখাইলেও, পরে অবস্থার চাপে পড়িয়া তিনিও ইসলামের শত্রু হইয়া দাঁড়ান। দিকে দিকে যখন ইসলামের লাল মশাল জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, তখন তিনি বিপদ গণিলেন। কিসে ইসলামের এই বিজয়-গতিকে রোধ করা যায়, ইহাই হইল তাঁহার প্রধান চিন্তা।

এই সময়ে হিরাক্লিয়াসের মনোভাব যে কিরূপ ছিল, তাহা একটি ঘটনায় সুপ্রকট হইয়া আছে। ফারোয়া নামক, জনৈক আরব-খৃষ্টান তখন সিরিয়ার 'মা-আন' প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি মুসলমান হন এবং একখানি পত্র লিখিয়া হযরতের আনুগত্য প্রকাশ করেন। এই সংবাদ শুনিয়া হিরাক্লিয়াস পদোন্নতির প্রলোভন দেখাইয়া ফারোয়াকে পুনরায় খৃষ্টধর্মে ফিরাইয়া আনিতে প্রয়াস পান। কিন্তু ফারোয়া এ প্রলোভনে মুগ্ধ হইলেন না। হিরাক্লিয়াসকে তিনি জানাইয়া দিলেন "আমি কিছুতেই রসুলুল্লার ধর্ম ত্যাগ করিব না। যিশুখৃষ্ট ইঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, ইহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনিও হয়ত মুসলমান হইতেন, কেবল রাজ্য ও প্রতিপত্তি হারাইবার ভয়ে তাহা পারিতেছেন না।"

ক্রুদ্ধ সম্রাট ফারোয়ার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। কিন্তু ইহাতেও ফারোয়া বিচলিত হইলেন না। অতুল সুখসম্পদ ও উচ্চ রাজপদ তুচ্ছ করিয়া হাসিমুখে তিনি মরণ বরণ করিলেন।

এইখানেই খৃষ্টানদিগের দুষ্কৃতির শেষ হইল না। মদিনা আক্রমণের জন্য তাহারা গোপনে গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিল। শোরাহ্‌বিল তাহার প্রধান পাণ্ডা।

হযরতের নিকট যথাসময়ে এ সংবাদ পৌছিল। অবিলম্বে তিনি তিন হাজার সৈন্যের একটি অভিযান মুতার দিকে প্রেরণ করিলেন।

এই অভিযানের নায়ক হইলেন জায়েদ—সেই ক্রীতদাস জায়েদ—হযরত যাঁহাকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন হাজার সম্ভ্রান্ত বংশীয় মোহাজের ও আনসারদিগের নেতা আজ এই ক্রীতদাস। আলির ভ্রাতা জাফর, কবি আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-রওয়াহা, নবদীক্ষিত বীরযোদ্ধা খালিদ প্রভৃতি গণ্যমান্য বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন; কিন্তু সবার শীর্ষে স্থান লাভ করিলেন জায়েদ! জাফর আবিসিনিয়া হইতে সবেমাত্র মদিনায় আসিয়াছিলেন, বংশমর্যাদার মোহ হয়ত তখন তাঁহার মনে জাগিয়া

ছিল, তিনি তাই প্রথমতঃ জায়েদের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে-ছিলেন; কিন্তু হযরত যখন জাফরকে একটু মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর বিষদ ব্যাখ্যা করিলেন, তখন জাফর নীরব হইলেন। দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি অন্যান্য সকলের মতই জায়েদকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

বিস্ময়ের বিষয় বটে! ইসলাম মানুষকে কোথা হইতে কোথায় টানিয়া তুলিতে পারে, পাঠক তাহা একবার লক্ষ্য করুন।

এই অভিযান প্রেরণের সময় হযরত যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী অন্যান্য অভিযানে হযরত মাত্র একজনকেই নেতা নিযুক্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু এবার তিনি অন্যরূপ নির্দেশ দিলেন। বলিলেন: যদি জায়েদের পতন হয় তবে জাফর এবং জাফরের যদি পতন হয়, তবে আবদুল্লাহ্-বিন্-রওয়াহা সেনাপতি পদে বরিত হইবেন। যদি পর পর তিনজনই নিহত হয়, তবে তখন মুসলিমগণ নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের সেনাপতি নির্বাচিত করিয়া লইবে।

যাত্রাকালে হযরত 'বিদায় পর্বত' পর্যন্ত অভিযাত্রীদিগের সংগে গেলেন। সকলকে উপদেশ দিয়া বলিয়া দিলেন: "সাবধান, কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে, বালক-বালিকাকে বা স্ত্রীলোককে বধ করিও না। শত্রুদিগের কোন বৃক্ষ ছেদন করিও না, কোন গৃহ জ্বালাইয়া দিও না, শুধু আল্লার শত্রুকেই বধ করিবে এবং সর্বদা আল্লাকে ভয় করিয়া চলিবে।" অতঃপর সকলকে শুভাশিস জানাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

জায়েদ সেনাদল সহ সিরিয়া সীমান্তে উপনীত হইতেই শুনিতে পাইলেন, 'মাতআব' অঞ্চলে একলক্ষ খৃষ্টান সৈন্য তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং স্বয়ং কাইসার তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেছেন। এই সংবাদে মুসলমানগণ একটু দমিয়া গেলেন। এক লক্ষ সুসজ্জিত শত্রুসেনার মুকাবেলায় মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য! সকলে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন: অবস্থা যখন এইরূপ তখন মদিনায় সংবাদ পাঠানোই সমীচীন। আবদুল্লাহ্-বিন-রওয়াহা এ কথা সমর্থন করিলেন না, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: "হে মুসলিম বীরবৃন্দ, এ কী কথা বলিতেছ আজ? আসিবার সময় তোমরা তো লাভ-লোকসানের খতিয়ান করিয়া আস নাই। শুধু জয়লাভই তো আমাদের কাম্য নয়,

শাহাদাতও আমাদের কাম্য। জয়লাভ করিতে পারি ভালই, অন্যথায় ইসলামের নামে—আল্লার নামে—আমরা শহীদ হইব। জয় হইলেও আমাদের লাভ, পরাজয় হইলেও আমাদের লাভ। কেন তবে কুণ্ঠিত হইতেছ? শত্রুসেনার সংখ্যাধিক্য দেখিয়া কেন তবে আজ ভীত হইতেছ? কোন ভয় নাই; চল, তিন হাজার সৈন্য লইয়াই আমরা এক লক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। ঈমানের তেজে আমরা জয়ী হইব।"

এই জলন্ত বীরবাণী শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সকল দুর্বলতা মুহূর্তমধ্যে কোথায় ভাসিয়া গেল। শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য বীরদল তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন।

মুতা নামক স্থানে উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

জায়েদ দক্ষতার সহিত সৈন্যবিন্যাস করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ইসলামের জয়-পতাকা তিনি তুলিয়া ধরিলেন। বহুক্ষণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিবার পর জায়েদ নিহত হইলেন। তখন জাফর ছুটিয়া গিয়া সেই পতাকা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনিও শহীদ হইলেন। এইবার আবদুল্লার পালা পড়িল। তাড়াতাড়ি তিনি ছুটিয়া আসিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বেশিক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলেন না—শত্রুহস্তে অচিরেই প্রাণ হারাইলেন। মুসলমানগণ তখন বিপদ গণিলেন। কাহাকে এইবার নেতৃত্ব দান করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি পরামর্শ করিবার পর সকলের মনোনয়ন পড়িল বীরেন্দ্র খালিদের উপর। খালিদ অম্লানবদনে নত মস্তকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

মুহূর্তমধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। কোন্ তড়িৎশক্তিবলে মুসলমানগণ যেন শক্তিমান হইয়া উঠিল; সেনাদলের নষ্ট শৃঙ্খলা এবং আহত মনোবল আবার ফিরিয়া আসিল। কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই খালিদের।

কিন্তু যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সেদিনকার মত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণ করাই খালিদ সংগত মনে করিলেন। অতি কৌশলে তিনি মুসলিম সেনাদলকে বাঁচাইয়া হটিয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য, এই পশ্চাদপসরণ খালিদের অসামান্য রণচাতুর্যের ফলেই সম্ভব হইল।

এরূপ একটা বিভ্রাট যে ঘটিবে, মদিনায় বসিয়া হযরত তাহা আপন মনেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। হযরত তাই পূর্ব হইতেই একদল সহকারী সেনা মুতা অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে এই সেনাদল

আসিয়া খালিদের সহিত মিলিত হইল। তখন মুসলমানগণ আবার নববলে বলিয়ান হইয়া উঠিলেন। নবরূপে ব্যূহবিন্যাস করিয়া খালিদ আবার খৃষ্টানদিগের সম্মুখীন হইলেন। খৃষ্টানেরা বিস্মিতও হইল, ভীতও হইল। ভাবিল, মদিনা হইতে এবার অসংখ্য সেনা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে।

পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুসলমানগণ প্রচণ্ড বেগে খৃষ্টানদিগকে আক্রমণ করিলেন। একা খালিদের হস্তেই আটখানি তরবারি ভাঙিয়া গেল। এই দিন মুসলমান সৈন্যের প্রত্যেকেই এমন দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং সর্বত্রই এমন অমানুষিক বীরত্ব দেখাইলেন যে, খৃষ্টানগণ বেশিক্ষণ আর তিষ্ঠিতে পারিল না, ছত্রভংগ হইয়া পলায়ন করিল।

মুসলিম বীরদল তখন জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিলেন। বহু লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ বিজয়-গৌরবে তাঁহারা মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

জাফর এবং জায়েদকে হারাইয়া হযরত অন্তরে খুবই ক্লেশ অনুভব করিলেন। জাফরের গৃহে যাইয়া তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে কোলে লইয়া তিনি আদর করিতে লাগিলেন। জাফরের স্ত্রী আস্‌না স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে কান্না দেখিয়া হযরত স্থির থাকিতে পারিলেন না। অশ্রুসজল চোখে নীরবে বাহির হইয়া আসিলেন।

অতঃপর হযরত জায়েদের গৃহে গমন করিলেন। জায়েদের শিশুকন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া হযরতের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হযরতও নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে জনৈক সাহাবী হযরতকে বলিলেন: "ইয়া রসুলুল্লাহ্। আপনি যদি এমনভাবে কাঁদিবেন, তবে আমরা কী করিব? এরূপ করিয়া কাঁদিতে তো আপনিই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।"

হযরত তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন: "এ কান্না দোষের নয়, ইহা বন্ধুর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ।"

পরিচ্ছেদ : ৫২

মক্কা-বিজয়

অষ্টম হিযরী। রমজান মাস।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল।

সন্ধির একটি শর্ত এই ছিল যে, আরবের যে-কোন গোত্র হযরত মুহম্মদের সহিত অথবা কোরেশদিগের সহিত স্বাধীনভাবে যোগাযোগ রাখিতে পারিবে, তাহাতে কোন পক্ষই বাধা দিবে না। এই সন্ধির বলে মক্কার 'খোজা' সম্প্রদায় মুহম্মদের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং বনি-বকর সম্প্রদায় কোরেশদিগের সহিত যোগ দিল। বনি-খোজা ও বনি-বকর গোত্রের মধ্যে পূর্ব হইতেই ভীষণ শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। কাজেই খোজাগণ মুহম্মদের পক্ষ গ্রহণ করায় বনি-বকরগণ তাহাদের উপর কুপিত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে কোরেশগণ খোজাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। মক্কায় বাস করিয়া মুহম্মদের সহিত মিতালি? কোরেশদিগের প্রাণে তাহা সহ্য হইবে কেন? খোজাদিগকে জব্দ করিবার জন্য তাই তাহারা বনি-বকরদিগকে উস্‌কাইয়া দিল।

'ওয়াতির' নামক একটি নিভৃত পল্লীতে ছিল খোজা গোত্রের বসতি। একদিন রাত্রিকালে স্ত্রীপুত্রপরিজনসহ তাহারা সুখে ঘুমাইয়া আছে, এমন সময় কোরেশ ও বনি-বকর গোত্রের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের পল্লীতে আক্রমণ করিল। এই অতর্কিত নৈশ আক্রমণের ফলে নিরীহ খোজাদিগের বহু নরনারী প্রাণ হারাইল। অনেকে প্রাণভয়ে ছুটিয়া গিয়া কা'বা-গৃহে আশ্রয় লইল। কা'বার চতুঃসীমার মধ্যে নরহত্যা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু পাষণ্ডেরা সেকথাও ভুলিয়া গিয়া খোজাদিগকে ধরিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল।

এই হত্যাকাণ্ডের পর খোজাগণ হযরতের নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিল। হযরত দেখিলেন: রাজনীতি বা ধর্মনীতি—যে-কোন দিক দিয়াই তিনি এখন খোজাদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য। বিভিন্ন জাতি যখন আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক (offensive and defensive) সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়, তখন একের বিপদে অপরকে সাহায্য করিতেই হয়।

সতর্কতার সহিত সমস্ত আয়োজন চলিতে লাগিল। অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা গোপন রাখিয়া তিনি সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এমন কি, প্রথম জ্ঞানবৃদ্ধ আবুবকরও এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই। অভিযানের সংবাদ যাহাতে মক্কায় না পৌঁছিতে পারে, হযরত সে জন্য মদিনার চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইলেন।

এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? পাঠকের মনে এ-প্রশ্ন জাগিতে পারে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে: মক্কা অভিযানের সংবাদ যদি কোরেশগণ পূর্বাহ্নেই জানিতে পারে, তবে তাহারাও বিপুল সমরায়োজন করিবে; ফলে একটা ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিবে এবং কোরেশকুল নির্মূল হইয়া যাইবে। হযরত এইরূপ ধ্বংসমূলক বিজয় চান নাই; চাহিয়াছিলেন কোরেশদিগকে রক্ষা করিতে—তিনি চাহিয়াছিলেন প্রেম দিয়া জয় করিতে, মানবতা দিয়া জয় করিতে। এই জন্যই তিনি কোরেশদিগকে প্রস্তুত হইবার কোন অবসর দেন নাই।

হাতিব নামক হযরতের জনৈক বিশ্বস্ত সহচর এই সময় একটি কাণ্ড করিয়া বসিলেন। হযরতের সহিত তিনি মদিনায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার স্ত্রীপুত্রাদি তখন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করিতেছিল। এজন্য তিনি আশংকা করিতেছিলেন, মক্কা-আক্রমণের সময় তাঁহার স্ত্রীপুত্রের উপর কোরেশগণ চরম লাঞ্ছনা করিবে। এই কারণে কোরেশদিগের সহানুভূতি আকর্ষণের বাসনায় তিনি একখানি গোপন পত্রসহ উম্মে-সারা নাম্নী জনৈক ক্রীতদাসীকে মক্কায় পাঠাইয়া দেন। সেই পত্রে মক্কা আক্রমণের সংবাদ দিয়া কোরেশদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় হযরত এই গুপ্তকথা কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন। আলি ও জুবায়েরকে ডাকিয়া বলিলেন: "শীঘ্র যাও, রওজা-খাক নামক স্থানে না পৌঁছিয়া দম লইবে না। সেখানে গিয়া দেখিবে, একজন ক্রীতদাসীর নিকট একখানা পত্র আছে, সেখানা লইয়া আইস।"

আদেশ শ্রবণমাত্র আলি ও জুবায়ের অশ্বারোহণে দ্রুতগতিতে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। দেখিলেন, উম্মে-সারার নিকট সত্যই একখানি পত্র রহিয়াছে। পত্রসহ ক্রীতদাসীকে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহারা হযরতের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই কার্যের জন্য হাতিবের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হইল। হাতিবের

ইহাই চিরাচরিত নিয়ম। হযরত তাই আশ্রিত খোজা সম্প্রদায়কে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সোজাসুজি কোরেশদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-অভিযান না পাঠাইয়া তিনি প্রথমতঃ তাহাদের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের মারফৎ এই কয়টি প্রস্তাব পাঠান হইল:

(১) হয় তোমরা বনি-খোজা গোত্রকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার কর;

(২) নয় তো বনি-বকর গোত্রের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন কর;

(৩) নয় তো হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা কর।

কোরেশদিগের মন পূর্ব হইতেই বিষাক্ত হইয়া ছিল; কাজেই এই তিনটি সর্তের মধ্যে শেষোক্ত সর্তটিই তাহারা গ্রহণ করিল। উৎসাহের সহিত তাহারা বলিয়া দিল: আমরা তৃতীয় সর্তই মানিয়া লইলাম।

দূত মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া হযরতকে সব কথা বলিলেন। হযরত তখন বুঝিলেন, কোরেশদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

এদিকে কোরেশ-নেতা আবুসুফিয়ান একটু ভীত হইয়া পড়িল। হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল করিয়া তাহারা যে ভাল কাজ করে নাই, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। হয় তো শীঘ্রই মুহম্মদ মক্কা আক্রমণ করিবে—এ আশংকাও তাহার মনে জাগিল। সে তখন তাড়াতাড়ি মদিনায় আসিয়া হযরতকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল: "বনি-বকর গোত্রকে সাহায্য করিলেও হোদায়বিয়ার সন্ধি তো তাহাতে ক্ষুন্ন হইতেছে না। আমরা সে সন্ধি মানিয়া চলিতে প্রস্তুত আছি।"

কিন্তু এ ধোঁকাবাজিতে হযরত ভুলিবেন কেন? তিনি বলিলেন: "হোদায়বিয়ার সন্ধি যদি মানিয়া চলিবে, তবে উপযুক্ত অর্থ দিয়া বনি-খোজাদিগের ক্ষতিপুরণ করিতেছ না কেন? যদি ইহা করিতে, তবেই বুঝিতাম যে সত্যই তোমরা আমার সহিত শান্তি রাখিতে ইচ্ছুক। শুধু মুখের কথায় চলিবে না!"

আবুসুফিয়ান এ কথায় জবাব দিল না। মদিনার মসজিদ-প্রাংগণে দাঁড়াইয়া সে ঘোষণা করিল: "মদিনাবাসীগণ, শোন, আমি হোদায়বিয়ার সন্ধিকে পুনঃস্থাপিত করিয়া গেলাম।" এই বলিয়া সে মদিনা ত্যাগ করিল।

হযরত বৃথা কালক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। অনতিবিলম্বে তিনি যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিলেন।

হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। নিজ পরিবারের নিরাপত্তার জন্যই যে তিনি এ-কার্য করিয়াছেণ, ইহা ছাড়া যে তাঁহার মনে অন্য কোন দুরভিসন্ধি নাই, এ কথা তিনি বুঝাইয়া বলিলেন। উগ্রমনা ওমর হাতিবের এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইলেন না; তিনি হাতিবকে 'গর্দান' মারিবার জন্য হযরতকে বলিলেন। কিন্তু হযরত হাতিবের কৈফিয়ৎ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। ইসলামের জন্য হাতিবের সেবা ও ত্যাগও নগণ্য ছিল না। কাজেই হযরত তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে দশ হাজার মুসলিম সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত হইয়া গেল। ১০ই রমযান তারিখে হযরত সকলকে লইয়া মদিনা হইতে যাত্রা করিলেন। "দশ সহস্র ন্যায়নিষ্ঠ সহচরসহ তিনি আসিলেন—" হযরত মুসার এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিল।

মক্কার উপকণ্ঠে 'মার-উজ্-জহরান' নামক গিরি-উপত্যকায় আসিয়া হযরত শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। সন্ধ্যার পর খাদ্য প্রস্তুতির জন্য শিবিরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে পর্বতটি এক অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করিল। মক্কা হইতে কোরেশগণ সে দৃশ্য দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এতবড় অভিযান লইয়া হযরত এত শীঘ্র যে মক্কা আক্রমণ করিবেন, কোরেশগণ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। এই অভিযানের পূর্বায়োজন সম্বন্ধেও তাহারা আজ পর্যন্ত কোন খবর পায় নাই—এতই সংগোপনে ও সতর্কতার সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

কোরেশ নেতা আবুসুফিয়ান হতভম্ব হইয়া পড়িল। কী করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। মদিনাবাসীরা সত্যসত্যই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে কিনা, সৈন্য-সংখ্যাই বা কত, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য তাহার বড় কৌতূহল জন্মিল। রাত্রিবেলায় হাকিম ইব্‌নে-নিজাম এবং বুদায়েল নামক দুইজন সহচরসহ সে উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইল।

সহসা কৃষ্ণবর্ণের কয়েকটি ছায়ামূর্তি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিল: "দাঁড়াও, তোমরা বন্দী।"

ওমর একদল রক্ষী সৈন্যসহ ছদ্মবেশে চতুর্দিকে পাহারা দিয়া ফিরিতে-ছিলেন; আবুসুফিয়ান ও তাঁহার বন্ধুদ্বয় তাঁহাদেরই হস্তে বন্দী হইল।

ওমর বন্দীত্রয়কে লইয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন।

প্রাণের বৈরী—ইসলামের বৈরী—আল্লার বৈরী এই আবুসুফিয়ান। সুদীর্ঘ একুশ বৎসর ধরিয়া হযরতের উপর এবং নিরপরাধ মুসলমানদিগের উপর কী নিষ্ঠুর অত্যাচারই না করিয়াছে সে। এহেন শত্রুকে হাতে পাইয়া নুরনবী কী করিলেন? কোত্‌ল করিবার হুকুম দিলেন? না। গালাগালি দিলেন? তা-ও না। মহাপুরুষের অন্তর করুণায় বিগলিত হইয়া গেল। কোরেশ-নেতার ভ্রান্তি ও পাপের জন্য তিনি বেদনা অনুভব করিলেন। করুণা-মধুর স্বরে আবুসুফিয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "আবুসুফিয়ান, এখনও কি তোমার ভুল ভাঙবে না? এখনও কি তুমি আমাকে আল্লার রসুল বলিয়া স্বীকার করিবে না? এখনও কি দেবদেবীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে?"

আবুসুফিয়ান উত্তর দিল: "কিছুদিন যাবত এই প্রশ্ন আমারও মনে জাগিয়াছে। দেবদেবীকে কী করিয়া আর এখন সত্য বলি? তাহারা সত্য হইলে নিশ্চয়ই এই বিপদে আমাদিগকে সাহায্য করিত।"

আবুসুফিয়ানের মনের আঁধার কাটিয়া যাইতেছে দেখিয়া হযরতের প্রাণ খুশীতে ভরিয়া উঠিল। বলিলেন: "তবে আর কেন? বল, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রসুলুল্লাহ্!"

আবুসুফিয়ানের প্রাণ এ কথায় সম্পূর্ণ সায় দিল না। আলো-আঁধারের মাঝখানে দোল খাইতে খাইতে ঘোষণা করিল: "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রসুলুল্লাহ্।"

হযরত এখন আবুসুফিয়ানের মনের অবস্থা বুঝিয়া ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। সত্য যে ধীরে ধীরে তাহার আপন আসন সম্পূর্ণভাবেই অধিকার করিয়া লইবে এ কথা তিনি জানিতেন।

হযরত তখন আবুসুফিয়ানকে সাগ্রহে আলিংগন করিলেন। এক অপূর্ব বিহিশ্‌তী দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। চিরজীবনের বৈরী আজ তাহার মিত্র হইতেছে! আজ তাঁহারই নিকট সে আত্মসমর্পণ করিতেছে! কত বড় বিজয় এ! এতদিনকার সব বিজয় অপেক্ষা এই বিজয়কেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন।

আবুসুফিয়ান নম্রভাবে বলিলেন: "মুহম্মদ, তুমি কোরেশদিগকে আজ ধ্বংস করিয়া ফেলিবে? আজ যদি তুমি অনুগ্রহ না দেখাও, তবে তোমার স্বজাতি ও স্বগোত্রের লোকেরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।"

এই সময় হযরতের চাচা আব্বাসও হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এতদিন তিনি কোরেশদিগের ভয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু অন্তর তাঁহার চিরদিনই হযরতের পানে উন্মুখ হইয়া ছিল। সুযোগ বুঝিয়া এখন তিনি হযরতের সহিত যোগ দিয়া প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আবুসুফিয়ানের পক্ষ হইয়া তিনি বলিলেন: "মুহম্মদ, আবুসুফিয়ান ছিলেন এতদিন কোরেশদিগের নেতা। আজিকার দিনে তুমি তাঁহাকে একটা-কিছু বিশেষ অনুগ্রহ দেখাও, নতুবা তাঁহার পদমর্যাদা থাকে না।"

হযরত বলিলেন: "নিশ্চয়ই আমি সে মর্যাদা তাহাকে দিব।" অতঃপর আবুসুফিয়ানের দিকে তাকাইয়া বলিলেন: "নগরে গিয়া ঘোষণা করিয়া দাও, আবুসুফিয়ানের নাম যাহারা করিবে, অথবা তাহার গৃহে যাহারা আশ্রয় লইবে, তাহাদের কোন ভয় নাই। এতদ্ব্যতীত নিজগৃহে যাহারা আবদ্ধ থাকিবে, অথবা কা'বা-গৃহে শরণ লইবে, তাহাদিগকেও আজ আমি কিছু বলিব না।"

আবুসুফিয়ান তাড়াতাড়ি মক্কায় ফিরিয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল: "কোরেশগণ, শোন, মুহম্মদ দশ হাজার সৈন্য লইয়া আমাদের দুয়ারে দণ্ডায়মান। আজ আর কাহারও নিস্তার নাই। যে-কেহ কা'বা-গৃহে অথবা আমার গৃহে আশ্রয় লইবে, অথবা নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকিবে, সে-ই আজ নিরাপদ। জানিয়া রাখ, আমি আর এখন তোমাদের দলপতি নই, আমি এখন মুসলমান।"

কোরেশগণ আতংকে অধীর হইয়া উঠিল। কেহ বা কা'বা-গৃহে কেহ বা আবুসুফিয়ানের গৃহে ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল, কেহ বা তাড়াতাড়ি গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রত্যূষেই বীরনবী নগর-প্রবেশের আয়োজন করিলেন। বিভিন্ন দলপতি-দিগকে বিভিন্ন দিক দিয়া মক্কা-প্রবেশের আদেশ দিলেন, কিন্তু কাহাকেও আজ আক্রমণ করিতে নিষেধ করিলেন। নিশান উড়াইয়া কাতারে কাতারে সেনাদল বীরপদভরে চলিতে লাগিল। সকলের শেষে ক্রীতদাস জায়েদের পুত্র ওসামার সহিত হযরত একই উটের পিঠে চড়িয়া নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কী মহনীয় এই দৃশ্য! ক্রীতদাসের সম-আসনে আজ এই সম্রাট! অন্য কোন সেনাপতি হইলে আজ কী আড়ম্বরেই

না নগর-প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হইত! চতুর্দোলায় চড়িয়া তিনি নিশ্চয়ই বিজয়মত্ত সেনাদলের পুরোভাগে থাকিতেন। কিন্তু হযরত চলিয়াছেন আজ সবার পিছনে সামান্য একটি উটে চড়িয়া! তাও আবার একজন ক্রীতদাসকে পার্শ্বে বসাইয়া। নত মস্তকে বিনীতভাবে সকলের আড়াল দিয়া বিজয়ী বীর আজ মুখ লুকাইয়া চলিয়াছেন। ইহা শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব—মানুষকে যিনি অকপটে ভালবাসেন—মানুষের অজ্ঞানকৃত অপরাধকে যিনি ক্ষমার চক্ষে দেখেন—সকল বিজয়ের মাঝখানে যিনি একমাত্র আল্লার করুণাস্পর্শ অনুভব করেন।

হযরতের হৃদয় বাস্তবিকই আজ ভাবের আবেগে বিহ্বল। দীর্ঘ একুশ বৎসর ধরিয়া শত অত্যাচার ও নিগ্রহ ভোগ করিয়া বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথ বাহিয়া আজ সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করিতেছেন। সকল কাঁটা আজ ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। অতীতের কোনো আঘাত বা বেদনার কথা আজ তাঁহার মনে নাই, আজ শুধু সার্থকতার আনন্দ—আজ শুধু বিজয়ের গৌরব। আজ বারেবারে তাঁহার মস্তক কৃতজ্ঞভাবে সর্বশক্তিমান আল্লার উদ্দেশ্যে নত হইয়া পড়িতেছে।

নগর-প্রবেশের পর হযরত সর্বপ্রথম শিষ্যবৃন্দকে লইয়া কা'বা-শরীফের দিকে অগ্রসর হইলেন। পরম ভক্তিভরে কা'বার চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। বহু কোরেশ নরনারী এই সময় কা'বা-গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা ভয়ে ভয়ে হযরতের গতিবিধির প্রতি নীরবে লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। তাহাদের মনে আজ মহা ভয়, মহা আতংক। কখন কী শাস্তি যেন তাহাদের উপর নামিয়া আসে, এই ভাবনায় তাহারা আজ ব্যাকুল। আত্মকৃত সকল অপরাধের চেতনা আজ দোযখের অগ্নির মত তাহাদিগকে দহন করিতে লাগিল।

হযরত কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ভরিয়া 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি করিতে লাগিলেন; ভক্তবৃন্দের কণ্ঠে সে-ধ্বনি রণিয়া রণিয়া ফিরিতে লাগিল। কা'বার আকাশে-বাতাসে তখন শুধুই তৌহিদের তড়িৎপ্রবাহ খেলিতেছিল। স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ৩৬০টি প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই হযরত তাহাদের নিকট অগ্রসর হইলেন এবং নিজ-হস্তের ছড়ির দ্বারা প্রধান দেবমূর্তিগুলির কপালে মৃদু স্পর্শ দিয়া বলিতে লাগিলেন: "সত্য আজ সমাগত। মিথ্যা বিতাড়িত। মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।"

ইহাই বলিয়া তিনি ওমরকে মূর্তিগুলি বাহিরে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। ওমর হযরতের আদেশ পালন করিলেন। পাষাণ দেবতার অধিকার হইতে আল্লার ঘর আজ মুক্ত হইল। আল্লার ঘরে আল্লাহ্ ফিরিয়া আসিলেন!

নামাজের সময় উপস্থিত হইল। হযরত বেলালকে আযান দিতে বলিলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া বেলাল আযান দিলেন। দলে দলে মুসলমানগণ কা'বা-প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। হযরত সকলকে লইয়া সেইখানে নামাজ করিলেন। কোরেশগণ সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

নামাযান্তে হযরতের দৃষ্টি পড়িল সমবেত কোরেশ নরনারীর প্রতি। সকলকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন: "কোরেশগণ, বল, আজ তোমরা কী ভাবিতেছ?"

"আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছি,"—তাহারা উত্তর দিল। "দীর্ঘদিন ধরিয়া আমরা তোমার উপর যে অত্যাচার করিয়াছি, আজ তুমি তাহার কী প্রতিফল দিবে তাহাই ভাবিতেছি।

আপন স্বজাতি ও স্বদেশবাসীর নিঃসহায় অবস্থায় কথা ভাবিয়া মহাপুরুষের অন্তর করুণায় গলিয়া গেল। এত যে অবিচার, এত যে আঘাত, তবু তিনি হাসিমুখে বলিলেন: "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনই অভিযোগ নাই। তোমাদের সব অপরাধ মাপ করিলাম। যাও, তোমরা সকলে আজাদ।"

এত বড় করুণা—এত বড় মহিমা কে কোথায় দেখিয়াছে? এত বড় ক্ষমা কে কোথায় করিয়াছে? প্রতিশোধ গ্রহণের কোন কথা নাই, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার কোন মতলব নাই। হাতে পাইয়াও যিনি দুষ্মণকে এমনভাবে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনি কত মহৎ। কোরেশগণের মুখে কোন কথা সরিল না। তাহারা জাগ্রত না স্বপ্নাচ্ছন্ন বুঝিতে পারিল না। কোন্ এক অলৌকিক যাদুমন্ত্রে তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িল। অশ্রুসজল নয়নে তাহারা হযরতের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল: "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রসূলুল্লাহ্।"

স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে ইসলামের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। বিশ্ব-প্রকৃতি অনিমেষ নেত্রে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

কত সুন্দর—কত অদ্ভুত এই বিজয়! রক্তপাত নাই, ধ্বংস-বিভীষিকা নাই; প্রেম দিয়া, পুণ্য দিয়া, ক্ষমা দিয়া এই বিজয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু চমকপ্রদ বিজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া আছে; বহু বীর-সেনাপতি বহু দেশ জয় করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্তু এতবড় রক্তবিহীন মহাবিজয়া কোথাও কেহ দেখিয়াছে কি? এ বিজয় নূতন যুগের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছে; ইহার মধ্যে দিয়া জগতে নব-জাতি, নবরাষ্ট্র ও নবসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্ধ কুসংস্কারের চাপে পড়িয়া ধরণী এতদিন আড়ষ্ট হইয়া ছিল, পাপ-পংকে তাহার প্রগতি পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, বিকৃত নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে মনুষ্য-বসতি একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই বিজয়ের পর হইতে ধ'ণী আবার নববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। মহাসাগরের ঢেউ আসিয়া ইহার সকল জঞ্জাল ভাসাইয়া লইয়া গেল; মহাসূর্যের জ্যোতিঃ আসিয়া ইহাকে আলোকে-পুলকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল, মানুষ আবার নূতন জীবন লাভ করিল। কণ্ঠে ফুটিল নূতন ভাষা, বক্ষে জাগিল নূতন আশা, চক্ষে লাগিল অনন্ত সম্ভাবনার স্বপ্ন। জগতের ইতিহাসে তাই তো এ এক মহাস্মরণীয় দিন।

মক্কাবিজয় তাই কোন বিশেষ একটা দেশবিজয় নয়—ইহা বিশ্ববিজয়। এ বিজয় কোরেশদিগের উপর নয়,—মিথ্যার উপর ইহা সত্যের বিজয়, অন্ধকারের উপর ইহা আলোকের বিজয়। নিপীড়িতা ধরণী যুগযুগ ধরিয়া এই মুক্তি-ফৌজেরই স্বপ্ন দেখিতেছিল। এই দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

পরিচ্ছেদ : ৫৩

মক্কা-বিজয়ের পরে

মক্কা-বিজয়ের পরের দিন।

কাল আর আজ! কত পার্থক্য! কত ওলট পালট! কাল যেখানে প্রাণহীন পাষাণ-প্রতিমা পূজা হইয়াছে, আজ সেখানে তৌহিদের কল-ঝংকার উঠিতেছে! কাল যাহারা দেবতাকে আপন জানিয়া মানুষকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে আজ তাহারাই দেবতাদিগকে নির্বাসিত করিয়া মানুষকে বুকে টানিয়া লইতেছে! কাল ছিল যে পরম শত্রু, আজ সে হইয়াছে অন্তরতম বন্ধু! নিয়তির কি বিচিত্র পরিহাস!

মক্কা-বিজয়ের পর হযরত নগরবাসীদিগের নিকট সাধারণ ক্ষমা ও অভয়বাণী ঘোষণা করিলেন। আবুসুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা—ওহুদ-যুদ্ধে যে হামজার হৃদপিণ্ড চিবাইয়া খাইয়াছিল, সেও আজ ক্ষমা পাইল। ফোজালা নামক এক পাষণ্ড কা'বা প্রদক্ষিণের সময় হযরতকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িয়াছিল; মহানবী আজ তাহাকেও ক্ষমা করিলেন। আবুযহলের পুত্র ইকরামা—যে এই হত্যার ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং প্রাণভয়ে সমুদ্রতীরে পালাইয়া গিয়া একখানি বিদেশগামী জাহাজে দেশত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাকেও তিনি অভয় দিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। 'রহ্‌মতুল্লিল-আলামিনে'র করুণা-ধারায় আজ প্রত্যেকের হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠিল।

নগর-সীমার মধ্যে হযরত রক্তপাত নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু খোজাগণ স্বপক্ষীয়দিগের বিজয়ের সুযোগ লইয়া বনি-বকর গোত্রের কতিপয় লোককে সহসা আক্রমণ করিয়া বসিল এবং একজনকে নিহত করিয়া পূর্বপোষিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিল। সংবাদ শ্রবণ মাত্র হযরত খোজাদিগকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন এবং বলিয়া দিলেন: "নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আমি নিজ হইতে দিতেছি; কিন্তু সাবধান, এখন হইতে যে-কেহ নরহত্যা করিবে, তাহাকে নিজের রক্ত দিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।"

মক্কার উপকণ্ঠে কতিপয় গোত্র বাস করিত। হযরত তাহাদের নিকটেও শান্তির বাণী প্রেরণ করিলেন। বীরবর খালিদকে বনি-যাজিমা গোত্রের নিকট পাঠান হইল। খালিদ গিয়া তাহাদিগকে ইসলামের নামে আহ্বান করিলেন। কিন্তু বনি-যাজিমাগণ তাহার প্রত্যুত্তরে খালিদের প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার আরম্ভ করিল। যুদ্ধমনা খালিদ এ ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারিলেন না। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং বনি-যাজিমাদিগের কয়েকজন লোক প্রাণ হারাইল। হযরতের নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল, তখন তিনি খালিদের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন: 'ইয়া আল্লাহ্, তুমি জান, খালিদের এই কার্যের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই।" এই বলিয়া তিনি উপযুক্ত রক্তপণসহ আলিকে বনি-যাজিমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আলি গিয়া বনি-যাজিমাদিগের প্রতি হযরতের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন এবং উপযুক্ত পণ অপেক্ষাও কিছু বেশী অর্থ তাহাদিগকে দিলেন। বনি-যাজিমাগণ যখন দেখিল হযরতের মনে কোন অসদভিপ্রায় নাই, তখন তাহারা শান্ত হইল এবং হযরতের উদার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

বিজয়ের উন্মাদনা প্রশমিত হইলে দলে দলে লোক আসিয়া হযরতের নিকট দীক্ষা লইতে লাগিল। অবিশ্বাসী নরনারীর অন্তরের অবরুদ্ধ ভক্তিপ্রেম আজ যেন গৈরিক-নিঃস্রাবে ঢালিয়া পড়িল। ভক্তপ্রবর আবুবকর তাঁহার শুভ্রকেশ কুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধ পিতা আবু-কোহাফাকেও হযরতের নিকট লইয়া আসিলেন। বৃদ্ধ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। পৌত্তলিক বেশেই তিনি এতদিন মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। আবুবকর যখন তাঁহাকে আনিয়া হযরতের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তখন হযরত সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আবুবকরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: "কেন উঁহাকে এখানে টানিয়া আনিয়া কষ্ট দিলে? আমাকে বলিলে তো আমিই নিজে উঁহার নিকটে যাইতাম।" এই বলিয়া বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া হযরত নিজের পাশে আনিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার হাতখানি আপন বুকে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন: "আল্লার সত্যধর্মকে এইবার গ্রহণ করুন।" বৃদ্ধ ভক্তিগদগদচিত্তে সম্মতি জানাইলেন; কম্পিত ওষ্ঠে তিনি কলেমা-শাহাদৎ পাঠ করিলেন: আশ্‌হাদো-আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

ওয়াহ্‌দাহু লা-শারিকালাহু ওয়া আশ্‌হাদো আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু।" (সাক্ষ্য দিতেছি: আল্লাহ্‌ ছাড়া কেহই উপাস্য নাই, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে মুহম্মদ তাঁহার বান্দা ও রসুল।)

মক্কার বাহিরের দিকে হযরতের দৃষ্টি পড়িল। বহুদিন পরে স্বদেশের বুকে ফিরিয়া আসিতে পারিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। মক্কার আকাশ-বাতাস ও পথ-প্রান্তর আজ তাঁহার বড় ভাল লাগিল। উচ্ছ্বাসভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন: "হে আমার প্রিয় জন্মভূমি, পৃথিবীর মধ্যে আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার স্বদেশবাসী আমাকে তাড়াইয়া না দিলে আমি তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করিতাম না।"

কা'বা-শরীফের চতুর্দিকে যে সীমা-প্রাচীর ছিল, তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। হযরত তৎক্ষণাৎ তাহা মেরামতের ব্যবস্থা করিলেন। ওসমান-বিন্‌-তাল্‌হা ছিলেন কা'বা-শরীফের চাবি-রক্ষক। হযরত তাল্‌হাকে ডাকিয়া কা'বার চাবি পুনরায় তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিলেন। হামজা ছিলেন জমজমের পানি সরবরাহের কর্তা; হযরত তাঁহাকেই সেই পদে বহাল রাখিলেন।

এইসব ছোটখাটো অনেক ব্যাপারের মধ্য দিয়া হযরতের সহৃদয়তা কোরেশদিগের অন্তর স্পর্শ করিল। তাহারা বুঝিল, হযরত মক্কাকে তাহাদের মতই ভালবাসেন এবং কাহারও সম্মান বা প্রতিপত্তি নষ্ট করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়।

সুযোগমত হযরত মক্কাবাসীদিগকে লইয়া এক সভা করিলেন। সেই সভায় তিনি এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিলেন। কোরেশদিগকে সাম্য, মৈত্রী ও একতার বাণী শুনাইলেন। বলিলেন: হে কোরেশগণ, অতীত যুগের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা মন হইতে মুছিয়া ফেল। কৌলিন্যের গর্ব ভুলিয়া যাও। সকলে এক হও। সকল মানুষই সমান—এ কথা বিশ্বাস কর। আল্লাহ্‌ বলিতেছেন:

> "হে মানব, আমি তোমাদের সকলকেই (একই উপাদানে) স্ত্রী-পুরুষ হইতে সৃজন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন গোত্রে ও শাখায় পৃথক করিয়াছি—যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার।"

এইরূপে সকল গ্লানি ও সকল মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়া

হযরত কোরেশ-জাতির অন্তরে দিলেন এক নূতন ইস্‌ম্‌-ই-আযম্‌; সকল ভেদজ্ঞান দূর করিয়া প্রাণে প্রাণে দিলেন এক অভিনব প্রেমের বন্ধন। বক্ষে দিলেন নূতন আশা, কণ্ঠে দিলেন নূতন ভাষা, বাহুতে দিলেন নূতন বল, নয়নে দিলেন নূতন স্বপ্ন। এক নূতন মহাজাতির বীজ আরবের মরুবক্ষে সেদিন প্রোথিত হইল।

পরিচ্ছেদ : ৫৪

হোনায়েন ও তায়েফ অভিযান

মক্কা-বিজয়ের পর হযরত রসুলে-করিমকে আরও কয়েকটি অভিযানে যোগদান করিতে হইয়াছিল।

হাওয়াজিন নামক একটি শক্তিশালী বেদুঈন গোত্র বহুদিন হইতে হযরতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিল। মক্কার দক্ষিণ-পূর্বদিকে তায়েফের নিকটবর্তী একটি পার্বত্য অঞ্চলে ছিল তাহাদের বসতি। নানা প্রশাখায় ইহারা পল্লবিত হইয়া ছিল। কোরেশদিগের ন্যায় ইহারাও ছিল পৌত্তলিক। মক্কা-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত নানাভাবে ইহারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে হযরতের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। এতদিন মক্কা ছিল কোরেশদিগের হাতে, তাই তাহারা নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিত। কিন্তু যখন দেখিল, মুহম্মদ মক্কা জয় করিয়া লইয়াছেন এবং কোরেশ ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহারা বিপদ গণিল। মুসলিমগণ তাহাদিগকেও আক্রমণ করিতে পারে, এই আশংকায় তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া হযরতের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আয়োজন করিল।

তায়েফের বনি সকিফ্ গোত্রও হাওয়াজিনদিগের সহিত যোগ দিল। এক বিরাট শক্তিশালী অভিযান রচনা করিয়া তাহারা হযরতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল।

সংবাদ শুনিয়া হযরত তাড়াতাড়ি মক্কা হইতে সদলবলে বহির্গত হইলেন। দেড় হাজার মদিনাবাসীর সহিত এবার দুই হাজার নবদীক্ষিত কোরেশ বীরও যোগ দিল। বলা বাহুল্য এই দলের মধ্যে আবুসুফিয়ান প্রমুখ কোরেশ নেতৃবৃন্দও ছিলেন। কী অপূর্ব পরিবর্তন। সারাজীবন যিনি পৌত্তলিক-দিগের নেতারূপে হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই আজ হযরতের ভক্তরূপে পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চলিলেন।

মা'জ-বিন্ জাবাল নামক জনৈক কুরআন-বিশারদ তরুণ মদিনাবাসীকে হযরত তাঁহার অবর্তমানে মক্কার মু'আল্লিম নিযুক্ত করিলেন। আত্তাব নামক আর একজন তরুণ কোরেশ-মুসলিমকে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল।

মক্কা হইতে দলে দলে মুসলিম সৈন্য বিচিত্র পতাকা উড়াইয়া কুচ করিয়া চলিল। এই দৃশ্য দেখিয়া মুসলিম সেনাদল মনে মনে একটু গর্বিত হইয়া উঠিল। চার-পাঁচ হাজার শত্রুর বিরুদ্ধে বারো হাজারের এই অভিযান। জয় তো সুনিশ্চিত!

কিন্তু আ'লীমুল-গায়িব আল্লাহ্ বুঝি অলক্ষ্য হইতে এ কথা শুনিতে পাইয়া তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। জয়-পরাজয়ের মালিক তো মানুষ নয়। আল্লার হুকুম না হইলে মানুষের সাধ্য কী যে কিছু করে! আল্লার ইচ্ছার সহিত যুক্ত না হইলে মানুষের সব আশা, ভরসা, সব শক্তি, সব অহংকার ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। মুসলমানগণ কি তাহা তখনও শিখে নাই? না শিখিয়া থাকিলে, তাহাদিগকে ইহা শিখাইতে হইবে।

'হোনায়েন' নামক উপত্যকায় পৌঁছিয়া মুসলমানগণ রাত্রিযাপন করিল।

ইহার কিছু দূরেই 'আওতাস' নামক স্থানে হাওয়াজিন সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, মুসলমানগণ হোনায়েনে পৌঁছিয়াছে, তখন তাহারা প্রস্তুত হইয়া পথের ধারের পর্বতগুলিতে আত্মগোপন করিয়া রহিল।

পরদিন ভোরবেলা মুসলিম সৈন্য হোনায়েন ত্যাগ করিয়া চলিল। চিত্ত তাহাদের ভাবনাহীন, গতি তাহাদের নিঃশংক নিরংকুশ। সহসা পথের দুইধার হইতে হাওয়াজিনগণ মুসলমানদিগকে অতর্কিত আক্রমণ করিল। বৃষ্টিধারার ন্যায় তাহাদের উপর তীরবর্ষণ হইতে লাগিল। ভীষণ বিপদ! অপ্রস্তুত ও অসতর্ক অবস্থায় কী করিবে তাহারা? দিশাহারা হইয়া তখন সকলে যে-যেদিকে পারিল, পলাইতে আরম্ভ করিল।

মুসলমানদিগের সকল অহংকার পথের ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদিগকে যে হীন লজ্জাস্কর পরাজয় বরণ করিতে হইবে, স্বপ্নেও তাহারা ভাবে নাই। এতদিন সংখ্যায় অল্প হইয়া বহুসংখ্যক শত্রুসেনাকে জয় করিবার অভিজ্ঞতাই তাহারা অর্জন করিয়াছে, কিন্তু সংখ্যাধিক্যের মধ্যে যে শক্তি নাই—এ সত্য তাহারা কোনদিনই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে নাই। আজ গর্বস্ফীত মুসলমান নিজে ঠেকিয়া সেই সত্য হৃদয়ংগম করিল। তাহারা পরিষ্কার বুঝিল, অল্পসংখ্যক হইলেই যে মানুষ পরাজিত হয়, তাহাও যেমন সত্য নয়; অধিকসংখ্যক হইলেই যে জয়লাভ করা যায় তাহাও তেমনি সত্য নয়।

হযরত সবার পিছনে 'দুলদুলের' উপর সওয়ার হইয়া আসিতেছিলেন। মুসলমানদিগের এই দুর্গতি দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন : "কোথায় চলিয়াছ ? ফিরিয়া দাঁড়াও। এই যে আমি এখানে।" হযরতের পার্শ্বেই ছিলেন আব্বাস। তিনিও উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া ফিরাইতে লাগিলেন। মুসলমানগণ আত্মস্থ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

তখন আবার নূতন ব্যূহ রচিত হইল। প্রচণ্ডবেগে মুসলমানগণ হাওয়াজিনদিগকে আক্রমণ করিল। হাওয়াজিন সেনা বেশিক্ষণ সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না; রণে ভংগ দিয়া তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এমনভাবে তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল যে, রসদপত্র তো দূরের কথা, নিজেদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগকেও সংগে লইয়া যাইতে পারিল না। বহু সংখ্যক উট ছাগ ও মেষ এবং বহু পরিমাণ রৌপ্য মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। কয়েক হাজার সৈন্য ও নরনারীও বন্দী হইল।

এইখানে ওহদ-যুদ্ধের কথা স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে। ওহদ এবং হোনায়েন—দুইটিই মুসলমানদিগের দারুণ শিক্ষাক্ষেত্র। ওহদে তাহারা জয়ী হইয়া পরমুহূর্তেই পরাজিত হইয়াছেন; হোনায়েনে তাহারা পরাজিত হইয়া পরমুহূর্তেই জয়ী হইয়াছে। ভাগ্যচক্রের উত্থান-পতনে নিজেকে কেমন করিয়া সামলাইয়া লইতে হয়, উভয়ক্ষেত্রেই মুসলমানেরা তাহা ভাল করিয়াই শিখিয়াছে। ওহদে শিখিয়াছে নেতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করিবার শোচনীয় পরিণাম, হোনায়েনে শিখিয়াছে অহংকার করিবার মারাত্মক কুফল। মুসলমানদিগের ঈমানের পরীক্ষাও এই দুই স্থানে ভীষণভাবে হইয়া গিয়াছে। মুহম্মদ যে সত্যসত্যই আল্লাহ্ প্রেরিত রসূল, আল্লাহ্ যে তাঁহার নিত্য-সহচর এবং পরম সম্পদে-বিপদে আলোকে-আঁধারে তিনি যে তাঁহাকে চালনা করিতেছেন, তাঁহার সাহায্য এবং করুণা ব্যতীত কোন কিছুই যে সম্ভব নয়, এ সত্য উভয় স্থানে সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে। হোনায়েনের যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের যে-আয়াত নাজিল হয়, তাহাতেও আল্লাহ্ এই কথাই বলিতেছেন :

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে বহু যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন—বিশেষ করিয়া হোনায়েনের যুদ্ধক্ষেত্রে, যখন তোমরা তোমাদের সংখ্যা দেখিয়া গর্বিত হইয়াছিলে। কিন্তু সংখ্যাবহুলতা তোমাদিগকে একটুও উপকার করেন নাই; এই বিশাল পৃথিবী তোমাদের কাছে তখন অত্যন্ত সংকীর্ণবোধ

হইয়াছিল। কাজেই তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গিয়াছিলে। তারপর আল্লাহ্ তাঁহার পয়গম্বরের উপর এবং বিশ্বাসীদিগের উপর করুণা বর্ষণ করিলেন এবং অগণিত সৈন্য (ফিরিশ্তা) পাঠাইলেন—তাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই—এবং তোমাদের দ্বারা তিনি অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তিদান করিলেন। এবং ইহা অবিশ্বাসীদিগের যোগ্য পুরস্কার।" —(৯ : ২৫-২৬)

হাওয়াজিনগণ পালাইয়া গিয়া তায়েফ নগরে আশ্রয় লইল।

আল্ হিজ্জারা নামক উপত্যকায় বন্দী ও লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া হযরত তায়েফ অবরোধ করিলেন। তায়েফের দুর্গ তখনকার দিনে খুব সুরক্ষিত ছিল। সুদক্ষ তীরন্দাজ বলিয়া তায়েফীদিগের সুনাম ছিল, তাছাড়া তাহারা একপ্রকার আগ্নেয় অস্ত্রেরও ব্যবহার জানিত। দুর্গ-মধ্য হইতে তায়েফী সৈন্য তীর এবং অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু মুসলমানদিগের তাহাতে বিশেষ কোনই ক্ষতি হইল না—তাহারা একটু দূরে সরিয়া রহিল। তবে ইহাও সত্য যে, এই অগ্নিবাণের ভয়ে তাহারা দুর্গ আক্রমণ করিতেও পারিল না।

দুই সপ্তাহ যাবত মুসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল; ইহা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিল না। দুর্গের চতুর্দিকে অসংখ্য আঙুর বাগের অবস্থান হেতু তায়েফীদিগের বেশ সুবিধা হইয়াছিল; আবরণের আড়ালে থাকিয়া তাহারা তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। হযরত এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য দ্রাক্ষাকুঞ্জ কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। এমন মূল্যবান সম্পদ নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া তায়েফ-নেতাগণ বিচলিত হইয়া পড়িল। হযরতের নিকট দূত পাঠাইয়া এই কার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য তাহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিল। হযরত বিনাসর্তে তাহাদের এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তবে নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন: "তায়েফ-নগরে যে সমস্ত ক্রীতদাস আছে, তাহারা যদি বাহিরে আসিয়া মুসলমানদিগের সহিত যোগ দেয়, তবে তাহারা মুক্ত।"

এই ঘোষণা-বাণীতেও তায়েফ-নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অনেক ক্রীতদাসই পালাইয়া হযরতের শিবিরে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইসলামের গুপ্ত শক্তি তায়েফবাসীদের অন্তরে এই প্রথম ক্রিয়া করিল।

অবরোধে কোনই ফল হইবে না দেখিয়া হযরত অবরোধ তুলিয়া লইয়া

হিজরায় ফিরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন অবরোধই শত্রুজয়ের একমাত্র পন্থা নহে। বন্ধন দিয়া যাহাদিগকে ধরা গেল না, মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে ধরিতে হইবে।

হিজরায় ফিরিয়া আসিতেই একটি ব্যাপার ঘটিল। বন্দীদিগের মধ্য হইতে জনৈক বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া একজন দেহরক্ষী সৈন্য হযরতের নিকটে আসিয়া বলিল: "হযরত, এই বৃদ্ধা বলিতেছে, আপনি তাঁর দুধ-ভাই। সত্য কি?"

হযরত দেখিলেন, এই বৃদ্ধা সত্যসত্যই শায়েমা—শৈশবে যাঁহার কোলে তিনি চড়িয়া বেড়াইয়াছেন। হযরত অমনি শায়েমার বন্ধন মুক্ত করিবার আদেশ দিলেন; তারপর আদর করিয়া তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন এবং সংগে করিয়া মদিনায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু শায়েমা তাহাতে রাজী হইলেন না। তখন হযরত তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন সহ আপন আত্মীয় স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া হাওয়াজিনদিগের মনে খুব আশার সঞ্চার হইল। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তাহারা হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। তাহারা আসিয়া বলিল: "এই বন্দীদিগের মধ্যে আপনার দুধ-ভাই, দুধ-ভগিনী এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে। ছোট বেলায় আপনাকে আমরাই লালন-পালন করিয়াছিলাম। এখন আপনি কত উচ্চ, আর আমরা কত তুচ্ছ! অতীতের কথা মনে করিয়া আজ আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন।"

হযরত এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। বলিলেন: "তোমরা কোন্‌টি ফিরাইয়া চাও। স্ত্রীপুত্রদিগকে, না তোমাদের ধন-সম্পদকে?"

দূতগণ বলিল: "স্ত্রীপুত্রদিগকে। স্ত্রীপুত্রের বিনিময়ে আমরা অন্য কিছু চাহি না।"

হযরত বলিলেন: "আগামীকল্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আজ আর কিছুই বলিব না।"

পরদিন দূতগণ আবার হযরতের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত মুসলমানদিগকে ডাকিয়া বলিলেন: "ইহাদের নিকট আমি চিরঋণী; আমার ইচ্ছা, বন্দীদিগকে বিনাপণে মুক্তি দেই। তোমাদের মত কি?"

হযরতের ইচ্ছায় কেহই বাধা দিল না। সমুদয় বন্দী নরনারী বিনাপণে, বিনাসর্তে মুক্তিলাভ করিল।

এই মুক্তিদানের ফল কী হইল, কৌতূহলী পাঠক তাহা লক্ষ্য করিতে থাকুন।

যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি হযরত সৈন্যদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। এবার মদিনাবাসীদিগকে কিছুই দিলেন না; সমস্তই মক্কার নবদীক্ষিত কোরেশ সৈন্যদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। মদিনাবাসীদিগের মধ্যে অনেকে ইহাতে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু হযরত সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন: "কোরেশগণ সারাজীবন আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইহপরকাল উভয়দিক দিয়াই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; কাজেই তাহাদের প্রতি আমি এই অনুগ্রহটুকু দেখাইতেছি। আর এই অনুগ্রহ এমন কী-ই বা বেশি! ছাগল-ভেড়া লইয়া ইহারা ফিরিয়া যাইবে, আর তোমরা আল্লার রসুলকে লইয়া দেশে ফিরিবে।"

মদিনাবাসী এই উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা আশংকা করিতেছিলেন, হযরত বুঝি বা এখন হইতে মক্কার কোরেশদিগের সংগে বাস করিবেন। কিন্তু এই ঘোষণার পর সকলের মন হইতে সেই অমূলক আশঙ্কা দূর হইয়া গেল।

একদিন হযরতের মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া হাওয়াজিন-নেতা 'মালিক' আর স্থির থাকিতে পারিল না; হযরতের নিকট আসিয়া সদলবলে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিল। শুধু তাই নয়, যে-তায়েফবাসীদিগের সঙ্গে মিশিয়া এতদিন তাহারা হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, এইবার সেই তায়েফবাসীদিগের বিরুদ্ধেই তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। দিনে দিনে এমন হইল যে, তায়েফবাসীদিগের ঘরের বাহির হওয়া অথবা পশুচারণ করা দায় হইয়া উঠিল। মুসলিম সৈন্যদ্বারা তায়েফ-দুর্গ অবরোধ অপেক্ষা তায়েফবাসীদিগের আপন লোক দ্বারা এ-অবরোধ অধিকতর কৌতূহলপূর্ণ নহে কি?

তারপর কী হইল? একটু পরেই বলিতেছি।

পরিচ্ছেদ : ৫৫

তাবুক-অভিযান ও অন্যান্য ঘটনা

নবম হিযরী পড়িল।

এই হিযরীর প্রধান সামরিক ঘটনা তাবুক-অভিযান। হযরতের জীবনে ইহাই শেষ যুদ্ধ-বিগ্রহ।

মদিনায় ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পর হযরত জানিতে পারিলেন, রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে আরবদেশ জয় করিবার বাসনা রোম-সম্রাটদিগের মনে জাগিয়া ছিল। কিন্তু কোনদিনই তাঁহাদের সে-সাধ পূর্ণ হয় নাই। সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবার নূতন করিয়া এই আরব-জয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। মূতা-অভিযানের অকৃতকার্যতা তাঁহার মনের সংকল্পকে আরও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিল। এবার অধিকতর ব্যাপকভাবে তিনি এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

সমস্ত সিরিয়া প্রদেশ হইতে অসংখ্য সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। সৈন্যদিগের এক বৎসরের বেতন অগ্রিম দেওয়া হইল। লাখম, জুজাম, গাসান প্রভৃতি গোত্রও রোমানদিগের সহিত যোগ দিল।

কিছুদিনের মধ্যেই হযরত জানিতে পারিলেন, বিরাট বাইজানটাইন বাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য যাত্রা করিয়াছে এবং তাঁহাদের অগ্রগামী সেনাদল 'বেল্‌কা' পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া হযরত মুসলমানদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। এবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন—রোমানদিগকে বাধা দিবার জন্য সিরিয়াতে অভিযান করিতে হইবে।

একে তো গ্রীষ্মকাল, তাহাতে পথ অতি দীর্ঘ ও বন্ধুর। কিন্তু ইসলামের অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের মনে কোনই দুর্বলতা নাই। হযরতের আদেশ শ্রবণমাত্রই তাঁহারা যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

হযরতও এবার বিরাটভাবে আয়োজন করিলেন। মক্কা-জয়ের পর আরবের বহু গোত্র তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। হযরত সকলকেই সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। দলে দলে লোক

আসিয়া সৈন্য-শ্রেণীতে ভর্তি হইতে লাগিল। প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইল, তন্মধ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী।

এতবড় বিরাট বাহিনীকে রক্ষা ও চালনা করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সে অর্থ কোথায়?

হযরত অর্থের জন্যও ভক্তবৃন্দের নিকট আহ্বান পাঠাইলেন। এ আহ্বান বিফল হইল না। আল্লার নামে—ইসলামের নামে—ভক্তগণ অকাতরে অর্থ-সাহায্য করিতে লাগিলেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য! কে কত দান করিতে পারে, তাহারই যেন পাল্লা চলিতে লাগিল। ওমর নিজের যাবতীয় সম্পত্তিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ আনিয়া হযরতের চরণে উপহার দিলেন। যে কোন সদানুষ্ঠানে দান করিবার জন্য আবু-বকরের খ্যাতি সর্বজনবিদিত ছিল। ওমর ভাবিলেন এইবার বুঝি তাঁহার দানই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিন্তু তাহা হইল কৈ! দানবীর আবুবকর তাঁহার যথাসর্বস্ব আনিয়া হযরতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন: "তোমার পরিবারবর্গের জন্য কী রাখিয়া আসিলে?" ভক্তকুলশিরোমণি অম্লান-বদনে উত্তর দিলেন: "আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলকে।"

ওসমানের দানও সামান্য নয়। তিনি দিলেন এক সহস্র উট, সত্তরটি অশ্ব এবং এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

হায়! এই মুসলমানদিগের বংশধরই কি আমরা! আজ ইসলামের জন্য—জাতির জন্য—কল্যাণ-কর্মের জন্য মুসলমানের অর্থাভাব! কিন্তু সত্যিকার অর্থাভাব তো এ নয়। দানের অভাব নয়—প্রাণের অভাব। প্রাণ শুকাইয়া গেলে মানুষের এই দশাই ঘটে। হস্ত তখন দান করিতে চাহে না।

সংগৃহীত অর্থ দ্বারা হযরত যথাসাধ্য সাজ-সরঞ্জাম ও রসদপত্র ক্রয় করিলেন। তবু অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে বহু মুসলমানকে সৈন্য-শ্রেণীতে ভর্তি করা গেল না। স্বদেশ ও স্বধর্মের এই চরম দুর্দিনে তাঁহারা যে কোন কাজেই আসিলেন না, এই খেদে তাঁহারা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহাদের ব্যবস্থা হইয়া গেল। যুদ্ধের পোশাক ও অস্ত্র কোনরূপে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল। সকলে তখন বিসমিল্লাহ বলিয়া রওয়ানা হইলেন।

চল্লিশ হাজার মুসলিম-বীরের এই বিশাল বাহিনী যখন নিশান উড়াইয়া কাতারে কাতারে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন একটা দেখিবার মত দৃশ্য হইল বটে! এতবড় বিপুল বাহিনী মুসলমানগণ ইহার পূর্বে আর কখনো বাহির করিতে পারে নাই।

বীরবর আলি এবার অভিযানে যোগ দিতে পারিলেন না। মদিনারক্ষার জন্য হযরত তাঁহাকে রাখিয়া গেলেন।

বহু ক্লেশ স্বীকার করিবার পর হযরত সকলকে লইয়া সিরিয়ার তাবুক নামক প্রান্তরে উপনীত হইলেন।

মুসলমানদিগের এই বিপুল সমরায়োজন দেখিয়া তথাকার খৃষ্টান দলপতি-দিগের চমক ভাঙিল। এতদিন তাহারা হযরতের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে একটা হীন ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। এখন দেখিল লোকবলে ও শৌর্যবীর্যে ইনি তো কম নন! রোমের রাজকীয় বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার মত শক্তি, সাহস ও যোগ্যতা যে ইঁহার আছে, এইবার তাহা সকলে উপলব্ধি করিল। রোম-সম্রাটকে তাহারা এ কথা জানাইয়া যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিল।

চল্লিশ হাজার মুসলিম বীরের সহিত যুদ্ধ করা সোজা নয়। চল্লিশ হাজার সৈন্য যদি এই যুদ্ধে আসিতে পারে, তবে কমপক্ষে আরও বিশ হাজার সৈন্য তাঁহার রক্ষিত আছে। যে-ব্যক্তির অংগুলি-সংকেতে অর্ধ লক্ষেরও বেশী লোক অকাতরে প্রাণ দিতে পারে, সে-ব্যক্তির শক্তি নিশ্চয়ই তুচ্ছ নয়। তাঁহার সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিতে যাওয়া নিছক আহাম্মুকি। ইহাই ভাবিয়া হিরাক্লিয়াস ভীত ও সংকুচিত হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধসাধ তাঁহার মিটিয়া গেল। সৈন্যদিগকে লইয়া অচিরে তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রোমানদিগের পৃষ্ঠপ্রদর্শনের পর তাবুক ও তৎপার্শ্ববর্তী খৃষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায় খুব ভীত হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ তাহারা হযরতের নিকটে আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল; অনেকে মুসলমান হইয়া গেল। হযরত ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে পরাজিত বা নিহত করিয়া তাহাদের দেশ ও ধনদৌলত অধিকার করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু সেরূপ কোন দুরভিসন্ধি তো তাঁহার ছিল না। শান্তি ও সত্যপ্রচারই ছিল বিশ্বনবীর প্রধান কামনা।

তাবুক হইতে ফিরিয়া আসিবার পর চতুর্দিক হইতে হযরতের নিকট শান্তির প্রস্তাব আসিতে আরম্ভ করিল। বিভিন্ন গোত্র প্রতিনিধি পাঠাইয়া হযরতের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিল। বনি-তামিম, বনি-মুস্তালিক, বনি-কিন্দা, বনি-আজাদ, বনি-তাঈ প্রভৃতি বহু গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিল। আরবের সুপ্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাই-এর পুত্র আদি-ইবনে-হাতেম এই সময় মুসলমান হন। হাতেম তখন জীবিত ছিলেন না; থাকিলে তিনিও যে হযরতের চরণ-শরণ লইতেন সে কথা অনায়াসে বলা যায়।

বিখ্যাত কোরেশ-কবি কা'ব-ইবনে-জোহায়েরও এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। মক্কা-বিজয়ের পর কা'বের ভ্রাতা ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরতের সহিত মদিনায় প্রস্থান করেন। তথা হইতে এক পত্র লিখিয়া কা'বকেও ইসলাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু কা'ব তদুত্তরে অশিষ্ট ভাষায় ইসলাম ও হযরত মুহম্মদকে গালাগালি দিয়া এক পত্র লিখেন। হযরত তাহা জানিতে পারিয়া কা'বের উপর রুষ্ট হন। অবশেষে কা'বের মতি পরিবর্তিত হয়। তিনি তখন অনুতপ্ত হইয়া হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বদ্ধপরিকর হন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি একদিন সহসা মদিনার মসজিদে উপস্থিত হইয়া হযরতকে সম্বোধন করিয়া বলেন: "কবি কা'ব অনুতপ্ত হইয়া আপনার চরণে শরণ লইতে চায়। যদি অনুমতি করেন, তাহাকে লইয়া আসি।" হযরত সম্মতি দিলেন। তখন কা'ব বলিলেন: "হযরত, আমিই সেই অধম কবি।" এই বলিয়া হযরতের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইলেন।

এই ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কা'ব সেইখানেই হযরতের উদ্দেশ্যে একটি 'নাতিয়া' রচনা করিয়া পাঠ করিলেন। তাহার শেষ দুইটি চরণ এইরূপ:

"তুমি নূর, ঘুচায়েছ তুমি সারা বিশ্বের আঁধার
আল্লার হাতের তুমি জ্যোতির্ময় মুক্ত তলোয়ার।"

এই নাতিয়া শ্রবণে হযরত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ কবিকে আপন উত্তরীয় (খিরকা) দান করিলেন।

এই মহামূল্য সম্পদ কবি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কা'বের মৃত্যুর

পর উত্তরীয়খানি খলিফাদিগের অধিকারভুক্ত হয় এবং পুরুষানুক্রমে উহা সাম্রাজ্যের পবিত্র বস্তুরূপে সমাদর লাভ করে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, তাতারীদিগের বাগদাদ আক্রমণের ফলে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

প্রসিদ্ধ বীর তারেকও এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

নজরান প্রদেশের আরব, খৃষ্টানগণও এই সময়ে হযরতের বশ্যতা স্বীকার করে। মুগীরা নামক জনৈক ভক্তকে হযরত প্রথম নজরানে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। তিনি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে হযরত জনৈক দূত-মারফৎ নজরানের বিশপকে এক পত্র লিখিয়া পাঠান। এই পত্র পাইয়া বিশপ বিচলিত হইয়া পড়েন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ৬০ জন পাদ্রীর এক প্রতিনিধি-সঙ্ঘ মদিনায় পাঠাইয়া দেন।

আসরের নামাজের পর খৃষ্টান-সঙ্ঘ মদিনার মসজিদে আসিয়া উপনীত হইলেন। ক্রমে খৃষ্টানদিগের সান্ধ্য উপাসনার সময় উপস্থিত হইল; তাঁহারা সেই মসজিদেই উপাসনা করিবার অনুমতি চাহিলেন। এদিকে মুসলমানদিগেরও মাগরিবের নামাযের সময় সমাগত। কাজেই সাহাবাদিগের অনেকেই খৃষ্টানদিগের সেই প্রস্তাবে আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু হযরত সে আপত্তি শুনিলেন না; পবিত্র মসজিদুন্নবীর ভিতরেই তিনি খৃষ্টান পাদ্রীদিগকে উপাসনা করিবার অনুমতি দিলেন। পাদ্রীরা পূর্বদিকে মুখ করিয়া খৃষ্টান প্রথায় তাঁহাদের উপাসনা করিতে লাগিলেন; আর মুসলমানেরা কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজেদের নামায সমাধা করিলেন। খৃষ্টান পাদ্রীগণ হযরতের এই মহানুভবতা ও উদারতা দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন।

ধর্মসংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনার পর খৃষ্টান দূতগণ আন্তর্জাতিক আরব-গণতন্ত্রের সভ্য হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং ইহার জন্য হযরতের উপরেই সর্ত নির্ধারণের ভার দিলেন। খৃষ্টানগণকে কি পরিমাণ কর দিতে হইবে তাহা সাব্যস্ত হইয়া গেল। তখন হযরত নজরানের অধিবাসীবৃন্দের নামে নিম্নলিখিত সনদ দান করিলেন:

"নজরানের পাদ্রী, পুরোহিত ও সাধারণ নাগরিকদিগের প্রতি—

আল্লার নামে তাঁহার রসুল মুহম্মদ এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, সর্বপ্রকার সম্ভবপর চেষ্টা দ্বারা আমরা তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিব;

তাহাদের দেশ, তাহাদের জীবন ও ধনসম্পদ অক্ষুণ্ণ থাকিবে; তাহাদের ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না; কোন ধর্মযাজক বা পুরোহিতকে পদচ্যুত করা হইবে না; কোন সন্ন্যাসীর সাধনায় ব্যাঘাত জন্মান হইবে না; তাহাদের দেশের মধ্য দিয়া সৈন্যচালনা করা হইবে না; যে পর্যন্ত তাহারা শান্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে, সে পর্যন্ত এই সনদের সর্ত সমানভাবে বলবৎ থাকিবে।"

খৃষ্টানগণ এই সনদপত্র সহ দেশে ফিরিয়া গেলেন। আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া এবং হযরতের মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া তথাকার প্রধান বিশপের এক ভ্রাতা বেশর সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন: "ইনিই সেই প্রতিশ্রুত মহানবী, আমি তাঁহার নিকট চলিলাম।" এই বলিয়া যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি মদিনায় আসিয়া হযরতের নিকট হইতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নজরানের আর একজন সন্ন্যাসীও এযাবত তপস্যা-মগ্ন ছিলেন, প্রতিনিধিদিগের মুখে শেষ-পয়গম্বরের বিষয়ে জানিতে পারিয়া তিনিও দেওয়ানা হইয়া দেশত্যাগী হইলেন এবং সত্বর হযরতের খিদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে নজরান অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়াইয়া পড়িল।

তায়েফ হইতে অবরোধ উঠাইয়া আনিবার পর তায়েফবাসীদিগের ভাগ্যে কি ঘটিল? এইবার তাহা বলি। এক আশ্চর্য উপায়ে তাহাদের মধ্যে পরিবর্তন আসিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে ওরওয়া নামক জনৈক তায়েফ-প্রধান হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, পাঠকের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। সেই ওরওয়া এখন মদিনায় আসিয়া হযরতের নিকট ইসলাম গ্রহণ করিলেন। শুধু তাই নয়, যে-আবে-কওসর্ তিনি নিজে পান করিলেন, দেশবাসীকেও তাহা পান করাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। হযরতকে বলিলেন: "হযরত, যদি অনুমতি করেন, তবে তায়েফে ফিরিয়া গিয়া আমার দেশবাসীদিগের মধ্যেও আমি ইসলাম প্রচার করি।" হযরত বলিলেন: "খুব ভাল কথা, কিন্তু আমার সন্দেহ হইতেছে, তোমার স্বজাতীয়েরা তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।" ওরওয়া বলিলেন: "দেশবাসীরা আমাকে খুব ভালবাসে, আশা করি তাহারা আমার কথা শুনিবে। আর যদি তাহারা আমাকে মারিয়াই ফেলে,

তাহাতেই বা দুঃখ কী ? সত্যের জন্য হাসিমুখে আমি সে-মরণ বরণ করিব।"

ওরওয়া তায়েফ যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার সময় গৃহে পৌঁছিয়াই তিনি তাঁহার ইসলাম-গ্রহণের কথা দেশবাসীর নিকট ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং সকলকেই সত্যপথে আসিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। শুনিয়াই লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পরদিন প্রত্যুষে তিনি ছাদের উপর উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে আযান দিতে আরম্ভ করিলেন। এইবার সকলের ধৈর্যের বাঁধ টুটিল। নাগরিকেরা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একটি তীর তাঁহার বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। আল্লার নাম করিতে করিতে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং একটু পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলিয়া গেলেন: "হে আমার দেশবাসী, তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি এই রক্ত দান করিলাম। বন্ধুগণ, তোমাদের ঈমান আসুক। বিদায় !!"

ওরওয়ার মৃত্যু-সংবাদ যখন হযরতের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। ওরওয়ার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন: "ওরওয়াকে নবী আল্-ইয়াসিনের সংগে তুলনা করা যায়। ইয়াসিন লোকদিগকে আল্লার নামে আহ্বান করিতে গিয়া তাহাদের হস্তেই নিহত হইয়াছিলেন।"

ওরওয়ার রক্তদান বাস্তবিকই বিফলে গেল না। অনেকের মনেই কল্যাণ-জিজ্ঞাসা জাগিল; অনেকেই মনে মনে তাঁহার মত ও পথ অনুসরণ করিল। তায়েফবাসীরা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়িল।

এদিকে আর এক কাণ্ড ঘটিল। যে-হাওয়াজিন গোত্রের সহিত মিতালি করিয়া তায়েফবাসীরা হযরতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, সেই হাওয়াজিন গোত্রই এখন তাহাদের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। ইসলাম গ্রহণের পর তাহারা প্রতিনিয়ত তায়েফবাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। দিনে দিনে এমন হইল যে, তায়েফীদের ঘরের বাহিরে আসা অথবা ছাগ-মেষাদি মাঠে চরান দায় হইয়া উঠিল। ভিতর-বাহির দুই দিক হইতেই এইরূপ চাপে পড়িয়া তাহারা বিব্রত হইয়া পড়িল। শান্তি স্থাপনের জন্য বাধ্য হইয়া তাহারা হযরতের নিকটে দূত পাঠাইল। ছয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই কার্যের জন্য মনোনীত হইলেন।

প্রতিনিধিগণ মদিনায় পৌঁছিলে হযরত তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ

করিলেন। পৌত্তলিক জানিয়াও মসজিদ-প্রাংগণে তাঁহাদের স্থান দিলেন। কয়েকদিন যাবত তাঁহারা হযরতের নিকট ইসলামের তত্ত্বকথা শুনিলেন। মুসলমানদিগের নামায-পড়া দেখিলেন এবং তাঁহাদের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিলেন। তারপর এক শুভ মুহূর্তে সকলে হযরতের হাতে হাত রাখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের এত সাধের দেবমূর্তিগুলির কী হইবে? ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে? সে তো সহজ কথা নয়। তা ছাড়া প্রতিদিন পাঁচবার করিয়া নামায পড়াও তো খুব মুশকিলের ব্যাপার! প্রতিনিধিগণ তাই হযরতকে বলিলেন: "হযরত, তায়েফবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করিবে, সে ভরসা আমরা রাখি। কিন্তু ইসলামের বিধি-নিষেধের সবগুলিই একদিনে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের অনুরোধ, ঠাকুরপ্রতিমাগুলিকে যাহাতে আমরা তিন বৎসর পর্যন্ত রাখিতে পারি এবং যাহাতে নামায পড়ার দায় হইতে মুক্তি পাই, দয়া করিয়া সেই ব্যবস্থা করুন।"

হযরত বলিলেন: "অসম্ভব। ইসলাম ও প্রতিমা এক সংগে থাকিতে পারে না; ইহাদের মধ্যে কোন আপোষ নাই। যে-মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করিবে, সেই মুহূর্তেই তোমাকে পৌত্তলিকতা বর্জন করিতে হইবে। তিন বৎসর তো দূরে থাকুক, এক দিনের—এক মুহূর্তেরও অবসর তোমাকে দেওয়া হইবে না। আর নামাযের কথা বলিতেছ? নামায অপরিহার্য। নামাযই তো ইসলামের প্রাণ। ইহাকে বাদ দিলে আর থাকিল কী? সমস্ত কল্যাণের উৎস-মূল এই নামায। সেই নামায তোমরা বর্জন করিতে চাও?"

প্রতিনিধিগণ শান্ত হইলেন। তবে বলিলেন: "আমাদের সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, আমরা নিজ হস্তেই প্রতিমাগুলিকে ধ্বংস করিতে পারিব। কিন্তু মুশ্‌কিল হইতেছে অশিক্ষিত জনসাধারণ ও স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া। বিশেষ করিয়া 'লাৎ' ঠাকুরের মূর্তি হইতেছে আমাদের প্রধান দেবমূর্তি। তাহাকে ভাঙিতে গেলে লোকেরা কাঁদাকাটি করিবে। কাজেই এ কাজটি আপনাদিগকে করিতে হইবে।"

হযরত তখন দুইজন উপযুক্ত মুসলমানকে প্রতিনিধিদিগের সংগে দিলেন। একজন হইলেন মুগীরা, আর একজন আবুসুফিয়ান। বলা বাহুল্য, ইহারা দুইজনেই ছিলেন তায়েফবাসীদিগের পরম বন্ধু। হায়! এক সময়ে

যাঁহারা দেবমূর্তির রক্ষক ছিলেন, আজ তাঁহারাই সংহারক সাজিলেন। প্রতিমা রক্ষা করিবার জন্য যাঁহারা একসময়ে আল্লার রসুলকে কতল করিতে বাহির হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই চলিলেন সেই রসুলের নির্দেশক্রমে সেই প্রতিমা ধ্বংস করিতে। নিয়তির কী অদ্ভুত পরিহাস!

দেশের ফিরিয়া প্রতিনিধিগণ অধিকাংশ স্বদেশবাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করিলেন। তখন আসিল প্রতিমা-ভংগের পালা। মুগীরা প্রকাণ্ড কুঠার হস্তে সমস্ত প্রতিমা ভংগ করিয়া চলিলেন। লাৎ ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুগীরা যখন 'আল্লাহু আকবর' রবে কুঠার উত্তোলন করিলেন, তখন বহু নরনারী কাঁদিয়া আকুল! ক্রন্দন-রোলের মধ্যে দেবতার পাষাণ-প্রতিমা খান্ খান্ হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

বিখ্যাত খাজরাজ-নেতা আবদুল্লাহ্-বিন্-উবাই-এর পরলোক গমনও এই সময়কার একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও এই পৌত্তলিক নেতা একজন মুনাফিক ছিলেন এবং যদিও তিনি ইহুদী ও অন্যান্য গোত্রের সহিত মিশিয়া বারে বারে হযরতকে বহু দাগা দিয়াছেন, তবুও তাঁহার মৃত্যুতে হযরত সহানুভূতি না দেখাইয়া পারেন নাই। আবদুল্লার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়াই তিনি তাঁহার কাফনের জন্য আপন উত্তরীয় পাঠাইয়া দেন এবং গোরস্তান পর্যন্ত শবাধারের অনুগমন করেন।

আবদুল্লার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মীদিগের বাধাদানের আর কোন শক্তি বা সম্ভাবনাই রহিল না, সকলেই শান্ত ভাব ধারণ করিল।

এদিকে পবিত্র কা'বা-গৃহও পৌত্তলিকতার বিষবাষ্প হইতে চিরতরে মুক্ত হইল।

নবম হিযরীর শেষভাগে যখন হজের সময় আসিল, তখন হযরত খাঁটি ইসলামী প্রথায় হজ শিক্ষা দিবার জন্য আবুবকরের অধীনে মাত্র ৩০০ শত মুসলমানকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। ইহার কিছু পরেই কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইল:

'হে বিশ্বাসীগণ, পৌত্তলিকেরা অপবিত্র, এই বৎসরের পরে তাহাদিগকে আর পবিত্র কা'বা-শরীফে (হজ করিতে) আসিতে দিও না।"—(৯ : ২৮)

তখন কালবিলম্ব না করিয়া হযরত একটি হুকুমনামা সহ আলিকেও মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। হজ সমাপনের পর সমবেত তীর্থযাত্রীদিগের নিকট আলি হযরতের এই ঘোষণা-বাণী পাঠ করিলেন:

"এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, এখন হইতে কোন পৌত্তলিক আর কা'বা-শরীফে হজ করিতে পারিবে না। কা'বা-গৃহে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।"

পৌত্তলিকেরা নীরবে এই আদেশ শ্রবণ করিল। কি করিবে তাহারা? প্রতিকারের শক্তি তো তাহাদের নাই! আকাশ হইতে আলোক যখন নামে, ধরণীর জমাট-বাঁধা অন্ধকার তখন ক্ষুব্ধ চঞ্চল হইয়া বাধা দিতে চায়, কিন্তু পারে কি? নীরবে অন্ধকারকেই বিদায় লইতে হয়। পৌত্তলিকরাও ঠিক সেইরূপ ভাবেই কা'বা হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল।

এইরূপে সর্বদিক দিয়াই ইসলাম জয়যুক্ত হইল। হযরত এখন সত্য-সত্যই বিজয়ী। যে সংগ্রাম বিশ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল, এইবার তাহার চরম অবসান হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের সকল সীমান্তই এখন নীরব। দীর্ঘকাল ধরিয়া চতুর্দিকে যে আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহা নিভিয়া গেল। ঝঞ্ঝা বাদল কাটিয়া গিয়া আকাশে এবার চাঁদ উঠিল। সেই আলোকে স্নান করিয়া ধরণী আবার পুলকিত হইয়া উঠিল!

বিদায়-হজ্জ

দশম হিযরীর অধিকাংশ সময় হযরত বিভিন্ন স্থানে প্রচারক পাঠাইতে এবং বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদিগকে গ্রহণ করিতে ব্যস্ত রহিলেন। অনুগত দেশ ও গোত্রদিগের নিকট কর আদায় করিবারও তিনি ব্যবস্থা করিলেন।

এই বৎসর তাঁহার পারিবারিক জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। হযরতের একমাত্র পুত্র ইব্রাহিম প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ কি ১৮ মাস হইয়াছিল। একমাত্র পুত্রের তিরোধানে হযরত অন্তরে দারুণ আঘাত পাইলেন। মৃত পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নীরবে তিনি অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

ইব্রাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ লাগিয়াছিল। জনসাধারণ ইহাতে মনে করিল, হযরতের পুত্রবিয়োগে প্রকৃতি এই বিমর্ষ ভাব ধারণ করিয়াছে। হযরত যখন এ কথা জানিতে পারিলেন, তখনই ইহার প্রতিবাদ করা সংগত মনে করিলেন। লোকদিগকে ডাকিয়া তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন: "তোমাদের এ ধারণা ভুল। আমার পুত্রবিয়োগের সংগে সূর্যগ্রহণের কোনই সম্বন্ধ নাই। আমার পুত্র মারা না গেলেও ঠিক ঐ সময়েই সূর্যগ্রহণ লাগিত। আল্লার অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে সূর্যগ্রহণ অন্যতম। গ্রহণের সময় তোমরা তাঁহার অসীম কুদরতের কথা চিন্তা করিয়া মুনাজাত করিবে।"

মহামানবের কী গভীর সত্যপ্রীতি। অন্য কোন ভণ্ড তপস্বী হইলে নিজের বুজুর্গী জাহির করিবার এই সুবর্ণ সুযোগ নিশ্চয়ই সে এমন করিয়া নষ্ট করিত না।

দেখিতে দেখিতে দশম হিযরীও শেষ হইয়া আসিল। আবার হজ্জের সময় আসিয়া পড়িল। হযরত এবার হজ্জ করিতে যাইবেন বলিয়া নিয়্যৎ করিলেন। জিলকদ মাসের শেষেই তাঁহার এই অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। সংগে সংগে একটা তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল, দলে দলে মুসলমানেরা হযরতের সহিত হজ্জ করিবার মানসে মক্কায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

হযরত এবার তাঁহার স্ত্রীদিগকেও সংগে লইয়া চলিলেন।

এই হজই হযরতের জীবনের শেষ হজ। কাজেই ইহা 'বিদায়-হজ' নামে পরিচিত।

জিল্‌কদ্ মাসের পঁচিশ তারিখে শিষ্যবৃন্দকে লইয়া যাত্রা করিলেন। অসংখ্য নরনারীর সে কি বিপুল সমারোহ! একত্ব ও সাম্যের সে কী মহনীয় চিত্র! আজ ইতর-ভদ্রে, ধনী-দরিদ্রে, বাদশা-গোলামে কোন প্রভেদ নাই। সকলেই আজ সমান, সকলেরই আজ একই পোশাক, একই পরিচ্ছদ; সকলের মুখে আজ একই বাণী—একই ভাষা, একই স্বপ্ন, একই আশা, একই ধ্যান, একই ধারণা, একই লক্ষ্য, একই বাসনা। মানুষ মাত্রেই যে এক-আদমের সন্তান—বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াও এ-সত্য আজ যেন মূর্তি ধরিয়া দেখা দিল।

পথ হইতেও অসংখ্য মুসলমান এই মহাহজে যোগদান করিলেন। প্রায় দুই লক্ষ মুসলমান সংগে লইয়া হযরত জিল্‌হজ মাসের পাঁচ তারিখে মক্কাশরীফে উপনীত হইলেন।

মক্কার প্রবেশ-দ্বারে পৌঁছিয়াই হযরত কা'বা গৃহকে দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ ভক্তিগদগদ কণ্ঠে দুহাত তুলিয়া মুনাজাত করিলেন: "ইয়া-আল্লাহ্, এই গৃহকে চিরকল্যাণ ও চিরমহিমায় মণ্ডিত কর এবং যাহারাই এখানে হজ করিতে আসিবে, তাহাদের সুখ-শান্তি ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি কর।"

হযরত অতঃপর ভক্তবৃন্দকে লইয়া কা'বা-গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং সাতবার ইহাকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিলেন।

হজের দিন আসিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের—'লাব্বায়েক' ধ্বনিতে কা'বা-প্রাংগণ মুখরিত হইয়া উঠিল। কী বিহিশ্‌তী দৃশ্য আজ! পুতুল নাই, পুরোহিত নাই। আছে সেই সর্বশক্তিমান নিরাকার আল্লাহ্, আর তাঁহার রসুল, আর তাঁহার উম্মৎ! এতদিন আল্লাহ্ তাঁহার রসুল এবং তাঁহার ধর্ম যেখানে নির্বাসিত হইয়াছিল, আজ সেইখানেই উঠিতেছে আল্লার গুণগান, সেখানেই দেখিতেছি মুসলমান, সেখানেই উড়িতেছে ইসলামের বিজয়-নিশান।

হজ সমাপনান্তে হযরত মুসলমানদিগকে লইয়া আরাফতের দিকে চলিলেন। তারপর মীনা-উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া বিশাল জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত খুৎবা (ভাষণ) দান করিলেন:

"হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজ যে-কথা তোমাদিগকে বলিব মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিও। আমার আশংকা হইতেছে, তোমাদের সংগে একত্রে হজ করিবার সুযোগ আমার ঘটিবে না।

হে মুসলিম, আঁধার যুগের সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে ভুলিয়া যাও, নব আলোকে পথ চলিতে শিখ। আজ হইতে অতীতের সমস্ত মিথ্যা সংস্কার, অনাচার ও পাপ-প্রথা বাতিল হইয়া গেল।

মনে রাখিও—সব মুসলমান ভাই-ভাই। কেহ কাহারও চেয়ে ছোট নও, কাহারও চেয়ে বড় নও। আল্লার চোখে সকলেই সমান।

নারীজাতির কথা ভুলিও না। নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের উপর নারীরও সেইরূপ অধিকার আছে। তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিও না। মনে রাখিও—আল্লাকে সাক্ষী রাখিয়া তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ।

সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। এই বাড়াবাড়ির ফলেই অতীতে বহু জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রত্যেক মুসলমানের ধন-প্রাণ পবিত্র বলিয়া জানিবে। যেমন পবিত্র আজিকার এই দিন—ঠিক তেমনই পবিত্র তোমাদের পরস্পরের জীবন ও ধন-সম্পদ।

হে মুসলমানগণ, হুঁশিয়ার! নেতৃ আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিও না। যদি কোন কর্তিত-নাশা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমির করিয়া দেওয়া হয় এবং সে যদি আল্লার কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে চালনা করে, তবে অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিবে।

দাসদাসীদিগের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করিও। তাহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিও না। তোমরা যাহা খাইবে, তাহাদিগকেও তাহাই খাওয়াইবে; যাহা পরিবে, তাহাই পরাইবে। ভুলিও না তাহারাও তোমাদেরই মত মানুষ।

সাবধান। পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদিগকে স্পর্শ না করে। শিরক্ করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা কথা বলিও না, ব্যভিচার করিও না। সর্বপ্রকার মলিনতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিও। চিরদিন সত্যাশ্রয়ী হইও।

মনে রাখিও—একদিন তোমাদিগকে আল্লার নিকটে ফিরিয়া যাইতে

হইবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। বংশের গৌরব করিও না। যে ব্যক্তি নিজ-বংশকে হেয় মনে করিয়া অপর কোন বংশের নামে আত্ম-পরিচয় দেয়, আল্লার অভিশাপ তাহার উপর নামিয়া আসে।

হে আমার উম্মতগণ, আমি যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাক, তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হইবে না। সেই গচ্ছিত সম্পদ কী? তাহা আল্লার কুরআন এবং তাঁহার রসূলের আদেশ।

নিশ্চয় জানিও, আমার পর আর কেহই নবী নাই: আমিই শেষ নবী।

যাহারা উপস্থিত আছে, তাহারা অনুপস্থিত সকল মুসলমানের নিকট আমার এই সকল বাণী পৌঁছাইয়া দিও।......"

হযরতের মুখমণ্ডল ক্রমেই জ্যোতিদীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কণ্ঠস্বর ক্রমেই করুণ ও ভাবগম্ভীর হইয়া আসিল। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনি আবেগভরে বলিতে লাগিলেন: "হে আল্লাহ্, হে আমার প্রভু, আমি কি তোমার বাণী পৌঁছিয়া দিতে পারিলাম? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলাম?"

লক্ষ কণ্ঠে নিনাদিত হইল: "নিশ্চয়! নিশ্চয়!!"

তখন হযরত কাতর কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিলেন: "প্রভু হে, শ্রবণ কর, সাক্ষী থাকো; ইহারা বলিতেছে, আমার কর্তব্য আমি পালন করিয়াছি।" ভাবের আতিশয্যে হযরত নীরব হইয়া রহিলেন। বিহিশ্‌তের জ্যোতিতে তাঁহার মুখ-কমল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

এই সময় কুরআনের শেষ আয়াত নাযিল হইল:

"(হে মুহম্মদ) আজ আমি তোমার দীন্‌কে সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমার উপর আমার নিয়ামৎ পূর্ণ করিয়া দিলাম। ইসলামকেই তোমার ধর্ম বলিয়া মনোনীত করিলাম।" —(৫:৩)

হযরত ক্ষণকাল ধ্যানমৌন হইয়া রহিলেন। বিশাল জনতা তখন নীরব। কিছুক্ষণ পরে তিনি নয়ন মেলিয়া করুণ স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সেই জনসমুদ্রের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন: "বিদায়! বন্ধুগণ বিদায়!!"

একটা অজানা বিয়োগ-বেদনা সবারই হৃদয়ে ছায়াপাত করিয়া গেল।

পরিচ্ছেদ : ৫৭

পরপারের আহ্বান

কার্যশেষে রাজদূত যেমন আপন রাজ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন, হযরতের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই হইল। বিদায়-হজের পর তিনি যেন কেমন বিমনা হইয়া পড়িলেন। মহাসিন্ধুর ওপার হইতে কোন্ যেন বেতার-বার্তা তিনি শুনিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি এ-পারের জরুরী কাজগুলি সারিয়া লইবার জন্য তাই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে একাদশ হিযরীর সফর মাস। হযরতের বয়স তখন ৬৩ বৎসর। মীনাপ্রান্তরে কুরআনের শেষ আয়াত যেদিন নাযিল হইল, সেই দিনই হযরত বুঝিতে পারিয়াছিলেন : তাঁহার কাজ ফুরাইয়াছে ; শীঘ্রই তাঁহাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

এই মহাপ্রস্থানের মহামুহূর্ত তাঁহার জীবনে কখন ঘনাইবে, তাহাও তিনি জানিতেন। আল্লাহ্ পূর্বেই একটি আয়াতে বলিয়া দিয়াছিলেন :

> "যখন আল্লার সাহায্য এবং বিজয় আসিবে এবং তুমি দলে দলে লোকদিগকে আল্লার ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ করিতে দেখিবে, তখন আল্লার গুণগান করিও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিও, কারণ তিনি ক্ষমাশীল।"—(সূরা এজাজা)

বিদায়-হজের প্রাক্কালে অসংখ্য গোত্রকে দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে মিলিত হইতে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, আল্লার সেই সাহায্য ও বিজয় সত্যসত্যই নামিয়াছে, কাজেই তাঁহার বিদায়-সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিয়াছে।

হযরতের সকল কার্যে ও সকল চিন্তায় তাই একটা পরিবর্তন দেখা দিল। বেলা-শেষে সাগরকূলে দাঁড়াইয়া পরপারের দিকে তিনি তাকাইলেন। অস্তপারের দেশে তাঁহার মন উধাও হইয়া গেল। সেই ধ্যান ও সেই স্বপ্ন তাঁহার চোখে নামিল।

হজ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় তাই তিনি ওহুদ প্রান্তরে উপনীত হইয়া শহীদদিগের মাজারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের রুহ্-শাফায়াতের জন্য মুনাজাত করিলেন। মৃত বীরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "হে সমাধি-শায়িতগণ,

তোমাদের আত্মার উপর আল্লার অনন্ত রহ্‌মৎ নাযিল হউক। আমরাও শীঘ্রই তোমাদের সহিত মিলিত হইতেছি।"

মদিনায় পৌঁছিয়াও হযরত একদিন নীরব নিশীথে 'জান্নাতুল্‌-বাকী' নামক গোরস্তানে উপস্থিত হইয়া একইভাবে মৃত মুসলমানদিগের রুহ্‌-শাফায়াতের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

কিন্তু এই বিদায়-যাত্রার মুখে দাঁড়াইয়াও মহানবী এপারের কর্তব্য কর্মে একটুও অবহেলা করেন নাই। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কর্তব্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

মূতা-অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিবার পর সিরিয়া প্রান্তরে আবার বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাইল। ইহুদী খৃষ্টানগণ কিছুতেই সন্ধির সর্ত সম্যকরূপে পালন করিল না। এ-কারণ পুনরায় তথায় অভিযান প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিল। হযরত তৎক্ষণাৎ মুসলমানদিগকে সিরিয়া যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এবারকার এ-অভিযানের নেতৃত্ব-ভার অর্পণ করিলেন জায়েদের পুত্র ওসামার উপর। বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক তরুণ যুবক এই ওসামা, তাহাতে আবার ক্রীতদাসপুত্র! তিনি হইলেন সেনাপতি, আর তাঁহারই অধীনে সাধারণ সৈনিক বেশে স্থাপিত হইলেন আবুবকর ও ওমর! দুনিয়া হইতে বিদায় লইবার পূর্বে ইসলামের নবসাম্যবাদ মুসলমানদিগের মধ্যে এতটা কার্যকারী হইয়াছে, তাহাই যেন একবার দেখিয়া যাইবার জন্য মহানবী এই ব্যবস্থা করিলেন। আবুবকর, ওমর অথবা অন্যান্য সাহাবাগণ যাঁহারা দীর্ঘদিন হযরতের সাহচর্যে থাকিয়া ইসলামের সমস্ত ধ্যান-ধারণা আপন জীবনে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন—তাঁহারা নির্বিচারে অবনত মস্তকে এ আদেশ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু একদল তরুণ মুসলমান ইহাতে আপত্তি তুলিলেন। ওসামার নেতৃত্ব স্বীকার করিবার মত মনোবল তাঁহাদের ছিল না। হযরত এ কথা বুঝিতে পারিয়া আবার সকলের নিকট ইসলামের সাম্য নীতির ব্যাখ্যা করিলেন। তখন সকলেই শান্ত হইলেন। একমনে একপ্রাণে ওসামার নেতৃত্বে মুসলিম বীরদল যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু নগরবাসীর মনোযোগ শীঘ্রই আর একটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। ওসামাকে আদেশ দিবার পরদিনই হযরত হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

পীড়ার সূচনা এইরূপ হইল :

'জান্নাতুল-বাকী' হইতে ফিরিয়া আসিয়া হযরত বিবি আয়েষার গৃহে উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাইলেন : আয়েষা শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া বকিতেছেন, "উঃ! মাথা গেল! মাথা গেল!" তাহা শুনিয়া হযরত বলিলেন : "আয়েষা, কার মাথা গেল? তোমার না আমার?" এই বলিয়া তিনি নিজের অসুস্থতার কথা জানাইলেন। তারপর একটু হালকা সুরে বলিলেন : "তোমার মাথা গেলেই বা ক্ষতি কী, আয়েষা? আমার পূর্বে তুমি যদি মারা যাও, তবে কি তুমি সুখী হও না? আমি তোমাকে আপন হাতে গোসল করাইয়া কাফন পরাইয়া কবরে শোয়াইয়া দিব, তার চেয়ে মধুর আর কী হইতে পারে?"

আয়েষা মৃদুস্বরে একটু হাসিয়া বলিলেন : "হাঁ, তা বৈ কি? আপনি তো তাই চান। আমি মারা গেলে আর একটি নতুন বিবি আনিয়া আমারই এই ঘরে আপনি নতুন সংসার পাতিবেন, এই বুঝি আপনার মতলব?"

আয়েষার এই স্নিগ্ধ বিদ্রূপ হযরত প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিলেন।

দাম্পত্য জীবনে এই চিত্রটুকু কত সুন্দর—কত মধুর!

হযরতের পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্যান্য সকল স্ত্রীর সম্মতি লইয়া তিনি আয়েষার গৃহে শয্যা গ্রহণ করিলেন।

হযরতের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাঁহার প্রিয় দুহিতা বিবি ফাতিমা পিতাকে দেখিতে আসিলেন। হযরত ফাতিমাকে কাছে ডাকিয়া তাঁহার কানে কানে কি যেন গোপন কথা বলিলেন। ইহাতে ফাতিমা উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন হযরত আবার তাঁহার কানে কানে আর একটি গোপন কথা বলিলেন। এইবার ফাতিমা হাসিয়া উঠিলেন। কেহই এ কান্না-হাসির অর্থ বুঝিল না।*

---

* পরবর্তীকালে বিবি ফাতিমা নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন : "প্রথমবার হযরত তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছিলেন, তাই আমি কাঁদিয়াছিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি বলিয়াছিলেন : ফাতিমা কাঁদিও না। আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সংগে বিহিশতে মিলিত হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি হাসিয়াছিলাম।" বলা বাহুল্য, হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যেই বিবি ফাতিমা ইন্তিকাল করেন।

দ্বিতীয় দিন হযরতের জ্বর হইল, সংগে সংগে তিনি তাঁহার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। বারে বারে বলিতে লাগিলেন: "খায়বারে ইহুদিনী যে বিষ দিয়াছিল, সেই বিষের যন্ত্রণা এখন আমি অনুভব করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি সকলকে তাঁহার মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালিতে বলিলেন।

কিন্তু নূরনবী তখনও একেবারে শয্যাশায়ী হন নাই। রুগ্ন শরীর লইয়াই তিনি প্রত্যহ মসজিদে গিয়া ইমামতি করিতে লাগিলেন।

নামায শেষে একদিন তিনি খুৎবা দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন: "আল্লাহ্ তাঁহার এক বান্দাকে দুনিয়ার সমস্ত সুখ-সম্পদ দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু সে তাহা ত্যাগ করিয়া আল্লাকেই গ্রহণ করিল।" কেহই এ কথার গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিল না; কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ আবুবকর এ কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া কাঁদিয়া জারজার হইতে লাগিলেন; সাধারণ লোক মনে করিল: "বৃদ্ধ আবুবকরের মাথা খারাপ হইল নাকি? হযরত একটি লোক সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাইতেছেন, ইহাতে কাঁদিবার কী আছে?"

অতঃপর হযরত বলিলেন: "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্য হইতে প্রেম ও ভক্তিতে আবুবকরকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি। এই মসজিদের সমস্ত দরজা আজ হইতে বন্ধ হইয়া যাক, শুধু খোলা থাক্ আবুবকরের দরজা।" হযরতের মৃত্যুর পর আবুবকরই যাহাতে মুসলমানদিগের খলিফা নির্বাচিত হন, এই ইংগিতই সেদিন তিনি দিলেন!

জীবনের আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে জানিয়া তিনি আর একদিন বিবি আয়েষার গৃহে সমবেত ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "হে মুসলমানগণ, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আল্লাহ্ তোমাদের উপর প্রসন্ন হউন। তাঁহারই শক্তিবলে তোমাদের জীবন ও কর্ম সাফল্যমণ্ডিত হউক। অক্ষুন্ন কল্যাণে তোমরা নিরাপদ হইয়া থাক। আজ হইতে রোজকিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসিবে, তোমাদের মধ্যবর্তিতায় তাহাদের সকলের প্রতিই আমি আমার সালাম ও দোওয়া পৌঁছাইয়া দিলাম।"

অন্য আর এক সময় তিনি বলিলেন: "সাবধান! তোমরা যেন আমার কবরকে পূজা না কর। পৃথিবীর বহু জাতি এই পাপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।"

সফর মাস শেষ হইয়া গেল। রবিউল-আউয়াল মাস পড়িল। হযরতের অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

সেদিন মাসের এগার তারিখ। রবিবার। এশার নামাযের আযান ধ্বনি হইল। হযরত অজু করিবার জন্য পানি চাহিলেন। অতি কষ্টে অজু করিয়া তিনবার উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনবারই তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, নামাযে যোগদান করিতে পারিলেন না। তখন আবুবকরকেই নামায পড়াইবার জন্য তিনি আদেশ পাঠাইলেন। আদেশক্রমে আবুবকর নামায আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু হযরতকে অনুপস্থিত দেখিয়া ভক্তবৃন্দ উতলা হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন: বুঝিবা হযরত আর ইহজগতে নাই। হযরত তাহা বুঝিতে পারিয়া দুইজন আত্মীয়ের স্কন্ধে ভর দিয়া মসজিদে উপস্থিত হইলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া আবুবকর মিম্বার হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিবার জন্য ব্যাগ্র হইয়া উঠিলেন; কিন্তু হযরত তাহা নিষেধ করিলেন। আবুবকরের পার্শ্বে বসিয়াই সেদিন তিনি নামায পড়িলেন।

নামায শেষে তিনি সকলকে বলিলেন: "হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আমি তোমাদিগকে আল্লার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। তোমরা নিষ্ঠার সহিত তাঁহার আদেশ-নিষেধ পালন করিও, তাহা হইলে তিনিই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। বিদায়।"

হযরতের অবস্থা দেখিয়া সাহাবীরা কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু হযরত যে এত শীঘ্রই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, এ কথা কিছুতেই কাহারও বিশ্বাস হইল না।

সারারাত্রি হযরতের খুব কষ্টে কাটিল।

সোমবার। প্রভাত হইতেই ফযরের আযান ধ্বনিত হইল। হযরত উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। আবুবকর নামায পড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন হযরত বিবি আয়েষাকে মসজিদ-সংলগ্ন দরজাটি খুলিয়া দিতে বলিলেন। খোলা দরজা দিয়া ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া আসিয়া হযরতের গায়ে লাগিতে লাগিল। নবপ্রভাতের অরুণ-আলো আসিয়া তাঁহার মুখে পড়িল। এই দিন এই সময়ে তিনি দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। নীরব দৃষ্টি মেলিয়া তিনি মসজিদের নামাযরত মুসলমানদিগের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। একটা পবিত্র শান্তি ও আনন্দ

তাঁহার চোখেমুখে খেলিয়া গেল। তাঁহার ইন্তিকালের পর মুসলিমগণ কিরূপ-ভাবে নামায পড়িবে, কিরূপভাবে চলিবে, সেই স্বপ্ন যেন আজ তাঁহার চোখে ঘনাইয়া আসিল। নবসূর্যের নব-আলোকে এক নবীন জাতির অভ্যুত্থান তিনি দেখিতে পাইলেন। অনাগত ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জ্বল চিত্র দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার জীবন-সাধনা যে সফল হইয়াছে, আল্লার বাণীকে তিনি যে জয়যুক্ত দেখিয়া যাইতে পারিতেছেন, এ গৌরব ও আনন্দে তাঁহার বুক ভরিয়া গেল। পবিত্র মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিল।

সকালবেলা হযরতের অবস্থা আশাতিরিক্তরূপে ভাল বলিয়াই বোধ হইল। সকলের সহিত তিনি বেশ কথা বলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল। ভক্তবৃন্দ শুশ্রূষা-শুজারি করিতে লাগিলেন; হযরত আরোগ্যলাভ করিতেছেন ভাবিয়া আবুবকর, ওমর, আলি, ওসমান প্রভৃতি সকলেই আপন আপন কাযে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে আবুবকরের স্ত্রী (আয়েষার জননী) মদিনার উপকণ্ঠে সুন্নাহ্ নামক পল্লীতে বাস করিতেছিলেন। হযরতের আশাপ্রদ অবস্থা দেখিয়া আবুবকর আপন স্ত্রীকে লইয়া আসিবার জন্য হযরতের অনুমতি চাহিলেন। হযরত সম্মতি দিলেন। দ্বিধাহীন চিত্তে আবুবকর সুন্নাহ্ যাত্রা করিলেন।

হযরতের অসুস্থতা নিবন্ধন ওসামা এতদিন সিরিয়া-যাত্রা স্থগিত রাখিয়া-ছিলেন। তিনি আসিয়া এক সময় হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ওসামার মস্তকে হস্ত রাখিয়া হযরত তাঁহাকে দোওয়া করিলেন এবং অনতিবিলম্বে সিরিয়ায় অভিযান করিবার জন্য পুনরায় তাঁহাকে তাকিদ দিলেন।

বিবি আয়েষা দিবারাত্রি হযরতের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তখনও তরুণবয়স্কা; কিন্তু তবু কী আদর্শ স্বামিভক্তি! কী অনুপম সেবাপরায়ণতা! স্বামীর পবিত্র মস্তক আপন কোলে রাখিয়া তিনি তাঁহাকে সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণে হযরতের অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন হইল। পীড়ার গতি মন্দের দিকে চলিল। বিবি আয়েষা ও অন্যান্য সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠিলেন। সংবাদ শুনিয়া ওমর ও অন্যান্য সাহাবাগণ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। এই সময় হযরত একবার ওমরকে কালি-কলম লইয়া আসিতে বলিলেন। উদ্দেশ্য: লিখিতভাবে তিনি কোন উপদেশ রাখিয়া যাইবেন। কিন্তু ওমর তাহা আনিলেন না। হযরতকে বাধা দিয়া বলিলেন: "ইয়া রসুলুল্লাহ্, লিখিত উপদেশের কী প্রয়োজন? আমাদের পক্ষে আল্লার কুরআন এবং আপনার আদর্শই তো যথেষ্ট।" কী অসাধারণ দৃঢ়তা ও মনোবল এই তেজোদৃপ্ত মানুষটির!

এই সময়ে আবুবকরের পুত্র আবদুর রহমান একখানি মেস্‌ওয়াক হস্তে হযরতের প্রকোষ্ঠে আসিলেন। হযরত সেখানির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। হযরত সব সময়ে মেস্‌ওয়াক করিয়া দাঁত পরিষ্কার রাখিতে ভালবাসিতেন। বিবি আয়েষা তাহা জানিয়া হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "মেস্‌ওয়াকখানি আপনি চান কি?" হযরত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আয়েষা তাহা লইয়া হযরতের হাতে দিলেন। হযরত তাহা মুখে দিয়া দেখিলেন, বড় শক্ত। তখন বিবি আয়েষা বলিলেন: আমি কি চিবাইয়া উহা নরম করিয়া দিব? হযরত মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন আয়েষা দাঁত দিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া মেস্‌ওয়াকখানির অগ্রভাগ মোলায়েম করিয়া দিলেন। তাই দিয়া হযরত দন্ত মঞ্জন করিলেন। কী অনুপম চিত্র এ!

ইহারই পর হঠাৎ একটা অবসাদ দেখা দিল। হযরত নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। হস্তপদ অসাড় হইয়া আসিল। বিবি আয়েষা তাহা লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি হযরতের মস্তক আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন এবং নিজ-হস্তে হস্তদ্বয় মর্দন করিতে লাগিলেন। হযরত মৃদুস্বরে আয়েষাকে বলিলেন: "হাত সরাইয়া লও।" বিবি আয়েষা তাহাই করিলেন। ধীরে ধীরে হযরতের জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিতে লাগিল। বিশ্ব-প্রকৃতি তখন বাহিরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; দিকে দিকে বিদায়ের করুণ রাগিণী বাজিতেছে। একটা মহাশোকের মাতন যেন বিশ্বের দুয়ারে ঘনাইয়া আসিতেছে। এত বড় বিরহ তো ধরণীতে আর কোনদিন আসে নাই।

একটা নিস্তব্ধতা আসিল।

হযরত একদৃষ্টে ঊর্ধ্ব আকাশ-পানে চাহিয়া রহিল। তারপর মৃদুস্বরে

বলিতে লাগিলেন : "ইয়া রফীকে-আ'লা ! হে আমার পরম বন্ধু !! তোমার কাছে·········!!!"

সব শেষ হইল ! বিশ্বনবীর রূহ্-মুবারক জান্নাত-লোকে প্রস্থান করিল ! (*)

---

* খৃষ্টান পঞ্জিকা অনুসারে রসুলুল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন : ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন, মোতাবেক ১২ই রবিউল আউওল ১১শ হিযরী।

(Vide Encyclopaedia Britannica : Mohammad)

পরিচ্ছেদ : ৫৮

শেষ-কথা

রসুল নাই! রসুল!! ধরণীর অন্তস্তল হইতে একটা অস্ফুট আর্তনাদ উত্থিত হইয়া আকাশ-বাতাসকে উতলা করিয়া তুলিল। এতদিন যাঁহাকে পাইয়া বিশ্বপ্রকৃতি শান্ত হইয়া ছিল, আজ আবার তাঁহাকে হারাইয়া সে হাহাকার করিতে লাগিল। মিলনোৎসবের প্রধান অতিথি চলিয়া গেলে সভাগৃহ যেমন নিষ্প্রভ হইয়া যায়, চমন-বাগিচা হইতে বুলবুল উড়িয়া গেলে যেমন করিয়া তরু-পল্লবে বিরহ ঘনায়, বিশ্ব-ধরণীরও আজ সেই দশা হইল। যাঁহার আগমনে তোরণে-তোরণে একদিন বাঁশি বাজিয়াছিল, নানা পত্রপুষ্পে যাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল, দিকে দিকে আনন্দ-মেলা বসিয়াছিল, সেই সম্মানিত প্রধান অতিথি আজ চলিয়া গেলেন। উৎসব-ভূমি আজ মলিন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। স্থলে জলে লতায়-পাতায় ফুলে-ফলে তৃণে-তৃণে শোকের ছায়া নামিল। সমস্ত হাসি-গান থামিয়া গেল; দিকে দিকে শুধুই একটা করুণ ক্রন্দনের সুর শোনা যাইতে লাগিল। মেষ-শিশুরা তৃণ মুখে দিয়া হঠাৎ ব্যথার সুরে কাঁদিয়া উঠিল, মরুপথে চলিতে চলিতে উটেরা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়া মদিনা পানে মুখ তুলিয়া জল-ছলছল নয়নে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বাগিচা হইতে বুলবুল উড়িয়া গেল; ফুলদল ঝরিয়া পড়িল; পাখীরা গান ভুলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল; সমীরণ গতি হারাইল; 'লু'-হাওয়া ধরণীর অন্তর্দাহ বহন করিয়া মরুদিগন্তে হাহাকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। উদাসী বেদুঈন তার বল্লম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া দাঁড়াইল; অশ্ব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিমর্ষভাবে বারে বারে হ্রেষারব করিতে লাগিল। জড়-চেতনে আজ এমনি করিয়া শোকের মাতন উঠিল। সকলেই মনে করিতে লাগিল: কী যেন তাহার নাই, কী যেন সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে, কোথায় যেন খানিকটা শূন্য হইয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত-মধ্যে হযরতের মৃত্যু-সংবাদ মদিনার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। আবুবকর তখনও সুন্নাতেই অবস্থান করিতেছিলেন; সংবাদ শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে হযরতের ইন্তিকালের সংবাদে বিহ্বল হইয়া ওমর তাড়াতাড়ি বিবি আয়েষার গৃহে উপস্থিত হইলেন। হযরতের দেহাবরণ উন্মুক্ত করিয়া একদৃষ্টে তিনি তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। সেই প্রশান্ত জ্যোতির্ময় মুখখানি দেখিয়া ওমর কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না যে, হযরত তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। সেই মুখ, সেই হাসি, সেই কমনীয়তা—সমস্তই বিদ্যমান; মৃত্যুর কোন লক্ষণ সেখানে নাই। ওমর হযরত বলিয়া উঠিলেন: "কে বলে হযরত নাই? মিথ্যা কথা। মরেন নাই—মরিতে পারেন না।" বলিতে বলিতে তিনি উন্মাদের ন্যায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন: "হযরত মরেন নাই, মরিতে পারেন না। যে বলিবে তিনি মারা গিয়াছেন, তাহার গর্দান লইব।" বলিতে বলিতে তিনি কোষ হইতে তরবারি তুলিয়া লইলেন। হযরতের মৃত্যুতে ওমর যে অতিমাত্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন এবং এই উক্তি যে তাঁহার অন্তর্বেদনারই বহিঃপ্রকাশ, সকলেই তাহা বুঝিতে পারিলেন।

ঠিক এই সময়ে হযরত আবুবকর আসিয়া পৌঁছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি বিবি আয়েষার গৃহে প্রবেশ করিয়া হযরতের মুখাবরণ তুলিয়া অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন: ভক্তিভরে নত হইয়া হযরতের পবিত্র ললাটে বারে বারে 'বোসা' (চুম্বন) দিতে দিতে অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি বলিতে লাগিলেন: "জীবনে যেমন সুন্দর ছিলে, মরণেও তুমি ঠিক তেমনি সুন্দর দেখাইতেছ।" তারপর দুই হাতে হযরতের মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে পুনরায় তাঁহাকে শোয়াইয়া দিয়া বলিলেন: হে আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি আজ সত্যই আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে!

ব্যথিত চিত্তে আবুবকর বাহিরে আসিলেন। ওমর তখনও অসিহস্তে দুয়ারে দণ্ডায়মান। সাহস করিয়া কেহই তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া আবুবকর অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন, ওমর কী করিতেছ! ক্ষান্ত হও। বাচালতা পরিত্যাগ কর। হযরত মারা গিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্যের কী আছে? আল্লাহ্ তাঁহার রসুলের নিকট কি এই আয়াত নাযিল করেন নাই?—

"নিশ্চয়ই তুমি মরিবে এবং তাহারাও (অন্যান্য লোকেরাও) মরিবে।" তারপর ওহদ-যুদ্ধের অবসানে কি আল্লাহ্ বলেন নাই:

"মুহম্মদ একজন প্রেরিত নবী ছাড়া আর কিছুই নন। নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীরা ইন্তিকাল করিয়াছেন। এ-ক্ষেত্রে কী করিবে? তিনি যদি মারাই যান, অথবা নিহতই হন, তবে কি তোমরা (পূর্বের অবস্থায়) ফিরিয়া যাইবে?

অতএব, হে লোক সকল, অবহিত হও। যাহারা এতদিন মুহম্মদের পূজারী ছিলে, তাহারা জানো যে মুহম্মদ মারা গিয়াছেন। আর যাহারা আল্লার পূজা করিতে, তাহারা জানো যে আল্লার মৃত্যু নাই—তিনি চির-জীবন্ত—তিনি হাইউল্-কইউম।"

আবুবকরের এই জ্বলন্ত সত্যবাণী শুনিয়া ওমরের চৈতন্য হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলি যেমন সবেমাত্র নাযিল হইল—উহাদের তাৎপর্য তিনি যেন আজ নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলেন। ওমর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল, বিহ্বল হইয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

এই সময় একটা নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল। হযরতের মৃত্যুর পর যে প্রশ্ন অনিবার্য হইয়া ছিল, এখনই তাহা দেখা দিল। মুসলমানদিগের নেতা বা খলিফা এখন কে হইবেন? এই প্রশ্নের আশু মীমাংসার প্রয়োজন হইল, কারণ ইহা না হইলে কোন কাজ করাই আর সম্ভব হইল না। অনতিবিলম্বে একটি পরামর্শ সভায় মোহাজের ও আনসারগণ মিলিত হইলেন: মদিনাবাসীদের কাহারও কাহারও ইচ্ছা ছিল—তাঁহাদের দলপতি সা'দ-বিন-উবাইদাকে খলিফা নির্বাচিত করেন। কিন্তু ওমর, আবু-উবাইদা প্রভৃতি তাহাতে সম্মত হইলেন না. তাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধ আবুবকরের নাম প্রস্তাব করিলেন। ওমর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "বন্ধুগণ, রসূলুল্লার ইংগিত কি এখনও আপনারা বুঝিতে পারেন নাই? জীবিত থাকাকালীন তিনি কি আবুবকরকেই এমামতি করিবার হুকুম দেন নাই? এমন কি নিজে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া নামায পড়েন নাই? আবুবকরকেই কি তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসিতেন না? অতএব আসুন, আমরা সকলেই আবুবকরকে খলিফা বলিয়া মানিয়া লই।" ইহাই বলিয়া তিনি আবুবকরের হস্ত ধারণ পূর্বক তাঁহার নিকট বয়েৎ হইলেন। তখন সকল বাধা-বিপত্তি ভাসিয়া গেল। একে একে সকলেই আসিয়া আবুবকরকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন। যাঁহারা

সাদ-বিন্-উবাইদাকে সমর্থন করিতেছিলেন, তাঁহারাও সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের সম্মতি জানাইলেন। এইরূপে আবুবকর মুসলমানদিগের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হইলেন।

আবুবকর তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন: "হে মুসলমানগণ, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই, সে কথা জানি, তবু তোমাদের ইচ্ছানুসারেই আমি তোমাদের খলিফা হইলাম। যদি আমি ভুল করি বা বিপথে চলি, তবে তোমরা আমাকে সংশোধন করিয়া লইও। মনে রাখিও, মিথ্যা বা দুষ্টবুদ্ধি দ্বারা কোন জাতি বড় হইতে পারে না; সততার মধ্যেই জাতির শক্তি নিহিত থাকে। যে জাতি ভীরু, আত্মপ্রবঞ্চক ও নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী, সে জাতিকে আল্লাহ্ ঘৃণা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। অতএব, তোমরা কায়মনোবাক্যে আমার আদেশ পালন করিবে। আমি যতখানি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলকে মানিয়া চলিব, তোমরা ঠিক ততখানি আমার কথা মানিয়া চলিবে।" ইহাই বলিয়া তিনি সকলকে শান্ত করিলেন।

হযরতের মৃতদেহ চব্বিশ ঘণ্টাকাল রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সোমবার অপরাহ্নে তিনি ইন্তিকাল করেন, মঙ্গলবার অপরাহ্নে তাঁহাকে দাফন করা হয়। এই চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া দলে দলে ভক্তবৃন্দ আসিয়া হযরতকে একবার শেষ-দেখা দেখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার পবিত্র আত্মার উপর আল্লার রহমত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বহু দূরপথ হইতে বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রী, বালক, বালিক—কাতারে কাতারে মদিনাপানে ছুটিয়াছে; সকলেরই মুখ মলিন, সকলেরই চোখে আঁসু, সকলেরই কণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি। মদিনার সর্বত্র সেদিন এমনই শোকের মাতন।

হযরতের মৃতদেহ কোথায় দাফন করা হইবে, তাহা লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেহ বলিতেছেন: মসজিদুন্নবীর মিম্বারের পার্শ্বে, কেহ বলিতেছিলেন মিম্বারের নিম্নে। কিন্তু আবুবকর কাহারও প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া বলিলেন: "জীবিতকালে হযরতকে বলিতে শুনিয়াছি: পয়গম্বরেরা যেখানেই দেহত্যাগ করেন, সেইখানেই তাঁহাদিগকে সমাহিত করিতে হয়। অতএব হযরত যেখানে শায়িত আছেন সেইখানেই তাঁহাকে দাফন করিতে হইবে।" এই নির্দেশ অনুসারে বিবি আয়েষার গৃহেই হযরতের সমাধি রচিত হইল।

মঙ্গলবার অপরাহ্নে হযরতের দাফন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। মদিনা-মসজিদে তখন অগণিত লোক। হযরতকে সমাধি-শয়নে শায়িত করিবার পূর্বে খলিফা আবুবকর সকলের তরফ হইতে এই মুনাজাত করিলেন :

"হে রসুলুল্লাহ, আল্লার অনন্ত রহমৎ তোমার পবিত্র আত্মার উপর বর্ষিত হউক। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি : তুমি আল্লার বাণী যথাযথ-ভাবেই আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছ; যতদিন না সত্য জয়যুক্ত হইয়াছে, ততদিন জীবন পণ করিয়া জিহাদ করিয়াছ। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই মা'বুদ নাই—এ কথা তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ এবং তাঁহার সান্নিধ্যে আমাদিগকে টানিয়া আনিয়াছ; বিশ্ববাসীদিগের প্রতি তুমি চিরদিনই সদয় ব্যবহার করিয়াছ। আল্লার ধর্ম সকলের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিবার বিনিময়ে তুমি কোনদিন কোন প্রতিদান চাও নাই, অথবা সে ধর্মকে কাহারও নিকটে বিক্রয়ও কর নাই। হে দরদী বন্ধু, আল্লার অনন্ত করুণায় তোমার রুহমুবারক অভিষিক্ত হউক! আমিন!"

* * *

আসুন পাঠক, আমরাও এই সুরে সুর মিলাইয়া বলি : "আমিন!!"

সমাপ্ত
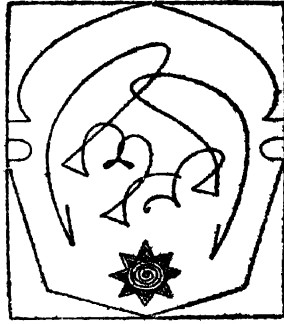
দ্বিতীয় খণ্ড

পূর্বাভাস

আল্লাহ্‌তালার দরগায় লাখো শুকরিয়া যে, এই অধম তাঁহার প্রিয় নবীর জীবন-কথার একাংশ আজ শেষ করিতে পারিল। ইহাকে আমি আমার জীবনের চরম সঞ্চয় এবং পরম সম্পদ বলিয়া মনে করি!

প্রথম খণ্ডে আমরা হযরতের জীবনেতিহাস আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার চরিত্রের নানা দিক এবং নানা সমস্যার আলোচনা করিব।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে লেখকের ধারণা কিছুটা স্বতন্ত্র। হযরত মুহম্মদকে আমারা শুধু 'মানুষ'ও বলি নাই, আবার 'অতিমানুষ'ও বলি নাই; দুই-এর মিলিত রূপের কল্পনা করিয়াছি। মানবিক এবং অতিমানবিক উভয় উপাদানই যে তাঁহার মধ্যে ছিল, এই কথার উপর জোর দিবার জন্যই তাঁহাকে এইরূপে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছি। বলা বাহুল্য, ইহাই মানুষের পূর্ণ-পরিণত রূপ। মানুষের ভিতর অতিমানুষ না থাকিলে সে মানুষ মানুষই নয়।

অতিমানুষ মানুষেরই পূর্ণরূপ। কাজেই অতিমানুষও মানুষ। সেই অর্থে রসুলুল্লাকে মানুষও বলা যায়।

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, হযরত দুই নামে পরিচিত ছিলেন; এক নামে তিনি ছিলেন 'মুহম্মদ' অর্থাৎ চরম-প্রসংসিত; অন্য নামে তিনি ছিলেন 'আহ্‌মদ' অর্থাৎ চরম-প্রশংসাকারী। 'চরম-প্রশংসিত' বলিলে বুঝা যায়: তিনি ছিলেন চরম পূর্ণ অর্থাৎ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ; আর 'চরম-প্রশংসাকারী' বলিলে বুঝা যায়: তাঁহার প্রদত্ত আল্লার প্রশংসা বা পরিচয় সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ। কাজেই হযরত মুহম্মদের জীবনের লক্ষ্য (mission) সার্থক হইয়াছে কিনা, তাঁহার বিচার করিতে হইলে সব সময়েই, আমাদের দৃষ্টকোণকে এই দুইটি বিন্দুতেই নিবদ্ধ রাখিতে হইবে; অর্থাৎ আমাদিগকে দেখিতে হইবে: (১) তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিলেন কিনা, (২) আল্লার যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা চরম এবং পরম হইয়াছে কিনা। হযরতের সফলতা বিচারের ইহাই হইবে দুই প্রধান মাপকাঠি।

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা প্রধানতঃ এই বিষয়েই আলোচনা করিব। আমরা দেখাইব যে, হযরত সত্যসত্যই বিশ্বনিখিলের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত আল্লা-পরিচিতিই সর্বাপেক্ষা সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

এতদ্ব্যতীত আরও এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিলে হযরতের জীবনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সেরূপ কয়েকটি মূল্যবান বিষয়ের আলোচনাও পাঠক এই দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিতে পাইবেন। হযরতকে চিনিবার পক্ষে সেগুলিও যথেষ্ট সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই।

পরিচ্ছেদ : ১

হযরত মুহম্মদের জন্ম-তারিখ কবে ?

৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট, মোতাবেক ১২ রবিউল আউওল, সোমবার, হযরত ভূমিষ্ঠ হন।

কিন্তু আধুনিক যুগের কোন কোন পণ্ডিতের মত : হযরতের সঠিক জন্ম-তারিখ ৯ই রবিউল আউওল, ১২ই নহে। ইহাদের প্রায় সকলেই মিসরের স্বনামখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মাহমুদ পাশা ফলকীকে অনুসরণ করিয়াছেন। পাশা মহোদয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে হযরতের জন্ম ৯ই রবিউল আউওল তারিখেই হইয়াছিল, কেননা হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ৯ই তারিখেই সোমবার পড়ে, ১২ই তারিখে পড়ে না।*

জনাব মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবও পাশা মহোদয়ের এই উক্তি সমর্থন করেন। 'মোস্তফা-চরিতে' তিনি নিম্নলিখিত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন।

"হযরতের জন্ম-তারিখ নির্ধারণে ঐতিহাসিকগণ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাবরি, ইবনে-খলদুন, ইবনে-হিশাম, কামিল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ১২ই রবিউল আউওল তারিখ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আবুল ফেদা বলেন, ঐ মাসের ১০ই তারিখে হযরতের জন্ম হইয়াছিল। তবে সমস্ত লেখকই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে রবিউল আউওল মাসে সোমবারে হযরতের জন্ম হয়। আধুনিক মুসলমান লেখকগণ সূক্ষ্মভাবে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১২ই বা ১০ই তারিখে সোমবার পড়িতে পারে না। উহা ৯ই ব্যতীত অন্য কোন তারিখ হইতে পারে না। মিসরের স্বনামখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মাহমুদ পাশা ফারুকী (ফলকী ?) স্বতন্ত্র একখানা পুস্তক রচনা করিয়া ইহা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন

* মাহমুদ পাশা যে পুস্তকখানি রচনা করেন, তাহার নাম 'নাতায়েজুল আফ্‌হাম'। পুস্তকখানি আরবীতে লিখিত। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না; কাজেই মূল যুক্তিতর্কের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ আমাদের জুটিল না।

করিয়াছেন। পাশা মহোদয়ের প্রমাণগুলির সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলেন —

(১) ছহি হাদিসে বর্ণিত আছে যে হযরতের শিশুপুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ লাগিয়াছিল।

(২) হিযরী ৮ম সালের জিলহজ্জ মাসে ইব্রাহিমের জন্ম হয়; ১৭ বা ১৮ মাস বয়সে হিজরীর কোন সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

(৩) অংক কষিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উল্লিখিত সূর্যগ্রহণ ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে ৮-৩০ মিনিটের সময় লাগিয়াছিল।

(৪) ঐ তারিখ ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, হযরতের জন্মসনে ১২ই এপ্রিল তারিখে রবিউল আউওল মাসের ১লা তারিখে আরম্ভ হইয়াছিল।

(৫) জন্মদিনের তারিখ নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু রবিউল আউওল মাসের ৮ই হইতে ১২ই পর্যন্ত এই মতভেদ সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সোমবার সম্বন্ধেও কাহারও মতভেদ নাই।

(৬) ৮ই হইতে ১২ই রবিউল আউওল মধ্যে ৯ই ব্যতীত সোমবার নাই। অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, ৯ই রবিউল আউওল ২০শে এপ্রিল, সোমবার হযরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"*

— (মোস্তফা-চরিত, ১৮৩-১৮৪ পৃঃ)

* অবশ্য এই যুক্তিধারা জনাব মৌলানা মোঃ আকরম খান সাহেবের নিজস্ব বলিয়া মনে হয় না। মৌলানা শিবলী নোমানী তাঁহার সুবিখ্যাত 'সীরাৎ-উন-নবী' গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় পাশা মহোদয়ের যুক্তিতর্কের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়াছেন; মৌলানা আকরম খান সাহেবের উক্তি ও যুক্তি তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। তবে পার্থক্য এই: শিবলী মহোদয় এ-সম্বন্ধে নিজের কোন মতামত ব্যক্ত করেন নাই, অথবা পাশা মহোদয়ের মত সমর্থনও করেন নাই; কিন্তু জনাব মৌলানা আকরম খান সাহেব অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিতই বলিতেছেন যে, ৯ই রবিউল আউওল তারিখেই হযরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শিবলী মহোদয়ের মন্তব্য মিলাইয়া দেখুন।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে উপরোক্ত উপকরণ (data) এবং যুক্তিধারা (syllogism) অনুসারে কি করিয়া যে "নিশ্চতরূপে" প্রমাণিত হয় যে, ৯ই রবিউল আউওল তারিখেই হযরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যুক্তি-প্রমাণের যেসব উপকরণ জনাব মৌলানা সাহেব ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতে কোন ক্রমেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে (conclusion) পৌঁছা যায় না। স্বীকার করিলাম ইব্রাহিমের মৃত্যুদিনে যে সূর্যগ্রহণ লাগিল, তাহা ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তারপর ? মাত্র এইটুকু প্রস্তাবনা হইতে কী করিয়া হযরতের জন্ম-তারিখে পৌঁছান যায় ? এই তারিখটিকে ভিত্তি করিয়া যদি আমাদিগকে হযরতের জন্ম-তারিখ নির্ধারণ করিতেই হয়, তবে যুক্তির ধারা নিম্নরূপ হইবে :

(১) ইব্রাহিমের মৃত্যু-তারিখে (অর্থাৎ ৭ই নভেম্বর ৬৩২ খৃঃ) আরবী সনের অমুক তারিখ ছিল ;

(২) ঐ তারিখে হযরতের বয়স এত বৎসর, এত মাস, এত দিন ছিল ;

(৩) অতএব হিসাব করিলে দেখা যায় যে, হযরতের জন্ম অমুক আরবী সনের অমুক মাসের তারিখে হইয়াছিল।

কিন্তু মৌলানা সাহেবের যুক্তিধারা সে-পথে চলে নাই। একটি হইতে অন্যটি, অন্যটি হইতে আর একটি—এইরূপভাবে চলিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে : "অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, ৯ই রবিউল আউওল তারিখেই হযরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

মৌলানা সাহেবের যুক্তিধারা যদি উপরোক্তরূপ হইতও তবুও হযরতের সঠিক জন্মতারিখ বাহির করা সম্ভব হইত না। "১৭ বা ১৮ মাস বয়সে ইব্রাহিমের মৃত্যু হইয়াছিল" বলিলে তো সব সঠিকতার মূলে সেইখানেই কুঠারাঘাত করা হইয়া যায়। এই অনিশ্চিত প্রতিজ্ঞার (premise) উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া হযরতের সঠিক জন্ম তারিখ বাহির করা তো দূরের কথা, ইব্রাহিমের জন্ম-তারিখও তো নির্ভুলরূপে বাহির করা সম্ভব হয় না। আর ইব্রাহিমের জন্ম-তারিখ বাহির করিয়াই বা লাভ কী ? সেখানেও তো ঐ একই প্রশ্ন জাগিবে : ইব্রাহিমের জন্মদিনে আরবী কোন্ তারিখ ছিল ? এবং সেই তারিখে হযরতের বয়স কত বৎসর, কত মাস, কত দিন ছিল ?

দ্বিতীয় কথা এই: মিশরীয় পাশা মহোদয়ের গণনা যে আমাদিগকে কোথায় লইয়া ফেলিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ১২ই রবিউল আউওল হইতে ৯ই রবিউল আউওল তারিখে হযরতের জন্মতারিখ স্থানান্তরিত হওয়া মাত্র তিন দিনের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা মোটেই নয়। এই ৯ই রবিউল আউওল ৫৭০ খৃষ্টাব্দে রবিউল মাসের ৯ই তারিখে নয়, ইহা ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ৯ই রবিউল আউওল, অর্থাৎ হযরতের প্রচলিত জন্মতারিখ হইতে প্রায় এক বৎসর পরবর্তী।* সুতরাং "৮ই হইতে ১২ই তারিখের মধ্যে ৯ই ব্যতীত সোমবার নাই"—এ যুক্তি খুবই বিভ্রান্তিকর।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি মূল্যবান কারণ আছে, যাহাতে পাশা মহোদয়ের গণনার উপর নির্ভর করা চলে না। কারণগুলি এই:

(১) ইংরাজী বর্ষগণনা-পদ্ধতির সহিত আরবী বর্ষগণনা-পদ্ধতির কোন মিল নাই, কেননা একটি সৌরবৎসর, আর একটি চান্দ্রবৎসর; একটির দিন রাত্রি ১২ টার পর হইতে আরম্ভ হয়, অপরটির দিন সূর্যাস্তের পর হইতে আরম্ভ হয়। চন্দ্রের উদয়াস্তের সংগে চান্দ্রমাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কাজেই ইংরাজী কোন্ তারিখের সহিত হিযরী কোন তারিখের সামঞ্জস্য আছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এমন কি এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সম্ভব হয় নাই। সরকারী ছুটি নির্ধারণের জন্য আজও তাই সর্বত্র নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে: যদি চাঁদ অমুক দিনে দেখা যায় তবে অমুক দিনে ছুটি হইবে। বর্তমানেই যখন উভয় তারিখের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন এখানে বসিয়া অংক কষিয়া কি করিয়া প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা সম্বন্ধে বলা যায় যে, অমুক খৃষ্টাব্দের অমুক মাসের অমুক তারিখে হিযরী সনের অমুক তারিখ ও অমুক দিনে পড়িয়াছিল? সৌরমাসের একটা বিধি-নির্দিষ্ট স্থিরতা আছে; কিন্তু চান্দ্রমাসের সেরূপ স্থিরতা কোথায়? চাঁদ না দেখা পর্যন্তও তো কোন কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

(২) একই ঘটনার সৌর ও চান্দ্র তারিখ নির্ধারণ করিতে গেলে,

* মৌলানা আকরম খান সাহেব বলিতেছেন: "সোমবার, ৯ই রবিউল-আউওল, ২০শে এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ছোবহুছাদেকের অব্যবহিত পরে হযরত জন্মগ্রহণ করিলেন।"
—(মোস্তফা চরিত, ১৮৩ পৃঃ)

অর্থাৎ ইংরাজী তারিখের মোতাবেক হিযরী তারিখ বাহির করিতে গেলে, অনেক ক্ষেত্রে এমন বিভ্রাট ঘটিয়া যায় যে, কিছুতেই তাহা রোধ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাউক: ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সোমবার দিনগতে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় একটি শিশুর জন্ম হইল। ঠিক ঐদিন সন্ধ্যাকালে রবিউল আউওল মাসের প্রথম চাঁদ দেখা দিল, অর্থাৎ ১লা তারিখ পড়িল। এক্ষণে শিশুটির জন্ম-তারিখ যদি কেহ লিপিবদ্ধ করিতে চায়, তবে তাহাকে লিখিতে হইবে: ১লা জানুয়ারী সোমবার, মোতাবেক ১লা রবিউল আউওল তারিখে শিশুটির জন্ম হইল। কিন্তু সেই শিশুটি যদি পরদিন (মঙ্গলবার) সকাল বেলা ১০ ঘটিকার সময় মারা যায়, তবে তাহার মৃত্যু-তারিখ কিভাবে লিখিতে হইবে? এ কথা অবশ্যই লেখা হইবে যে, ২রা জানুয়ারী শিশুটি মারা গিয়াছে। কিন্তু এই ২রা জানুয়ারী মোতাবেক রবিউল আউওল মাসের কত তারিখ লিখিতে হইবে? সেখানে আর ২রা রবিউল আউওল লিখিলে চলিবে না, ১লাই লিখিতে হইবে, কারণ ১লা রবিউল আউওল তখনও শেষ হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, ইংরাজী তারিখ অনুসারে শিশুটির মৃত্যু তাহার জন্মের একদিন পরে ঘটিতেছে, কিন্তু হিযরী তারিখ অনুসারে জন্মের দিনেই ঘটিতেছে। এ-ক্ষেত্রে যিনি লিখিবেন যে, শিশুটির জন্মের দিনই মারা গিয়াছিল, তাঁহার কথাও যেমন নির্ভুল হইবে, যিনি লিখিবেন একদিন পরে মারা গিয়াছিল, তাঁহার কথাও ঠিক তেমনি নির্ভুল হইবে। একদিনের ব্যাপারেই যখন এই, তখন দেড় হাজার বৎসরের পূর্বেকার ঘটনা সম্বন্ধে যে পার্থক্য ও মতবিরোধ দেখা দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী?

(৩) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত কোন চান্দ্রমাসের পহেলা তারিখই নিরূপণ করা সহজ নহে। কোন সময় চাঁদ মেঘে ঢাকা থাকে, কেহ দেখিতে পায়, কেহ পায় না। আবার একস্থানে দেখা গেলেও, দূরবর্তী অন্য কোন স্থানে সেই দিনই যে দেখা যাইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা থাকে না। বোম্বাইয়ে আজ দেখা গেলে কাল হয়ত কলিকাতায় দেখা যায়। অবশ্য বর্তমানে টেলিফোন, টেলিগ্রাম অথবা অথবা রেডিওর সাহায্যে একস্থানে দেখা গেলেই অন্যস্থানে সে-সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব। কিন্তু হযরতের যুগে তো এ-সব কোন সুবিধাই ছিল না। মক্কায় দেখা গেলেই যে সে-চাঁদ মদিনাতেও সেইদিনই দেখা যাইত, তাহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

কাজেই আরবী মাসের ১লা তারিখ নির্ণয় করা তখনকার দিনে সহজ ছিল না; উহা সর্ববাদিসম্মত নাও হইতে পারিত।

(৪) হযরতের জন্ম সময়ে আরবে কোনই প্রচলিত সন-তারিখ ছিল না। বর্তমানে যে-হিযরী সন চলিতেছে, তাহাও হযরতের জন্মের ৫২ বৎসর পর (অর্থাৎ ৬২২ খৃষ্টাব্দে) আরম্ভ হয়।

(৫) এখন যে পদ্ধতিতে হিযরী সন গণনা করা হইতেছে, হযরতের জন্ম-সময়ে ঠিক সেই পদ্ধতিতেই আরবী-বর্ষ গণনা করা হইত না। তখন প্রত্যেক বৎসরের মাস ও দিন-সংখ্যাও সমান থাকিত না। প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর একরূপে গণনা করা হইত, তৃতীয় বৎসর অন্যরূপে গণনা করা হইত। প্রথম দুই বৎসরের প্রত্যেকটিতে ৩৫৪ দিন থাকিত, তৃতীয় বৎসরে ৩৮৪ দিন থাকিত। এইরূপে প্রতি তিন বৎসরের গড় ধরিলে তবে এক বৎসরে ৩৬৪ দিন পাওয়া যাইত। যথা (৩৫৪+৩৫৪+৩৮৪) ÷ ৩=৩৬৪। অন্য কথায় প্রথম দুই বৎসরে প্রত্যেকটিতে ১০ দিন করিয়া কম থাকিত, এবং প্রতি তৃতীয় বৎসরে ৩০ দিনের এক অতিরিক্ত মাস (intercalary month) জুড়িয়া দেওয়া হইত। এইরূপে গোঁজামিল দিয়া প্রতি তিন বৎসরান্তে সৌর ও চান্দ্রবর্ষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা হইত। বলা বাহুল্য, এই সংযোগ-বিয়োগের ফলে কোন্ বৎসরের কোন্ মাস কখন আরম্ভ হইত, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইত না। এই অনিশ্চয়তার দরুণ আরবের 'পবিত্র' মাসগুলির (অর্থাৎ মহররম, রজব, জিলকদ্ এবং জিলহজ) স্থিরতা থাকিত না। ফলে দস্যু ও লুণ্ঠনকারীরা ইহার সুযোগ লইয়া পবিত্র মাসগুলিতেও লুঠতরাজ করিত।

(৬) কোন্ সময়ে যে এই অতিরিক্ত মাসটি জুড়িয়া দেওয়া হইত, তাহার কোনই রেকর্ড বা প্রমাণ বিদ্যমান নাই।*

* স্যার উইলিয়ম মুয়র বলিতেছেন:

"There is reason to believe that the (Arabic) year was originally lunar and so continued till the beginning of the figth century, when in imitation of the jews it was turned by the interjection of a month at the close of every third year, into a luni-solar period—" The Life of Mohammed. Page cii.

(৭) আরবী বর্ষ-গণনায় এই বিভ্রাট লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং আল্লাহ্‌ ইহার সংশোধনের জন্য এক আয়াত নাযিল করেন।* কিন্তু এই আয়াতও হিযরী ১০ম সনে অবতীর্ণ হয়, অর্থাৎ হযরতের জন্মের প্রায় ৬২ বৎসর পরে। অতঃপর ১১শ হিযরী হইতে অতিরিক্ত মাস (intercalary month) যোগ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়। কিন্তু এই নূতন গণনাপদ্ধতিও সরকারীভাবে অনুমোদিত হয় ১৭শ বা ১৮শ হিযরীতে, অর্থাৎ হযরত ওমরের খেলাফৎ সময়ে। কাজেই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, হযরতের জীবদ্দশায় আরবী বর্ষ-গণনার কোনই বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন ছিল না; যাহা ছিল, তাহাও হযরত ওমরের সময় হইতে রদ-বদল হইয়া গিয়াছিল।

(৮) শুধু আরবী পঞ্জিকারই যে সংস্কার হইয়াছে, তাহাও নহে। ইংরাজী পঞ্জিকারও (calendar) সংস্কার হইয়াছে।

এরূপ অবস্থায় কিসের উপর নির্ভর করিয়া যে এই বিষয়ে গবেষণা চলিতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে এখন কোনরূপ স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমরা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে করি।

উপরে যে-সমস্ত বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা বিবেচনা করিলে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরতের আবির্ভাবকালে আরবী পঞ্জিকায় যে গোঁজামিল ছিল, তাহার সুমীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আধুনিক কোন গবেষণাই নির্ভুল হইতে পারে না। হযরতের জন্ম-তারিখ নির্ধারিত হইয়াছিল এক পদ্ধতিতে, এখন গণনা করা হইতেছে অন্য পদ্ধতিতে। আরবী ও ইংরেজী বর্ষ গণনা-পদ্ধতির হেরফেরের দরুণই যে এই বিভ্রাট দেখা দিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখনকার গণনালব্ধ ৯ই তারিখ যে সেই যুগের গণনালব্ধ ১২ই তারিখ ছিল না, এবং ১২ই তারিখেই যে সোমবার পড়ে নাই, তাহারই বা প্রমাণ কী? এরূপ অবস্থায় বর্তমান গণনার কোন সার্থকতাই দেখি না। এরূপ গবেষণা দ্বারা চমক লাগানো যায় বটে, কিন্তু

---

* নিশ্চয় আল্লার বিধানে যেদিন আকাশ-পৃথিবীকে সৃজন করিয়াছেন, সেইদিন হইতে মাসের সংখ্যা ১২টি; ইহাদের মধ্যে চারিটি পবিত্র। ইহাই ঠিক গণনা, অতএব তাহাদের সম্বন্ধে কোন অন্যায় করিও না।—(৯ : ৩৬)

প্রকৃত সত্য নিরূপণ হয় না। বস্তুতঃ ঘটিয়াছেও তাহাই। গবেষণাকারীদের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। কেহ বলিতেছেন ২০শে এপ্রিল, কেহ বলিতেছেন ২২শে এপ্রিল, কেহ বলিতেছেন ৯ই রবিউল আউওল, কেহ বলিতেছেন ১০ই রবিউল আউওল। ইহার উপরে বৎসরের গোলমাল তো আছেই। কেহ বলিতেছেন ৫৭০ খৃষ্টাব্দ কেহ বলিতেছেন ৫৭১ খৃষ্টাব্দ।

পক্ষান্তরে ১২ই রবিউল আউওল ঠিক রাখিলেই যে ইহার মোতাবেক ইংরাজী তারিখ ২৯শে আগষ্ট ৫৭০ খৃষ্টাব্দ হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, আরবী পঞ্জিকার ন্যায় ইংরাজী পঞ্জিকারও সংস্কার করা হইয়াছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে Pope Gregory XIII খৃষ্টান ক্যালেণ্ডারের সংশোধন করেন। তখনকার গণনায় ৩৬৫ ১-৪ দিনে একটি সৌর বৎসর পূর্ণ হইত। গ্রেগরী দেখিলেন এই সিকি দিনটুকুর জন্য (সিকিও নয়, প্রকৃতপক্ষে ৫ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট) হিসাবে বড়ই গণ্ডগোল বাধে। তাই তিনি নির্দেশ দেন যে ভগ্নাংশটুকু বাদ দিয়া শুধু ৩৬৫ দিনেই এক বৎসর ধরিতে হইবে। সিকি দিনগুলি সম্বন্ধে এই বিধান দেন যে, প্রতি চতুর্থ বৎসরে একটি দিন বাড়াইয়া দিতে হইবে। ইহাকে বলা হইবে 'লিপ্ ইয়ার'। 'লিপ্ ইয়ার' বৎসরে তাই থাকে ৩৬৬ দিন। এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে না হইয়া ২৯ দিনে হয়। এই নির্দেশ দেওয়ার সময় দেখা যায়, ১১ দিনের গোঁজামিল আছে। গ্রেগরী তখন উক্ত ১১ দিনকে একদম উড়াইয়া দেন, অর্থাৎ ৩রা অক্টোবর তারিখকে ১৪ই অক্টোবর বলিয়া ঘোষণা করেন। গ্রেগরীর এই বিধান সমস্ত ক্যাথলিক দেশগুলি মানিয়া লয়, কিন্তু গ্রীক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট দেশগুলি অস্বীকার করে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড গ্রেগরীর মত অনুসরণ করিয়া ইংরাজী ক্যালেণ্ডারের সংস্কার করে। তদনুসারে ৩রা সেপ্টেম্বরকে ১৪ই সেপ্টেম্বর বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই বৎসর আরও একটি আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। এতদিন ২৫শে মার্চ হইতে খৃষ্টান বৎসর গণনা করা হইত; এবার ১লা জানুয়ারী হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হইল।"*

* এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন Encyclopaedia Britannica. Vol. IV. Article : Calendar.

আরও একটি সমস্যা আছে। প্রতিদিনের তারিখ (date-line) কোন সময় হইতে আরম্ভ হইবে, তাহাও সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। বর্তমানে রাত্রি ১২টা (Zero hour—0^H) হইতে দিন গণনা আরম্ভ হয়। কিন্তু এই 0^H সর্বত্র সমান থাকে না। Longitude-এর বিভিন্ন কোণে ইহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কিভাবে ইহা সংঘটিত হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকদের মুখ হইতেই শুনুন :—

Let us take one more example to clarify the matter. Take any day and hour at the prime meridian of Greenwitch, for instance, 7 p. m. (19^H), May 1. At this moment the time at longitude 99° ($=6^H$) West is 13^H on May 1, and farther westward yet, at 180° the time would be 7^H (7 a. m.) May 1. From Greenwitch, again, let us consider the time going eastward to a station at 60° ($=4^H$) E ; it would be 23^H (11 p m.). At 75° E, 24^H on May 1, which is 0^H of May 2 ; at 90° E, it would be 1^H, May 2 ; at 180 ; 7^H (7 a.m.), May 2. There is then, a discrepancy of 1 day in the two methods of reconing, but our reconing is correct in each. The moment the west bound traveller crosses the line, the date changes from May 1 and becomes May 2 for him ; the moment the east-bound traveller crosses the line, the date changes from May 2 and becomes May 1 to him.

—(New Handbook of the Heavens)
by Bernard-Bennett-Rice. p. 186.

অতএব আমাদের বক্তব্য এই যে, এ কথা যখন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে না যে, ৯ই রবিউল আউওল তারিখেই হযরতের জন্ম হইয়াছিল, তখন প্রায় দেড় হাজার বৎসর হইতে প্রচলিত এবং মুসলিম-জাহানের সর্বত্র স্বীকৃত ও প্রতিপালিত ১২ই রবিউল আউওল, সোমবার, তারিখকেই আমরা হযরতের জন্মদিন বলিয়া মানিয়া লইব।

পরিচ্ছেদ : ২

কা'বা-শরীফ কখন নির্মিত হইয়াছিল ?

কা'বা-শরীফ জগতের প্রাচীনতম উপাসনা-গৃহ। ইসলামের ইতিহাসে সত্যই ইহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইসলামের সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। দেহের সহিত আত্মার যে-সম্বন্ধ, ফুলের সহিত গন্ধের যে-সম্বন্ধ, প্রদীপের সহিত শিখার যে-সম্বন্ধ, কা'বার সহিত ইসলামের ঠিক সেই সম্বন্ধ। একটি ছাড়া অন্যটির কল্পনা তাই অত্যন্ত দুরূহ।

কা'বা গৃহ কখন নির্মিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। অধিকাংশ পণ্ডিতেরই মত: হযরত ইব্রাহিমই ইহার প্রথম নির্মাতা।* আবার কেহ কেহ বলেন: হযরত আদমের হস্তেই ইহা প্রথম নির্মিত হইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের মত স্বতন্ত্র। হযরত আদমের হস্তে ইহা প্রথম নির্মিত হইয়াছিল, এ কথা বলিলেও আমরা সন্তুষ্ট নই। কা'বার ইতিহাস আরও গভীর। ইহার উৎস-মুখ হযরত আদম হইতেও অনেক দূরে। কা'বা দুনিয়ার নয়, কা'বা বেহেশ্‌তের; কা'বা মানুষের নয়, কা'বা আল্লার। সত্যসত্যই ইহা 'বায়তুল্লাহ্‌' বা আল্লার ঘর। এ শুধু আমাদের অনুমান নয়, পবিত্র কুরআন-হাদিস হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"শোয়াব-উল ঈমান" নামক বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থে কা'বা-গৃহের জন্ম-ইতিহাস এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে:

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া যখন বিহিশ্‌ত হইতে দুনিয়ায় নির্বাসিত হন, তখন আদম 'সারণ' দ্বীপে (বর্তমানে সিংহলে?) এবং হাওয়া আরব দেশে পতিত হন। প্রায় একশত বৎসর উভয়ে এইরূপে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকেন। অতঃপর অনেক সাধনার পর হযরত আদম আসিয়া আরব দেশে হাওয়ার সহিত মিলিত হন। তখন আদম কৃতজ্ঞতাভরে আল্লার নিকট প্রার্থনা করেন: "হে আল্লাহ্‌, বিহিশ্‌তে অবস্থান কালে 'বায়তুল

* "কা'বা-মন্দির যে হযরত ইব্রাহিম কর্তৃকই নির্মিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।"

—মোস্তফা-চরিত, ১৫৯ পৃঃ

মামুর' নামক যে জ্যোতির্ময় মসজিদে ফিরিশ্‌তাদিগের সহিত আমি নিত্য তোমার ইবাদাৎ করিতাম, সেইরূপ একটি মসজিদ তুমি আমাকে দাও— যাহাতে দুনিয়াতেও আমরা তোমার গুণগান করিতে পারি।" আদমের এই প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেন। তখন সেই বিহিশ্‌তী বায়তুল-মামুরের একটি প্রতিকৃতি (tabernacle) দুনিয়ায় নামিয়া আসে। হযরত আদম সন্তুষ্টচিত্তে সেখানে ইবাদৎ করিতে থাকেন। একটি বেহেশ্‌তী ঝর্ণাও সেখানে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাই সেই পবিত্র 'জমজম্'।

আদমের বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং কালে কালে এখানে লোকালয় স্থাপিত হইল। আদমের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণও এই পবিত্র মসজিদকে কায়েম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে লোকেরা যখন আল্লাহ্‌তালাকে ভুলিয়া গেল, তখন আর এই মসজিদের কেহই কোন যত্ন লইল না। অবশেষে হযরত নূহের সময়ে যে-বিশ্বব্যাপী জলপ্লাবন হইল, তাহাতেই ইহা লোকচক্ষুর অন্তরালে চাপা পড়িয়া গেল। আল্লার অভিশাপে পৌত্তলিকগণও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। সমগ্র আরব-দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইল।

বহুযুগ পরে হযরত ইব্রাহিম আল্লার হুকুমে বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইলকে ঠিক এই স্থানেই নির্বাসন দিয়া আসিলেন। শিশু ইসমাইলের পদাঘাতে যে ঝর্ণাধারা উন্মুক্ত হইল, উহাই সে জমজম্। কালক্রমে এই উৎসের চতুষ্পার্শে নূতন করিয়া আরব-জাতির বসতি স্থাপিত হইল। অতঃপর হযরত ইব্রাহিম আসিয়া বিবি হাজেরা ও ইসমাইলের সহিত যখন এইখানে বসবাস করিতে লাগিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁহার সেই লুপ্ত ঘরের বা বায়তুল্লার পুনর্নির্মাণের জন্য ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ দান করিলেন। তৎক্ষণাৎ পিতাপুত্র প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু কোথায় যে সেই পবিত্র গৃহ অবস্থিত ছিল, তাহা সঠিকরূপে বুঝিতে পারিলেন না। তখন আল্লার নির্দেশ একখণ্ড মেঘ আসিয়া প্রাচীন মসজিদের স্থান নির্ণয় করিয়া দিল। পিতাপুত্র মাটি খুঁড়িয়া সেই মসজিদের ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করিলেন এবং সেই ভিত্তিমূলের উপরেই নূতন করিয়া কা'বা-গৃহ নির্মাণ করিলেন।* বর্তমান কা'বা-প্রাংগণে যে একখানি কৃষ্ণপ্রস্তর লক্ষিত হয় এবং হাজিগণ

* তফসীর-ই-হাক্কানি'তেও কা'বা-শরীফের আদি-বৃত্তান্ত মূলতঃ এইরূপই লিখিত হইয়াছে।—(দেখুন : ২১১-২১৩ পৃষ্ঠা)

যাহাকে ভক্তিভরে চুম্বন করিয়া থাকেন, অনেকের মতে সেই প্রস্তরখানি হযরত আদমের সময়কার কা'বা-গৃহেরই প্রস্তরখণ্ড বিশেষ। অতএব দেখা যাইতেছে যে কা'বা-গৃহের অস্তিত্ব হযরত ইব্রাহিমেরও বহুপূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল।

কা'বা-গৃহ যে হযরত ইব্রাহিমের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, পবিত্র কুরআন হইতেও তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। হযরত ইব্রাহিম যখন বিবি হাজেরা ও ইসমাইলকে নির্বাসন দিয়া আসেন, তখনকার কথা কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত ইব্রাহিম যতক্ষণ দৃষ্টি চলে, ততক্ষণ বারেবারে পিছন ফিরিয়া প্রিয়তমা পত্নী ও প্রাণাধিক পুত্রকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তারপর যেই তিনি দৃষ্টি সীমার বাহিরে গিয়া পড়িলেন, অমনি তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। কাতর কণ্ঠে তিনি প্রার্থনা করিলেন :

"হে প্রভু, আমি আমার সন্তান-সন্ততির এক অংশ শস্যফলহীন মরু-উপত্যকায় তোমার গৃহের সন্নিকটে রাখিয়া আসিলাম—যাহাতে তাহারা তোমার ইবাদৎ করিতে পারে, অতএব তুমি মানুষের মনকে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট কর এবং কিছু ফলমূল তাহাদিগকে দাও ; হয়ত তাহারা তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে।"*

ইহা দ্বারা বুঝা যায় : নির্বাসিত হাজেরার সন্নিকটেই যে, "আল্লার ঘর" বিদ্যমান ছিল, হযরত ইব্রাহিম তাহা জানিতেন এবং সেইজন্যই তিনি এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

* জনাব মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব স্বীয় মত সমর্থন করিতে গিয়া এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন : "হযরত ইব্রাহিম মক্কায় আসিয়াছিলেন কয়েকবার—একবার মাত্র নহে। এইরূপে কা'বা নির্মাণের পরও দেশে চলিয়া গিয়া যেবার তিনি পুনরায় মক্কায় আগমন করেন আলোচ্য প্রার্থনাটি সেইবারের।'—(মোস্তফা-চরিত : ১৬৯ পৃঃ)। এ-অনুমান আদৌ সংগত বলিয়া মনে হয় না ; কারণ তাহা হইলে হযরত ইব্রাহিম "ফলহীন" মরুভূমির উল্লেখ করিতেন না বা লোকজন যাহাতে সেখানে আকৃষ্ট হয় এবং ফলমূল মিলে, এরূপ প্রার্থনা করিতেন না। হাজেরাকে নির্বাসন দিবার পর হযরত ইব্রাহিম যখন মক্কায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন, তখন তো সেখানে লোকালয় স্থাপিত হইয়াই গিয়াছে এবং শস্যফলমূলাদি জন্মিতেছে। তখন এরূপ প্রার্থনার কোন মানে হয় না। তফসীর-ই-হাক্কানি আমাদের মত সমর্থন করিতেছেন।—(দেখুন ২১১-২১৩ পৃষ্ঠা)

"তফসীর-ই-হাক্কানিতে" ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, বিবি হাজেরা যখন বিজন মরুভূমির মধ্যে নিজেকে নিঃসহায় মনে করিয়া ভীত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন জনৈক ফিরিশ্‌তা আসিয়া কানে কানে তাঁহাকে এই আশ্বাস দিলেন: "হাজের', কাঁদিও না। এইখানেই আল্লার ঘর নিহিত আছে। তোমার পুত্র ইসমাইল বড় হইয়া এই ঘরকে পুনর্নির্মাণ করিবে।" ইহাই শুনিয়া হাজেরা আশ্বস্ত হইলেন।

হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইলের উপর আল্লাহ্‌ যখন কা'বা-গৃহ পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন, তখন আল্লাহ্‌তালা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, কা'বা-গৃহ পূর্ব হইতেই তথায় অবস্থিত ছিল। আল্লাহ্‌ বলিতেছেন:

"এবং আমরা ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ দিলাম: আমার গৃহকে পবিত্র কর.........।" —(২ : ১২৫)

কোন গৃহের অস্তিত্ব পূর্ব হইতেই বিদ্যমান না থাকিলে তাহার পবিত্র করার কথা আসিতে পারে না। বিশেষ করিয়া হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাইলের হস্তে যে-ঘর নির্মিত হইল, তাহা যে অপবিত্র ছিল, এ কথারও কোন মানে হয় না। কাজেই, এখানে যে হযরত ইব্রাহিমের পূর্ববর্তী অবস্থার কথাই বলা হইতেছে তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। হযরত ইব্রাহিম কর্তৃক কা'বা-গৃহের নির্মাণ প্রসংগেও কুরআন-পাকে যে আয়াত আছে, তাহাও এই কথারই সমর্থন করে:

"এবং যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল (কা'বা-গৃহের) ভিত্‌ উঁচু করিতেছিলেন, তখন তিনি (ইব্রাহিম) প্রার্থনা করিলেন: হে আমার প্রভু, আমাদের ইহা (এই সুকার্য) কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি শ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।" —(২ : ১২৭)

এখানে অধিকাংশ তফসীরকারই 'ভিত্‌ উঁচু করা'র অর্থ পুনর্নির্মাণ (rebuild) বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও আল্লাহ্‌ এই কা'বা-গৃহকে দুনিয়ার 'প্রথম গৃহ' (The First House) এবং 'সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গৃহ' (The Ancient House) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:

"নিশ্চয়ই মানুষের জন্য প্রথম-স্থাপিত গৃহ বাক্কার গৃহ (অর্থাৎ কা'বা) যাহা আশীর্বাদপ্রাপ্ত এবং জাতিসমূহের পথপ্রদর্শক।" —(৩ : ৯৫)

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই কা'বা-গৃহই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ; ইহার পূর্বে দুনিয়ায় আর কোন গৃহ নির্মিত হয় নাই। আদি মানব হযরত আদমের সমসাময়িক না হইলে কিছুতেই ইহাকে "মানুষের জন্য প্রথম স্থাপিত গৃহ" বলা যাইত না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলিতেছেন:

"অতঃপর তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করিতে ও পরিচ্ছন্ন হইতে বল এবং তাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালন করুক এবং 'প্রাচীন গৃহের' চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করুক।" —(২২:২৯)

ইহা হইতে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে, কা'বা-গৃহের অস্তিত্ব হযরত ইব্রাহিমের আবির্ভাবের বহুপূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল।*

কা'বা দুনিয়ার প্রথম গৃহ। আদিকাল হইতে এই 'খোদার ঘরের' অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে এবং রোজ-কিয়ামাৎ পর্যন্ত থাকিবে। কা'বা-গৃহ সত্যই 'বায়তুল মামুরের'-ই প্রতিকৃতি। কা'বার দিকে মুখ ফিরাইলে প্রকৃতপক্ষে বায়তুল মামুরের দিকেই মুখ ফিরানো হয়, আর বায়তুল মামুরের দিকে মুখ ফিরাইলে প্রকৃতপক্ষে আল্লার দিকেই মুখ ফিরানো হয়। এই জন্যই বিশ্বের মুসলমান যে যেখানেই থাকুক, কা'বা-শরীফকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিদিন নামায পড়ে। বেতার-যন্ত্র অথবা টেলিফোনের সংযোগ-গৃহের ন্যায় ইহাও একটি আধ্যাত্মিক সংযোগ-কেন্দ্র। আল্লার সহিত সংযোগ চাহিলে এই কা'বা-গৃহেই তাঁহাকে প্রথম স্মরণ লইতে হইবে। এই পবিত্র গৃহ তাই আল্লাহ্তালার চির আশীর্বাদপ্রাপ্ত পুণ্য-নিকেতন। অনন্তকাল ধরিয়া আল্লার করুণা ইহার শিরে বর্ষিত হইবে—রোজ-কিয়ামৎ পর্যন্ত এ-গৃহ কায়েম থাকিবে; তারপর ধ্যানলোকের সেই বায়তুল মামুরে পুনরায় মিলাইয়া যাইবে। মৌলানা মুহম্মদ আলি কা'বা-শরীফ সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন:

"If, on the one hand, Mecca is declared to be the First House raised on the earth for the worship of the Divine Being it is on the other announced to be *Mubarak*, which word, though ordinarily rendered as *blessed* signifies the

* কা'বা যে সত্যসত্যই 'অতি প্রাচীন গৃহ' ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ বিদ্যমান Sir William Muir বলিতেছেন:

"A very high antiqnuity must be assigned to the main features of the religion of Mecca. Although Herodotus does not refer to the Kaba yet,

continuance for ever or the blessings which a thing possesses, and thus it is the first as well as the last House in which the nations of the world have found, and will find, their true inspiration and guidance."—(The Holy Quran, p. 171)

অর্থাৎ: "একদিকে মক্কার কা'বাকে আল্লার উপাসনার জন্য জগতের 'সর্বপ্রথম গৃহ' বলা হইয়াছে, অন্যদিকে ইহাকে 'মুবারক' বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে। 'মুবারক' শব্দের সাধারণ অর্থ 'অনুগ্রহপ্রাপ্ত'। কিন্তু ইহার গূঢ় অর্থ হইতেছে কোন জিনিসের উপর চিরদিনের জন্য ধারাবাহিকভাবে (আল্লার) অনুগ্রহ-বর্ষণ। এই কারণেই ইহা জগতের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ গৃহ ; এখানেই বিশ্বের সকল জাতি যুগে যুগে সত্যিকার প্রেরণা এবং পথের দিশা পাইয়া আসিয়াছে এবং পাইবে।"

সত্যই তাই। কা'বা-শরীফ এক অপূর্ব সৃষ্টি। আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে এ এক চিরন্তন স্বর্ণসেতু। স্রষ্টার উদ্দেশ্যে সৃষ্টির নিবেদিত একটি নীরব প্রণতি অনন্তকালের জন্য যেন রূপ ধরিয়া এখানে শোভা পাইতেছে।

---

he names as one of the chief Arab divinities ALILAT, and this is strong evidence of the worship at that early period of Al-Lat, the great idol of Mecca. He likewise alludes to the veneration of the Arabs for stones. Diodorus Siculus writing about half a century before our era says of Arabia washed by the Red Sea, there is in this country a temple greatly revered by the Arabs. These words must refer to the Holy House of Mecca, for we know of no other whichever commanded such universal homage. Early historical tradition gives no trace of its first construction. Some authorities assert that the Amelekites re-built the edifice which they found in ruins and retained it for a time under their charge. All agree that it was in existence under the Jurham tribe (about the time of the Christian era) and being injured by a flood of rain, was then repaired. Tradition represents the Kaba as from immemorial the scene of pilgrimage from all quarters of Arabia."

—(The Life of Muhammad, Pp. Cii-Ciii)

মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব স্বীয় মতের বিরোধী বলিয়াই মুয়রের এই উক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু পাঠক দেখিতেছেন, মুয়র এখানে কোন খারাপ কথা বলেন নাই।

পরিচ্ছেদ : ৩

ইসলাম ও পৌত্তলিকতা

হযরত মুহম্মদকে সারাজীবন কঠোর সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ-সংগ্রামের বিরাম ছিল না। কিন্তু কিসের জন্য এই সংগ্রাম? এ-সংগ্রামের মূল কারণ কী ছিল? লক্ষ্য, উদ্দেশ্যই বা কী ছিল? ইহার পশ্চাতে ছিল কি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির তাড়না? ছিল কি কোন অহেতুক রাজ্যজয়ের বাসনা? অথবা অন্য কোন মনোবিলাস? না। সমস্ত সংগ্রামের মূল প্রেরণা ছিল পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৌহিদকে জয়যুক্ত করা। এ-সংগ্রাম তাই প্রকৃতপক্ষে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে নয়, মক্কার বিরুদ্ধে নয়, ইহুদী-খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে নয়—জগৎজোড়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। মানুষের মনের আঙিনায় যে অসংখ্য মূরৎ আল্লাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মুহম্মদ চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া আল্লাহ্ ও মানুষের চিরন্তন যোগসূত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে। ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র সাধনা। এই লক্ষ্য হইতে কোন-দিন তিনি একবিন্দু বিচ্যুত হন নাই। পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে ধরণী যখন একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল, সে সময় সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও নিঃসংগ অবস্থায় একা দাঁড়াইয়া জগতের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে তিনি তৌহিদের অগ্নিবীণা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেইদিন হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবন-বীণা একই সুরে বাঁধা ছিল। কত ভয়-ভীতি, কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন, কত প্রলোভন তাঁহার গতি-পথে বাধার বিন্ধ্যাচল রচনা করিয়াছে, কিন্তু মহাপুরুষ কোনো স্থানে এতটুকু শংকা মানেন নাই; জীবন-মরণ পণ করিয়া তিনি তাঁহার সত্যবাণীকে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কোরেশগণ কত সময় বলিয়াছে: "মুহম্মদ, যাহা চাও সব দিব, শুধু ঐ একটি কথা তোল—শুধু বল যে, আমাদের দেবতারাও সত্য।" কিন্তু মুহম্মদ বলিয়াছেন: "তোমরা যদি আমার একহাতে চন্দ্র আর একহাতে সূর্য আনিয়া দাও, তবু বলিব: একমাত্র আল্লাহ্ সত্য—তিনি ছাড়া আমাদের আর কোন উপাস্য নাই।" তায়েফবাসী পৌত্তলিকগণ বলিয়াছিল: "আমরা ইসলাম গ্রহণ করিতেছি:

কিন্তু আমাদের বুৎগুলি ভাঙিতে বড় মায়া লাগে, একটু সময় আমাদিগকে দিন।" হযরত বলিয়াছেন: "ইসলাম ও মূর্তিপূজা এক সংগে থাকিতে পারে না। যে-মুহূর্তে তুমি ইসলাম কবুল করিবে, সেই মুহূর্তেই তোমাকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিতে হইবে।" বস্তুতঃ হযরত কোন অবস্থাতেই ইসলামের মূলমন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়াছেন, সমাজ ও স্বজাতিকে ছাড়িয়াছেন, দেশত্যাগ করিয়াছেন, কঠোর বিপদকে বরণ করিয়াছেন, বারে বারে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছে, তবু তিনি আপন আদর্শ হইতে একটু স্খলিত হন নাই। পৌত্তলিকদিগকে মানুষ হিসাবে তিনি ভালোবাসিয়াছেন, তাহাদের বহু অপরাধকে তিনি ক্ষমা করিয়াছেন; এমন কি তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া দেশের কাজও করিয়াছেন কিন্তু পৌত্তলিকতার সহিত কোনদিন তিনি সন্ধি করেন নাই। আদর্শের বেলায় কোন আপোষ চলে না। অন্ধকার ও আলোকের মত ইহারা দুই পরস্পর বিরোধী বস্তু। একই স্থানে একই সময়ে উভয়ের অবস্থান অসম্ভব।

পৌত্তলিকতার সংগে ইসলামের কেন এত বিরোধ? জগতে এত পাপ, এত দুর্নীতি বিদ্যমান থাকিতে হযরত কেন এই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন?

কারণ আছে। মানুষের জীবনে পৌত্তলিকতার অভিশাপ অত্যন্ত ভয়াবহ। বহু পাপ, বহু দুর্নীতি, বহু অধঃপতনের মূলই হইতেছে এই পৌত্তলিকতা। সত্যদ্রষ্টা মুহম্মদ তাই এই পৌত্তলিকতাকে উচ্ছেদ করিবার জন্যই এত দৃঢ়সংকল্প ছিলেন।

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়: একদিকে আল্লাকে না-চেনা, অপরদিকে নিজেকে না-চেনা—এই উভয়বিধ অজ্ঞানতা হইতেই হয় পৌত্তলিকতার জন্ম। আল্লাই যে 'রব', আল্লাই যে আমাদের জীবন-মরণের প্রভু, তিনি ছাড়া আমাদের যে আর কোন গতি নাই, সহায় নাই, শরণ নাই, বিশ্ব-নিখিল যে তাঁহারই সৃষ্টি এবং সবার উপরে যে একমাত্র তাঁহারই প্রভুত্ব বিরাজমান, এই সহজ এবং স্বাভাবিক সত্যোপলব্ধির অভাবই হইতেছে পৌত্তলিকতার মূল। মানুষ যদি জানে এবং মানে যে আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান, যাহা কিছু চাহিতে হয়, তাঁহারই কাছে চাহিতে হয়, তবে কেন সে আল্লাকে ছাড়িয়া অপর কাহারও শরণাপন্ন হইবে? আল্লাহ্-মানা লোক কখনও পৌত্তলিক হইতে পারে না।

পৌত্তলিক নিজেকেও চেনে না। নিজে কত বড় তাও সে জানে না। আত্মবিস্মৃত রাজপুত্রের মত সে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়। সে জানে না তার মধ্যে কী অসীম শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে। সে জানে না সে ছোট নয়, তুচ্ছ নয়—সে 'আল্লার প্রতিনিধি', সে আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—আশ্‌রাফুল্‌-মাখ্‌লুকাৎ। সে জানে না তাহার চেয়ে অন্য কেহ বড় নয়, অন্য কেহ নমস্য নয়; চন্দ্র-সূর্য, মেঘবিদ্যুৎ, গিরিনদী, মরুপ্রান্তর—জড়প্রকৃতির সমস্তই তাঁহার আয়ত্তাধীন—সকলেই তাঁহার সেবায় নিয়োজিত।* একদিকে আল্লাকে সর্বশক্তিমান বলিয়া না-মানা, অপরদিকে নিজেকে ছোট বলিয়া জানাই হইতেছে পৌত্তলিক মনোবৃত্তির দুই প্রধান উপাদান।

অতএব সত্যকার মানুষ হইতে হইলে এবং আমাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির সম্যক্ পরিস্ফুরণ করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন—এই অসীম অনন্ত এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাকে জীবনের মধ্যে বরণ করিয়া লওয়া এবং তাঁহার সহিত আত্মার নিবিড় যোগস্থাপনা করা: উন্নত মস্তকে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করা: আমি মানুষ, আমার চেয়ে দেবতা বড় নয়, দেবতার চেয়ে আমি বড়। অসীম, অনন্ত ও বিরাটের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে কেমন করিয়া মানুষ বড় হইবে? বড়র সহিত যুক্ত না হইলে কখনও বড় হওয়া যায় না।

মানব-জীবনে এই অসীমের অনুভূতির প্রয়োজন আছে। মানুষের দুইটি অংশ: জড় এবং চৈতন্য (Matter and Spirit)। এই দু-এর সমন্বয়েই তাহার সৃষ্টি। জড়দেহের পুষ্টির জন্য যেমন তাহার স্থূল খোরাকির প্রয়োজন, চিন্ময় সত্তার পরিপুষ্টির জন্যও তেমনি তাহার আধ্যাত্মিক খোরাকির প্রয়োজন। এই খোরাক আর কিছুই নয়—সেই অসীম অনন্ত

---

* "এবং যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিলেন: আমি দুনিয়ায় (আমার) প্রতিনিধির সৃষ্টি করিব।" —(২:৩০)

"এবং তিনি—যিনি তোমাদিগকে জগতে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন।" —(৩৫:৩৯)

"এবং তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদের অধীন করিয়াছেন রাত্রিকে, দিনকে, সূর্যকে, চন্দ্রকে এবং তারকাদিগকে তাঁহার আদেশ অনুসারেই তোমাদের অধীন করা হইয়াছে। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে চিন্তাশীলদিগের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।" —(১৬:১২)

নিরাকারের স্পর্শানুভূতি এই জ্যোতিঃসাগরের সহিত আমাদের জীবন ধারায় যোগ রাখা তাই নিতান্ত অপরিহার্য। সেই যোগসূত্র ছিন্ন হইলে মানুষ তখন আর চলমান থাকে না, বদ্ধপংক পুষ্করিণীর মত পঙ্গু, অচল হইয়া পড়ে। সে তখন আর পরিপূর্ণ মানুষ থাকে না, অর্ধাংশ হইয়া যায়; তাও নিকৃষ্ট অর্ধাংশ—যাহা সাধারণ পশুদের মধ্যেও বিদ্যমান। কাজেই নিরাকার আল্লার ধ্যান ও ধারণা —সে যতই অস্পষ্ট হউক না কেন—মানুষের জীবনের এক মস্তবড় সম্পদ। আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীতে যে অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় রহস্যলোক রহিয়াছে, মানুষ যদি তাঁহার সন্ধানই না পাইল, জড়-জীবনের সংকীর্ণ পিঞ্জরের মধ্যে যদি সে চিরকাল সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল,—অসীম অনন্ত আকাশে যদি তাহার মনোবিহংগ রঙীন পাখা মেলিয়া উড়িতেই না শিখিল, তবে আর তার এমন কী-ই-বা গৌরব!

আমার বাহ্যতঃ যাহা দেখি বা শুনি, তাহাতেই আমাদের সকল দেখাশুনা শেষ হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে এক গোপন রহস্যলোক আছে। সে অতীন্দ্রিয় লোকে পৌঁছিতে পারিলেই আমাদের মনুষ্যজীবন সার্থক ও পরিপূর্ণ হয়। অদৃশ্যে বিশ্বাস সেই লোকে পৌঁছিবার একমাত্র খেয়া তরী। সেই তরীতে একটি সূক্ষ্ম মনেরই স্থান আছে, অন্য কোন স্থূল বস্তু সংগে লইবার উপায় নাই, নিলেই তরীর ভরাডুবি হয়। যাত্রীকে তাই সর্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া হালকা হইতে হয়। সাকার মূর্তি বা জড়পূজা এইজন্যই আমাদিগকে বর্জন করা দরকার। আত্মার উন্নয়নে এ বাধা দেয়।

অনেকে বলেন: নিরাকারকে ধারণা করিতে পারি না, তাই একটা মূর্তি দিয়া তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি। কিন্তু নিরাকারকে বিশুদ্ধ-ভাবে ধারণা করা যদি কঠিন হয়, তবে সেই নিরাকারকে আকার দিয়া ধারণা করা তো আরও কঠিন—আরও অসম্ভব। যাইতে চাই আকাশে, পথ ধরি পাতালের: বুঝিতে চাই আলোককে, ধ্যান করি আঁধারের। কোন লক্ষ্যবস্তুকে পাইতে হইলে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আরেক বস্তুদ্বারা তাহার বাস্তব উপলব্ধি (Positive Realisation) কিরূপ করিয়া সম্ভব? কাজেই নিরাকারকে উপলব্ধি করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইবে সাকারকে মনের সম্মুখ হইতে সরাইয়া দেওয়া। নিরাকারকে ধারণা করিতে পারি না—এই উপলব্ধিই তো নিরাকারের ধারণা। নিরাকারকে যদি ধারণা করিতেই পারিতাম, তবে আর সে নিরাকার রহিল কোথায়?

যে নিরাকারকে ধারণায় ধরা যায়, সেও তো সাকার। সেও তো সংকীর্ণ। তাই যাহারা নিরাকারকে আকার দিয়া ধরিতে চায়, তাহারা ভ্রান্ত। তবে এ কথা ঠিক যে, সাকারকে অস্বীকার করিলেও নিরাকারকে ধ্যান করা যায় না। সমস্ত জ্ঞান আমাদের দ্বন্দ্বধর্মী। আলোককে বুঝিবার জন্য যেমন আঁধারের প্রয়োজন, নিরাকারকে বুঝিবার জন্য তেমনি সাকারের প্রয়োজন। সাকারকে এই আলোকে গ্রহণ করিলে দোষ নাই; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার করিলে দোষ হয়।

স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সান্ত হইতে অনন্তে, সীমা হইতে অসীমে ছুটিয়া চলাই মানব-মনের চরম লক্ষ্য ও পরিণতি। প্রত্যেক বস্তু তাহার বিপরীতকে খুঁজিবে —ইহাই দার্শনিক সত্য। শুধু দর্শন নহে, বিজ্ঞানও আজ সেই কথাই বলে। "Dematerialisation of Matter" অর্থাৎ জড় হইতে অজড়ে পৌঁছানই বিজ্ঞানের নবতম সাধনা। মানব-জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতিও তাই। সে সসীম, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই সে চাহিবে অসীমের স্পর্শ, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। আকারবিশিষ্ট মানুষ তাই আর এক আকারকে পূজা করিতে পারে না। পৌত্তলিকতা এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সীমা হইতে অসীমে না ছুটিয়া অসীমকেই সে সসীম করিতে চায়! সত্য-উপলব্ধির এই বিপরীতমুখিতাই পৌত্তলিকতার প্রধান অভিশাপ।

প্রত্যেক মানুষের মনের কোণে স্বভাবতই একটা দূরের পিয়াসা জাগিয়া আছে। সান্তকে লইয়া সে বেশিদিন শান্ত হইয়া থাকিতে পারে না, অনন্তের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। পৌত্তলিকতা আমাদের এই অনন্তের স্বপ্নকে ভাঙিয়া দেয়, জীবনের দিকচক্রবালকে সে সংকীর্ণ করিয়া আনে; মানুষের শক্তি ও সাহস সীমাবদ্ধ হইয়া আসে; স্থূলকে অতিক্রম করিয়া সে আর ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। মাকড়সা যেমন তাহার চারিপাশে জাল বুনিয়া নিজেকে বন্দী করিয়া রাখে, পৌত্তলিক মন তেমন করিয়া কুসংস্কারের জালে জড়াইয়া যায়। বাহিরে তাহার বিশাল জগৎ পড়িয়া থাকে, কিন্তু তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না, একটা আবরণ আসিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। এইরূপে যখন অসীমের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়, চিত্ত-মুকুরে আর যখন অনন্তের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয় না, তখন স্বভাবতই মানুষ আপনার জড়জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসে। কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য প্রভৃতি যাবতীয় স্থূল প্রবৃত্তিগুলিই তখন প্রবল

হইয়া দেখা দেয়; মানুষ তখন আর ঊর্ধ্বমুখীন হইতে পারে না; দেহের ক্ষুধাকেই সে চরম এবং পরম বলিয়া মনে করে। তখন হিংসা দ্বেষ ব্যভিচার-অবিচার প্রভৃতি পশুজীবনের যাবতীয় পাপ ও দুর্নীতি আসিয়াই তাহাকে ঘিরিয়া ধরে। এইরূপে তাহার নৈতিক মৃত্যু ঘটে; পৌত্তলিকতার কুফল বর্ণনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাই ঠিকই বলিয়াছেন :—

মুগ্ধ, ওরে, স্বপ্ন ঘোরে
যদি, প্রাণের আসর-কোণে
ধূলায়-গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে,
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগযুগান্তরে।

অতএব আমাদিগকে অসীম, অনন্ত ও নিরাকারের ধেয়ানী হইতে হইবে; শুধু স্থূলদর্শী বস্তুতান্ত্রিক হইলে চলিবে না, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আমাদের চাই-ই চাই। নিরাকারের ধারণা তো অস্পষ্ট হইবেই, তবু ইহাকে বর্জন করা চলিবে না: সবকিছু সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতে চাওয়াও মানুষের আর-এক অভিশাপ। উহাতে আনন্দ নাই। আমাদের অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি উহাতে আড়ষ্ট হয়। এইজন্য অস্পষ্টতাও আমাদের জীবনে একান্ত প্রয়োজন। ঈমান-বিল্-গায়িব বা বিরাট অজানাতে বিশ্বাস তাই আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন।

পৌত্তলিকতার আর একটি অভিশাপ: মানুষকে সে ভীরু, দুর্বল ও দাসভাবাপন্ন করিয়া তুলে। অসংখ্য দেবতাকে বড় বলিয়া স্বীকার করিতে করিতে ভিতর হইতে সে একেবারে মরিয়া যায়। নিজেকে কত হীন ভাবিলে সামান্য একটা শিলাখণ্ডকে বড় বলিয়া প্রমাণ করা যায়। একজন চৌকিদার ও রাজপ্রতিনিধিতে যে প্রভেদ, একজন পৌত্তলিক ও নিরাকারবাদীতে সেই প্রভেদ। চৌকিদার পথে বাহির হইলেই দেখিতে পায়: চতুর্দিকে তাহার অসংখ্য প্রভু বিদ্যমান। সকলকেই তাই সে 'সেলাম' করিয়া চলে। গ্রামের মোড়ল হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাট পর্যন্ত সকলেই তাহার মনিব—সকলেরই সে ভৃত্য। কিন্তু রাজপ্রতিনিধির মন

এই দাসমনোভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি জানেন, স্বয়ং সম্রাটের পরেই তাঁহার স্থান—একমাত্র সম্রাটই তাঁহার নমস্য; সম্রাট ছাড়া আর সকলের উপরেই তিনি প্রভুত্ব করিবার অধিকারী। পদমর্যাদা ও শক্তির গৌরবে তাই তিনি উচ্চশির।

পৌত্তলিকতা মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকেও বিকৃত ও কলুষিত করিয়া তুলে। সকল মানুষ যদি একথা বুঝিতে পারিত যে, একই উৎস-মুখ হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে, তবে এ কথাও স্বতঃসিদ্ধভাবেই স্বীকৃত হইত যে, তাহাদের সকলেরই জন্মগত অধিকার সমান, সকলেই তাহারা ভাই ভাই। বিচিত্র এবং বিভিন্ন হইয়াও পুষ্পমালার মত তাহারা একই মিলন-সূত্রে গ্রথিত থাকিতে পারিত। কিন্তু পৌত্তলিকতা সেই নিগূঢ় ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দেয়। পৌত্তলিকতা বহুত্বেরই প্রতীক; কাজেই পৌত্তলিক হইলেই তাহার মনের চারিপাশে খণ্ডতার স্বপ্ন ভিড় জমায়। নানা দলে নানা সম্প্রদায়ে গোটা সমাজ বিভক্ত হইয়া পড়ে; জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। একটা পুরোহিত শ্রেণী বা অভিজাত সম্প্রদায় আপনা-আপনি গড়িয়া উঠে; তাহারাই দেয় সমাজ-বিধান, তাহারাই হয় সমাজ-নেতা। বিস্ময় লাগে সেইখানে—যেখানে কোটি কোটি মানুষ এই মুষ্টিমেয় পুরোহিতদলকে অম্লানবদনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লয় এবং নিজদিগকে সত্যসত্যই ছোট ভাবিয়া পশ্চাতে হটিয়া আসে। যুগযুগান্তের মত তাহাদের মনে ক্ষুদ্রত্বের ছাপ পড়িয়া যায়, তাহারা আর ভাবিতেই পারে না যে, কোন কালে তাহারা বড় ছিল অথবা বড় হইতে পারে। আল্লাহ্ যে তাহাদিগকে ছোট করেন নাই, ইচ্ছা করিলে তাহারাও যে আর-দশজনের মতই বড় হইতে পারে—এ বিশ্বাস তাহাদের মন হইতে মুছিয়া যায়। কোটি কোটি মানুষ এমনই করিয়া পৃথিবী হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহাদের শক্তি জাতির বা দেশের কোন কাজে লাগে না। জনশক্তির এই বিরাট অপচয়ের জন্য পৌত্তলিকতা বহুলাংশে দায়ী।

পৌত্তলিকের দেশসেবা বা স্বাদেশিকতাও খুব উন্নত ধরণের হইতে পারে না। স্বদেশ-প্রেমও তাহার হাতে লাভ করে একটা সংকীর্ণ সাকার রূপ। দেশের অর্থে সে বুঝে দেশের মাটিকে—দেশের মানুষকে নয়। স্বদেশ তাহার নিকটে দেশ-মাতৃকা বা দেশ-জননী রূপে প্রতিভাত হয়। স্বদেশ-প্রীতি তখন স্বদেশ-পূজায় পরিণত হয়। একটা উৎকট পৌত্তলিক

ভংগিতে তখন লোকেরা স্বীয় দেশকে দেখিতে আরম্ভ করে। ইহারই ফলে জন্মলাভ করে অন্য দেশ ও অন্য ধর্মের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ। এই উৎকট স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে বিশ্বকবি ইকবাল কী সুন্দরই না বলিয়াছিলেন :

"ইন্ তাজা খোদাউ মে বড়া সব্ সে উহ্ ওতান হ্যয়
যো পিরহান উসকা হ্যয় উহ্ মজহাবকা কাফন হ্যয়।"

(অর্থাৎ : এই সব তাজা দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেবতা হইল স্বদেশ। স্বদেশের যাহা রূপসজ্জা, ধর্মের তাহাই কাফন।)

কাব্য, সংগীত, শিল্প, ললিত-কলা—যে-কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন, পৌত্তলিকতার অভিশাপ সর্বত্রই সমান। যেখানে সে ঢুকিবে, সেখানেই সে আনিবে মনের খর্বতা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতা। পৌত্তলিক কবি কখনও অতীন্দ্রিয় লোকের খবর দিতে পারে না; তাহার কাব্যে থাকে শুধুই বস্তুতান্ত্রিকতা। সে কখনও মরমপন্থী হইতে পারে না। সংগীতেও ঠিক তাই। শ্রেষ্ঠ সংগীতের লক্ষণ হইতেছে অনির্বচনীয়কে রূপ দেওয়া; শুধু আভাসে, শুধু ইংগিতে সেই চির-অব্যক্তকে ব্যক্ত করা। কিন্তু কোন পৌত্তলিক গায়কের কণ্ঠে ইহা প্রায়ই সম্ভব হয় না। নিরাকারবাদী ও স্বপন-বিলাসী কোন দরদী সুরশিল্পীর মিহিন সুরের জাল পাতিলে কোন কালেও সেই কল্পলোকের মায়াপরীরা ধরা দেয় না।

মোটের উপর যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, পৌত্তলিকতা মানুষের আত্ম-বিকাশের পথে মস্ত বড় বাধা। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মানুষকে সে অগ্রসর হইতে দেয় না; পদে পদে তাহাকে পিছনের দিকে টানে।

পৌত্তলিকতার এই বিষময় ফল বুঝিতে পারিয়াই মহামানব হযরত মুহম্মদ পৌত্তলিকতাকে বর্জন করিবার জন্য এতটা তাগিদ দিয়া গিয়াছেন। পৌত্তলিকতা বর্জন করিলে মানুষের যে কী কল্যাণ হয়, ইসলামের ইতিহাস তাহা ভাল করিয়াই জগতকে দেখাইয়াছে। শৌর্য, বীরত্ব ও সাহস; ধর্ম, সত্য, ন্যায় ও নীতি; ত্যাগ, সেবা, সংযম ও সততা; প্রতিভা, বুদ্ধি, বিদ্যা ও কৌশল; সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও কাব্য - সর্বক্ষেত্রেই তাহার অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলিয়া যায়।

কেমন করিয়া দিকে দিকে ইসলামের বিজয়-নিশান উড়িল? কেমন করিয়া মুষ্টিমেয় আরব-সন্তান দিগ্বিজয় করিল? আটলান্টিক হইতে কেপ কুমারিকা পর্যন্ত কেমন করিয়া তাহাদের পদানত হইল? তারেক, মুসা, খালেদ, অলিদ,

আলি, হামজা, সুলতান মাহ্মুদ, মুহম্মদ ঘোরী, কাসেম, কুতবুদ্দীন, বখ্তিয়ার, আকবর, চাঁদ-সুলতানা, আওরঙ্গজেব—কেমন করিয়া এতগুলি প্রতিভা জন্মলাভ করিল? কেমন করিয়া হাফিজ, রুমী, ওমর-খৈয়াম, ইবনে-রুশ্দ, আবুসিনা প্রভৃতি মনীষীর আবির্ভাব হইল? তানসেন, আমীর খসরু, সনদ, রুদ্র প্রভৃতি অসংখ্য সুর-শিল্পী কেমন করিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল? কেমন করিয়া তাজমহল, জুমা-মস্জিদ ও আল্হাম্‌রা রচিত হইল?

এক কথায় বলিব: পৌত্তলিকতাকে বর্জন করিয়া—তৌহিদের ইস্মে আযম লাভ করিয়া।

এস তবে, হে মানুষ, তোমার ঐ হাতে-গড়া পাষাণ-প্রাচীরকে ভংগ করিয়া উদারমুক্ত নীল আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াও। আল্লার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে সারা প্রাণ দিয়া ঘোষণা কর: "হে বিশ্বনিয়ন্তা প্রভু! তুমি ছাড়া আমাদের আর কেহ মা'বুদ নাই। একমাত্র তোমাকেই আমরা ইবাদৎ করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" আল্লাকে এইরূপে আমাদের সাধারণ কেন্দ্র বলিয়া মানিয়া লইলেই আমরা পরস্পর ভাই হইব, আমাদের সকল বৈষম্য দূরে যাইবে; বিশ্ব আমাদের স্বদেশ হইবে, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও মহামানবতার স্বপ্ন সেইদিন আমাদের সফল হইবে।*

---

* এই প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে পৌত্তলিকতাকে দেখা হইয়াছে। ইসলাম কী তাহা বুঝিতে হইলে পৌত্তলিকতার সহিত তাহার কোথায় কতটুকু বিরোধ তাহা জানিতেই হয়। সেই হিসাবেই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে। ধর্ম হিসাবে পৌত্তলিকতাকে নিন্দা করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। অপর কোন ধর্মকে নিন্দা করা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ।

পরিচ্ছেদ : ৪

ইসলাম ও মো'জেজা

ইসলামের সহিত মো'জেজার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে মো'জেজাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মো'জেজাকে অস্বীকার করিলে ইসলামের অনেক মূলবস্তুকেই অস্বীকার করা হয়। ইসলামের সত্য ধারণাও ইহাতে সম্ভব হয় না। মো'জেজায় বিশ্বাস তাই মুসলমানের ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশ।

ইসলামের সমস্ত ধ্যান-ধারণার উপরেই এই মো'জেজা বা অলৌকিকের ছাপ আছে। আল্লাহ্ যে মাত্র একটি 'কুন্' শব্দ দ্বারা অনস্তিত্বের মধ্য হইতে এই বিচিত্র বিশ্ব রচনা করিয়াছিলেন, হযরত আদমকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে যে বিবি হাওয়াকে পয়দা করিয়াছিলেন, বেহেশ্ত হইতে যে আদম-হাওয়া দুনিয়ায় নামিয়া আসিয়াছিলেন, হযরত নূহের সময় যে ভীষণ তুফান হইয়াছিল, নমরূদ কর্তৃক হযরত ইব্রাহিম যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অক্ষত দেহে তাহার মধ্যে বাঁচিয়া ছিলেন, হযরত মুসা যে তুর পাহাড়ে আল্লার নূরী দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তস্থিত লাঠি যে মাটিতে পড়িয়াই সর্পাকৃতি ধারণ করিয়াছিল, নীলনদের পানি যে দুইভাগ হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এবং হযরত মুসা যে বনি-ঈসরাইলদিগকে লইয়া তাহার মধ্য দিয়া হাটিয়া নদী পার হইয়া গিয়াছিলেন, বিনা পিতায় বিবি মরিয়মের গর্ভে যে হযরত ঈসার জন্ম হইয়াছিল, হযরত মুহম্মদ যে আল্লার নূর হইতে পয়দা হইয়াছিলেন, শৈশবে ফিরিশ্তারা আসিয়া যে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিল, তিনি যে সশরীরে মি'রাজে গিয়াছিলেন, জিব্রাইল ফিরিশ্তা যে তাঁহার নিকট আল্লার বাণী পৌঁছাইয়া দিতেন,—ইত্যাদি সমস্তই তো অলৌকিক ব্যাপার! ইহার কোন্‌টিকে মুসলমান অস্বীকার করিবে?

আলাহ্তালা কুরআন মজিদের প্রথমেই তাই মুসলমানদিগের ঈমান বা বিশ্বাসের উপর তাগিদ দিয়াছেন। সত্যকার মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন:

"নিশ্চয়ই এই কিতাব (কুরআন)—যাহাতে কোন সন্দেহ নাই—সেই সব লোকের জন্য পথপ্রদর্শক—যাহারা আল্লাকে ভয় করে; যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, এবং প্রার্থনা করে, এবং আমি যাহা তাহাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে দান করে; এবং তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি যে-সব বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে; নিশ্চয়ই তাহাদের পরকাল সম্বন্ধে কোন চিন্তা নাই।" --(২ : ৪)

উপরোক্ত আয়াত হইতে এই কথাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে আদর্শ মুসলমান হইতে হইলে 'ঈমান-বিল্-গায়িব' বা অদৃশ্যের বিশ্বাস আমাদের অপরিহার্য।

আমাদিগকে প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে আমরা যাহা-কিছু দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহার অতীতেও না-দেখা ও না-শোনা অনেক কিছু আছে। অন্য কথায় আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নয়, যাহা জানি এবং যাহা জানি না, যাহা দেখি এবং যাহা দেখি না—সমস্তটা একত্র করিলে তবে আমাদের জ্ঞানের পরিধি নির্ণীত হইতে পারে। চীনীয় ধর্ম-প্রচারক কন্‌ফুসিয়াস্ তাই সত্যই বলিয়াছেন:

"To know what we know and to know what we do not know—that is wisdom."

অর্থাৎ: যাহা জানি তাহা জানা এবং যাহা জানি না, তাহা জানা—ইহারই নাম জ্ঞান।

কাজেই যেটুকু দেখি বা যেটুকু শুনি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যদি আমরা বলি, ইহার বাহিরে আর কিছুই নাই, তবে তাহা নিছক বেকুফি ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের দৃষ্টি এবং শ্রবণের অন্তরালে আর একটি অজানা রহস্যলোক আছে—যেখানে বসিয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অনেক কিছু কুদ্রৎ প্রকাশ করিতেছেন।

অতএব, এই না-দেখা-না-শোনাকে স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে যাত্রা শুরু করিতে হইতেছে। অদৃশ্যে বিশ্বাস ছাড়া এমন কি সাধারণ জ্ঞানও আমরা অর্জন করিতে পারি না। পৃথিবী যে গোলাকার তাহা কেহই আমরা দেখি নাই; পুস্তকের কথায় অথবা শিক্ষকের কথায় বিশ্বাস করিয়া এ-জ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছি। এইরূপ চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের জ্ঞানের দুই-তৃতীয়াংশই এইরূপ বিশ্বাস বা অথরীটি (authority) হইতে প্রাপ্ত।

এই অজানাকে অস্বীকার করিলে আমাদের কী দশা ঘটে, আল্লাহ্ তাহাও বলিয়া দিতেছেন :

"নিশ্চয়ই যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে সতর্ক করা না-করা সমান, তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। আল্লাহ্ তাহাদের অন্তর এবং শ্রবণের উপর সিলমোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চোখের উপর আবরণ টানিয়া দিয়াছেন এবং পরকালে তাহাদের জন্য ভীষণ শাস্তি আছে।" —(২ : ৭)

বাস্তবিক অবিশ্বাসী হইলে আমাদের কল্যাণ নাই। না-দেখিয়া না-শুনিয়া কিছুই বিশ্বাস করিব না—এরূপ বলিয়া আমরা যদি সব-কিছু বর্জন করি, তবে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের শাস্তিভোগ করিতে হয় প্রচুর। এরূপ করিলে আমাদের হৃদয় এবং শ্রবণ রুদ্ধ হইয়া যায়, আমাদের নয়নে অন্ধ যবনিকার আড়াল পড়ে, আমরা তখন যাহা দেখি এবং যাহা শুনি, তাহার বাহিরে আর কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাই না, আমাদের অনুভূতি নষ্ট হইয়া যায়, অজানাকে জানিবার জন্য মনে আর কোন কৌতূহল জাগে না, আমাদের আত্মা আর অনন্তের পথে উধাও হয় না। আমাদের জীবনের পরিসর সংকীর্ণ হইয়া আসে, নব নব আবিষ্কারের প্রেরণা আমরা পাই না ; সম্ভাবনার যে বিরাট জগৎ এখন অনাবিষ্কৃত অবস্থায় বাহিরে পড়িয়া আছে, চিরদিনের মত তাহা আমাদের নিকট রুদ্ধ হইয়া যায়। আমাদের অন্তর, শ্রবণ ও নয়ন চাপা পড়িয়া গেলে এই দশাই ঘটে, আমরা তখন পশুদের মত মাটির পৃথিবীকেই আঁকড়িয়া ধরি। এর চেয়ে চরম শাস্তি মানুষের পক্ষে আর কী আছে ?

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এত বড় সতর্কবাণী লাভ করা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অনেকেই এই না-দেখা ও না-শোনাকে বিশ্বাস করিতে চান না। মানবীয় জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ জানিয়াও তাঁহারা মনে করেন : তাঁহারা যাহা দেখেন বা শোনেন তাহার বাহিরে আর-কিছু দেখিবার বা শুনিবার নাই। পাশ্চাত্ত্য জড়-বিজ্ঞান এই মনোভাবকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। "জ্ঞান-চাক্ষুষ সত্য বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিপরীত" হইলেই তাঁহারা আর কোন-কিছুকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন। যুক্তি-জ্ঞানকেই তাঁহারা সত্য নির্ণয়ের মাপকাঠি বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু ইহাই যে সত্যকার বৈজ্ঞানিক মনোভংগি, তাহাও তো নয়। "জ্ঞান চাক্ষুষ সত্য ও অভিজ্ঞতার বিপরীত" হইলেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে, এ কথা আর যে-কেহই বলুক, কোন বৈজ্ঞানিক বলিবে না। বৈজ্ঞানিকের মনের দরজা সব সময় খোলা থাকে; সহজে কাহাকেও সে প্রত্যাখ্যান করে না। 'সমস্তই সম্ভব'—ইহাই হইতেছে বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিলে তাহার কোন আবিষ্কারই আর সম্ভব হয় না। কাজেই অদৃশ্য ও অনাগতের উপর বৈজ্ঞানিকের প্রগাঢ় বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক আগে কল্পনাবলে একটি hypothesis খাড়া করে, তারপর তাহারই উপর গবেষণা করিতে থাকে। এইরূপেই নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে যে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে, একই রূপ কারণ ঘটিলে যে একই রূপ কার্য ঘটিবে, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের বলিষ্ঠ বিশ্বাস থাকে। কাজেই, গোড়াতেই তাহাকে যাত্রা করিতে হয় এই বিশ্বাসের পুঁজি লইয়া; বিশ্বাস হারাইলে সে একদম পঙ্গু হইয়া পড়ে। যুক্তির ভিতরেও বিশ্বাস আছে। যুক্তিতে যাহা পাই, তাহা যে সর্বত্র একইরূপ ক্রিয়া করিবে, এই বিশ্বাস না থাকিলে বৈজ্ঞানিক যুক্তিও অচল হয়। এ সম্বন্ধে বর্তমান যুগের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক Prof. A. N. Whitehead কী বলিতেছেন, শুনুন:

> "It is the faith of every one of us that at the base of things we shall not find mere arbitrary mystery. The faith in the order of nature which has made possible the growth of science is a particular example of a deeper faith."
>
> —(Science and Modern World, Pp. 30-31)

অর্থাৎ: আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সমস্ত জিনিসের মূলে গিয়া আমরা কোন খামখেয়ালের পরিচয় পাইব না। প্রকৃতির শৃঙ্খলার উপর এই আস্থা—যাহা না হইলে কোন বৈজ্ঞানিক প্রগতিই সম্ভব হইত না—আমাদের অন্তরের গভীরতার বিশ্বাসেরই একটা সুন্দর নিদর্শন।

বাহির হইতে কোন সত্যবাণীও যে আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারে, বিজ্ঞান তাহাও অবিশ্বাস করে না। অনেক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন:

"Science will not exclude the possibility of authentic

messages from without. Cautious in accepting or rejecting theories within her own recognized domain, she will be even more cautious before rejecting, as well as before accepting, theories which relate to the vast region that lies as yet outside."

—(Belief and Action—Viscount Samuel, P. 49)

অর্থাৎ : বাহির হইতে কোন সত্যবাণী আসিবার সম্ভাবনাকে বিজ্ঞান কখনও অস্বীকার করে না। তাহার নিজ সীমার অন্তর্ভুক্ত কোন মতবাদকে স্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করিতে সে যেমন হুঁশিয়ার, তাহার এলাকার বহির্ভূত এবং আজাবধি অনাবিষ্কৃত কোন মতবাদকে স্বীকার বা অস্বীকার করিতে সে তদপেক্ষা আরও হুঁশিয়ার।

ইহাই যদি হয় বিজ্ঞানের স্বরূপ, তবে বিজ্ঞানের নামে কি করিয়া সেই বিরাট অজানা জগতকে অস্বীকার করা যায়?

বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকদের জানার গর্ব আজ বড় নয়। সকল বৈজ্ঞানিক আজ অকুণ্ঠচিত্তে এই কথা বলিতেছেন: "We do not know"—আমরা জানি না।

এই কথার মধ্যে মানবীয় জ্ঞানের অপূর্ণতার সুরই ধ্বনিত হইতেছে। জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা মানুষ চির-অজ্ঞান চির-অজ্ঞেয়কে কিছুতেই আজ ধরিতে পারিতেছে না, যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার লক্ষ্যবস্তু আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে। তাই এই হাহাকার।

যুক্তিজ্ঞান বা চিন্তা যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ সত্য দিতে পারে না, ইহা দার্শনিক সত্য। খ্যাতনামা ভারতীয় দার্শনিক Sir Radhakrishnan সত্য-নির্ণয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন:

"Thought itself is self-contradictory or inadequate. Thought is incapable of giving us the whole of reality. The "*that*" exceeds the "*what*" in Bradly's words. Thought gives us knowledge and not reality···What thought reveals is not opposed to reality, but is revelatory of a part of it. Partial views are contradictory only because they are partial. They are true so far as they go, but

they are not the whole truth. Reality can be apprehended by a form of feeling or intuition." —Indian Philosohpy, P. 42-43.

অর্থাৎ: চিন্তা নিজেই আত্মবিরোধী ও অসম্পূর্ণ। চিন্তা আমাদিগকে সম্পূর্ণ সত্য দিতে পারে না। দার্শনিক ব্রাডলির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "তাহা" চিরদিনই "কী"কে অতিক্রম করিয়া আছে। চিন্তা আমাদিগকে সত্যের জ্ঞান দান করে বটে, কিন্তু সে শুধু জ্ঞানই—আসল সত্য নয়। চিন্তা যাহা ধরিয়া দেয় তাহা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত নয় বটে, কিন্তু আংশিক। আংশিক সত্য আংশিক বলিয়াই পরস্পর-বিরোধী। তাহারা তাহাদের সীমানার মধ্যেই সত্য, কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারাই সত্যকে পাওয়া যায়।

Sir Radhakrishnan আরও বলেন:

"It is when thought becomes perfected in intuition that we catch the vision of the real."

অর্থাৎ: জ্ঞান যখন প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে আসিয়া পূর্ণ হয়, তখনই আমরা সত্যের দেখা পাই।

অবস্থা যখন এই, তখন জ্ঞানবিজ্ঞানের নামে মো'জেজাকে বিশ্বাস না করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নহে কি? জগতের কোন্ বস্তুটি বা কোন্ ঘটনাটি অলৌকিক নয়? মাটি ফুঁড়িয়া গাছ বাহির হইতেছে, ডালপালা উঠিতেছে, শাখায় রং-বেরং-এর ফুল ফুটিতেছে, প্রতিদিন সূর্য উঠিতেছে, আবার ডুবিয়া যাইতেছে, আবার পরদিন কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময়ে পূর্বাকাশে দেখা দিতেছে, বাতাসকে দেখিতে পাইতেছি না অথচ অনুভব করিতেছি যে সে আছে, মেঘেরা দল বাঁধিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আবার বৃষ্টি-ধারায় নামিয়া আসিয়া ধরণী ভাসাইয়া দিতেছে—কোন্‌টি রাখিয়া কোন্‌টির কথা বলি? কোন্‌টি অলৌকিক নয়?

Walt Whitman এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন:

"Why! who makes, much of miracle? As to me I know nothing else but miracles."

অর্থাৎ: অলৌকিক লইয়া এত হৈ-চৈ কেন? আমি তো অলৌকিক ছাড়া অন্য কিছুই জানি না।

Laurence Housman নামক আর একজন মনীষী বলিতেছেন:
"Find something that isn't a miracle, you'll have cause to wonder then."

অর্থাৎ: এমন একটি জিনিস খুঁজিয়া বাহির কর যাহা অলৌকিক নয়, তখন তোমাকে ভাবিতে হইবে।

Prof. Huxley'র ন্যায় বৈজ্ঞানিকও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন:
"The miracles of the Church are child's play to the miracles I see in Nature."

অর্থাৎ: প্রকৃতিতে যে মো'জেজা নিত্য দেখিতে পাই, তাহার তুলনায় ধর্ম সংক্রান্ত মো'জেজা ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়।

সত্যই তাই নয় কি? বিশ্বপ্রকৃতি অত্যাশ্চর্য মো'জেজায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তবু আমাদের মো'জেজায় বিশ্বাস হইতে চাহে না কেন? তাহারও কারণ আছে।

বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সম্বন্ধে আমাদের মনের বদ্ধমূল ধারণা বা পূর্বসংস্কারই মো'জেজায় অবিশ্বাসের প্রধান কারণ। আপাতদৃষ্টিতে স্বভাবের নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভংগ হইয়া যায় বলিয়াই মানুষ মো'জেজাকে সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। আগুনের স্বভাব-ধর্ম সব-কিছুকে পুড়াইয়া ছাই করা; সর্বক্ষণ আমরা এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করিতেছি। মানুষ, গরু, বাড়ি, ঘর—সমস্তই আমরা আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতে দেখি। এক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তিকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু সে পুড়িল না, দিব্য তাহার মধ্যে বসিয়া হাসিতে লাগিল, তবে তৎক্ষণাৎ আমাদের মনের বদ্ধমূল ধারণায় আঘাত লাগে, কাজেই আমরা বলি: ইহা অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে যে আগুনকেও পানি করিতে পারেন, * এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে চাহি না—স্বভাব-অস্বভাব অথবা সম্ভব-অসম্ভবের জ্ঞান আমাদের এতই দৃঢ়মূল।

* নমরুদ যখন হযরত ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ্ বলিয়াছেন: "ইয়া নারো কুনি বরদাঁ ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম"—(কুরআন)। অর্থাৎ: 'হে অগ্নি, ইব্রাহিমের উপর তুমি শীতল এবং শান্তিদায়ক হইয়া যাও।' বলা বাহুল্য, এই কারণেই হযরত ইব্রাহিম আগুনে পুড়েন নাই।

বস্তুতঃ স্বভাব-অস্বভাব সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাই হইতেছে মো'জেজায় অবিশ্বাসের সর্বপ্রধান অন্তরায়। কাজেই, প্রথমে আমরা এই স্বভাব-অস্বভাব সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা করিব। কোন্‌টি স্বাভাবিক, কোন্‌টি অস্বাভাবিক; স্বাভাবিকের সংজ্ঞা কী আর তার সীমা কোথায়; কোন্‌খান পর্যন্ত স্বাভাবিক থাকে, আর কোন্‌খান হইতে অস্বাভাবিক আরম্ভ হয়; আমরা যাহাকে অস্বাভাবিক মনে করি, সত্যসত্যই তাহা অস্বাভাবিক কি না—এ সমস্ত সমস্যার সম্যক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের দোহাই দিয়া মো'জেজাকে অস্বীকার করা আমাদের সংগত হইবে না। অতএব স্বভাব ও অস্বভাব সম্বন্ধে আমরা এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পরিচ্ছেদ : ৫

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক

'অস্বাভাবিক'কে বুঝিতে হইলে 'স্বাভাবিক'কে বুঝিতে হয়, আর 'স্বাভাবিক'কে বুঝিতে হইলে আগে বুঝিতে হয় স্বভাবকে।

স্বভাব (Nature) কী ?

বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহার মূলে রহিয়াছে একটা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। যাহা কিছু ঘটিতেছে, সমস্তই একটা বিধিনির্দিষ্ট নিয়মে ঘটিতেছে; অন্ধভাবে বা খেয়ালের বশে কেহ চলিতেছে না। কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র তাহাদের নির্ধারিত পথে চলাফেরা করিতেছে; কোথাও বিরোধ নাই, বিশৃঙ্খলা নাই। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পূর্বদিকে সূর্য উঠিতেছে, পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি আসিতেছে, আম গাছে আম ফলিতেছে, কাঁটাল গাছে কাঁটাল ফলিতেছে; আজ পূর্বদিকে, কাল পশ্চিমদিকে সূর্য উঠিতেছে না, আম গাছে কাঁটাল, কাঁটাল গাছে আম ফলিতেছে না। এইরূপে সর্বত্রই নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিচয় পাইতেছি। আল্লার এই নিয়ম-রাজ্যের নামই হইতেছে স্বভাব বা প্রকৃতি।

স্বভাবের একটা স্থিরতা বা ধারাবাহিকতা আছে, একটা কার্যকারণ-সম্বন্ধ আছে। যে-কারণে একবার একটি ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, সেই কারণ উপস্থিত হইলে পুনরায় সেই ঘটনাটি ঘটিতেছে। একইরূপ কারণ দেখিলে তাই আমরা বুঝিতে পারি যে, একইরূপ কার্য ঘটিবে ("like cause produces like effect") ; আবার একইরূপ কার্য বা ফল দেখিলেও বুঝিতে পারি যে, এর মূলে আছে একইরূপ কারণ। এই স্বভাব-ধর্মের কোন ব্যতিক্রম নাই; যুগে যুগে দেশে দেশে ইহা সত্য। "Nature never breaks her own law"—স্বভাব তাহার নিজের নিয়ম কখনও ভংগ করে না, ইহাই হইতেছে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্বভাবের এই স্থিরতা বা বিশ্বস্ততার উপরেই নির্ভর করে। কাজেই যদি কেহ বলে যে, অমুক লোকটিকে

প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু সে তাহাতে পুড়িয়া মরিল না, আগুনের মধ্যে বসিয়া ফুলের মত দিব্বি হাসিতে লাগিল, তবেই আমাদের তাহা বিশ্বাস হইতে চাহে না, কারণ আমরা জানি যে স্বভাব-ধর্মের ইহা বিপরীত। এই জন্য আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার বিপরীত কিছু ঘটিলেই আমরা বলি যে উহা অস্বাভাবিক।

কিন্তু স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা খুবই ভ্রান্ত। স্বাভাবের জ্ঞান জন্মে আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আর অভিজ্ঞতা জন্মে আমাদের ভূয়োদর্শন হইতে, অর্থাৎ একই ঘটনা বারে বারে দেখিবার ফলে। কাজেই এই দেখা বা observation-এর উপরেই আমাদের স্বভাব-অস্বভাবের জ্ঞান সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এই দেখার উপরে আমরা কতটুকু আস্থা স্থাপন করিতে পারি! স্বভাবকে আমরা এতটুকু দেখিয়াছি? কোন বস্তুকে আমরা চূড়ান্তরূপে দেখিতে পারি কি? একবার, দুইবার, একশতবার, হাজারবার—যতবারই দেখি না কেন, সে-দেখা নিশ্চয়ই আমাদের শেষ দেখা নয়। ভবিষ্যতে কী ঘটিবে, অতীত এবং বর্তমান দেখিয়া আমরা একেবারে নিঃসন্দেহরূপে তাহা বলিতে পারি না। সূর্য পূর্বদিক হইতে উঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়; অতীতে এ-ঘটনা প্রতিদিন সত্য হইয়া আসিয়াছে; এখনও ইহা ঘটিতে দেখিতেছি। কাজেই আমরা অনুমান করি যে, আগামী কল্য বা আগামী বৎসর বা একশত বৎসর পরেও সূর্য পূর্বদিক হইতেই উঠিবে। কিন্তু এ অনুমান যে নির্ঘাৎ সত্য হইবেই, তাহা কি আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি? নিশ্চয়ই না। ভবিষ্যতে কী ঘটিবে, কে জানে? কাজেই, সূর্য যে প্রতিদিন পূর্বদিক হইতে উঠিবেই, এ কথা যদি আমরা চিরসত্যরূপে গ্রহণ করি তবে আমাদের ভুল হইবে।

স্বভাবের সমনিয়মানুবর্তিতা (Uniformity of Nature) সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। আমরা মনে করি, স্বভাব কোন অবস্থাতেই তাহার নিয়ম ভংগ করে না, কিন্তু এ ধারণা ভুল। জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে এ ধারণা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু জড়-জগতের বাহিরে Uniformity of Nature খাটে না; সেখানে প্রকৃতি নিতান্ত খামখেয়ালের পরিচয় দেয়। জড়-পদার্থের বেলায় প্রকৃতি স্থিরতার নীতি (Principle of Determinacy) মানিয়া চলে বটে, কিন্তু ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক জগতে সে মানে স্বাধীন ইচ্ছা বা অনিশ্চয়তার নীতি

(Principle of Free-will বা Indeterminacy)। এ সম্বন্ধে Sullivan বলিতেছেন :

"The question is : Which of these principles does nature obey? And the answer we have obtained so far is that the ultimate processes of Nature are not strictly determined. This theory has no difficulty in explaining the fact that in practice when we deal with appreciable lumps of matter Nature exhibits strict laws of cause and effect. For, this apparent uniformity of nature is merely a statistical effect. The idiosyncrasies of the individual electrons and atoms in any perceptible piece of matter cancel out, as it were. Indeed one of the real tasks of Science at present is to deduce the laws that govern its ultimate constituents. The deduction cannot be effected otherwise round. It is the electron that is the key to the universe."

—(Limitations of Science, Pp. 93-94)

অর্থাৎ : প্রশ্ন হইতেছে—এই নীতিগুলির কোন্‌টি স্বভাব মানিয়া চলে ? এ পর্যন্ত যে উত্তর পাইয়াছি তাহা এই যে, স্বভাবের শেষ পদ্ধতিতে স্থিরতার নীতির কড়াকড়ি নাই। এই থিওরী দ্বারা এ কথা বেশ ব্যাখ্যা করা যায় যে, কার্যতঃ যখন আমরা কোন স্থূলকায় জড় পদার্থ লইয়া বিচার করিতে বসি, তখন স্বভাব কার্য-কারণ নীতিটি খুব মানে ; এই আপাতদৃষ্ট নিয়মানুবর্তিতা শুধু হিসাবেই পাওয়া যায় ; কিন্তু প্রত্যেক পরমাণু ও ইলেকট্রনের বেলায় দেখা যায় যে তাহারা খামখেয়ালী। বস্তুতঃ স্থূল জগতে নয়, স্থূল জগতের অন্তরালে ইলেকট্রন-জগৎ কোন্ নিয়মে চালিত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের প্রধান কর্তব্য। সৃষ্টির মূল রহস্যই এইখানে।

অতএব, স্বভাব-অস্বভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা একেবারে অভ্রান্ত নহে। যতই দেখি না কেন, আমাদের generalisation (অর্থাৎ একই ঘটনাকে বহুবার ঘটিতে দেখিয়া সে সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

কিছুতেই অবিসম্বাদিতরূপে নির্ভুল হইতে পারে না, উহার মধ্যে খানিকটা অনুমান বা অন্ধবিশ্বাস থাকিয়াই যায়।

আমাদের দেখার ভিতরেও অনেক গলৎ থাকে। সীমাবদ্ধ জ্ঞান বা অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় লইয়া আমরা যাহা দেখি, বা অনুভব করি, তাহা সব সময়ে সত্য হয় না। ইহা অসম্ভব নয় যে, আমরা দেখিতেছি একরূপ, কিন্তু ঘটিতেছে অন্যরূপ। সৃষ্টির সমস্ত রহস্য আমাদের নিকট এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, আমরা জানি না কোথায় কী ঘটিতেছে, অথবা কেমন করিয়া ঘটিতেছে। সৃষ্টি-রহস্য এতই গভীর এবং দুর্বোধ্য। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, আমাদের বিশ্ব (Universe) সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা অনুমান সর্বত্র নির্ভুল নয়, তাহার প্রমাণ: পণ্ডিতগণ আজ যাহা বলিতেছেন, কালই তাহা বদলাইয়া যাইতেছে। প্রকৃত সত্য তাই এখনও আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে রহিয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ আজ অকুণ্ঠচিত্তে বলিতেছেন:

"We can never say that any theory is final or corresponds to absolute thuth, because at any moment new facts may be discovered and compel us to abandon it."

—The New Background of Science by Sir James Jeans.

অর্থাৎ: আমরা যে-কোন থিওরীকেই চরম এবং ধ্রুব সত্য বলিতে পারি না, কারণ যে-কোন মুহূর্তে, নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং তাহার ফলে বাধ্য হইয়া আমরা পুরাতন মতকে বর্জন করিতে পারি।

বলা বাহুল্য, এই কারণে স্বভাবের সীমারেখাও চূড়ান্তরূপে সুনির্দিষ্ট হয় নাই। কোন্‌টি স্বাভাবিক আর কোন্‌টি অস্বাভাবিক, কেহই তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। স্বভাবের রাজ্য ক্রমবিস্তারশীল। আজ যাহা অস্বাভাবিক ভাবিতেছি, কালই তাহা স্বাভাবিক হইয়া যাইতেছে। কাজেই কোন নূতন ঘটনা ঘটিতে দেখিলেই যে তাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে, এর কোন মানে নাই। প্রত্যেক স্বাভাবিক ঘটনাই এক সময় অস্বাভাবিক ছিল।

জনৈক পাশ্চাত্য লেখক এ-সম্বন্ধে কী সুন্দর না বলিয়াছেন:

"The next supernatural of one generation is the natural of the next."

অর্থাৎ: এক যুগে যাহা অস্বাভাবিক মনে করি পরবর্তী যুগে তাহাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়।

স্বভাবের স্থিরতা (Uniformity of Nature) অথবা কার্য-কারণ সম্বন্ধের উপরে বৈজ্ঞানিকদের তাই এখন আর সেরূপ বিশ্বাস নাই। একই কারণে যে একই ঘটনা ঘটিবেই, অথবা একই ঘটনা ঘটিলে যে তাহার মূলে একই কারণ বিদ্যমান থাকিবেই, এ কথা জোর করিয়া বলা এখন শক্ত। স্বভাব যে সর্বত্র নিয়ম-নিগড়েই বাঁধা রহিয়াছে কোন দিন যে তাহার ব্যতিক্রম হয় না, তাহাও নয়।

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে একই নিয়ম দ্বারা স্বভাব সর্বত্র কাজ করে না। মনে হয়, কোন্ এক অদৃশ্য গোপন শক্তি যেন আড়ালে থাকিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের একটু হের-ফের করিয়া দেয়। এই অজানা বা অদৃষ্টকে বৈজ্ঞানিকেরা আজ নত মস্তকে স্বীকার করিতেছেন:

"Although we are still far from any positive knowledge, it seems possible that there may be some factor for which we have so far found no better name than fate, operating in nature to neutralise the cast-iron inevitability of the old law of causation. The future may not be unalterably determined by the past as we used to think: in part at least it may rest on the knees of whatever gods there be."

—The Mysterious Universe by Sir James Jeans, P. 28.

অর্থাৎ: "যদিও আমরা এখনও স্থির-নিশ্চিত নই, তবু বলিব স্বভাবের মধ্যে এমন একটা-কিছু কার্য করিতেছে, যাহাকে আমরা অদৃষ্ট ছাড়া অন্য কোন ভাল নামে অভিহিত করিতে পারি না; এই অদৃষ্টই কঠোর কার্য-কারণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করিতেছে। আমরা পূর্বে যেরূপ ভাবিতাম যে, অতীতের দ্বারাই ভবিষ্যৎ সমভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেরূপ নাও হইতে পারে। অন্ততঃ কিছুটা-অংশ 'দেবতাদের' উপর (তাহারা যাহাই হউক) নির্ভর করিতেছে।"

স্বভাবের যে ভুল হয়, এই ভুল করিতেই যে সে ভালোবাসে, বৈজ্ঞানিকগণ সে সম্বন্ধেও এখন সজাগ:

"Nature permits certain 'margin of error' and if we try

to get within this margin, Nature will give us no help; she knows nothing, apparently, of absolutely exact measurements." —(The Mysterious Universe, P. 39)

অর্থাৎ: স্বভাবের খানিকটা জায়গায় গলৎ আছে ; সেখানে যদি আমরা ঢুকি, তবে সে আমাদিগকে কিছুই সাহায্য করে না। মনে হয়, ঠিক-ঠিক মাপ জোখের সে কিছুই জানে না।

খ্যাতনামা জার্মান বৈজ্ঞানিক Prof. Heisenberg-এরও মত যে "Nature abhors accuracy and precision above all things."

অর্থাৎ: মাপা জোখা সঠিকতাকে স্বভাব সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করে।

স্বাভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কত অসম্পূর্ণ আশা করি উপরের আলোচনা হইতে সে-কথা এখন সুস্পষ্ট হইয়াছে। সাধারণ লোকের কথা নয়, স্বয়ং বৈজ্ঞানিকেরাই আজ হতাশ হইয়া এই কথা বলিতেছেন। এক সময় যাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন যে, স্বভাবের মধ্যে, একটা শৃঙ্খলা (order) এবং ব্যতিক্রমহীনতা (uniformity) আছে এবং এই ধারণার উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা জগতে যে-কোন ব্যাপারকে কার্য-কারণ-নিয়ম (law of causation)-এর বশবর্তী করিয়া যান্ত্রিক উপায়ে (mechanically) ব্যাখ্যা করা যায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবং এই উদ্ধত স্পর্দ্ধায় আল্লার অস্তিত্বকে পাত্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন, তাঁহারাই আজ কোথায় নামিয়াছেন, দেখুন। বৈজ্ঞানিক আজ অদৃষ্টবাদী। বৈজ্ঞানিক আজ আল্লা-বিশ্বাসী। Viscount Samuel কী সুন্দরই না বলিতেছেন:

"Indeed in so far as it accepts and emphasizes the principle of causality and in so far as itperceives that the universe, as we see it, cannot be self-caused, science leads inevitably to the conclusion that there must be a casual factor, not comprised within our view of the universe. If this be Deity, then science has made atheism impossible." —(Belief and Action, P. 33)

অর্থাৎ: বিজ্ঞান যে-পর্যন্ত কার্য-কারণ-বিধিকে মানিয়া চলিবে এবং যে-পর্যন্ত বুঝিবে যে এই বিশ্ব আপনা আপনি সৃষ্ট হয় নাই সে পর্যন্ত

তাহাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে যে, ইহার পিছনে নিশ্চয়ই এমন একটি আদি কারণ আছে—যাহা আমাদের বিশ্বসম্বন্ধীয় দৃষ্টিসীমার বাহিরে রহিয়াছে। এই আদি কারণ যদি কোন দেবতা (আল্লাহ্) হয়, তবে এ কথা সত্য যে, বিজ্ঞান নাস্তিকতাকে অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।”

কোথা হইতে কোথায় আসিলাম, পাঠক তাহা একবার চিন্তা করুন।

পরিচ্ছেদ : ৬

স্বাভাবিক ও অতিস্বাভাবিক

স্বাভাবিক ও অতিস্বাভাবিক লইয়া আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। এই আলোচনায় আমরা দেখিলাম : স্বভাবের প্রকৃত স্বভাব এখনও নিরূপিত হয় নাই : অন্য কথায় স্বভাবকে আমরা এখনো সম্পূর্ণরূপে চিনি নাই। কাজেই, কোন্‌টি যে স্বাভাবিক, আর কোন্‌টি অস্বাভাবিক, সে-কথা নিশ্চিতরূপে আমরা বলিতে পারি না।

কিন্তু এইখানেই আমাদের সমস্যার শেষ নয়। স্বভাব ও অস্বভাবের দ্বন্দ্বে আরও একটি তৃতীয় পক্ষ আছে, তাহার দাবী ও বক্তব্য না শুনিলে কিছুতেই এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় না।

সেটি হইতেছে অতিস্বভাব।

অতিস্বভাব কী ?

স্বভাবের যাহা উর্ধ্বে তাহাকেই আমরা অতিস্বভাব বলিয়া জানি। আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, স্বভাবের একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন আছে। এই নিয়ম কানুন দ্বারাই স্বভাব চালিত হয় ; সেই নিয়ম-কানুন স্বভাব কখনও ভ.গ করে না। একটি ঢিল উর্ধ্বদিকে ছুঁড়িয়া দিলে সে মাটিতে পড়িবেই—ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কোন কারণবশতঃ ঢিলটি মাটিতে না প.ড়য়া ক্রমাগত উর্ধ্বদিকেই ছুটিতে থাকে, তবে বলিব উহা অতিস্বাভাবিক ; অর্থাৎ স্বভাব-ধর্মের উহা বাহিরে। অতএব, স্বভাবের নিয়মকে লংঘন করিয়া যে-সমস্ত ঘটনা ঘটে, তাহাদিগকে আমরা অতি স্বাভাবিক বলিতে পারি। নীল-নদের বিভক্ত জলরাশির মধ্য দিয়া হযরত মুসার হাঁটিয়া নদী পার হওন, হযরত ঈসার পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ, হযরত মুহম্মদের বক্ষ-বিদারণ ও মি'রাজ—ইত্যাদি যাবতীয় অলৌকিক ঘটনাই অতিস্বাভাবিকের পর্যায়ভুক্ত।

কোন অতিস্বাভাবিক ঘটনা নিত্য ঘটিতে পারে না, কারণ নিত্যঘটমান হইলেই সে আর অতিস্বাভাবিক থাকে না—স্বাভাবিক হইয়া যায়।

অতএব এ কথা এখানে সুস্পষ্ট হইতেছে যে, অস্বাভাবিকের ন্যায়

অতিস্বাভাবিকও স্বভাবের ব্যতিক্রম বিশেষ ; এ কারণ স্বভাবের সহিত তাহারও বিরোধ। তবে অতিস্বাভাবিক একেবারে অস্বাভাবিক নয় ; মনে হয় যেন উভয়ের মধ্যবর্তী।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, আসমান-জমীনে যাহা-কিছু ঘটিতেছে, সমস্তই হয় স্বাভাবিক (natural), নয় ত অতিস্বাভাবিক (supernatural), নয় ত অস্বাভাবিক (unnatural) ; অন্য কথায় যাবতীয় ঘটনাকেই তিন ভাগে ভাগ করা যায় : (১) স্বাভাবিক, (২) অতিস্বাভাবিক, (৩) অস্বাভাবিক।

স্বভাব-অস্বভাব সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, এইবার অতিস্বভাবকেই একটু পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

স্বভাব ও অস্বভাব সম্বন্ধে আমরা যে-প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এখানেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিতেছি : কোন্‌টুকু স্বাভাবিক আর কোন্‌টুকু অতিস্বাভাবিক ? উভয়ের কোন চৌহদ্দী আছে কি ?

পূর্বেই বলিয়াছি স্বাভাবিক সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা বা পূর্ব সংস্কারই হইতেছে যত অনর্থের মূল। স্বভাবকে আমরা একেবারে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখি বলিয়াই আমাদের এই দুর্ভোগ। মানুষকে ছোট করিয়া দেখিলে যেমন অতিমানুষ বা দেবতাকে স্বীকার করিতে হয়, স্বভাবকে ছোট করিয়া দেখিলেও ঠিক তেমনি অতিস্বভাবকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যদি আমরা ভাবি যে, যাহা-কিছু ঘটে সমস্তকে লইয়াই স্বভাব, তবে আর অনর্থক এই বিতর্কের সৃষ্টি হয় না। যদি কোন বস্তু বা ঘটনা একবার ঘটিয়াই গেল, তবে আর তাহা অতিস্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক রহিল কোথায় ? অতিস্বাভাবিকও তখন স্বাভাবিক হইয়া গেল।

স্বভাব, অস্বভাব বা অতিস্বভাবের তারতম্য তাই নিতান্তই আমাদের মনগড়া। বিশ্ব-নিখিলের যাবতীয় ঘটনাকে এক অখণ্ড রূপ দিয়া দেখিলে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক বা অতিস্বাভাবিকের প্রশ্ন আর আমাদের মনে জাগে না। Prof. Huxley কী সুন্দরই না বলিতেছেন :

"I employ the words 'supernature' and 'supernatural' in their popular senses. For myself, I am bound to say that the term 'Nature' covers the totality of that which is the world of psychical phenomena appears to me to be as

much part of nature as the world of physical phenomena and I am unable to perceive any justification for cutting the universe into two halves, one natural and one supernatural."

—Huxley's Essays. (Vol. V. p. 39)

অর্থাৎ :—'অতি-স্বভাব,' এবং 'অতি-স্বাভাবিক' শব্দ দুইটিকে আমি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিতে বাধ্য যে, বিশ্ব-জগতে যাহা-কিছু আছে, সমস্তই স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী জড়জগতের ঘটনাবলীর মতই স্বভাবের অংশ; কাজেই সমগ্র জগৎটাকে 'স্বাভাবিক' এবং 'অতিস্বাভাবিক'—এই দুই খণ্ডে ভাগ করার আমি কোন সংগত কারণ খুঁজিয়া পাই না।

বাস্তবিকই তাই। 'স্বভাব' অর্থে আমরা শুধু জড়জগতের ঘটনাবলীকেই মানিতেছি, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতকে মানিতেছি না। অথচ জড়জগতের সংগে-সংগে আধ্যাত্মিক জগতও যে আছে এবং সে-জগতে যে নিত্য নব-নব ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বভাবের সমগ্ররূপের কথা আমাদিগকে তাই ভাবিতে হইবে; সমগ্র স্বভাব কোন্ নিয়ম দ্বারা চালিত হইতেছে তাহা জানিতে হইবে। স্বভাব সম্বন্ধে আংশিক-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াই কোন্‌টি স্বাভাবিক, কোন্‌টি অস্বাভাবিক, তাহা বিচার করিতে যাওয়া আমাদের মূর্খতা।

আমাদের জ্ঞান, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণতা হইতেই অতিস্বভাব ও অস্বভাবের ধারণা জন্মে। জ্ঞান দ্বারা যাহাকে ধরিতে পারি না, বুদ্ধি দ্বারা যাহাকে বুঝিতে পারি না, অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহার কোন সমর্থন পাই না, তাহাকেই আমরা বলি অতিস্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক। আমরা সব বুঝি, কিন্তু সব যে বুঝি না, এইটুকু বুঝি না! কুব্জ যেমন চায় যে, তাহার কুব্জতা ভালো না হইয়া দুনিয়ার অন্যান্য সকলেও তাহারই মত কুব্জ হউক, আমরাও ঠিক সেইরূপই মনে করি যে, আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সম্প্রসারিত না হইয়া জগতের সব-কিছু আমাদের বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে আসুক।

এ মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ নয়। আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার দৈন্য স্বীকার করা উচিত। যদি কোন অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা আমরা

না করিতে পারি, তবে তাহাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান না করিয়া অন্ততঃ এইটুকুই বলা উচিত যে, ঘটনাটি সম্ভব হইতে পারে, তবে ইহার কারণ আমরা জানি না। জনৈক খ্যাতনামা পাশ্চাত্য লেখক এ সম্বন্ধে কী বলিতেছেন, শুনুন:

"The only reasonable attitude for a sensible man to adopt towards any problem dealing with the supernatural which cannot be submitted to a scientific standard of truth, is that of saying; I do not know, yet such and such is my opinion." —The Evidence for the Supernatural, p. 12.

অর্থাৎ: "অতিপ্রাকৃতিক কোন ঘটনাকে যদি কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিতে না আনা যায়, তবে তখন যে-কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মাত্র এই কথাই বলা উচিত যে, 'আমি নিশ্চিতরূপে এটা জানি না, তবে আমার মত এই'।"

বস্তুত অতিস্বাভাবিক হইলেই অস্বাভাবিক হয় না। অতিস্বাভাবিকও স্বাভাবিক। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা যাহাকে অতিস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহা অতিস্বাভাবিক নাও হইতে পারে। স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বাড়িলে হয়ত আমরা দেখিব, আজ যাহাকে অতিস্বাভাবিক ভাবিতেছি, তাহাও স্বাভাবিক।

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন! ঊর্ধ্বদিকে কোন-কিছু ছুঁড়িয়া দিলে তাহা মাটিতে পড়িবেই, ইহাই আমাদের ধারণা। কিন্তু একজন প্রতি সেকেণ্ডে ৭-মাইল বেগে একটি বুলেট ছুঁড়িলে দেখিবে, সে বুলেট আর মাটিতে ফিরিয়া আসিবে না। তখন নিশ্চয়ই মনে হইবে: একটা অলৌকিক বা অতিস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানে কোনই অস্বাভাবিক বা অতিস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে নাই। পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিলে কোন বস্তুই যে আর মাটিতে ফিরিয়া আসে না, ইহা এখন বৈজ্ঞানিক সত্য। কোন বস্তুর ফিরিয়া আসা-না-আসা নির্ভর করে তাহার গতির (Velocity) উপর। সে গতি হইতেছে প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মাইল, অর্থাৎ ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল।

অতএব অলৌকিক বা অতিস্বাবিককে অস্বীকার করিবার কোনই সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। এক সীমাহীন রহস্যলোকের

মধ্যে আমরা ডুবিয়া আছি; ইহার কিছুটা আমরা জানি, বাকীটা সবই আমাদের অজানা। কাজেই, জানার ঔদ্ধত্য ও অভিমান নিশ্চয়ই আমাদের শোভা পায় না।

তাহা হইলে অতিস্বাভাবিক সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত কী? আমরা ইহাকে মানিব, না মানিব না?

দুই উপায়ে আমরা এ-সমস্যার সমাধান করিতে পারি; হয় আমাদের স্বভাব-অতিস্বভাবের সীমা-প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া সব একাকার করিয়া লইতে হয় এবং বলিতে হয়: যাহা-কিছু ঘটে সবই স্বভাব, না হয় ত স্বভাবের সংগে সংগে অতিস্বভাবের অস্তিত্বকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়: অর্থাৎ আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হয়, আমাদের জানা-স্বভাবের বাহিরেও একটা বৃহত্তর অজানা-স্বভাব আছে, যেখানে কোন অজ্ঞাত কারণে অনেক-কিছু অলৌকিক কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে।

অতিস্বাভাবিক সম্বন্ধে যাহা সত্য, অতিমানবিক সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই সত্য। 'মানুষের' সংজ্ঞা ও গণ্ডীকে যদি ছোট করা হয়, তবেই অতিমানুষের প্রশ্ন জাগে। আর যদি স্বীকার করা হয় যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ এত শক্তি ও সম্ভাবনা দিয়া রাখিয়াছেন যে, সে-শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে মানুষ অনেক 'অসম্ভবকে সম্ভব' করিতে পারে, তবে আর অতিমানবতা দাঁড়াইতেই পারে না। অতিমানুষ অ-মানুষ নয়, মানুষেরই উন্নততর ও পূর্ণতর প্রকাশ।

বলা বাহুল্য, এই হিসাবে হযরত মুহম্মদকে আমরা মানুষও বলিতে পারি, অতিমানুষও বলিতে পারি। মানুষের সংজ্ঞা ব্যাপক হইলে তিনি মানুষ, সংকীর্ণ হইলে তিনি অতিমানুষ। আমরা বলিব তিনি ছিলেন মানুষ।

স্বভাব, অস্বভাব ও অতিস্বভাবের বৈজ্ঞানিক রূপ আমরা এতক্ষণ দেখিলাম। এই আলোকে, আসুন পাঠক, আমরা একবার আমাদের মো'জেজার সমস্যাকে বিচার করিয়া দেখি।

উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহাতে মো'জেজাকে অস্বীকার করা আর আমাদের শোভা পায় কি? নিশ্চয়ই না। স্বভাবের ধারণা আমাদের বদলাইয়া গেলে মো'জেজা আর আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে না। আমরা বুঝিব যে, আমাদের স্বভাবের (our nature) আইন-কানুনের সহিত মো'জেজার মিল না থাকিলেও 'সমগ্র স্বভাবের'

(all nature) আইন-কানুনের সহিত ইহার গরমিল নাই। অনেক খ্যাতনামা লেখক এ সম্বন্ধে ঠিক একথাই বলিতেছেন :

"They (miracles) exceed the laws of *our nature* but it does not therefore follow that they exceed the laws of *all nature*."

অর্থাৎ : অলৌকিক ঘটনাবলী 'আমাদের স্বভাবের' নিয়ম লঙ্ঘন করে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা এ-কথা বলা চলে না যে, তাহারা 'সমগ্র স্বভাবের' নিয়মকেই লংঘন করে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মো'জেজা স্বভাব-নিয়মকে লঙ্ঘন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বৃহত্তর কর্মচারী আসিলে নিম্নতর কর্মচারীর প্রচারিত বিধান যেমন সাময়িকভাবে অচল বলিয়া মনে হয়, মো'জেজা দ্বারাও স্বভাবের নিয়ম ক্ষণিকের জন্য সেইরূপ স্তব্ধ হয় মাত্র :

"We should see in miracle not the infraction of a law but the neutralizing of a lower law, the suspension of it for a time, by a higher."

অর্থাৎ : অলৌকিকের মধ্যে স্বভাব-নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটে না, উচ্চতর নিয়মের দ্বারা নিম্নতর নিয়মের উহা ক্ষণিকের অচলতা মাত্র।

বস্তুতঃ মো'জেজা ঊর্ধ্ব-স্বাভাবিক (Preter-natural) হইতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কিছুতেই উহা বিরুদ্ধ-স্বাভাবিক (Contra-natural) নহে।

স্বভাবের কার্য-কারণ-নিয়ম সম্বন্ধে যাহারা অতি-বিশ্বাসী, তাহাদিগকেও বলা যায়, মো'জেজা এ-নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটায় না : কারণ ছাড়া যদি কোন কার্য ঘটিতে নাই পারে, তবে মো'জেজার পশ্চাতেও যে একটা-কিছু কারণ আছে, ইহা নিশ্চিত।

"A miracle, then, is no contradiction in the law of cause and effect : it is merely a new effect supposed to be introduced by the introduction of a new cause."

অর্থাৎ : মো'জেজা কার্য-কারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নহে ; নূতন কারণঘটিত ইহা এক নূতন কার্য।

পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, স্বভাবকে আমরা বড়ই ছোট করিয়া ফেলিয়াছি : স্বভাবের বৃহত্তর অংশ এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত

ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আমরা যখন দেখি, তখন সব-কিছু খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি, কিন্তু ঊর্ধ্বলোক হইতে ব্যাপক দৃষ্টি দিয়া দেখিলে সমস্ত খণ্ডতা এক মহা-ঐক্যের মধ্যে মিলিয়া যায়। মো'জেজাও ঠিক তাই। যে-স্বভাবের সহিত আমরা পরিচিত, সেখান হইতে দেখিলে মনে হয়, মো'জেজার সহিত স্বভাবের কোন মিল নাই; কিন্তু এই স্বভাব হইতে আরও ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেখিলে আমরা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব—সমস্তই একই নিয়মে চালিত হইতেছে, কোথাও বৈষম্য নাই; বৈসাদৃশ্য নাই। Archbishop Trench বলিতেছেন:

"The true miracle is a higher and a purer nature coming down out of the world of untroubled harmonies into this world of ours, which so many discords have jarred and disturbed, and bringing this back again though it be but for one mysterious prophetic moment into harmony with that higher." —Notes on Miracles, p. 15.

অর্থাৎ: প্রকৃত মো'জেজা ঊর্ধ্বতর এবং পবিত্রতর স্বভাবেরই নামান্তর, সেই সাম্যলোক হইতেই উহা আমাদের এই নিম্নের বিশৃংখল-ধরণীতে ক্ষণিকের জন্য নামে এবং উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটায়।

বস্তুতঃ স্বভাবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখার ফলেই আজ আমাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। আল্লার রাজ্যে অস্বাভাবিক বলিয়া কোন কিছু নাই; যাহাই কিছু হউক না কেন, ঘটিলেই তাহা স্বাভাবিক হইয়া যায়। স্বভাবের পূর্ণ-পরিচয় ও তার নিয়ন্ত্রণ-রহস্য জানিতে পারিলে 'মো'জেজা'ও আর অস্বাভাবিক বা অতিস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে না। আল্লার কুদরতে বিশ্বাস করিলে সবই স্বাভাবিক ও সম্ভব হইয়া যায়। জনৈক ইংরাজ পাদ্রীর সহিত সুর মিলাইয়া আমরাও বলি:

"Once believe that there is a God and Miracles are not incredible."

অর্থাৎ: একবার মাত্র বিশ্বাস কর যে আল্লাহ্ আছেন তবেই আর মো'জেজাতে অবিশ্বাস হইবে না।

পরিচ্ছেদ : ৭

বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে ?

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এ-যুগের মানুষ বিজ্ঞানমনাঃ। বিজ্ঞানের উপর তাহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। বিজ্ঞান যাহা বলে, অম্লানবদনে তাহারা তাহা মানিয়া লয়। শুধু তাই নয়, নিজেরাও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমস্ত কাজ করিতে ভালবাসে। তাহাদের চিন্তায় ও কার্যে, যুক্তি ও তর্কে কোনরূপ বিশৃংখলা বা অন্ধানুসরণ না থাকে, তাহাদের বিচার-বুদ্ধি গোঁড়ামি বা পূর্বসংস্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়, এক কথায় তাহাদের চিন্তা, কার্য ও ধ্যান-ধারণা বিজ্ঞানসম্মত হয়—ইহাই তাহাদের লক্ষ্য।

শরিয়ৎ বা শাস্ত্রবাণীর সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ ঘটিলে লোকের মন স্বভাবতঃ বিজ্ঞানের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। বিজ্ঞানকেই তাহারা বড় বলিয়া মানে এবং বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরেই তাহারা শাস্ত্রকে যাচাই করিয়া লইতে চায়। বলা বাহুল্য, লোকের ধর্মবিশ্বাসের শিথিলতার ইহাই হইতেছে প্রধান কারণ। লোক এখন আর অন্ধভাবে শাস্ত্রের আদেশ নিষেধকে মানিয়া লইতে চাহে না; শাস্ত্রবিধানের পশ্চাতে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কিনা, তাহাই জানিতে চায়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না দিতে পারিলে কোন ধর্মবিধানই তাহাদের মনঃপূত হয় না।

এরূপ মননশীলতা যে খুবই দোষের, তাহা অবশ্যই নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে সকল কিছুই যাচাই করিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য; সন্দেহ নাই। মুক্তবুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কিছুর সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিয়া লওয়া খুবই ভালো কথা। নির্বিচারে কোন কিছু নাইবা মানিয়া লইলাম। গোঁড়ামি ও কুসংস্কার কে চায়!

কিন্তু এইখানেই যত গণ্ডগোল। এক কূল ত্যাগ করিয়া আমরা আর এক কূলে যাইতেছি, কিন্তু যে-কূলে যাইতেছি, সে-কূল স্থির আছে ত? ইহাই হইতেছে আমাদের একমাত্র প্রশ্ন। যে-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া আমরা ধর্মকে বর্জন বা অস্বীকার করিতেছি, সেই বিজ্ঞান সত্য ত? সে আমাদিগকে যাহা বলিতেছে, তাহা নির্ভরযোগ্য ত? অথবা সে কী বলিতেছে তাহা আমরা ভাল করিয়া জানি ত? একথা প্রথমেই আমাদের বিচার

করিয়া দেখা উচিত। স্বর্ণের বিশুদ্ধতা বিচার করিতে হইলে আমরা তাহাকে কষ্টিপাথরে যাচাই করি, কিন্তু সেই কষ্টিপাথর খাঁটি কি না, তাহা ত আমাদিগকে আগে দেখিতে হয়! শুধু অন্ধকারে বিজ্ঞানের নামে মাতোয়ারা হইলে ত চলিবে না, বিজ্ঞান কী বলে এবং যাহা বলে বা এতদিন যাহা বলিয়া আসিয়াছে. তাহার মূল্য কতখানি—তাহার বিচার আগে করিতে হইবে ; তারপর গোঁড়ামি ও কু-সংস্কারের বিচার হইবে।

আর গোঁড়ামি ও কুসংস্কারই বা কাহাকে বলি ? তুমি যাহাকে কুসংস্কার বলিতেছ, আমার কাছে তাহা কুসংস্কার নাও হইতে পারে। আবার আজ যাহা কুসংস্কার মনে হইতেছে, কাল তাহা পরীক্ষিত সত্য হইয়াও দাঁড়াইতে পারে ; অথবা আজ যাহা অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতেছি কাল যে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? কাজেই, ধ্রুবকে না জানা পর্যন্ত কোন কিছুতেই আমরা গোঁড়ামি বা অন্ধবিশ্বাস বলিয়া উপহাস করিতে পারি না।

গোঁড়ামির সংজ্ঞা কী ? পুরাতনকে নির্বিচারে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতনকে অস্বীকার করার নাম যদি গোঁড়ামি হয়, তবে নূতনকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং পুরাতনকে নির্বিচারে বর্জন করাও ত একপ্রকার গোঁড়ামি। গোঁড়া বলিয়া সকলকে যে গালাগাল দিয়া বেড়ায় সেও আর এক গোঁড়া! প্রকৃত বিজ্ঞানীর মন এই উভয় প্রান্তকেই এড়াইয়া চলে। সে তার মনকে রাখে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্বিকার। কাজেই 'হাঁ' ও 'না' —এই উভয় প্রান্তে দাঁড়াইয়া কাহাকেও 'গোঁড়া' বলিয়া গালাগালি দিবার অধিকার কাহারও নাই।

গোঁড়া হইবার গোঁড়ামি এবং গোঁড়া-না-হইবার গোঁড়ামি—উভয়বিধ গোঁড়ামির মূলেই থাকে একই প্রকার মনোবৃত্তি। যাহাদিগকে গোঁড়া বলি তাহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা যাহা জানে তাহা অন্ধভাবে মানে। যাহারা নিজদিগকে মুক্তিবুদ্ধি বলিয়া প্রাচীন পন্থীদিগকে ঘৃণা করে, তাহারাও অবিকল একইভাবে নিজেদের বর্তমান জ্ঞানবুদ্ধিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করে। কাজেই প্রাচীনপন্থীরা যদি আধুনিকদিগের নিকট গোঁড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে প্রাচীনপন্থীদিগের কাছে আধুনিকেরাও কেন গোঁড়া বলিয়া প্রতিপন্ন না হইবে ? বিজ্ঞান যখন এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, এবং যখন ইহার নিত্য-নূতন পরিবর্তন ঘটিতেছে, তখন একটা নির্দিষ্ট

সময়ের চলমান মতবাদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা আদৌ বুদ্ধিমানের কার্য নহে। বিজ্ঞান আজ যাহা বলিতেছে, বা এতদিন যাহা বলিয়া আসিতেছে, তাহাই যে ধ্রুব সত্য, তার প্রমাণ কী? প্রকৃত সত্য যদি আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়া থাকে, তবে আজিকার বিজ্ঞানকে আঁকড়িয়া থাকার মত গোঁড়ামি ও বেকুফী আর নাই। কাজেই আমরা যাহাতে বোকা বনিয়া না যাই, সেজন্য আমাদের বিজ্ঞানের স্বরূপটা গোড়াতেই ভাল করিয়া চিনিয়া লওয়া উচিত।

বলা বাহুল্য, ধর্মসম্বন্ধীয় গোঁড়ামি যদি দোষের হয়, তবে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গোঁড়ামিও নিশ্চয়ই দোষের। কাজেই আমাদের সাধের বিজ্ঞানকে একবার পরখ করিয়া লওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এরূপ না করিলে হযরতের জীবনের বহু আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক ঘটনাকে আমরা বুঝিতে পারিব না।

বিজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ নহে। সে প্রতিনিয়ত আমাদের সহিত ছলনা করিয়া ফিরিতেছে। বহুরূপীর মত সে নানা বেশে আমাদের চোখের সামনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাই তাহার সাচ্চা চেহারা এখনও আমরা ধরিতে পারি নাই। বিজ্ঞানের এই চঞ্চলতার কথা আজ বিজ্ঞানীরা নিজ মুখেই ব্যক্ত করিতেছেন। Prof. A. N. Whitehead বলিতেছেন:

"The eighteenth century opened with the quiet confidence that at last nonsense had been got rid of. To-day we are at the opposite pole of thought, Heaven knows what seeming nonsense may not to-morrow be demonstrated truth." —(Science and the Modern World, p. 137)

অর্থাৎ: অষ্টাদশ শতাব্দীর সংগে সংগেই লোকের ধারণা জন্মিল যে অবশেষে গাঁজাখুরি ব্যাপারের হাত হইতে আমরা রেহাই পাইলাম। আজ কিন্তু আমরা ঠিক ইহার বিপরীত কথাই চিন্তা করিতেছি। আল্লাহ্ জানেন, কোন্ গাঁজাখুরি ব্যাপার কাল পরীক্ষিত সত্যরূপে আমাদের সম্মুখে দেখা দিবে না!

এইসব দেখিয়া শুনিয়াই পণ্ডিতেরা আজ আর বিজ্ঞানকে লইয়া পূর্বের ন্যায় অত বড়াই করিতেছেন না। বিজ্ঞান প্রকৃত সত্যকে এখনও পায় নাই, একথা আজ ধরা পড়িয়াছে। চিন্তাশীল মনীষীরা তাই স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন:

"The scientific theories of to-day differ greatly from those of a century ago : no one doubts that the theories of a century hence are likely to differ greatly from those of to-day : how then can we put faith in any of them ?"

—Belief and Action, Viscount Samuel, p. 25

অর্থাৎ : আজিকার বৈজ্ঞানিক মতবাদ এক শতাব্দী পূর্বের মতবাদের সহিত বহু পরিমাণে মিলে না ; এখন হইতে এক শতাব্দী পরের মতবাদের সহিতও আজকার মতবাদ সেইরূপ মিলিবে না। কেমন করিয়া তবে ইহাদের একটাকেও আমরা বিশ্বাস করিতে পারি ?

বিজ্ঞানে অনেক দাবীই যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত, বৈজ্ঞানিকরা নিজ মুখেই তাহা আজ স্বীকার করিতেছেন :

"We have seen that the new self-consciousness of Science has resulted in the recognition that its claims were greatly exaggerated."—Limitations of Science, p. 194

অর্থাৎ : বিজ্ঞান এতদিন যে-সব দাবী করিয়া আসিয়াছে, তাহার অধিকাংশই যে অতিরঞ্জিত, বিজ্ঞানের নবজাগ্রত আত্মচেতনা এ-সত্য এখন বুঝিতে পারিয়াছে।

বিজ্ঞান আমাদিগকে যে অবিমিশ্র কল্যাণই দান করিয়াছে, তাহা নহে, সে আমাদের জীবনকে বিড়ম্বিতও করিয়াছে :

"Science, in spite of all its practical benefits, had seemed to many thoughtful men, perhaps to the majority, to have darkened life. (Ibid. p. 194)

অর্থাৎ : অধিকাংশ চিন্তাশীল লোকেই মনে করেন, বিজ্ঞান দ্বারা যদিও আমাদের নানা উপকার হইয়াছে, তবু সে আমাদের জীবনকে দুঃখময় করিয়াছে।

সত্যই তাই। একথা সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের কিছু জানা দরকার। এইবার আমরা তাই অতি সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আদিম যুগের মানুষ যখন প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিল, তখন প্রকৃতিকে সে দেখিল এক অভিনব দৃষ্টিভংগিমায়। সূর্য-চন্দ্র, মেঘ-বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝা-বাদল

ইত্যাদি নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া সে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। যাহারা চিন্তাশীল এবং আলোকপ্রাপ্ত, তাহারা বুঝিল, এই সুন্দর সৃষ্টির পিছনে নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টা আছেন—যিনি সর্বশক্তিমান এবং যিনি যখন-যাহা খুশি তাহাই করিতে পারেন। কালে কালে মানুষের এই ধারণা আরো পরিপুষ্ট হইল। মানুষ বুঝিতে পারিল, প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা অন্ধকারে ঘটিতেছে না, তাহার মূলে আছে একটা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আর একটা নিয়ম-শৃংখলা। কোন্ কারণে কোন্ ঘটনা ঘটিতেছে—মানুষ তখন তাহাই জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। প্রকৃতির রহস্যলোকে মানুষের মন নিত্য আনাগোনা করিতে লাগিল। পণ্ডিতদিগের চেষ্টায় বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইল; বহু বিষয়ের কারণ তাহারা খুঁজিয়া পাইলেন। এই কার্য-কারণ-পরম্পরা একটা বিশিষ্ট রূপ লাভ করিল সপ্তদশ শতাব্দীতে —যখন গ্যালিলিও ও নিউটন জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রচলিত সমস্ত সংস্কার ও ধারণাকে তাঁহারা একেবারে উল্টাইয়া দিলেন। এতদিন লোকে মনে করিত; সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু এখন তাঁহারা বলিলেন: না, সূর্য স্থির হইয়া আছে, পৃথিবীই সূর্যের চারিপাশে ঘুরিতেছে; মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, আলোক, বিদ্যুৎ, পদার্থ ইত্যাদি বিষয়ে বহু নূতন তথ্য এই সময়ে আবিষ্কৃত হইল। বাদল-ধনু, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া এতদিন লোকে নানা কথা ভাবিত, কিন্তু এখন তাহারা এই নব বিজ্ঞানীদের যুগে ইহাদের নূতন ব্যাখ্যা শুনিল। পণ্ডিতেরা অংক কষিয়া কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিলেন, কেমন করিয়া কী ঘটিতেছে এবং কখন কী ঘটিবে। সৌরজগতের অধিকাংশ রহস্যের এইরূপ কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হওয়ায় তাঁহাদের স্পর্ধা ও অভিমান এতদূর বাড়িয়া গেল যে, তাঁহারা বিশ্বজগতকে একটা যন্ত্র (machine) বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এবং ঘোষণা করিলেন যে, কোন ব্যাপারকেই তাঁহারা এই যন্ত্র বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই যান্ত্রিক মনোভাব চরমে উঠিল। বহু ইঞ্জিনীয়ার-বৈজ্ঞানিক এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহারা সকলেই ইঞ্জিনিয়ারী দৃষ্টিভংগিতে এই জগতকে দেখিতে লাগিলেন। Helmholtz নামক জনৈক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করিলেন: "The final of all natural science is to resolve

itself into mechanics"—অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই শেষকালে যন্ত্রবিজ্ঞানে আসিয়া পরিণত হয়। Waterston, Maxwell প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরাও এই মত সমর্থন করিলেন। মানুষের আত্মা, মন, বুদ্ধি, প্রতিভা ইত্যাদিকে তাঁহারা "evolution of gas" অর্থাৎ এক প্রকার গ্যাসেরই বিবর্তন—এই বলিয়াই ব্যাখ্যা দিলেন। এই সৃষ্টির মূলে যে একজন স্রষ্টা আছেন, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন খুঁজিয়া পাইলেন না। একটা নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের স্রোত বহিয়া চলিল, সেই স্রোতে মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঈমান, আকিদা সমস্তই ভাসিয়া গেল; বিজ্ঞান-বিরোধী কোন কথাই আর কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহিল না।

নিরাশার অন্ধকারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষসূর্য অস্তমিত হইল।

বিংশ শতাব্দীর নবারুণরাগে এক নূতন রহস্যলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, মানুষ আবার নূতন করিয়া জগৎ ও জীবনকে দেখিতে শিখিল।

এ-যুগের বিজ্ঞান আনিল নূতন বাণী, নূতন দৃষ্টিভংগি। মানুষের চিন্তাজগতে আনিল এক মহা বিপ্লব। এতদিনকার সাধের সমস্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদের বুনিয়াদ নড়চড় হইয়া গেল। জগৎ দেখিল, এতদিন বিজ্ঞান যে কথা বলিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রায় কোনটিই নির্ভুল নহে।

এই বিপ্লবের শ্রেষ্ঠনায়ক হইতেছেন মনীষী আইনষ্টাইন (Einstein)। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি থিওরী প্রচার করিলেন, তার নাম: Theory of Relativity. তিনি বলিলেন: বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যে-জ্ঞানলাভ হইতেছে বা হইয়াছে, তাহা ধ্রুব সত্য (Absolute Truth) নহে তাহা আপেক্ষিক (Relative) অর্থাৎ আমরা যাহা দেখি বা শুনি, তাহা এক অবস্থায় আমাদের কাছে যে-পরিমাণ সত্য, অন্য অবস্থায় ঠিক সেই পরিমাণে সত্য নহে, অবস্থার পরিবর্তন হইলে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হইয়া যাইবে। কাজেই বিশ্ব-জগৎ সম্বন্ধে সর্বদেশ, সর্বকাল ও সর্বলোকসম্মত কোন সত্যকে লাভ করা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থান, কাল ও গতির কথা বলা যাইতে পারে। আমরা সীমাবদ্ধ জীব, স্থান ও কাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অতি ক্ষুদ্র। আমরা এক ইঞ্চি স্থানকে বা এক সেকেণ্ড সময়কে খুবই কম বলিয়া মনে করি, আবার এক কোটি বৎসর সময় আমাদের কাছে খুবই বেশী বলিয়া মনে হয়; তার কারণ আমরা

বড়-জোর একশত বৎসর বাঁচি এবং এক হাজার মাইল স্থানের খবর রাখি। কিন্তু অপর গ্রহেও যে আমাদের মতই ইঞ্চি এবং সেকেণ্ড দ্বারা স্থান-কালের পরিমাপ হয়, অথবা আমাদের মাইল ও ঘণ্টার সহিত যে তাহাদের মাইল ও ঘণ্টার মিল আছে, তাহার প্রমাণ কি ? আমরা যাহাকে এক ঘণ্টা সময় বলিতেছি, মঙ্গল গ্রহে তারা এক ঘণ্টা না-ও হইতে পারে। কাজেই আমরা যদি যদি বলি যে, অত মাইল দূরে বা অমুক সময় অমুক ঘটনাটি হইয়াছিল, তবে তাহা একটা ধ্রুব সত্য রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। স্থান, কাল এবং গতি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ঠিক নয়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মনে করুন ডাউন পাঞ্জাব মেল পূর্ণবেগে হাওড়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এক ব্যক্তি একটি মধ্যবর্তী ষ্টেশনের প্লাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছে। সে দেখিল, ট্রেনখানি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। কিন্তু ট্রেনখানির গতিবেগ সম্বন্ধে কি এই কথাই অভ্রান্ত সত্য ? কিছুতেই না। বিভিন্ন অবস্থা হইতে দেখিলে ইহার গতি বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবে। ধরুন, অন্য এক ব্যক্তি ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগবান একখানি লোকাল ট্রেনে চাপিয়া একই দিকে (same direction) যাইতেছে। অর্থাৎ পাঞ্জাব মেলের পাশাপাশিই তাহার ট্রেন চলিতেছে। সে কী দেখিবে ? সে দেখিবে যে, পাঞ্জাব মেলখানি ঘণ্টায় মাত্র ৩৫ মাইল (৬০—২৫=৩৫) বেগে চলিতেছে আবার মনে করুন, তৃতীয় এক ব্যক্তি হাওড়া হইতে বিপরীত দিকে (opposite direction) ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে একখানি গাড়ীতে চড়িয়া পাঞ্জাব মেলখানিকে তাহার পাশ দিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখিল। সে দেখিবে পাঞ্জাব মেল ঘণ্টায় ৮৫ মাইল (৬০+২৫=৮৫) বেগে ছুটিতেছে। তিন অবস্থায় তিন জন তিন রকম দেখিল। কার দেখা সত্য ? পাঞ্জাব মেলের গতি প্রকৃতপক্ষে কত ? ৬০ মাইল—৩৫ মাইল ? ৮৫ মাইল ? অথবা অন্য কিছু ?

আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন :

মনে করুন উপরোক্ত পাঞ্জাব মেলেই এক ভদ্রলোক নিজের কামরা হইতে খাবার কামরায় (dining car) যাইতেছেন। তিনি চলিয়াছেন ঘণ্টায় দুই মাইল বেগে। পথের ধারের এক বাড়ীর জানালা হইতে এক ব্যক্তি ট্রেনের দিকে চাহিয়া আছে। সে দেখিল ভদ্রলোকটি গাড়ীর

সমান গতিতেই (অর্থাৎ ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে) অগ্রসর হইতেছে। পক্ষান্তরে চন্দ্র বা মঙ্গল-গ্রহ হইতে কেহ যদি দেখে, তবে দেখিবে লোকটি পৃথিবীর গতির সঙ্গে সমানে ছুটিয়া চলিতেছে। (অর্থাৎ প্রতিঘণ্টায় ১০০০ মাইল বেগে যাইতেছে)।

কার দেখা সত্য?

একদিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, কেহই মিথ্যা দেখে নাই। নিজের নিজের দিক দিয়া প্রত্যেকের দেখাই সত্য হইয়াছে। কিন্তু অন্য দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, কোনটাই সত্য নহে। কোন কিছুর গতি নির্ণয় করিতে হইলে তার বাহিরে একটা নির্দিষ্ট স্থান বা স্থির বিন্দু চাই-ই চাই। অন্যথায় কোন কিছুর গতি নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গতি নির্ণয় করিতে হইলেই কোন একটা নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে করিতে হয়। কোন ট্রেন ৬০ মাইল বেগে ছুটিয়া যাইতেছে বলিলে উহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোন স্থিতবিন্দু (fixed point) হইতে ঘণ্টায় সে ৬০ মাইল দূরে সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেরূপ একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এই বিশ্বজগতে আমরা পাই কোথায়? বিশ্ব-প্রকৃতিতে সেরূপ কোন স্থির-বিন্দু নাই। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র প্রতিনিয়ত বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে, কেহই স্থিরভাবে বসিয়া নাই। যে দাঁড়াইয়া আছে, সে মনে করিতেছে সে স্থির হইয়াই আছে, কিন্তু তা নয়। পৃথিবী অনবরত তাহার মধ্যশলাকার (axis) চারিদিকে ঘুরিতেছে; কাজেই দাঁড়াইয়া থাকি, আর দৌড়াইয়া চলি, প্রত্যেকেই আমরা পৃথিবীর সংগে সংগে ঘুরিতেছি। অতএব ট্রেনখানি সম্বন্ধে কাহারো দেখা নির্ভুল হইতেছে না। পৃথিবীর অ্যাক্সিস্ হইতে দেখিলে নিশ্চয়ই ট্রেনখানির গতি অন্যরূপ প্রতিভাত হইবে। আবার সূর্যলোক হইতে যদি কেহ দৃষ্টিপাত করে তবে ট্রেনের কোন গতি হয়ত তাহার দৃষ্টিগোচরই হইবে না; সে দেখিবে কেবল মাত্র পৃথিবীর গতি। এইরূপে অসংখ্য ব্যক্তি অসংখ্য অবস্থা হইতে অসংখ্য রূপে ট্রেনখানিকে দেখিতে পারে। এইজন্যই কোন-কিছুর সঠিক গতি নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। James Jeans বলিতেছেন :—

"Nature is such that it is impossible to measure an absolute velocity by any means whatsoever."

—The New Background of Science by Jeans, p. 97

J. W. N. Sullivan বলিতেছেন :

"Let us suppose, for instance, that we are travelling by a train moving at sixty miles per hour. What does that statement mean ? Evidently it means that we are passing fixed objects outside, such as railway buffets, trees, telegraph posts, at the rate of sixty miles an hour. But these so-called fixed objects are all partaking in the motion of rotation of the earth on its axis. So that with respect to the earth's axis, our train is moving quite a different way. But even the earth's axis is not fixed in space. The whole earth is moving round the sun. And the sun and the whole solar system is moving quite rapidly through space towards the star *Vega*. And Vega and the Sun and the whole system of stars of which they form part are in motion with respect to other systems of stars which are themselves moving with respect to one another. There is no absolutely fixed point from which we can measure our motion. Motion is relative."

অর্থাৎ : "মনে করুন আমরা ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগবান একখানি ট্রেনে যাইতেছি ! এ কথায় অর্থ কি ? অর্থ এই যে, আমরা ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে বাহিরের কতিপয় স্থির বস্তুকে (যেমন বৃক্ষ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ইত্যাদি) অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। কিন্তু এই তথাকথিত 'স্থির বস্তুগুলি' সকলেই পৃথিবীর কক্ষপরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করিতেছে। কাজেই, পৃথিবীর অ্যাক্সিস্ হইতে দেখিলে বলিতে হয়, আমাদের ট্রেনখানি অন্যভাবে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর এই অ্যাক্সিসও একস্থানে স্থির হইয়া নাই। পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে ; সূর্য এবং সমগ্র সৌর জগতও মহাশূন্যের মধ্য দিয়া 'ভেগা' (Vega) নামক নক্ষত্রের দিকে দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আবার এই 'ভেগা' সূর্য এবং তাহাদের পরিবারভুক্ত নক্ষত্রগুলী অন্য আর একটি গতিশীল নক্ষত্রের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কাজেই এই বিশ্ব-জগতে এমন

কোন নির্দিষ্ট বিন্দু নাই—যেখান হইতে আমরা কোন বস্তুর গতি নির্ণয় করিতে পারি। গতি তাই আপেক্ষিক।" ইহার উপরেও আর একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। এক গ্রহে যাহা সত্য, অপর গ্রহেও যে তাহা ঠিক সেইরূপই সত্য, তাহা কে বলিবে? আমাদের এই পৃথিবী হইতে কোন বস্তুকে আমরা যেরূপ দেখিতেছি সূর্য বা মংগলগ্রহ হইতে দেখিলেও যে সেইরূপই দেখিব, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। আমাদের এখানকার স্থান এবং কালের ধারণার সহিত সেখানকার স্থান-কালের ধারণা নাও মিলিতে পারে। কাজেই স্থান ও কাল সম্বন্ধে অন্যনিরপেক্ষ অপরিবর্তনীয় সত্য জানিবার উপায় আমাদের নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এই নূতন মতবাদ একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। মনীষী আইনস্টাইনের "Theory of Relativity" প্রকাশিত হইবার পর, প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রায় সমস্তগুলিই একরূপ অচল হইয়া পড়িয়াছে। পদার্থ (Matter), স্থান (Space)*, কাল (Time), আলোক (Light), বিদ্যুৎ (Electricity), মহাকর্ষ নীতি (Law of Gravitation), কার্যকারণ-নীতি (Law of Causation) ইত্যাদি বিষয়ক সমস্ত মৌলিক ধারণাই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। আইনস্টাইন ও তাঁহার মতানুসারী পণ্ডিতেরা পূর্বতন মতগুলির নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ফলে, বিজ্ঞান-জগতে একটা প্রকাণ্ড ওলট-পালটের সূচনা হইয়াছে। আমরা অতি সংক্ষেপে এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা পাঠ করার সংগে সংগে ইসলাম ও তাহার পয়গম্বর সম্বন্ধেও পাঠকের অনেক ধারণা পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

পদার্থ (Matter)

প্রথমেই পদার্থের কথা বলা যাউক।

জড়প্রকৃতির প্রধান উপাদান পদার্থ লইয়া পণ্ডিতদিগের গবেষণার অন্ত

* স্থান [Space] সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা উচিত। স্থান অর্থে শুধু পৃথিবীর উপরিভাগ নয়। আমাদের মাথার উপরে ও চতুর্দিকে যে মহাশূন্য রহিয়াছে, যাহার মধ্যে কোটী গ্রহনক্ষত্র ঘুরাফেরা করিতেছে—সমস্তকেই স্থান বলে। Space অর্থে তাই মহাশূন্য।

নাই। প্রাচীনকাল হইতেই প্রকৃতির এই দিকটায় তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া আছে। প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন: ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে আমাদের পৃথিবী রচিত। কালে কালে গবেষণা করিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন: মোট ৭১ প্রকার উপাদান দ্বারা এই জগৎ গঠিত। ইহার পরে আরও গবেষণা চলিল; ফলে পদার্থের মোট সংখ্যা ৯২তে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আসিল অণুবাদ বা Molecular Theory. এই থিওরীতে বলা হইল যে, প্রত্যেক পদার্থকে ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ করিয়া চলিলে অবশেষে যে-চরম অবিভাজ্য অংশটি পাওয়া যায় তাহার নাম অণু বা Molecule. Molecule-কে আর অধিক ভাগ করা চলে না, ইহাই পদার্থের শেষ ক্ষুদ্রতম অংশ। কিন্তু কিছুদিন পরে এ মতবাদও পরিত্যক্ত হইল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Dalton বলিলেন, Molecule-কে আরও সূক্ষ্মাংশে বিভাগ করা যায়, সেই সূক্ষ্মতম অংশের নাম Atom বা পরমাণু। দুই বা ততোধিক Atom দ্বারা এক-একটি Molecule গঠিত হয়। কাজেই Atom-ই হইতেছে পদার্থের সর্বশেষ অবস্থা। ইহাই হইল Atomic Theory বা পরমাণুবাদ।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সংগে সংগে Atomic Theory-ও উড়িয়া গেল। পণ্ডিতেরা দেখিলেন, Atom-ই পদার্থের শেষ অবস্থা নয়। Thomson, Rutherford প্রভৃতি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকেরা ঘোষণা করিলেন: সমস্ত পদার্থের মূলে আছে বিদ্যুৎ (electricity); সে বিদ্যুৎ আবার দুই প্রকারের: Electron ও Proton. Electron হইতেছে ঋণাত্মক (negative) বিদ্যুৎ আর Proton হইতেছে ধনাত্মক (positive) বিদুৎ। এই ইলেকট্রন ও প্রোটনই হইতেছে সকল পদার্থের মূল। অনেকগুলি Electron ও Proton লইয়া এক একটি Atom গঠিত। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য গ্রহনক্ষত্র যেমন প্রতিনিয়ত চক্রাকারে ঘুরিতেছে, এক একটি Atom-কে ঘিরিয়া Electron ও Proton-গুলিও তেমনই নৃত্য করিতেছে। এই Electron ও Proton হইতে অবিরত একটা তাপ বিকীর্ণ হইতেছে; সমুদ্রের তরংগের ন্যায় সেই তড়িৎ-তরংগ নাচিয়া চলিতেছে।

ইহাই হইতেছে পদার্থ সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ।

কোথা হইতে কোথায় আসিলাম, পাঠক একবার লক্ষ্য করুন। পুরাতন বিজ্ঞান বলিতেছিল, এই জড়প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র উপাদান (Elements) রহিয়াছে ; তাহাদের মোট সংখ্যা কত, তাহাও বিজ্ঞানীরা গণনা করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু নূতন বিজ্ঞান বলিতেছে, পদার্থের মূলে গেলে কোনই স্বাতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না ; সেখানে শুধুই নূরের লীলা-খেলা—সেখানে শুধুই জ্যোতির তরঙ্গ-দোলা।

স্থান ও কাল (Space and Time)

স্থান ও কাল সম্বন্ধেও প্রাচীন ধারণা একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ববর্তী সমস্ত পণ্ডিতেরাই অনুমান করিয়া গিয়াছেন : আমরা যে-পৃথিবীতে বাস করি, তাহার স্থান সমতল-গুণবিশিষ্ট এবং তাহার মাত্র তিনটি অবস্থান বা বিস্তার (dimension) আছে : দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই ইউক্লিড তাঁহার জ্যামিতি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আইনস্টাইন ও তাঁহার সতীর্থেরা বলিলেন, স্থানের ধারণা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। ইউক্লিডের জ্যামিতি শুধু সমতল ক্ষেত্রের পক্ষেই খাটে, কিন্তু আমরা যে-জগতে বাস করি, সে-জগৎ ওরূপ সমতল-বিশিষ্ট নয়। "We live in a universe whose geometry is non-Euclidean." অর্থাৎ যে-জগতে আমরা বাস করি, তাহার জ্যামিতি ইউক্লিডের নয়। আমাদের জগৎ গোলক-ধর্মী (spherical), অর্থাৎ বাঁকানো। কাজেই ইউক্লিডের জ্যামিতির নিয়মে বুঝিতে গেলে এ-জগতের কিছুই আমরা বুঝিতে পারিব না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে : ইউক্লিড আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যে-কোন ত্রিভুজের তিন কোণ একত্রে দুই সমকোণের সমান। কিন্তু এ-কথা শুধু সমতল ক্ষেত্রে অংকিত ত্রিভুজের বেলাই খাটে, একটি ডিম্বের উপরে বা একটি গোলকের উপরে অংকিত ত্রিভুজের বেলায় খাটে না। গোলকের উপরে ত্রিভুজ আঁকিলে সে ত্রিভুজের তিন কোণ কিছুতেই একত্রে দুই সমকোণের সমান হইবে না।

সরল রেখা (Straight line) সম্বন্ধেও ইউক্লিড আমাদের মনে যে ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন, তাহাও ভুল। শুধু সমতল ক্ষেত্রের বেলাতেই ইউক্লিডের সংজ্ঞা খাটে, কিন্তু বিশ্বজগৎ (universe)-এর বেলায় এ সংজ্ঞা খাটে না। উচ্চ গণিতে (higher mathematics) সরল রেখার সংজ্ঞা

হইতেছে অন্তরূপ। সেখানে বৃত্তের (circle) পরিধিও বক্র না হইয়া সরল হইয়া যায়। আমরা কোন কেন্দ্র (centre) লইয়া যখন ছোট একটি বৃত্ত আঁকি, তখন সে বৃত্তের পরিধি সুস্পষ্টভাবেই বক্র হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু বৃত্তটির ব্যাস (radius) যদি ক্রমাগত আমরা বাড়াইতে থাকি, অর্থাৎ বৃত্তটি যদি ক্রমাগত বড় হইতে থাকে, তবে দেখা যাইবে, পরিধির বক্রতা ক্রমেই শিথিল হইয়া সরল রেখার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে পরিধিটি যদি অনন্তে (Eternity) প্রসারিত করিয়া দেওয়া যায়, তবে তখন তাহা সরলরেখা হইয়াই দেখা দিবে।

আবার ইউক্লিড যে বলেন: এক সরল রেখা দ্বারা কোন স্থানকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তাহাও ভুল। পৃথিবী বা কোন গোলকের উপরে ক্রমাগত একটি সরল রেখা টানিয়া গেলে এক সরল রেখা দ্বারাও একটা নির্দিষ্ট স্থানকে সীমাবদ্ধ করা যায়।

আইনস্টাইন এ কথাও বলিতেছেন যে, ইউক্লিডের জ্যামিতির জ্ঞান আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে বলিয়াই বিশ্বজগতের অনেক ঘটনাই আমরা বুঝিতে পারি না। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম (Law of Gravitation)-এর কোনই প্রয়োজন হয় না যদি আমরা জানি যে, আমরা ইউক্লিডের পৃথিবীতে বাস করি না। বক্রাকার জগতের স্বাভাবিক ধর্ম হিসাবেই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মকে ব্যাখ্যা করা যায়। J. W. N. Sullivan তাঁহার বিখ্যাত "Limitations of Science" নামক পুস্তকে বলিতেছেন:

> "A great deal of Nature's behaviour can be explained if we suppose that events are taking place in a non-Euclidean universe. Many of the happenings that have led us to invent laws of nature to account for them are merely natural consequences of the fact that we live in a universe whose geometry is non-Euclidean" (p. 75)

অর্থাৎ: স্বভাবের বহু আচরণকেই আমার অনায়াসে ব্যাখ্যা করিতে পারি—যদি আমরা মনে করি যে, যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা ইউক্লিডের জগতে ঘটিতেছে না। যে সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমাদিগকে স্বভাবের নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইতেছে,

তাহাদের অধিকাংশই অতি স্বাভাবিকভাবেই এজন্য ঘটিতেছে যে, আমরা যে-জগতে বাস করি তাহার জ্যামিতি ইউক্লিডের নয়।

আইনস্টাইন তাই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :

"The phenomenon of gravity is merely the effect of the curvature of the four-dimensional space-time world.

…(One, Two, Three…Eternity)

অর্থাৎ : আকর্ষণ ব্যাপারটা চারি ডাইমেনশন বিশিষ্ট বক্রাকার জগতের স্বাভাবিক ধর্ম ছাড়া কিছু নয়।

জগৎ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের এতদিনকার বদ্ধমূল ধারণা তাহা হইলে একেবারে চুরমার হইয়া যাইতেছে না কি?

সময় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সময়ের ধারণাও আমাদের একেবারে ভুল। একটা মনগড়া হিসাব ও নিক্তি দ্বারা আমরা সময়কে পরিমাপ করিতেছি। একে তো সময় যে কী তাহা আমরা জানি না, তাহার উপর আবার আমাদের সময়ের হিসাব ও বিভাগও নিতান্ত ভুল। কোন ঘটনার ঠিক-সময় কেমন করিয়া তবে আমরা নির্ণয় করিতে পারি? কোন্‌টি বর্তমান, কোন্‌টি অতীত, কোন্‌টি ভবিষ্যৎ তাহাই বা কি করিয়া বুঝি? কোন ঘটনা ঘটা এবং তাহার দেখা বা শোনার মধ্যে যে-সময়ের দূরত্ব বা ব্যবধান থাকে তাহা সর্বত্র সমান নয়। দেখার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হইতেছে: যে-বস্তুকে আমরা দেখি, তাহার আলোক বিকীর্ণ হইয়া আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে এবং চক্ষু-ফলকের মধ্য দিয়া তাহা মস্তিষ্কে গিয়া একটা অনুভূতির সৃষ্টি করে এবং তখনই আমরা বুঝি যে সেই বস্তুটিকে আমরা দেখিতেছি। কাজেই, কোন বস্তুর আলোক আমাদের চক্ষে না আসিয়া পৌঁছান পর্যন্ত আমরা বলিতে পারি না যে, সেই বস্তুটিকে আমরা দেখিতেছি। এই আলোক আমাদের চক্ষে আসিয়া পৌঁছিতে নিশ্চয়ই কিছু সময় লাগে, কারণ, পাঠক জানেন আলোকের গতি আছে। প্রতি সেকেণ্ডে আলোক ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল যাইতে পারে। কাজেই যে-মুহূর্তেই কোন ঘটনা ঘটিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি, ঠিক সেই মুহূর্তেই যে সে ঘটনাটি ঘটে তাহা নহে, তাহার পূর্বেই ঘটে। কত পূর্বে, তাহা নির্ভর করে ঘটনাটি হইতে আমাদের দূরত্বের উপরে। ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল দূরে ঘটিলে সে ঘটনাকে আমরা এক সেকেণ্ড পরে দেখিতে পাইব। এই হিসাবে

১,১১,৬০,০০০ মাইল দূরে ঘটিলে ১ মিনিট পরে দেখিব; ইহার দশগুণ দূরে ঘটিলে ১০ মিনিট পরে দেখিব—লক্ষগুণ দূরে ঘটিলে লক্ষ মিনিট পরে দেখিব। আমরা আকাশে যে-সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদের কোন-কোনটি কোটী কোটী মাইল দূরে অবস্থিত; কাজেই তাহাদের আলোক এই পৃথিবীতে পৌঁছিতে হাজার হাজার বৎসর কাটিয়া যায়। এত দূরে তাহারা অবস্থিত যে, তাহাদের দূরত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের পঞ্জিকার বৎসরে কুলায় না—আলোক বৎসর (light-year) দ্বারা বুঝিতে হয়।* এমনও হইতে পারে, যে-নক্ষত্রটি আজ আমরা যেখানে দেখিতেছি অর্থাৎ যাহার আলো আজ আমাদের চক্ষে আসিয়া প্রতিভাত হইতেছে, সে-নক্ষত্রটি হাজার হাজার বৎসর পূর্বে সেখানে দেখা গিয়াছিল; কিন্তু আজ আর সেখানে সে নাই, এতদিন সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে অথবা মরিয়া-পচিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে। অতএব, এই পৃথিবীতে বসিয়া যাহাকে আমরা মনে করিতেছি যে, 'আজ' বা 'এখন' দেখিলাম, প্রকৃতপক্ষে তাহা 'এখনকার' ব্যাপার নয়—সুদূর অতীতের ব্যাপার। আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। মনে করুন: ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যেদিন যুদ্ধ হয়, সেদিন যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের চক্ষে সে-যুদ্ধের আলোক-চিত্র সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিভাত হওয়ায় তাহারা বুঝিয়াছিল যে, যুদ্ধটি সেই দিনই সেই সময়ে ঘটিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবী হইতে কোটি কোটি মাইল দূরবর্তী বহু গ্রহে বা নক্ষত্রে সে আলোক-চিত্র হয়ত এখনও পৌঁছায় নাই। কাজেই যে-গ্রহে উহা আজ ঘটিতেছে,—ঠিক তেমনি করিয়া ক্লাইভ আসিয়াছে, তেমনি করিয়া মোহনলাল বীরের মত যুদ্ধ করিতেছে, ইত্যাদি; আবার যে-গ্রহে উহা এখনও পৌঁছায় নাই, সে-গ্রহের অধিবাসীরা পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন খবরই রাখে না। দশ বৎসর, বিশ বৎসর, একশত বৎসর পরে হয়ত তাহারা দেখিবে যে পলাশীর যুদ্ধ চলিতেছে। এ অবস্থায় আমরা কী বলিব? পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে? না ঘটিতেছে? না ঘটে নাই? বর্তমানই বা কাহাকে বলিব? অতীতই বা

* এক আলোক-বৎসর (light-year) প্রায় ৬০,০০০,০০,০০০,০০০ মাইল। অর্থাৎ এক বৎসরে আলোক ষাট হাজার কোটী মাইল যাইতে পারে। এক আলোক বৎসরের পথ বলিলে তাই বুঝিতে হইবে ষাট হাজার কোটী মাইলের পথ।

কাহাকে বলিব ? আর ভবিষ্যৎই বা কাহাকে বলিব ? যে-ঘটনা আজ আমার নিকট 'অতীত', সেই ঘটনাই অপরের নিকট 'বর্তমান' আবার অন্য আর একজনের নিকট 'ভবিষ্যৎ'। অতএব আমরা দেখিতেছি, সময় সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ঠিক নহে। উহা একটা আপেক্ষিক ধারণা মাত্র। দৃষ্টি-বিন্দুর (point of observation) তারতম্যে সময়েরও তারতম্য ঘটিয়া যায়।

কোন-কিছু দেখার ন্যায় শোনাও আমাদিগকে ভুল্যরূপে বিভ্রান্ত করে। আলোকের ন্যায় শব্দেরও গতি আছে; কাজেই শব্দদ্বারা স্থান বা কালকে নির্ণয় করিতে গেলেও অবিকল একইরূপ ভুল হইবে।

এইজন্যই আইনস্টাইন প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, আমাদের স্থান-কাল বা গতির ধারণা আপেক্ষিক। তাঁহাদের মতে আমাদের 'স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' (Standard Time) বলিয়া কোন টাইম নাই; সকল টাইমই 'লোকাল' (Local)। প্রকৃতির সঠিক সময় (True time of Nature) যে কী, তাহা এখনও আমরা জানি না।

Sir James Jeans বলিতেছেন :

"True time implies the existence of a body at rest in space. Not only have we no means of discovery as to when a body is at rest in space but there is every reason to suppose that the phrase is meaningless. On these grounds, Einstein maintained that all time is 'local'; there are as many local times as there are rockets or planets or stars moving through space and none of them is more fundamental than any other."—The New Background of Science (p. 97)

অর্থাৎ: সঠিক সময় নির্ধারণ করিতে হইলে কোন স্থানে কোন একটি স্থির বস্তু চাই, কিন্তু প্রকৃতিতে সেরূপ কোন স্থির বস্তু নাই। এইজন্যই আইনস্টাইন মনে করেন যে, সমস্ত টাইমই 'লোকাল'; বিশ্ব ভুবনে যত গ্রহ-নক্ষত্র আছে, তত লোকাল টাইম আছে, তাহাদের কোনটাই কোনটা হইতে অধিক মৌলিক নহে।

স্থান ও কালের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নাই। Minkowski বলেন : "Henceforth space itself and time by itself are doomed to fade away into more shadows and only a kind of

union of the two will preserve an independent reality."

—(Limitations of Science, p. 72)

অর্থাৎ : এখন হইতে স্বতন্ত্রভাবে স্থান এবং কালের অস্তিত্ব আর থাকিবে না, কেবল উভয়ের একটি মিলিত রূপই সত্য বলিয়া টি কিয়া থাকিবে।

J. W. N. Sullivan বলেন :

"Nature, it appears, knows nothing of the distinction we make between space and time. The distinction we make is ultimately a psychological peculiarity of ours. There is nothing absolute about space or time".

—(Limitations of Science, p. 72)

অর্থাৎ : আমরা স্থান ও কালের মধ্যে যে পার্থক্য করি, প্রকৃতি সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না বলিয়া মনে হয়। এই পার্থক্য আমাদের মনেরই এক অদ্ভুত খেয়াল বিশেষ। স্থান বা কাল বলিয়া ধ্রুব কিছুই নাই।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :—

"Two events which are simultaneous for one observer are not simultaneous for an observer who is moving with a different motion. There is no such thing as the *time or the distance* between two events. Different observers reach different results." – (Ibid., pp. 70-71)

অর্থাৎ : দুইটি ঘটনা একজন দর্শকের কাছে সমসাময়িক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ভিন্ন-গতিসম্পন্ন আর একজন দর্শকের কাছে সমসাময়িক বলিয়া মনে হইবে না। দুইটি ঘটনার মধ্যে বাঁধাধরা কোন কাল বা দূরত্ব নাই। বিভিন্ন দর্শক বিভিন্নভাবে তাহাদিগকে দেখিবে।

স্থান (space) সম্বন্ধে আইনস্টাইন আরও একটি নূতন কথা বলিয়াছেন। আমাদের এই জগৎ (universe) সমাহীন (infinite) নয়, সসীম (finite) ; কিন্তু তাই বলিয়া ইহার চতুঃসীমার দিশা পাওয়াও আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। সসীম হইয়াও আমাদের জগৎ ক্রমাগত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, নীহারিকাপুঞ্জ প্রতিনিয়ত অতি দ্রুতবেগে পশ্চাতে হটিয়া যাইতেছে, কাজেই আমাদের জগৎ (universe) আয়তনে দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। একটি ডিম্বাকৃতি রবারের বেলুনের সহিত আমাদের

এই ক্রমবর্ধমান জগতে (Expanding Universe) তুলনা হইতে পারে। মনে করুন, এই বেলুনটির মধ্যে পৃথিবী, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র অংকিত রহিয়াছে। এখন এই বেলুনটাকে ক্রমাগত পাম্প করিয়া বাড়াইয়া দিলে যেরূপ দশা ঘটে, আমাদের জগতেরও ঠিক সেইরূপ দশাই ঘটিতেছে। এই ধরণের জগতে বাস করিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতি দ্বারা আমাদের কোন কাজই চলে না। এইজন্যই বিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ্ রাইমান (Riemann) এক নূতন ধরণের জ্যামিতি আবিষ্কার করেন; বক্র জগতের স্থান নির্ণয়ের জন্য জ্যামিতি কার্যকরী বলিয়া আইনস্টাইন ইহাকে মানিয়া লইয়াছেন।

স্থান-কাল (Space-time)

স্থান ও কালের সঠিক স্বরূপ দেখাইয়াই আইনস্টাইন থামেন নাই। তিনি বলিতেছেন: স্থান ও কালকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখাও ভুল। প্রকৃতিতে 'স্থান' ও 'কাল' বলিয়া কোনো দুইটি আলাদা জিনিস নাই; যদি থাকে তবে তাহা ঢালাই-করা একটা অবিভাজ্য জিনিস—যাহাকে আমরা একসংগে স্থান-কাল (Space-time) বলিতে পারি। কাজেই, স্থান সম্বন্ধীয় যে-কোন ঘটনাকে বুঝিতে হইলে এই সময়-সমস্যাকে (time factor) এড়াইয়া চলিবার উপায় আমাদের নাই; স্থানের ভিতরে যখন মিশিয়া আছে, অর্থাৎ স্থান যখন সময় ছাড়া দাঁড়াইতেই পারিতেছে না, তখন স্থানের মধ্যে যাহা-কিছু ঘটিবে, সময়ের সংগে সে সমস্তরই সম্বন্ধ থাকিবে। এইজন্যই আইনস্টাইন বলিতেছেন যে, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য (length), প্রস্থ (breadth) এবং উচ্চতা (height) ছাড়া আরও একটি বিস্তার বা স্থিতি আছে, সেটি হইতেছে সময়; এই সময় হইতেছে তাঁহার মতে প্রত্যেক বস্তুর চতুর্থ বিস্তৃতি বা fourth dimension। এইরূপ সময়-বিশিষ্ট স্থানকে তিনি "fourth dimensional continuum" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। একখানি টানা-পোড়েন দেওয়া তাঁতের কাপড় যেমন, আমাদের স্থান-কালও সেইরূপ একটা ঢালাই-চাদর—যাহার উপর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সমস্ত ঘটনার চিত্র-মূর্তি আঁকা রহিয়াছে। আমরা একটির পর আর একটি দেখিয়া যাইতেছি, তাই আমাদের কাছে সময় ও দূরত্বের

ধারণা জন্মিতেছে ; কিন্তু প্রকৃতির কাছে এই সময় বা দূরত্বের কোন প্রশ্নই জাগে না। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—সমস্তই সে একসঙ্গে দেখিতেছে। বিশ্ব-প্রকৃতির এই চাদরে সব কিছুই আঁকা রহিয়াছে ; সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিবার, সমস্তই ঢালাই হইয়া আছে ; বর্তমান বৎসর যেরূপ আছে, ২৯০০০ সালও ঠিক তেমনই আছে। অষ্ট্রেলিয়া দেশটি আমরা অনেকেই দেখি নাই, তবু যেমন পৃথিবীর বুকে তাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে, ভবিষ্যতের ঘটনাও পূর্ব হইতে সেইরূপ ঘটিয়া রহিয়াছে—আমরা কোনদিন তাহা দেখি বা না দেখি, তাহাতে কিছু যায় আসে না। কাজেই প্রকৃতির নিকট ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কোনই তারতম্য নাই—তাহার কাছে সমস্তই চির-বর্তমান।

প্রত্যেক বস্তুর স্থিতি বা অস্তিত্বের সঙ্গে তাই শুধু স্থানেরই সম্বন্ধ নাই, কালও তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। যে-কোন লোকের পরিচয় দিতে গিয়া শুধু যদি বলি যে তিনি অমুক স্থানের অধিবাসী ছিলেন ; তাহা হইলে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। 'কোথায় ছিলেন' প্রশ্নের সংগে 'কখন ছিলেন' এ প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। যে-কোন একটা ঘর বাড়ি বা স্কুল সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গেলেও একই কথা বলিতে হয়। মহাকালের বুকে কোন্ ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্যন্ত অবস্থিত ছিল, তাহাও তাহার ভৌগোলিক পরিচয়ের সহিত বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন : অন্যথায় কাহারও পরিচয় সম্পূর্ণ বা সুনির্দিষ্ট হয় না। এইজন্য দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সঙ্গে সময়-রেখারও হিসাব লইতে হয়। সাড়া-ব্রীজের পরিচয় দিতে গিয়া শুধু যদি এর দৈর্ঘ্যের উল্লেখ করি, প্রস্থ বা উচ্চতার কথা না বলি, কিংবা শুধু যদি এক উচ্চতার কথা বলি, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের কথা না বলি, তাহা হইলে যেমন সাড়া-ব্রীজ সম্বন্ধে আমাদের কোন পরিচয়ই সম্পূর্ণ হয় না, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার কথা বলিয়া সময়-রেখার উল্লেখ না করিলেও তেমন পরিচয়ে ত্রুটি থাকিয়া যায়। স্থান এবং কালের ধারণা তাই একসঙ্গে বাঁধা। এতদিন মানুষ শুধু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার কথাই ভাবিয়াছে, সময়-রেখার কথা ভাবে নাই। আইনস্টাইন সেই সত্য আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান-জগতে বিপ্লব আনিয়াছেন।

সময়কে এইজন্যই প্রত্যেক বস্তুর চতুর্থ বিস্তৃতি (fourth dimension) বলা হয়।

আলোক ও বিদ্যুৎ (Light & Electricity)

আলোক সম্বন্ধেও আমার ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্বে লোকে মনে করিত যে, চোখের জ্যোতি দিয়াই আমরা জগতের সমস্ত কিছু দেখি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিলেন, চোখের কোনই জ্যোতি নাই; প্রত্যেক পদার্থ বা বস্তুর নিজস্ব জ্যোতিই বিকীর্ণ হইয়া আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে, তাই আমরা সমস্ত কিছু দেখি। এই মতবাদের ফলেই আলোক-রশ্মির গতি-নির্ণয়ের সমস্যা আসিল এবং তাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা চলিতে লাগিল। ইহারই ফলে নিউটনের 'Corpuscular Theory of Light' প্রকাশিত হইল। তিনি বলিলেন: আলোক-রশ্মি সর্বত্র সরল রেখায় পরিভ্রমণ করে এবং উহা সূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু (Corpuscles) দ্বারা গঠিত। কিন্তু এই মতবাদ সম্পূর্ণ নির্ভুল নহে। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিলেন, আলোক-রশ্মি সোজাভাবেই চলে বটে, কিন্তু বাধা পাইলে সে বাধাকে ডিঙাইয়া যাইতে পারে। শব্দ (Sound) যেমন বাধা পাইলেও বাধাকে ডিঙাইয়া আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছে, আলোক-রশ্মিকে বাধা দিলেও সেইরূপ উহা সেই বাধাকে ডিঙাইয়া পুনরায় সরল পথে চলে। কেহ চীৎকার করিলে সেই ধ্বনি-তরংগকে (Vibration) যেমন কোন বেড়া দিয়ে একেবারে আটকাইয়া রাখা যায় না, আলোক-রশ্মিকেও সেইরূপ কোন আড়াল টানিয়া একেবারে আটকাইয়া দেওয়া হয় না, তরংগের ন্যায় উভয়েই তাহাদের সম্মুখের বাধাকে ডিঙাইয়া চলে। সমুদ্রের জলরাশির উপরিভাগে যেমন অসংখ্য তরংগ-দোলা দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ তাহারা যেমন সোজাভাবেই চলে, আলোকও সেইরূপ তরংগ-ভংগিতে সরল রেখায় চলে।* এই মতবাদের নাম হইল "Undulatory Theory

* নিউটন আবিষ্কার করেন যে প্রত্যেক গতিশীল বস্তুই স্বাভাবিক অবস্থায় সরলরেখায় পরিভ্রমণ করে। আলোক-রশ্মি সর্ব অবস্থাতেই সোজা পথে চলিতে চায়, চুম্বক বা অপর কোন প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার গতিকে সাময়িকভাবে ফিরাইয়া দিলেও সে পুনরায় সোজা পথেই চলে—বাঁকা পথে চলে না। (Every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by unforeseen forces."—Newton)

of Light"। একটা সরু চিরুণীকে লম্বালম্বিভাবে দেখিলে যেরূপ মনে হয়, আলোক-রশ্মিও ঠিক তদ্রূপ। দেখিতে একটা সরলরেখাই বটে, কিন্তু উহার প্রতিটি দাঁত উঠা-নামা করিয়া ঢেউয়ের মত বরাবর চলিয়া গিয়াছে।

আলোক-তরংগকে আরও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিলেন, ইহারা তিন প্রকারের: ছোট, বড় এবং মাঝারি। বলা বাহুল্য, এই তারতম্য অনুসারেই বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-তরংগকে 'খাটো' তরংগ (Short wave), 'মাঝারি' তরংগ (Medium wave) এবং 'লম্বা' তরংগ (Long wave) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। রেডিওতে যাঁহারা গান শোনেন, তাঁহারা ইহাদের বিষয় অল্প-বিস্তর জানেন।

ইহা হইতেই এ-যুগের অন্যতম নূতন মতবাদ 'Quantom Theory' আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, রশ্মি-তরংগ (Photon) প্রতি বারে এক একটি ঝাঁকুনি (jerking) দিয়া থামিয়া থামিয়া চলে। এই ঝাঁকুনিগুলিকে (Quanta) পরিমাপ করিয়াই আলোকের তরংগ-দৈর্ঘ্য (Wave-length) নিরূপণ করা হয়।

আলোক সম্বন্ধে সূক্ষ্ম গবেষণা করিতে যাইয়া পণ্ডিতেরা যে আর-একটি অভিনব তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাও বিজ্ঞান-জগতে কম বিস্ময় ও বিপ্লব সৃষ্টি করে নাই। সেটি হইতেছে "Cosmic Radiation." বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন্ সুদূর হইতে এক প্রকার তাপ (Radiation) প্রতিনিয়ত বিকীর্ণ হইয়া আমাদের এই সৌর জগতে ঠিকরিয়া পড়িতেছে, তাহার গতিরোধ কিছুতেই করা যাইতেছে না। এই তাপ অত্যন্ত ধ্বংসকারী। সমুদয় পদার্থের অন্তর্নিহিত পরমাণুকে (Atoms) ধ্বংস করাই ইহার কাজ। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রতি এক-কিউবিক ইঞ্চি পরিমিত স্থানের মধ্যে প্রায় ৩০টি Atom-কে সে নিহত করিতেছে। সমস্ত পদার্থের পরিবর্তন, ধ্বংস বা ক্ষয় সম্ভবতঃ এই কারণেই সাধিত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, নিখিল জগতের সমুদয় পদার্থের পরমাণুসমূহ দিনে দিনে যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে বা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হইতেছে, তাহার কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কী নিয়মে বা কোন্ কারণে এই একটি পরমাণু নিহত

হইতেছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না। একদল সৈন্যের উপর বাহির হইতে বন্দুকের গুলি চালাইলে যেমন বলা যায় না যে, কে কখন মরিবে, ইহাও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার। যে পরমাণুটি বুড়া হইয়া গিয়াছে, অথবা যেটি সামনে আছে, সেইটিই যে আগে মরিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন—

রেডিয়াম (Radium) একটি ধাতু। এই ধাতুর পরিমাণুগুলি দিনে দিনে সীসার (Lead) পরমাণুতে পরিবর্তিত হইতেছে। অন্য কথায় রেডিয়াম ধাতুর পরমাণুসমূহের মোট সংখ্যা দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে। জানা গিয়াছে, প্রতি ২০০০ পরমাণুর মধ্যে মাত্র ১টি পরমাণু এক বৎসরে মরিয়া যায়, কিন্তু এই দুই হাজারের মধ্যে কোন্‌টি যে মরিবে তাহা কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই। আমরা হয়ত মনে করিতে পারি যে, যে-পরমাণুটি অতি-বৃদ্ধ অথবা যেটি অতি-তরুণ, সেইটিই মহাতাপে প্রথম মরিবে; কিন্তু তাহা মোটেই নয়। ভাগ্যনিয়ন্তা নিতান্ত খামখেয়ালীর মত যেটাকে খুশী নিহত করিতেছেন।

এই একটিমাত্র আবিষ্কারের ফলেই বৈজ্ঞানিকদিগের এতদিনকার বদ্ধমূল ধারণা একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে। এতদিন তাঁহারা মনে করিতেন: কার্য-কারণ-নীতি (Law of Causation) ও স্বভাবের সমনিয়মানুবর্তিতা (Uniformity of Nature) দ্বারাই বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অন্য কথায়: প্রকৃতির মূলে আছে একটা স্থিরতার নীতি বা "Principle of Determinacy," অর্থাৎ প্রকৃতিতে যাহা-কিছু ঘটিতেছে, তাহার মূলে কোন খাম-খেয়াল নাই, —আছে একটা পূর্ব-স্থিরীকৃত বিধান, এবং সে বিধানের নড়চড় বা ব্যতিক্রম নাই। কিন্তু এই Cosmic radiation-এর ব্যাপার দেখিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের একেবারে তাক লাগিয়া গিয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, যান্ত্রিক নিয়মে এ জগৎ চলিতেছে না; এমন এক অদৃশ্য শক্তি এর পিছনে রহিয়াছে,—যে আপন ইচ্ছামত যখন যাহা খুশী তাহাই করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই কারণেই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা Principle of Determinacy'-এর পরিবর্তে এখন মানিয়া চলিতেছেন "Principle of Indeterminacy"—অর্থাৎ অনিশ্চয়তার নীতি। পূর্বে জড়বাদই ছিল বৈজ্ঞানিকদিগের প্রধান চিন্তার বিষয়; অ-জড় হইতে তাহারা জড়ে নামিয়া আসিতেন,

কিন্তু এখন তাহারা জড় হইতে অ-জড়ে চলিয়াছেন, "Dematerialization of Matter"-ই হইতেছে এখন তাহাদের লক্ষ্য। কাজেই বলা যাইতে পারে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আবার সেই আদিম যুগে ফিরিয়া চলিয়াছে। "যা-কিছু সমস্তই আল্লার কুদ্‌রৎ, তিনি সর্বশক্তিমান, যাহা খুশী তাহাই তিনি করিতে পারেন"—এই মনোভাবই বিজ্ঞান-জগতে আবার ফিরিয়া আসিতেছে। নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস দূরীভূত হইয়া গিয়াছে ; অদৃশ্য শক্তিতে আবার মানুষের বিশ্বাস বা ঈমান আসিতেছে। Sir James Jeans তাই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন :

"History, of course, may repeat itself, and once again an apparent capriciousness in nature may be found, in the light of fuller knowledge, to rise out of the inevitable operation of the law of cause and effect."

—(Mysterious Universe, p. 34)

অর্থাৎ : ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে ; আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সংগে সংগে কঠোর কার্য-কারণ-নীতির মধ্য হইতে আবার আমরা প্রকৃতিতে আপাত-খোশ-খেয়াল নীতির অভ্যুত্থান দেখিতে পারি।

বস্তুতঃ আমাদের মনে হয়, এতদিন পরে বৈজ্ঞানিক তাহার পথের দিশা পাইয়াছে। এক অপূর্ব রহস্যলোক এখন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ; অবাক বিস্ময়ে সে শুধু সেই অনাবিষ্কৃত নূতন জগতের পানে চাহিয়া আছে। সকল স্পর্দ্ধা, সকল আস্ফালন তাহার সংযত হইয়া গিয়াছে ; সে এখন জানিয়াছে—সে কিছুই জানে না। সকল বৈজ্ঞানিক আজ তাই অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করিতেছে : "We do not know"—আমরা কিছুই জানি না।

ইহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, বিজ্ঞানের মতিগতি আজ কিরূপভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এতকাল মনোজগতকে অস্বীকার করিয়া জড়জগতকেই সে সত্যবস্তু বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ ভুল আজ তাহার ভাঙ্গিয়াছে। মানস-লোকের গোপন-গহনে সে আজ প্রবেশ করিয়াছে। মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে সে আর এখন পূর্বের মত তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছে না ; সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে সে এখন সাম্য খুঁজিয়া ফিরিতেছে। চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকেরা তাই আজ বলিতেছেন :

"The science of mind, at present in such rudimentary state, will one day take control."—Limitations of Science

অর্থাৎ: মনোবিজ্ঞান যদিও এখন ইহার প্রাথমিক অবস্থায় আছে, তবু সে একদিন কর্তৃত্ব করিবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নূতন বিজ্ঞান এখন আর পুরাতন বুলি আওড়াইতেছে না; সে আনিয়াছে নূতন বাণী—নূতন ইংগিত—যাহার সংগে ধর্মের কোনই বিরোধ নাই।

Sir James Jeans-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসংগের পরিসমাপ্তি করিতেছি:

"Our main contention can hardly be that the science of today has a pronouncement to make, perhaps it ought rather to be that science should leave off making pronouncement"

—(Mysterious Universe, p. 188)

অর্থাৎ: এটা আমাদের প্রধান দাবী নয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানের কোন ঘোষণা-বাণী প্রচার করিবার আছে, বরং ইহাই আমাদের দাবী হওয়া উচিত যে, বিজ্ঞান যেন কোন কিছুই আর ঘোষণা না করে।

———

পরিচ্ছেদ : ৮

ইসলাম ও নূতন বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং স্বরূপ পাঠকবর্গকে কিঞ্চিৎ দেখাইলাম। এইবার পবিত্র কুরআনের সহিত তাহাকে একটু মিলাইয়া পাঠ করা যাউক :—

(১) পদার্থ (Matter) সম্বন্ধে বিজ্ঞান বলিতেছে : সমস্ত পদার্থের মূলে আছে বিদ্যুৎ ; অর্থাৎ আকাশ-পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা মূলতঃ আর কিছুই নয়—বিদ্যুতেরই লীলা-খেলা।

কুরআন বলিতেছে :

"আল্লাহো নুরস্সামাওয়াতে অল্ আর্দ্।"

অর্থাৎ : আকাশ-পৃথিবীর সমস্তই আল্লার নূর হইতে সৃষ্ট।

তাহা হইলে কুরআন যাহা বলিতেছে, আধুনিক বিজ্ঞানও ঠিক সেই কথাই বলিতেছে নাকি ?

বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন : কোন্ সুদূর অজ্ঞাতলোক হইতে প্রতিনিয়ত একটা জ্যোতিঃ আসিয়া আমাদের এই পৃথিবীতে পড়িতেছে। তাহার নাম "Cosmic radiation." এই "Cosmic radiation" যে কোথা হইতে আসিতেছে এবং ইহা যে কাহার জ্যোতিঃ, বিজ্ঞান তাহা না জানিলেও ইসলাম তাহা জানে।

(২) বিজ্ঞান বলিতেছে : সমস্ত পদার্থের মূলে যে বিদ্যুৎ আছে, তাহা দুই প্রকারের : ইলেকট্রনস্ (Electrons) এবং প্রোটন্স (Protons) ; ইলেকট্রন্ হইতেছে ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুৎ, আর প্রোটন হইতেছে ধনাত্মক (Positive) বিদ্যুৎ। ইহাদিগকে পুরুষ ও স্ত্রী বিদ্যুৎও বলা যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সৃষ্টির কোন-কিছুই একাকী পড়িয়া নাই, প্রত্যেক বস্তুই জোড়ায়-জোড়ায় (in pairs) সৃষ্টি হইয়াছে। ঠিক ইহারই সহিত কুরআনের এই আয়াত মিলাইয়া পড়ুন :

"সেই আল্লার মহিমা—যিনি পৃথিবীতে যাহা উৎপন্ন হয়, সে-সকল বস্তুর এবং তদনুরূপ অন্যান্য বস্তুর এবং যাহা তাহারা (মানুষ) জানে

না, এমন বস্তুর প্রত্যেকটিকেই জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন"।

—(২৬ : ৩৬)

(৩) বিজ্ঞান বলিতেছে: সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র মহাশূন্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেহই কোনখানে স্থির হইয়া নাই। কুরআনে বলিতেছে: সূর্য চাঁদকে ধরিতে পারে না, রাত্রিও দিনের নাগাল পায় না, সকলেই মহাশূন্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

—(২৬ : ৪০)

(৪) বৈজ্ঞানিকগণ এতদিন বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন যে, স্বভাবের মধ্যে একটা চিরস্থির শৃংখলা আছে (Nature is orderly) এবং কার্য-কারণ-নীতির দ্বারাই জগতের সব কিছু সংঘটিত হইতেছে। অর্থাৎ তাঁহারা মনে করিতেছিলেন: সব কিছুই নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ; কোন্ কারণে কী ঘটিবে তাহা পূর্বেই স্থির হইয়া আছে, ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। এইজন্যই তাঁহারা 'Principle of Determinacy' অর্থাৎ স্থিরতার নীতিকে মানিয়া চলিতেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এ-মত বর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রকৃতি ওরূপ কোন মাপাজোঁকা নিয়ম-নীতির ধার ধারে না; কাজেই তাঁহারা এখন 'Principle of Determinacy'-র পরিবর্তে 'Principle of Indeterminacy' (অনিশ্চয়তার নীতি) অথবা 'Free will' (স্বাধীনতার নীতি) মানিয়া চলিতেছেন; অন্য কথায় তাঁহারা এখন স্বীকার করিতেছেন যে, স্বভাব সবত্র কার্য-কারণ-নীতি-মানিয়া চলে না, কারণ ছাড়াও কার্য হয়। এরূপ কেন হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহারা বলিতেছেন যে, সব কিছুর পিছনে এমন একটা অদৃশ্য শক্তি আছে -যাহা সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া আপন খুশিমত এই সব হের-ফের করে। অতি-আধুনিক একজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন:

"Do events really happen of causes of cause or don't ? Can you prove it ?"

—(Flight into Space by J. N. Leonard, p. 159)

অর্থাৎ: কারণ দ্বারাই যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা প্রমাণ করিতে পার ?

এ সম্বন্ধে কুরআন বলিতেছে:

"আকাশ-পৃথিবীর সকল পদার্থই আল্লার গুণগান করে। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সবজ্ঞ। আসমান-জমীনের সমুদয় রাজ্য তাঁহারই।

তিনিই জীবন-মৃত্যু ঘটান এবং সমস্ত কিছুর উপর তাঁহারই প্রভুত্ব বিদ্যমান।" —(৫৭ : ১-২)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলিতেছেন :

"আল্লাহ্ যাহা খুশি তাহাই সৃষ্টি করিতে পারেন; যখন তিনি কোন-কিছু ঘটাইতে চান, তখন তাঁহাকে বলেন 'হও,' আর অমনি হইয়া যায়.।" —(৩ : ৪৬)

সব-কিছুর উপরেই যে আল্লার কর্তৃত্ব বা শক্তি রহিয়াছে, কুরআন তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে :

"ইন্নাল্লাহা আলাকুল্লি শাইইন কাদির।"

অর্থাৎ : সব-কিছুর উপরে আল্লারই কর্তৃত্ব।

ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে আল্লার সৃষ্টিতে কারণ বা উপকরণের কোন প্রয়োজন হয় না।

(৫) বিজ্ঞান বলিতেছে : সরল রেখায় চলাই হইতেছে আলোকের ধর্ম; তবে কখনও কখনও চুম্বক (magnet)-এর আকর্ষণে ইহা বাঁকিয়া যাইতে পারে। মানুষের মধ্যেও 'নূর' বা জ্যোতিঃ রহিয়াছে, কাজেই তাহার গতি-পথও সরল রেখায় হওয়াই স্বাভাবিক। তবে পথে যদি কোথাও সে অন্যকিছু দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তাহার পথ বাঁকিয়া যাইতে পারে। মানুষের পক্ষে এই আকর্ষণই হইতেছে 'শয়তান'। চুম্বকের আকর্ষণে আলোক যেমন বিপদগামী হয়, শয়তানের আকর্ষণে মানুষও তেমনি বিপদগামী হয়। যাহাতে এই শয়তানের প্রলোভন বা আকর্ষণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া সে 'সিরাতল্.মুস্তাকিমে' (সরল পথে) চলিতে পারে, এই জন্যই আল্লাহ্ মানুষকে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছেন :

"আমরা তোমারই বন্দিগী করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদিগকে সেই সরল পথে চালাও—যে পথে তোমার অনুগৃহীত প্রিয়জনেরা চলে—নয় তাহাদের পথে যাহারা পথভ্রান্ত ও অভিশপ্ত.।"

—(সূরা ফাতিহা)

(৬) বিজ্ঞান বলিতেছে, এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে, যখন মানুষ তাহার আত্মাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক মুহূর্তের মধ্যে যেখানে খুশী চলিয়া যাইতে পারিবে এবং সেখানে গিয়া তথাকার জড়প্রকৃতি হইতে নিজের দেহের যাবতীয় উপাদান (আব, আতশ, খাক, বাদ) সংগ্রহ করিয়া

স্ব-মূর্তিতে আবির্ভূত হইতে পারিবে। আত্মা ডাক দিলেই জড় উপাদান-গুলি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া ঘনীভূত হইয়া তাহার দেহ নির্মাণ করিয়া দিবে। পুনরায় সে-দেহ ফেলিয়া পূর্বস্থানে সে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

ইহা যদি মানুষের দ্বারা এই জীবনেই সম্ভব হয়, তাহা হইলে রোজহাশরে স্ব-মূর্তিতে আমাদের পুনরুত্থান সম্ভব হইবে না কেন? উপাদানগুলিকে আল্লাহ্ ডাক দিলেই তো একত্রীভূত হইয়া যাইবে।

এ সম্বন্ধে কুরআন-শরীফে আল্লাহ্ সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন:

"এবং যখন ইব্রাহিম বলিলেন: প্রভু, কেমন করিয়া তুমি মৃতকে পুনর্জীবিত কর, তাহা আমাকে দেখাও। তিনি (আল্লাহ্) বলিলেন: কেন? তোমার কি বিশ্বাস হয় না? তিনি (ইব্রাহিম) বলিলেন: নিশ্চয়ই (বিশ্বাস হয়), তবে দেখাইলে অন্তরে শান্তি পাইতাম। তিনি (আল্লাহ্) বলিলেন: তাহা হইলে (বিভিন্ন শ্রেণীর) চারিটি পাখী আনিয়া তোমার অনুগত হইতে শিক্ষা দাও। তারপর তাহাদিগের মাথা কাটিয়া রাখিয়া মাংসগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রাখিয়া আইস। তারপর তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকো। দেখিবে তাহারা তোমার নিকট (নিজ দেহে) উড়িয়া আসিবে। এবং জানো যে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী।"—(২:২৬০)

হযরত ইব্রাহিম আল্লার নির্দেশিত পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইলেন।

বলা বাহুল্য, হযরত ইব্রাহিম পাখীগুলির সৃষ্টিকর্তা ছিলেন না, শুধু পোষ মানাইয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার নিকটেই যখন মৃত প্রাণীর স্ব-শরীরে পুনরাবির্ভাব সম্ভব হইল, তখন বিশ্বস্রষ্টা আল্লার নিকট তাহা সম্ভব হইবে না কেন?

নূতন বিজ্ঞান এখন কোন্ পথে এবং কোন্ লক্ষ্যে চলিয়াছে, আশা করি পাঠক ইহা হইতেই তাহা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই পূর্ব-ধারণা লইয়া আসুন পাঠক এইবার আমরা মি'রাজের বিভিন্ন দিক আলোচনা করি।

পরিচ্ছেদ : ১

মি'রাজ কী ?

মি'রাজ কী ? ইহা স্বপ্ন না সত্য ?

মি'রাজের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তবে ইহা যে কিরূপ করিয়া সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ বলেন ইহা শারীরিক, কেহ বলেন আধ্যাত্মিক, কেহ স্বাপ্নিক।

এরূপ মতভেদে আশ্চর্যের কিছুই নাই। আল্লা ও তাঁহার রসূলের মধ্যে সংঘটিত এমন একটি গূঢ় রহস্যপূর্ণ ব্যাপারকে যে নানা লোকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া মানুষ যখন তাহার আয়ত্তের বহির্ভূত কোন বিষয়বস্তু বুঝিবার চেষ্টা করে, তখন এই দশাই ঘটে।

মি'রাজ যে কী তাহা আমরা বুঝি না। তবু বিভিন্ন দিক হইতে মি'রাজের সাম্ভাব্য ও অসাম্ভাব্য সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মি'রাজ সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন জাগিতে পারে, এক একটি করিয়া আমরা তাহাদের আলোচনা করিতেছি।

হযরত শরীরতঃ গিয়াছিলেন কিনা

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত : হযরতের মি'রাজ শরীরতঃ ঘটিয়াছে।

পক্ষান্তরে অনেকের মত : এই উপলব্ধি আধ্যাত্মিকভাবেই সাধিত হইয়াছিল।

মি'রাজের ঘটনা যে আধ্যাত্মিকভাবে ঘটিতে পারে না, অথবা ঘটিলে যে হযরতের গৌরবের তাহাতে কোন হানি হয়, তাহা আমাদের মত নয়। এসব ব্যাপার অনায়াসেই আধ্যাত্মিকভাবে ঘটিতে পারে। আর তাহা ঘটিয়া থাকিলে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তির কারণও থাকিবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের কথা এই : শরীরতঃ ঘটিতেই বা বাধা কী ?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হযরতের এই নভোভ্রমণ শরীরতঃই ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ তিনি সচেতন অবস্থাতে, সশরীরেই আকাশ-ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আমরা ইহা প্রমাণ করিব।

অবশ্য যুক্তিবাদীরা এ কথা মানিবেন না। তাঁহাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা এ কথা মানিতে বাধা দিবে। স্থূলদেহী মানুষ। জড়-জগতের নিয়ম-নিগড়ে সে আবদ্ধ। কেমন করিয়া সে আকাশ-লোকে বিহার করে? আমাদের এই পৃথিবীর উপরে বায়ুস্তর আছে, তাহার উচ্চতা মাত্র ৫২ মাইল, ইহার উর্ধ্বে আর বায়ুর অস্তিত্ব নাই; কেমন করিয়া তবে শ্বাস-প্রশ্বাসবিশিষ্ট জড়ধর্মী মানুষ সেই বায়ুহীন উর্ধ্বলোকে গিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে? জড়-প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কোন মানুষের পক্ষে গ্রহে গ্রহে বিচরণ করা কখনও সম্ভব?

বলা বাহুল্য, এই যুক্তি-জ্ঞানের পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক মননশীলতা নাই। পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি: স্বভাবের সীমারেখা চিরদিনই মানুষের কাছে অজ্ঞেয় ও ক্রমবিস্তারশীল হইয়া রহিয়াছে। আজ যাহা অস্বাভাবিক ভাবিতেছি, কাল যখন তাহা স্বাভাবিক হইয়া যাইতেছে, তখন স্বভাবের দোহাই দেওয়া আর এখন বুদ্ধিমানের কার্য নহে। হযরত যে সজ্ঞানে শরীরতঃই নভোভ্রমণ করিয়াছিলেন, নিম্নের আলোচনা হইতেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

মি'রাজ ও মাধ্যাকর্ষণ

হযরতের সশরীরে আকাশ-ভ্রমণের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। প্রত্যেকেই জানেন: পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে। যে-কোন শূন্যে অবস্থিত স্থূলবস্তুকে সে মাটির দিকে টানিয়া নামায়। কাজেই যুক্তিবাদীরা বলেন হযরতের শরীরতঃ আকাশ-ভ্রমণ অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্ভব।

কিন্তু এ কথা এখন জোর করিয়া বলা যায় যে, বিরুদ্ধবাদীদের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিতান্তই অসম্পূর্ণ। যে-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া তাঁহারা মি'রাজকে অস্বীকার করিতেছেন, সেই বিজ্ঞানই আজ মি'রাজকে সত্য ও সম্ভব বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছে। শূন্যে অবস্থিত কোন স্থূল বস্তুকে পৃথিবী যে সব সময়ে সমভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না, আজ তাহা পরীক্ষিত সত্য। পৃথিবী যে সব সময়ে সব বস্তুকেই সমানভাবে টানিয়া নামাইতে পারে, তাহাও নহে; প্রত্যেক গ্রহেরই নিজস্ব আকর্ষণ-শক্তি আছে। পৃথিবীর যেমন আকর্ষণী শক্তি আছে, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহেরও তেমনি আকর্ষণী শক্তি আছে। সূর্য ও পৃথিবী পরস্পর

পরস্পরকে টানিয়া রাখিয়াছে। এই টানাটানির ফলে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এমন একটা স্থান আছে যেখানে কোন আকর্ষণ-বিকর্ষণ নাই। কাজেই পৃথিবীর কোন বস্তু যদি এই নিষ্ক্রিয় সীমানায় (Neutral Zone) পৌঁছিতে পারে অথবা এই সীমানা পার হইয়া সূর্যের সীমানায় পা দিতে পারে, তবে তাহার আর পৃথিবীতে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। গতি-বিজ্ঞান (Dynamics) স্থির করিয়াছে যে, পৃথিবী হইতে কোন বস্তুকে যদি প্রতি সেকেণ্ডে ৬.৯৩ অর্থাৎ মোটামুটি ৭ মাইল বেগে ঊর্ধ্বলোকে ছুঁড়িয়া দেওয়া যায়, তবে আর সে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আসিবে না :

"A bullet fired from the earth's surface with a speed of 6.93 miles a second or more will fly into space."

—The Universe Around Us, by J. Jeans, p. 216

ইহাও সত্য যে, পৃথিবীর কোন বস্তুকে অনুরূপ বা তদূর্ধ্ব গতিবেগে যদি কেহ তুলিয়া লইতে পারে, তাহা হইলেও তাহার বেলায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। পৃথিবীর বুক হইতে কোন স্থূল বস্তু যতই ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়, ততই তাহার ওজন (Weight) কমিতে থাকে। এ অবস্থায় তাহার অগ্রগতি সহজ হইয়া আসে। এ সম্বন্ধে অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক Arthur G. Clark তাঁহার 'The Exploration of Space' নামক পুস্তকে বলিতেছেন :

"As the distance from the earth lengthens into the thousands of miles, the reduction (of gravity) becomes substantial; twelve thousand miles up, a one-pound weight would weigh only an ounce. It follows, therefore, that further away one goes from the earth, the easier it is to go onward."—P. 15.

অর্থাৎ : পৃথিবী হইতে কোন বস্তুর দূরত্ব যতই বাড়িতে থাকে, ততই তাহার ওজন কমিতে থাকে, পৃথিবীর এক পাউণ্ড (আধ সের) ওজনের কোন বস্তু ১২,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে মাত্র এক আউন্স হইয়া যায়। ইহা হইতেই বলা যায় যে পৃথিবী হইতে যে যত ঊর্ধ্বে অগ্রসর হইবে, ততই অগ্রগতি সহজ হইবে।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :

"Gravity steadily weakens as we go upwards away from earth, until at very great distances, it becomes completely negligible."—P. 32.

অর্থাৎ : পৃথিবী হইতে যতই উর্ধ্বে যাওয়া যায়, ততই ওজন কমিতে থাকে ; অবশেষে তাহার আকর্ষণ-শক্তি মোটেই বুঝা যায় না।

এই অবস্থাকে বৈজ্ঞানিকেরা "Zero Gravity" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, কোন স্থূল বস্তুকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে উর্ধ্বে ছুঁড়িয়া দিলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাহার বেলায় অকর্মণ্য হইয়া পড়ে।

বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে উর্ধ্বলোকে ছুটিতে পারিলে পৃথিবী হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। ইহাকে 'মুক্তিগতি' (Escape Velocity) বলে।

"This velocity is 25,000 m. p.h., and is called the velocity of escape."—Ibid. p. 34.

গতি-বিজ্ঞানের এইসব আবিষ্কারের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা এখন গ্রহ ভ্রমণের (Interplanatory flight) জন্য দিনরাত মাথা ঘামাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে যখন পৃথিবী হইতে মানুষ গ্রহে গ্রহে ভ্রমণ করিবে। গ্রহ-অভিযানের জন্য ইতিপূর্বেই রকেট (Rocket) সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে ; এখন বড় বড় "Spaceship" নির্মিত হইতেছে। চন্দ্রলোকে (Moon) এবং মঙ্গল গ্রহে (Mars) যাইবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে। আগামী ১৯৭১ সালের জুন মাসে চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে এই অভিযান শুরু হইবে।* সম্প্রতি জনৈক ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করিয়াছেন :

* বৈজ্ঞানিকদিগের নভোভ্রমণের স্বপ্ন সফলতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। গত ৪।১০।৫৭ তারিখে রাশিয়া একটি কৃত্রিম উপগ্রহ (Satellite) আকাশে উড়াইয়াছে। উপগ্রহটি ঘণ্টায় ১৭,০০০ মাইল ছুটিয়া মহাশূন্যের মাঝে প্রতিবারে এক ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে। রকেটের গতি ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বর্ধিত করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে অভিযান করিবে।

"For forecasts Dr. Gaetano Crocco, Italy's 'grand old man' of aeronautical science, June 1971 should mark the period when a spaceship will zoom from the earth to a bid to bridge the heaven. Dr. Crocco selects 1971 because the relative positions of the two planets (Mars and Venus) with regard to the earth and each other appear from initial studies to be the most favourable at that time."

—(Quoted from "Pakistan Observer," dated 29.9.56)"

অতএব দেখা যাইতেছে মাধ্যাকর্ষণের যুক্তি দ্বারা মি'রাজের সম্ভাবনাকে নির্ধারিত করা যাইতেছে না।

হযরতের দেহ কি জড়ধর্মী ছিল ?

হযরতের সশরীরে আকাশ-ভ্রমণকে যাঁহারা বিশ্বাস করিতে চান না, তাঁহাদের অন্যতম যুক্তি এই যে, জড়দেহ লইয়া নভোলোকে পৌঁছান অসম্ভব। কিন্তু আমাদের কথা এই: হযরত মানব ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহার দেহ আমাদের ন্যায় জড় উপাদান-বিশিষ্ট ছিল, তাহার প্রমাণ কী ? বুনিয়াদ বা জাত এক হইলেও প্রত্যেক বস্তুর প্রকারভেদ তো আছে। কয়লা হইতে হীরক প্রস্তুত হয়, এবং উভয়ই পদার্থ; কিন্তু তাই বলিয়া কয়লা ও হীরক কি এক বস্তু ? নিশ্চয়ই নয়। তা ছাড়া সমস্ত পদার্থের ধর্ম যে সর্বত্র একইরূপ থাকে, তাও নয়। কাঁচ একটি জড় পদার্থ; বাধা দেওয়া জড় পদার্থের ধর্ম। আমার আঙুল উহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না অমনি সে বাধা দেয়; কিন্তু কোন আলোকরশ্মি দেখিলেই সে সসম্মানে তাহার জন্য নিজের দেহের ভিতর দিয়াই পথ ছাড়িয়া দেয়। আবার অনেক অস্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া সাধারণ আলো প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু যদি উহাদের উপর রঞ্জন-রশ্মি (X-Ray) নিক্ষেপ করা যায়, তবে সে উহাদিগকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সাধারণভাবে দেখিতে গেলেও একই পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় থাকিতে পারে। কঠিন, তরল এবং বায়বীয়—পদার্থের এই তিন রূপ। পানি যখন কঠিন অবস্থায় থাকে, তখন বরফের আকার ধারণ করে, এবং তাহা দিয়া বাড়ি-ঘর পর্যন্ত তৈয়ার করা চলে। যখন তরল অবস্থায় থাকে, তখন আবার ইহা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ

করে। আবার এই পানিকেই বাষ্পাকারে পরিণত করিলে সে আমাদের চোখের অলক্ষ্যে মেঘলোকে উড়িয়া যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় পানি সম্বন্ধে যদি বলি যে, পানি দ্বারা বাড়িঘর তৈরী করা যায় না, অথবা পানি কখনও উড়িয়া যাইতে পারে না, তবে কি আমাদের কথা সত্য হইবে? কাজেই আমরা কোন পদার্থকে যে-বেশে দেখিতেছি, তাহাই যে উহার একমাত্র সত্য রূপ, তাহা নাও হইতে পারে।

অতএব, আমাদের কথা এই, বাহির হইতে হযরতকে জড়দেহী মানবরূপে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে হয়ত তিনি জড়ধর্মী ছিলেন না। পদার্থের যাহা সার—সেই জ্যোতিঃ বা নূর দ্বারাই তাঁহার দেহ গঠিত ছিল। এইজন্যই প্রবাদ আছে: আল্লার নূরে মুহম্মদ পয়দা, মুহম্মদের নূরে সারাজাহান পয়দা।

আল্লার নূর হইতেই যে হযরত মুহম্মদের সৃষ্টি, ইহা শুধু আমাদের কথা নয়; হযরত নিজেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সহি হাদিস হইতে জানা যায় হযরত বলিতেছেন:

"আনা নূরুল্লাহে ওয়া কুল্লু শাইইন মিন্ নূরী।"

অর্থাৎ: আমি আল্লার নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর হইতে সৃষ্ট।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন:

"আউয়ালো মা খালাকাল্লহু নূরী।"

অর্থাৎ: আল্লাহ্ সর্বপ্রকার যাহা সৃষ্টি করেন, তাহা আমার নূর।

কুরআন পাকেও আল্লাহ্ বলিতেছেন:

"ক্বাদ্ যা'কুম মিনাল্লাহে নূর ওঁ কিতাবুম্-মুবিন।" —(৫ : ১৫)

অর্থাৎ: নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আসিয়াছে আল্লার নূর এবং তাঁহার কিতাব।

হযরতের দেহ যে জ্যোতির্ময় এবং অনন্যসাধারণ ছিল, তাহার আরও প্রমাণ আছে। বিশ্বস্ত হাদিস গ্রন্থ হইতে জানা যায়:

(১) হযরতের দেহের কোন ছায়া ছিল না।

(২) হযরত সম্মুখেও যেরূপ দেখিতেন, পিছনেও সেইরূপ দেখিতেন।

(৩) আলোকেও যেরূপ দেখিতেন, অন্ধকারেও সেইরূপ দেখিতেন।

(৪) হযরতের দেহের কোন ভারত্ব ছিল না।

এই সমস্ত তথ্য হইতে অনুমিত হয় যে, হযরতের দেহ আমাদের মত স্থূল উপাদানে গঠিত ছিল না; তাঁহার দেহগঠনের উপাদান ছিল

নূর বা জ্যোতি: এই কারণেই স্থূল দেহ লইয়াও তাঁহার পক্ষে আকাশ-ভ্রমণ সম্ভব হইতে পারিয়াছিল।

যদি ধরিয়াও লই যে, হযরতের দেহ জড়পদার্থ (matter) দ্বারাই গঠিত ছিল, তাহাতেই বা কী ? মানুষের দেহ শুধু জড় উপাদানেই গঠিত নয়, তাহার মধ্যে চৈতন্য (Spirit) বা প্রাণশক্তি (Mind)-ও তো আছে। এই প্রাণশক্তিই চিরদিন জড়ের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। চিদ্‌শক্তিসম্পন্ন মানুষ ইচ্ছা করিলে তাই জড়জগতের নিয়ম-কানুন উল্টাইয়া দিয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে। বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক Sir James Jeans এ-সম্বন্ধে কী বলিতেছেন, দেখুন :

"To say that mind cannot influence matter, now becomes as absurd as to say that mind cannot influence ideas,"

অর্থাৎ : কল্পনার উপর আমাদের মন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, এ কথা বলা যেমন বোকামি, পদার্থের উপর মনের কোন শক্তি নাই— এ কথা বলাও ঠিক তেমনি বোকামি।

ইহাই যদি সত্য হয়, তবে বিরাট প্রাণশক্তিসম্পন্ন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের নিকট তাঁহার জড়দেহ কেন আকাশ-ভ্রমণে বাধার সৃষ্টি করিবে ?

মি'রাজ কি আধ্যাত্মিকভাবে সাধিত হইয়াছিল ?

আমাদের পরবর্তী বিচার্য বিষয় এই : মি'রাজের ঘটনাবলী আধ্যাত্মিক উপায়ে সাধিত হইয়াছিল কি না। ঘটনাটি যে আধ্যাত্মিকের পর্যায়ভুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ কী ? এমন অদ্ভুত ব্যাপার নিশ্চয়ই সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির গোচরযোগ্য নহে। কাজেই মি'রাজকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বলিতে আমাদের আপত্তি নাই; তবে সেই সংগে আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, হযরত যখন সশরীরে সজ্ঞানে সচেতন অবস্থাতেই এই মি'রাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা প্রমাণ পাইতেছি এবং সশরীরে নভোভ্রমণ যখন অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়, তখন খামাখা আমরা ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খুঁজিতে যাইব কেন ? ব্যাপারটি শুধু আধ্যাত্মিক হইলে শরীরতঃ ঊর্ধ্ব-প্রয়াণের কোন আবশ্যকই হইত না। একস্থানে বসিয়া ধ্যানযোগেই তো আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করা যায়। মি'রাজ এ-শ্রেণীর সিদ্ধিলাভ নহে—ইহা আরও ব্যাপক ও গভীর—ইহা সত্যের বাস্তব

উপলব্ধি—অথবা সত্যদর্শন। মি'রাজ-রজনীতে আল্লাহ্ নিজের মহিমা এবং সৃষ্টিলীলার গূঢ় রহস্যের সহিত তাঁহার প্রিয় হাবিবকে সব দিক দিয়া পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন। দোযখ বেহেশ্ত্; আরশ-কুর্সী ইত্যাদি সমস্ত রহস্যের দ্বারই সেদিন তিনি উদ্ঘাটিত করিয়া আপন বন্ধুকে দেখাইয়াছিলেন। এই পূর্ণ পরিচয় বা দিব্যদর্শনই ছিল মি'রাজের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মি'রাজ কী স্বপ্ন ?

মি'রাজ নিশ্চয় স্বপ্ন নহে। স্বপ্ন অতি নিম্নস্তরের জিনিস। অবশ্য স্বপ্নেও অনেক আধ্যাত্মিক বিষয় প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করিয়া নবী-রসূলদিগের স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য: স্বপ্নের স্থান অতি নিম্নে। উহা পরিপূর্ণ সত্যদর্শন নহে, উহা সত্যের আভাস মাত্র। মি'রাজ নিশ্চয়ই এরূপ স্বপ্ন ছিল না। স্বপ্নই যদি হইবে, তবে ইহা লইয়া এত আপত্তি উঠিবে কেন? হযরত যদি বলিতেন: আমি রাত্রে এইরূপ একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা হইলে লোকদের তাহা অবিশ্বাস করিবার কী কারণ থাকিতে পারিত? ব্যাপারটি তো সেইখানে মিটিয়া যাইত। সশরীরে গিয়াছিলেন এবং স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়াছিলেন বলাতেই ত যত আপত্তি! হযরত শুধু ঐরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এইরূপ কথা কুরআন-হাদিসেও নাই।

মি'রাজ ও কালের প্রশ্ন

মি'রাজ সম্বন্ধে যাহারা সন্দেহ করেন, তাঁহাদের নিকট কালের প্রশ্নও একটা বড় যুক্তি। বিবরণে প্রকাশ, হযরত যখন বোরাকে চড়িয়া রওয়ানা হন, তখন তাঁহার অজুকরার স্থান হইতে অজুর পানি যেরূপভাবে গড়াইয়া যাইতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া ঠিক সেইরূপভাবেই গড়াইয়া যাইতে দেখিলেন। নিমেষের মধ্যে কি করিয়া এত বড় কাণ্ড ঘটিল? ইহা হইতেছে সন্দেহবাদীদের প্রশ্ন। কিন্তু যে-বিজ্ঞানের বলে তাঁহারা ইহা অবিশ্বাস করেন, সেই বিজ্ঞানই ত বলিতেছে যে, সময়ের স্থিরতা কিছুই নাই, উহা আমাদের একটা মনের খেয়াল মাত্র। সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা হিসাবও একেবারে ভুল। যে-হিসাবে কোন ঘটনাকে আমরা নির্ণয় করি, প্রকৃতি সে-হিসাবের ধার ধারে না। আল্লার ঘড়ির সঙ্গে আমাদের ঘড়ি মিলে না। অন্য গ্রহে আমাদের ঘড়ি অচল। কাজেই

যে-ঘড়ি আমাদের একান্তই মনগড়া এবং যাহার কোনই মূল্য নাই, তাহাই লইয়া মি'রাজের সময় নির্ণয় করিতে যাওয়া আমাদের খুবই অন্যায়। বৈজ্ঞানিকেরা তো পরিষ্কারই বলিয়া দিয়াছেন : স্বভাবের প্রকৃত সময় (True time of Nature) আজও তাঁহারা জানেন না। কাজেই সময়ের প্রশ্ন মোটেই এখানে যুক্তিযুক্ত নয়।

সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে ঠিক নয়, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এখন একমত। দর্শকের নিজস্ব গতির উপরে কালের গতি নির্ভর করে। একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে যেভাবে কোন ঘটনাকে ঘটিতে দেখিব, দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া গেলে সে-গতিতে দেখিব না। মনে করুন, কোন ব্যক্তি তাহার ইচ্ছামত যে-কোন বেগে শূন্যলোকের মধ্য দিয়া উড়িয়া যাইতে পারে। সে যদি আলোকের গতি অপেক্ষা কম গতিতে ছুটে, তবে দেখিবে স্বাভাবিকভাবেই সব ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে ; অর্থাৎ সময় সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অন্য কথায় : রবির পর সোম, সোমের পর মঙ্গল আসিতেছে। সে যদি আলোকের সম-গতিতে, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটিতে পারে, তবে দেখিবে সময় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে অর্থাৎ সকাল কি সন্ধ্যা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। আবার আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী দ্রুত যদি সে ছুটিতে পারে, তবে দেখিবে, সময়ের গতি উল্টা দিকে চলিতেছে, অর্থাৎ কোন ঘটনা ভবিষ্যতের দিকে না গিয়া পিছাইয়া যাইতেছে, অন্য কথায় : রবির পর শনি, শনির পর শুক্র আসিতেছে।

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, গতির তারতম্যে সময়ের তারতম্য ঘটিয়া যায়। এ সম্বন্ধে জনৈক অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন :

"If speeds that approach the velocity of light make time in a moving system run slower, a superlight velocity should turn the time backward."

—One Two Three Infinity (p.105)

অর্থাৎ : আলোকের গতির যত কাছে যাওয়া যায়, ততই যখন সময় শ্লথ হইয়া আসে, তখন ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ যে, আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী দ্রুত গতিতে গেলে সময় উল্টাদিকে বহিবে।

জনৈক কাব্য-রসিক বৈজ্ঞানিক আলোকের এই বিচিত্র গতিকে একটি ছোট কবিতায় চমৎকার রূপ দিয়াছেন :—

"There was a young girl named Miss Bright
Who could travel much faster than light
She departed one day, in an Einsteinian way,
And came back on the previous night."

অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী গতিতে কেহই যাইতে পারে না। অন্য কথায় আলোকের গতি সর্বোচ্চ গতি এবং ইহাই ধ্রুবগতি (Absolute)। কিন্তু অধুনা এই মত পরিত্যক্ত হইতেছে।

Harold Leland Goodwin বলেন :

"Would it be odd if one of them exceeded it some day and demonstrated that the velocity of light is not absolute ?"

—(Space Travel)

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :

"The constancy of the speed of light has been challenged recently···A European scientist who has studied the subject for over a quarter of a century M. de Bray, says that the alleged constancy of light is unsupported by observation." —(Space Travel, p. 180-181)

বস্তুতঃ আলোকের গতি অপেক্ষা মনের গতি ঢের বেশী। কাজেই আলোকের গতিই যে সর্বোচ্চ গতি, এখন এ কথা মানা যায় না।

মিরাজ ও নূতন বিজ্ঞান

স্থান, কাল এবং গতি সম্বন্ধে নূতন বিজ্ঞান আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে। সে সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন ; অন্যথায় মি'রাজের ন্যায় দুর্বোধ্য ঘটনার স্বরূপ ও প্রকৃতি আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না।

নিম্নে অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করিতেছি :

(ক) দর্শকের গতির তারতম্যে বস্তু বা ঘটনার স্থান-নির্ণয়ে তারতম্য ঘটে।

"Two events occurring at the same place, but at two

differentmoments, from the point of view of one observer will be considered as occurring at different places, if viewed by another observer in a different state or in different states of motion."—(One Two Three.Infinity, p.92)

অর্থাৎ একই স্থানে, কিন্তু বিভিন্ন মুহূর্তে, সংঘটিত দুইটি ঘটনা বিভিন্ন গতিতে দেখিলে দর্শকেরা বিভিন্ন রূপে দেখিবে।

মনে করুন: দ্রুত একখানি চলন্ত ট্রেনের খাবার কামরায় জানালার ধারে একটি টেবিলে বসিয়া এক সাহেব খানা খাইতেছে। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে সাহেব সিগারেট ধরাইল। পাশেই খানসামা দাঁড়াইয়া ছিল। সে দেখিল: দুইটি ঘটনাই (খানা খাওয়া ও সিগারেট ধরানো) একই স্থানে সংঘটিত হইল। ইহা সম্ভব হইল এইজন্য যে, ট্রেনের গতি, সাহেবের গতি এবং খানসানার গতি সমান ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারটিই যদি লাইনের ধারে পাঁচ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি গুম্‌টি ঘরের নিশানধারী দুই জন চৌকিদার লক্ষ্য করে, তবে প্রথম জন দেখিবে সাহেবটি খানা খাইতেছে, দ্বিতীয় জন দেখিবে সাহেব সিগারেট ধরাইতেছে। আর এই দুইটি ঘটনার মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ মাইলের ব্যবধান ঘটিয়া গিয়াছে। চলন্ত গাড়ীতে থাকিয়া খনসামা দুইটি ঘটনাকে একই স্থানে সংঘটিত হইতে দেখিয়াছে, কিন্তু মাটির উপরে দণ্ডায়মান অবস্থায় দুই জন চৌকিদার ঘটনা দুইটিকে দুই বিভিন্ন স্থানে ঘটিতে দেখিয়াছে। দর্শকের গতির তারতম্যই এই পার্থক্যের কারণ।

(খ) একই সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, সংঘটিত দুইটি ঘটনা দর্শকের গতির তারতম্যে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হইতেছে বলিয়া মনে হইবে।

"Two events occurring at the same moment (i.e., simultaneously) but at different places, from the point of view of one observer, will be considered as occurring at different moments ; if viewed by another observer in a different state of motion."—(Ibid)

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়: মনে করুন উপরিউক্ত চলন্ত ট্রেনের সাহেবটি যখন সিগারেট ধরাইল, ঠিক সেই মুহূর্তে ডাইনিং কারের অন্য কোণে অবস্থিত আর একজন সাহেবও সিগারেট ধরাইল। খানসামা দেখিল একই সময়ে

দুইটি ঘটনা ঘটিল। কিন্তু এই ঘটনাটিই যদি মাটিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় কোন লোক দেখে, তবে সে দেখিবে একজন সাহেব অন্য জনের চেয়ে কিছু আগে সিগারেট ধরাইয়াছে; অর্থাৎ দুইজনের সিগারেট ধরাইবার মধ্যে ব্যবধান ঘটিয়া গিয়াছে।

স্থান এবং কালের ন্যায় গতিও আপেক্ষিক। নির্দিষ্ট কোন গতির কথা কেহই বলিয়া দিতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন:

মনে করুন, একখানি ট্রেন ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। একটি যাত্রী তাহার কামরা হইতে হাজির হইয়া খাবার গাড়িতে (dining car) যাইতেছে। তার এই চলার গতি কত? সে দেখিল: ঘণ্টায় সে দুই মাইল বেগে যাইতেছে। কিন্তু রেল-লাইনের ধারে কোন বাড়ির জানালায় দাঁড়াইয়া যদি একটি লোক এই চলন্ত গাড়ির দিকে তাকাইয়া থাকে, তবে সে কী দেখিবে? সে দেখিবে লোকটি ৫০ মাইল বেগে যাইতেছে অর্থাৎ গাড়ির গতির সমগতিতেই সে চলিতেছে। আবার মঙ্গল গ্রহ হইতে দেখিলে দেখা যাইবে পৃথিবীর আহ্নিক গতির সমগতিতেই অর্থাৎ (ঘণ্টায় ১০০ মাইল) বেগে লোকটি ছুটিয়া চলিয়াছে।

লোকটির প্রকৃত গতি তাহা হইলে কত?

(গ) গতির উপর থাকিলে সময় অস্বাভাবিকরূপে খাটো হইয়া যায়:—

"Suppose you decided to visit one of the satellites of Sirius which is at a distance of nine light-years from the solar system and use for your trip a rocket-ship that can move practically with the speed of light. It would be natural for you to think that the round trip to Sirius and back would take you at least eighteen years and you would be inclined to take with you a very large food supply. That precaution, however, would be absolutely unnecessary if the mechanism of your rocket-ship made it possible for you to travel at nearly the velocity of light. In fact, if you move for example at 99·99999999 per cent of the speed of light, your wrist-watch, your heart, your lungs, your digestion and your mental process will be slowed

down by a factor of 70,000 and the 18 years (from the point of view of people left on the earth) necessary to cover the distance from earth to Sirius and back to earth again would seem to you as only a few hours. In fact, starting from earth right after breakfast you will just feel ready for lunch when your ship lands on one of the Sirius planets. If you are in a hurry and start home right after lunch, you will, in all probability, be back on earth in time for dinner. But, and here you will get a big surprise if you have forgotten the laws of relativity, you will find on arriving home that your friends and relatives have given you up as lost in the interstellar paces and have eaten 6570 dinners without you. Because you were travelling at a speed close to that of light, eighteen terrestrial years have appeared to you as just one day." —(Ibid, p. 104)

ভাবার্থ: মনে করুন আপনি 'সাইরিয়াস' গ্রহে বেড়াইতে যাইবেন। পৃথিবী হইতে সাইরিয়াসের দূরত্ব ৯ আলোক বৎসর, অর্থাৎ ৫৪ লক্ষ-কোটী মাইল। অন্য কথায়: যদি আপনি রকেটশিপে যান, তবে সাইরিয়াস গ্রহে পৌঁছিতে পৃথিবীর সময়ানুসারে আপনার নয় বৎসর লাগিবে। ফিরিয়া আসিতেও আরও নয় বৎসর লাগিবে। এত দীর্ঘপ্রবাসে প্রচুর রসদপত্র নিশ্চয়ই আপনি সঙ্গে লইতে চাহিবেন। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন হইবে না। সময় এত সংকুচিত হইয়া যাইবে যে, এই ১৮-বৎসর আপনার ঘড়িতে ১২।১৩ ঘণ্টার বেশি বলিয়া মনে হইবে না। আপনি যদি পৃথিবী হইতে সকালবেলায় চা খাইয়া রওয়ানা হন, তবে সাইরিয়াস গ্রহে পৌঁছিয়া আপনি দুপুরের লাঞ্চ খাইবেন। লাঞ্চ খাইয়াই যদি পৃথিবীর দিকে যাত্রা করেন, তবে গৃহে ফিরিয়া আপনি রাতের খানা (ডিনার) খাইতে পারিবেন। অর্থাৎ আপনি রাত্রি ৮।৯ টায় ফিরিয়া আসিবেন। আপনার বেলায় তো এইরূপ। কিন্তু পৃথিবীতে পরিত্যক্ত আপনার স্ত্রী-পুত্র দেখিবে: তাহাদের ১৮ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহারা ইত্যবসরে ৬৫৭০টি ডিনার খাইয়া ফেলিয়াছে।

এই সব অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত অবাক হইবেন। কিন্তু ইসলামের কাছে ইহা কোনই নূতন কথা নয়। ১৪০০ বৎসর আগেই পবিত্র কুরআনে সময় সম্বন্ধে আল্লাহ্ ঠিক অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন, দেখুন :

"তুমি কি ভাবিয়াছ সেই ব্যক্তির কথা যে একটা গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ সে গ্রামটি ধসিয়া পড়িল। লোকটি বলিল, কিরূপে আল্লাহ্ পুনরায় এর অধিবাসীদিগকে জীবিত করিবেন। তখন আল্লাহ্ লোকটির মৃত্যু ঘটাইলেন এবং একশত বৎসর সেই অবস্থায় রাখিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া বলিলেন : তুমি কত দিন এইরূপ (মৃত) অবস্থায় ছিলে? লোকটি উত্তর দিল : এক দিন বা তারও কম। আল্লাহ্ বলিলেন, না, তুমি একশত বৎসর মৃত অবস্থায় ছিলে। কিন্তু তোমার খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি তাকাও, উহা অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে, অথচ তোমার গাধার প্রতি চাহিয়া দেখ। ইহা এই উদ্দেশ্যে যাহাতে আমি তোমাকে অন্যান্য লোকদের জন্য নিদর্শন করিতে পারি। এবং গাধার অস্থিগুলির প্রতি তাকাও, দেখ কি প্রকারে আমি সেগুলিকে জুড়ি এবং উহাতে মাংস পরাই। যখন এই ঘটনাগুলি তাহাকে স্পষ্ট দেখান হইল, সে বলিয়া উঠিল, আমি বুঝিলাম, নিঃসন্দেহ, আল্লাহ্ সর্বশক্তিময়।" —(২ : ২৫৯)

সূরা 'কাহ্‌ফে' বর্ণিত 'আসহাব্-কাহ্‌ফের' কাহিনীও এখানে স্মরণীয়। গুহার মধ্যে সাত ব্যক্তি ৩০০ বৎসরেরও ঊর্ধ্বকাল ঘুমাইয়া ছিল। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় তাহাদের কাছে এক দিনের বেশি বলিয়া মনে হয় নাই।

এই সব সাংকেতিক ঘটনা হইতে এই সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান আপেক্ষিক (relative)। এক-এক অবস্থায় সময় এক-এক রূপ ধারণ করে, কাজেই সময় সম্বন্ধে কাহারও ধারণা কাহারও সহিত মিলে না। অন্য কথায় : সময়ের প্রভাব সকলের উপর সমান নহে। এই জন্যই আইনস্টাইন বলিয়াছেন যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম বলিয়া কোন টাইম নাই, সব টাইমই লোকাল (There is no standard time, all time is local.")।

বস্তুতঃ স্থান, কাল, মহাকর্ষ বা গতির প্রশ্ন লইয়া রসূলুল্লার সশরীরে মি'রাজ আর এখন অবিশ্বাস করা চলে না। বরং অবস্থা এখন এরূপ

দাঁড়াইয়াছে যে, মি'রাজে বিশ্বাস না করিলে বর্তমান যুগের কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যই আর বুঝা যাইবে না। এখন নভোভ্রমণের বা গ্রহ-বিহারের (interplanetory flight বা space-travel-এর) যুগ আসিয়াছে। পৃথিবী হইতে space-ship-এ চড়িয়া বৈজ্ঞানিকেরা, চন্দ্রলোকে এবং মঙ্গলগ্রহে যাত্রা করিবে—ইহাই বিজ্ঞানের নবতম সাধনা। এই 'স্পেস্-শিপ' বা 'রকেটের' সঙ্গে 'বুরাকের' কত নিকট সম্বন্ধ ! অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, 'বুরাকের' কথা বলিলে তাহা ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস হয় আর 'রকেটের' কথা বলিলেই তাহা নিরেট বৈজ্ঞানিক সত্য হইয়া দাঁড়ায় !

আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

"Let us suppose that a hollow projectile, holding a man, such as Jules Verne and Wells used on their voyages to the moon, should be sent off into space with a velocity one twenty thousandth less than light. If at the end of a year the projectile should be caught like a comet by the gravitation of some star and be swung around and sent back to earth, the man on stepping out of his shell, would be two years older, but he would find the world two hundred years older."

—Easy Lessons in Einstein, by Edwin E. Slosson.

অর্থাৎ : মনে করুন একটা ফাঁপা চোঙের ভিতরে একটি মানুষ পুরিয়া আলোকের বিশ-সহস্রাংশের এক ভাগ কম গতিতে ঊর্ধ্বে ছুড়িয়া দেওয়া হইল। এক বৎসর চলিবার পর চোঙাটি যদি কোন তারকার আকর্ষণে পড়ে এবং ধূমকেতুর মত সে যদি তাহাকে একবার ঘুরাইয়া আনিয়া পুনরায় সেই চোঙাটিকে পৃথিবীতে নামাইয়া দেয়, তবে লোকটি চোঙা হইতে নামিয়া দেখিতে পাইবে তাহার বয়স মাত্র দুই বৎসর বাড়িয়াছে, কিন্তু ইত্যবসরে পৃথিবীর ২০০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

এই রূপহীন জগতকে দেখিবার জন্যই হযরতকে বস্তু-জগত হইতে বহু দূরে যাইতে হইয়াছিল। সে জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কী বলিতেছেন, দেখুন :

"In the extra mundane realm, time ceases to flow,

gravitation on longer drags downward, matter is non-existent, light is immovable and change is impossible. Thus the new mathematics leads to a state curiously like the conventional conception of heaven."

—Easy Lessons in Einstein.

অর্থাৎ : সেই অ-পার্থিব জগতে সময় বহে না, মহাকর্ষ নীচের দিকে টানিয়া নামায় না, পদার্থ বলিয়া সেখানে কিছুই নাই, আলোক সেখানে অচল, পরিবর্তন সেখানে অসম্ভব। কাজেই নূতন গণিত আমাদের স্বর্গের প্রচলিত ধারণার কাছেই লইয়া যাইতেছে।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, স্থান ও কাল সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাই মি'রাজকে বিশ্বাস করিবার প্রধান অন্তরায়। স্থান-কালের ধারণা পরিবর্তিত হইলেই মি'রাজ সম্বন্ধে আমাদের মনে আর কোন সন্দেহই জাগিবে না।

মি'রাজের তাৎপর্য

পূর্বেই বলিয়াছি : জগৎ জুড়িয়া সসীম ও অসীমের লীলাখেলা চলিয়াছে ; সান্তের মধ্যে অনন্ত এবং অনন্তের মধ্যে সান্ত আসিয়া লুকোচুরি খেলা করিতেছে। সান্ত ও অনন্ত চায় পরস্পরকে উপলব্ধি করিতে। মি'রাজ হযরতের জীবনে সেই মহা উপলব্ধি। কেবলমাত্র সীমার মধ্যে বসিয়া আমরা যখন সসীমকে সত্য করিয়া চিনিতে পারি না, শুধু অসীমের মধ্যে থাকিয়াও সেইরূপ অসীমকে চেনা যায় না। আমরা যখন কোন ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকি, তখন ঘরকে কি সত্য করিয়া চিনি ? সম্পূর্ণ চেনা চিনিতে হইলে ঘরটিকে ভিতর হইতেও দেখিতে হয়, বাহির হইতেও দেখিতে হয়। অসীমের পরিপ্রেক্ষণায় সসীমকে না দেখিলে এবং সসীমের পরিপ্রেক্ষণায় অসীমকে না দেখিলে কাহারও পরিচয়ই সম্পূর্ণ হয় না। স্রষ্টাকে চিনিবার জন্য তাই তাঁহাকে স্রষ্টার নিকটে যাইতে হইয়াছিল, এই জন্যই সৃষ্টি এবং স্রষ্টা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান একেবারে সম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছিল। মি'রাজের ইহাই তাৎপর্য।

অবশ্য অসীমকে কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এ অতি অদ্ভুত রহস্য। সীমার মাঝেই অসীম তাহার সুর বাজায়, রূপ-সাগরের

মধ্যেই অরূপ-রতন ডুবিয়া থাকে। সেই অপরূপ অরূপ যে কিরূপ, কিরূপে তাহা বুঝাইবে! একই সীমাহীন মহাকালের মধ্যে যেমন দিন-ক্ষণ, সপ্তাহ-মাস, বৎসর শতাব্দী এক একটি স্বতন্ত্র লইয়া দেখা দেয়, অথচ একে একে সকলেই মহাকাল-বক্ষে মিশাইয়া যায়, অসীমের মধ্যে সসীমও ঠিক তেমনি করিয়া প্রকাশ পায়। সমুদ্র-তরংগ যেমন করিয়া নানা বৈচিত্র্যে লীলায়িত হইয়া পুনরায় সমুদ্রের বুকেই মিলাইয়া যায়, সসীমও তেমনি নানারূপে দেখা দিয়া অসীমের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়

মি'রাজের সার্থকথা

মি'রাজের সার্থকতা কী? কেহ কেহ এ-প্রশ্ন করিতে পারেন। হযরত মুহম্মদের জীবনালোচনার প্রারম্ভেই আমরা দাবী করিয়া আসিয়াছি যে, তিনি হইতেছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক ও আদর্শ। পাঠক সেই দাবীর কথা মি'রাজ রাজনীতে একবার স্মরণ করুন এবং মনে মনে চিন্তা করুন: হযরত বাস্তবিকই আমাদের আদর্শ কি না। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহাকেই বলি—যাহার পূর্ণতা বা উৎকর্ষ একেবারে চরম। হযরতের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা এই মি'রাজ-রজনীতেই লাভ হয় নাই কি? এতবড় সত্যোপলব্ধির পর মানুষের আর কী কামনার থাকিতে পারে? কী সাধনার থাকিতে পারে? মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার শেষসীমায় গিয়া তিনি পৌঁছিয়াছেন। কাজেই আধ্যাত্মিক জীবনে যখন কাহারও আলোর প্রয়োজন হয়, এ-পথের চরম বিশেষজ্ঞরূপে এই মরুভাস্করের চরণ শরণ লইতেই হয়।

স্থান, কাল এবং গতির উপর মানুষের যে অপরিসীম শক্তি ও অধিকার আছে, জড়-শক্তিকে সে যে অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে: মানুষের মধ্যেই যে বিরাট অতিমানুষ ঘুমাইয়া আছে, মি'রাজ সেই কথাই প্রমাণ করে।

আধ্যাত্মিক জগতে হযরতকে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে স্বতঃসিদ্ধভাবে এ-সিদ্ধান্তও মানিয়া লইতে হয় যে, ইহলৌকিক ব্যাপারেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ: কারণ ইহজীবনের আদর্শ পরজীবনের কল্যাণ দ্বারাই পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া চলিতে পরকালে মানুষের শাশ্বত কল্যাণ হইতে পারে, হযরত তাহা সম্যক-রূপে অবগত ছিলেন। কাজেই তিনি যে-বিধান দিয়া গিয়াছেন, তাহা

সেই পরমার্থলাভের সহায়ক না হইয়াই পারে না। কেমন করিয়া কোন্ পথ ধরিয়া গেলে মক্কা শরীফে পৌছিতে পারা যায়, সে নির্দেশ নির্ভুলভাবে একমাত্র তিনিই দিতে পারেন, যিনি নিজে তথায় গিয়াছেন। ধর্মজগতেও ঠিক তাই। কেমন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে মানুষ পরকালে অনন্ত সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহা একমাত্র তিনিই বলিয়া দিতে পারেন—যিনি ব্যক্তিগত জীবনে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। কাজেই হযরত মুহম্মদের নির্দেশিত সমাজ ও রাষ্ট্র বিধান অভ্রান্ত না হইয়াই পারে না।

এইখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি। হযরতের 'মুহম্মদ' এবং 'আহমদ' নামকরণের উদ্দেশ্য ও সার্থকতাও এই মি'রাজের মধ্যে নিহিত আছে। 'চরম-প্রশংসিত' (মুহম্মদ) এবং 'চরম-প্রশংসাকারী' (আহমদ)—হযরতের এই দুইটি নাম যে বাস্তবিকই সত্য, তাহা কি আজ নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে না? মি'রাজ-রজনীতে আল্লাহ্তালা মুহম্মদকে কি চরম এবং পরম গৌরব দান করেন নাই? কোন ফিরিশ্‌তা বা কোন প্রয়গম্বর যেখানে উঠিতে পারেন নাই হযরত মুহম্মদ সেখানে উঠিয়াছেন। স্বয়ং ফিরিশ্‌তা জিব্রাইলও সিদ্‌রাতুল মনতাহা' পর্যন্ত গিয়া তদূর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু হযরত তাহা অপেক্ষাও বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন এবং অবশেষে আল্লার নৈকট্য লাভ করিয়াছেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁহার আপন মহিমা এবং সৃষ্টিলীলার যাবতীয় রহস্য তাঁহাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এর চেয়ে বড় সম্মান বা বড় প্রশংসা মানুষ বা পয়গম্বরের ভাগ্যে আর কী হইতে পারে? পক্ষান্তরে মুহম্মদ ছাড়া বিশ্বভুবনে আল্লাহ্তালার চরম প্রশংসাকারীই বা কে? আল্লার চরম প্রশংসা তিনিই করিতে পারেন—যিনি তাঁহাকে চরমভাবে চিনিয়াছেন। চরমভাবে চিনিতে হইলে চরম নৈকট্যের প্রয়োজন। এই চরম নৈকট্য কি একমাত্র মুহম্মদের ভাগ্যেই ঘটে নাই? মুহম্মদের পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বর বা কোন মহাপুরুষ কি স্রষ্টার এত নিকটে পৌছিতে পারিয়াছেন? কাজেই একমাত্র মুহম্মদই যে আল্লার প্রকৃষ্ট পরিচয়দাতা বা চরম-প্রশংসাকারী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কী?

মি'রাজের সার্থকতার আর একটা দিকও আছে। হযরতের বিশ্বজনীন রূপও এই মি'রাজ-রজনীতে প্রকাশ পাইয়াছে। এই রাত্রে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের সহিত হযরতের পরিচয় ঘটিয়াছে। হযরত প্রথমতঃ

জেরুজালেম গিয়া হযরত ঈসা-মূসা-সুলায়মানের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন মস্‌জিদে দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন এবং এইরূপে জবুর, তাওরাৎ ও ইঞ্জিলের সত্যকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন। তারপর সেখান হইতে বিভিন্ন আসমান পরিভ্রমণ করিয়া হযরত আদম, ঈসা, দাউদ, ইব্রাহিম প্রভৃতি অতীতের যাবতীয় সত্য-প্রচারকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে সালাম জানাইয়াছেন। তাঁহারাও হযরতকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর রূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। অতীতের সমস্ত ধর্মপ্রচারকদিকের সহিত এই যে যোগ-স্থাপনা, ইহা হযরতের বিশ্বজনীন রূপেরই এই সুস্পষ্ট পরিচয় এবং ইসলামের সনাতনত্বেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পূর্ববর্তী সমস্ত পয়গম্বরের প্রচারিত সত্যই যে ইসলামের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সকল পথ ও মত যে হযরত মুহম্মদের মধ্যে আসিয়াই এক পরম ঐক্যে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে মি'রাজের মধ্য দিয়া সেই কথাটিই আমরা জানিতে পারি।

মি'রাজ আমাদের লক্ষ্য ও গন্তব্য পথেরও সন্ধান দেয়। আমাদিগকে অসীম অনন্তের পথে উধাও হইতে হইবে এবং অজানাকে জানিতে হইবে, এই বাণীই সে আমাদের কানে কানে বলে। মি'রাজের স্মৃতি অহরহ মনে জাগিলে আল্লার অস্তিত্ব এবং তাঁহার নৈকট্যলাভ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হয়; অসীম অব্যক্ত এবং অনির্বচনীয়ের একটা ছাপ আপনা আপনি মনের উপর দাগ কাটিয়া বসে। ফলে আমাদের চিন্তা ও কল্পনা ঊর্ধ্বমুখীন হয়; জড়জীবনের পংকিলতার মধ্যে আমরা নিজদিগকে একেবারে হারাইয়া ফেলি না। বস্তুতঃ মি'রাজ আল্লার ধারণাকে এবং আল্লার সহিত মানুষের সম্পর্ককে খাঁটি ইসলামী রংএ রূপ দেয়। নিরাকারের ধ্যান ও ধারণাকে সে সহজ করিয়া দেয়।

মি'রাজ মানবাত্মার জয় ঘোষণা করিয়াছে। আত্মার যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আল্লার মধ্যে যে সে বিলীন হইয়া যাইবে না, চিরকাল সে যে বাঁচিয়া থাকিবে, এই মহাসত্যই মি'রাজের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এইখানে ইসলামের জীবন-দর্শন সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দর্শনের মতে আল্লাতে বিলীন হইয়া যাওয়াই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু ইসলামের দর্শন অন্যরূপ। আল্লাহ্‌ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চান না, অনন্ত জীবনে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চান। আল্লাতে লয়প্রাপ্তিই যদি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য ও শেষ পরিণতি হইত

তবে রসুলুল্লাহ্ আর মি'রাজ হইতে দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতেন না। ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, আল্লার নৈকট্য লাভ করিয়া আমরা তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইব বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে নিজকে বিলীন করিয়া দিব না; অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসিব। মি'রাজে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

ইহাই মি'রাজের স্বরূপ। সন্দেহবাদীরা ইহাকে নিছক কল্পনা বলিতে চান বলুন, কিন্তু তাঁহারা জানিয়া রাখুন; কল্পনারও এখানে একেবারে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। মানুষের কল্পনা ইহার চেয়ে আর উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। কাজেই কল্পনার দিক দিয়াও ইহা একেবারে অতুলনীয়।*

বস্তুতঃ যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, মি'রাজ সত্যই এক অপূর্ব ঘটনা। এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও হৃদয় পবিত্র হয়; মনের দিকচক্রবাল সম্প্রসারিত হইয়া যায়; মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বুকে বল ও ভরসা জাগে; অসীম ও বিরাটের ধারণা মনের মধ্যে আপনা-আপনি ঘনীভূত হইয়া উঠে।

সেই মহামানবের প্রতি শত সহস্রবার দরূদ ও সালাম—যিনি সমগ্র মানবজাতিকে এমন অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার বাণী দান করিয়াছেন।

* মহাকবি দান্তে (Dante) তাঁহার 'Divine-Comedy' নামক মহাকাব্যের পরিকল্পনা যে এই মি'রাজ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষজ্ঞরা তাহা এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশদরূপে জানিতে চান, তাঁহারা Miguel Asin নামক বিখ্যাত লেখকের 'Islam and the Divine Comedy' নামক পুস্তকখানা পাঠ করুন। —লেখক।

পরিচ্ছেদ : ১০

থিওসফী ও মি'রাজ

এইবার আমরা নূতন আর একটি দিক দিয়া মি'রাজের সাম্ভাব্য-অসাম্ভাব্য বিচার করিব। কিছুদিন যাবত পাশ্চাত্য দেশে Theosophy নামক নূতন এক অধ্যাত্মবিদ্যার খুবই প্রচলন হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতের বহু বিষয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষারা আলোচনা করিয়াছেন এবং কার্যতও অনেক কিছু অলৌকিক ব্যাপার সিদ্ধ করিয়াছেন। সেই 'থিওসফী'র আলোকে মি'রাজকে একবার পরীক্ষা করা যাউক।

থিয়সফী'র মতে মানুষের এই জড়দেহই (Physical romody) এক মাত্র দেহ নয়, স্থূল দেহ ছাড়া তাহার আরও তিন প্রকার দেহ আছে, যথা—astral body (জ্যোতির্দেহ), mental body (মানস-দেহ), এবং casual body (নিমিত্ত-দেহ)। এই অ-জড় দেহগুলিকে 'etheric double' (ইথারিক ডবল) বলা হয়। স্থূল দেহের সঙ্গে সঙ্গেই ইথারিক দেহ মিশিয়া থাকে,—যেমন থাকে মোটা পর্দার সাথে সরু পর্দার স্থর। স্থূল দেহ গঠিত হয় জড়জগতের উপাদান দ্বারা—(যেমন মাটি, পানি, আগুন; বাতাস ইত্যাদি), আর ইথারিক দেহ গঠিত হয় জ্যোতিঃ বা ইথার দ্বারা। সার্ট, কোট যেমন আমাদের দেহের পোষাক, দেহগুলি তেমনি আমাদের আত্মার পোষাক! আসল বস্তু হইল আত্মা বা রুহু আর দেহ তাহার ঘর বা পোষাক। আমরা যেমন প্রয়োজন হইলে মোটা পোষাক ছাড়িয়া পাতলা বা হাল্‌কা পোষাক পরি; আত্মাও তেমনি প্রয়োজন বোধে স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে। নিদ্রাকালে স্থূল দেহ যখন ঘুমায়, আত্মা তখন ইথারিক দেহ ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক জগতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সব দেহই আত্মার বশ। যে মানুষের আত্মিক শক্তি যত প্রবল, সে তত সহজেই দেহগুলিকে বশ করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে সে যে-কোন দেহ ধারণ করিয়া নিজকার্য সাধন করিতে পারে। জড়দেহের জাগ্রত অবস্থাতেও সে অপর যে-কোন দেহ লইয়া সর্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা রাখে। এই সূক্ষ্ম দেহকে ইচ্ছা করিলে সে অপরের দৃষ্টিগোচরও করাইতে পারে। এই

অন্তই একই সময়ে একই মানুষ ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় তাহার নিজের চেহারায় অন্যত্র দেখা দিতে পারে। কেমন করিয়া পারে তাহা থিওসফীর ভাষাতেই শুনুন :

"If any person be observed who is much more developed any one who is accustomed to function in the astral world and to use the astral body for that purpose, it will be seen that when the physical body goes to sleep and the astral body slips out of it, we have the man himself before us in full consciousness ; the astral body is clearly outlined and definitely organised, bearing likeness of the man and the man is able to use it as a vehicle—a vehicle for more convenient than the physical."—Man and His bodies, by Annie Besant, P. 49.

অর্থাৎ : জ্যোতির্দেহ লইয়া আধ্যাত্মিক জগতের কার্যক্ষম যদি কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, তাহার স্থূল দেহ যখন ঘুমায় এবং জ্যোতির্দেহ লইয়া সে যখন বাহির হইয়া পড়ে তখন আসল মানুষটাই সজ্ঞানে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয় ; জ্যোতির্দেহটি সেই মানুষটিরই হুবহু প্রতিকৃতি লইয়া পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে। মানুষটি তখন সেই দেহকেই তাহার বাহনস্বরূপ ব্যবহার করে। এই বাহন স্থূল দেহের বাহন অপেক্ষা শতগুণে সুবিধাজনক।

বলা বাহুল্য, এই বিচ্ছিন্ন স্থূল দেহেরও তাহাতে কোন অসুবিধা হয় না, জ্যোতির্দেহের সহিত তাহার যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে। এই জ্যোতির্দেহ লইয়া মানুষ যে-কোন সময়ে যে-কোন দূরবর্তী স্থানে অপর কাহারও সম্মুখে উদয় হইতে পারে :

"A person who has complete mastery over the astral body can, of course, leave the physical at any time and go to a friend at a distance. If the person thus visited be clairvoyant, i.e, has developed astral sight, he will see his friend's astral body. If not, such a visitor might slightly densify his vehicle by drawing into it

from the surrounding atmosphere particles of physical matter and thus materialize sufficiently to make himself visible to physical sight.' (Ibid, p. 55)

অর্থাৎ: কোন ব্যক্তি যদি তাহার জ্যোতির্দেহের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে তবে সে যে-কোন সময়ে তাহার জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্তী কোন বন্ধুর সম্মুখে দেখা দিতে পারে। বন্ধুটির জ্যোতিদৃষ্টি যদি খুব প্রখর থাকে, তবে সে তাহাকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে, যদি তাহা না হয়, তবে আগন্তুক তখন তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জড়প্রকৃতি হইতে কিছু-কিছু জড় উপাদান আকর্ষণ করিয়া এমনভাবে ঘনীভূত হইয়া দাঁড়ায় যে তখন তাহার বন্ধু তাহাকে চর্মচক্ষেই চিনিতে পারে। জ্যোতির্দেহ (astral body) অপেক্ষা মানস-দেহ (mental body) আরও ক্ষমতাশালী। এই দেহ লইয়া মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চস্তরে বিচরণ করিতে পারে।

"The man fashions his mind-body into likeness of himself, shapes it into his own image and likeness and is then in its temporary and artificial body, free to traverse the three planes at will and rise superior to the ordinary limitations of man."—Ibid.

অর্থাৎ: মানসদেহ ধারণের ক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি তাহার মানসমূর্তিকে নিজের আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া লয়। এই কৃত্রিম দেহ লইয়া সে তখন যদৃচ্ছাক্রমে ত্রিভুবন বিহার করিতে পারে এবং মানুষের সাধারণ ক্ষমতার সীমারেখার ঊর্ধ্বে চলিয়া যায়।

এ-হেন শক্তিসম্পন্ন মানুষের কাছে পদার্থ বা স্থানকালের (matter, space and time) কোন বাধা-বন্ধন থাকে না:

"In this way, matter, time and space are conquered and barriers cease to exist for the unified man."—Ibid.

অর্থাৎ: এই উপায়ে জড়, কাল এবং স্থানকে সে জয় করে, তাহার কাছে কোন বাধাই আর থাকে না।

এই অবস্থায় তাহার গতিশক্তিও অস্বাভাবিক রূপে বাড়িয়া যায়:

"Travelling in the astral body is so swift that the space and time may be said to be practically conquered for although the man knows he is passing through space, it is passed through so rapidly thatthe power to divide friend from friend is lost. All things that are seen are seen at once the moment attention is turned towards them ; all that is heard is heard at a single impression; space, matter and time, as known in the lower world, have disappeared, sequence no longer exists it the 'eternal now."
—Ibid.

অর্থাৎ : জ্যোতির্দেহে ভ্রমণ এত ক্ষিপ্রগতিতে সম্পন্ন হয় যে স্থান-কাল প্রকৃতপক্ষে হার মানে; কারণ যদিও সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে স্থানকে অতিক্রম করিয়া সে চলিতেছে, তবু তাহার গতিবেগ এত প্রিয় হয় যে, বন্ধু হইতে বন্ধুকে পার্থক্য করিবার তাহার আর ক্ষমতা থাকে না। যাহা কিছু দেখিতে হয়, এক নিমেষেই দেখে, যাহা কিছু শুনিতে হয়, এক নিমেষেই শুনে, নিম্নজগতের স্থান, কাল এবং পদার্থ তখন দূরীভূত হয় এবং সেই চিরবর্তমানের মধ্যে ঘটনাপ্রবাহ বিলীন হইয়া যায়।

এইবার পাঠক মি'রাজের কথা একবার ভাবুন। সাধারণ মানুষের পক্ষেই যখন এতটা সম্ভব, তখন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর এবং আল্লার রসুলের পক্ষে সশরীরে মি'রাজ করিতে যাওয়া অসম্ভব কিসে?

অস্বাভাবিকতার দোহাই দিয়া এতদিন যাঁহারা শারীরিক মি'রাজকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, আশা করি এবার তাঁহারা নূতন ভাবে চিন্তা করিবেন।

পরিচ্ছেদ : ১১

'মুহম্মদ' ও 'আহ্‌মদ' নাম কি সার্থক হইয়াছে ?

এই পুস্তকের প্রারম্ভেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি, বিশ্বনবী মুহম্মদের জীবন এবং কার্য কতদূর সফল হইয়াছে তাহা বিচার হইবে—তাঁহার 'মুহম্মদ' ও 'আহ্‌মদ' নামের সার্থকতা দেখিয়া; অন্য কথায়: তিনি সত্যই 'মুহম্মদ' (চরম-প্রশংসিত) এবং আহ্‌মদ (চরম-প্রশংসাকারী) ছিলেন কিনা—এই বিচারই হইবে তাঁহার মূল্যনিরূপণের কষ্টিপাথর। এ-কথাও বলিয়া রাখিয়াছি, 'চরম-প্রশংসিত' হইতে হইলেই তাহাকে চরম-পূর্ণ বা আদর্শ হইতে হয়, কেননা চরম-পূর্ণ বা আদর্শ না হইলে কেহ কখনও চরম-প্রশংসিত হইতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্ যখন মুহম্মদকে 'চরম-প্রশংসিত' আখ্যা দিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, মুহম্মদ ছিলেন আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌তালা মুহম্মদকে 'আহ্‌মদ' অর্থাৎ চরম-প্রশংসাকারী বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এই কথাই বুঝা যায় যে, মুহম্মদ আল্লার যে-প্রশংসা করিয়াছেন, অর্থাৎ আল্লাকে তিনি যেরূপ চিনিয়াছেন এবং আল্লার যে-পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা মানুষের পক্ষে একেবারে চরম বা চূড়ান্ত হইয়াছে, অন্য কথায় উহাই আমাদের নিকট আল্লার একমাত্র সত্য ও সম্পূর্ণ পরিচয়।

এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে: তবে কি হযরত মুহম্মদের পূর্বে অন্য কেহই আল্লাকে সঠিকভাবে চিনিতে পারেন নাই, অথবা আল্লাহ্ কি অন্য কাহারও নিকটই সম্পূর্ণ আত্মপরিচয় দেন নাই? বেদ-উপনিষদ, জিন্দাবেস্তা, জবুর, তাওরাৎ, ইঞ্জিল ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে আল্লার যে-পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহা কি সত্য নয়? উত্তর: সে পরিচয় অনেকাংশে সত্য বটে, তবে সম্পূর্ণ ও ব্যাপক নয়, তাহা আংশিক। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন: হযরত মুহম্মদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। এক ব্যক্তি বলিল: "হযরত মহম্মদের পিতার নাম আবদুল্লাহ্। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" আর এক ব্যক্তি বলিল: "হযরত মুহম্মদের পিতার নাম আবদুল্লাহ্ এবং মাতার নাম আমিনা। তিনি ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ১ই রবিউল আউয়াল, সোমবার

তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শেষ নবী ছিলেন।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল: "হযরত মুহম্মদ ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সুবেহ্ সাদিকের সময় মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ্। মাতার নাম আমিনা। জন্মের ছয় মাস পূর্বেই তাঁহার পিতা ইন্তিকাল করেন। কাজেই তাঁহার দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। ধাত্রী হালিমার নিকট তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়...ইত্যাদি ইত্যাদি।" এইরূপভাবে পরিচয়ের গণ্ডীকে ধীরে ধীরে বাড়াইয়া এমন অবস্থায় আনা যায় যে, তখন হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। তাঁহার জন্ম, বংশ-পরিচয়, শিক্ষা, কার্য, প্রতিভা, চরিত্র, মহিমা ইত্যাদি সমস্তই নিঃশেষিত রূপে বলা হইলে তবেই বলা যায় যে সেই পরিচয় সম্পূর্ণ এবং চরম। আল্লার পরিচয় সম্বন্ধেও ঠিক তাই। হযরত মুহম্মদের পূর্বে যাঁহারা আল্লাকে চিনিয়াছিলেন এবং চিনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয় পূর্ণ ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে সত্যও ছিল না। কিন্তু হযরত মুহম্মদ আল্লার যে-পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মানুষের জন্য একেবারে সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

যাহাই হউক, আমাদিগকে এখন বিচার করিতে হইতেছে: হযরত সত্যই 'মুহম্মদ' এবং 'আহ্মদ' ছিলেন কিনা। অন্য কথায়: আমাদিগকে দেখিতে হইবে: (১) হযরত আদর্শ সৃষ্টি কিনা; (২) হযরতের প্রদত্ত আল্লা-পরিচিতি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ কিনা। এই দুইটি পরীক্ষায় তিনি যদি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তবেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অক্ষুণ্ণ থাকে।

আমরা এখন সেই বিচারেই প্রবৃত্ত হইব।

পরিচ্ছেদ : ১২

মুহম্মদ 'মুহম্মদ' ছিলেন কিনা ?

মুহম্মদ 'মুহম্মদ' ছিলেন কিনা, অন্য কথায় তিনি আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কিনা, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে দুই উপায়ে তাহা সম্ভব—(১) যুক্তিজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা ভাবগতভাবে (subjectively), (২) জীবনের ঘটনাবলীর দ্বারা বস্তুগতভাবে (objectively)। আমরা ভাবগতভাবেই প্রথম অগ্রসর হইব।

(১) ভাবগতভাবে

সর্বপ্রথম একটি কথা আমাদিগকে জানিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ কাহাকে বলিব ? শ্রেষ্ঠত্বের সংজ্ঞা কি ? মাপকাঠি কী ?

বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠত্বের মূল আছে সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের ধারণায়। প্রকৃত শ্রেষ্ঠ হইতে হইলে তাহাকে সত্য হইতে হয়, সুন্দর হইতে হয় এবং মঙ্গল হইতে হয়। এই তিনটি কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াই আমরা শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করি। যে যতখানি সত্য, যতখানি সুন্দর, যতখানি মংগল, সে ততখানি শ্রেষ্ঠ।

অপূর্ণতাই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র পরিপন্থী। শ্রেষ্ঠ হইতে হইলেই তাহাকে সর্বপ্রকারে পূর্ণ হইতে হয়। কিন্তু এরূপ পূর্ণ হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই যদি কেহ প্রকৃত শ্রেষ্ঠ থাকে, তবে সে হইতেছে সত্য, সুন্দর ও মংগলের চিরনিলয়—সকল পরিপূর্ণতার একমাত্র অধিকারী—সেই পরমপূর্ণ আল্লাহ্। তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ধ্রুব আদর্শ। এই আদর্শের পাশে আনিয়াই আমরা অন্য সকলের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করিয়া থাকি।

তাহা হইলে এ কথা এখন সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ যখন আমাদের সকল শ্রেষ্ঠত্বের চিরন্তন আদর্শ, তখন অন্য যে-কেহই আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ হইতে চেষ্টা করুক না কেন, আল্লার গুণাবলীই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া শ্রেষ্ঠ হইবার অন্য কোন পন্থা নাই। এই জন্যই হযরত

মুহম্মদ সকল মানুষকে আল্লার গুণাবলী অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন:

"তাখাল্লাকু বি আখ্‌লাকিল্লাহ্‌"

অর্থাৎ: তোমার আল্লার গুণাবলীর অনুকরণ কর।

অতএব আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, যিনি আল্লার গুণাবলীর যতটা অনুসরণ করিতে পারিবেন, অর্থাৎ আল্লার যত নৈকট্যলাভ করিবেন, তিনিই হবেন আমাদের মধ্যে তত শ্রেষ্ঠ বা আদর্শস্থানীয় এবং সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে যিনি আল্লার নিকটবর্তী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তিনিই হইবেন আমাদের সকলের অনুকরণীয়। কাজেই হযরত মুহম্মদকে যদি আমরা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া দাবী করি, তবে আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে তিনিই আল্লার গুণাবলীকে সর্বাপেক্ষা অধিক আয়ত্ত করিয়াছেন, অন্য কথায়: তিনি আল্লার সবচেয়ে বেশি নৈকট্যলাভ করিয়াছেন।

কিন্তু এ-বিচারের সামর্থ্য আমাদের খুব বেশি নাই। আল্লার গুণাবলী কে সর্বাপেক্ষা বেশি আয়ত্ত করিয়াছে, অথবা কে তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী হইয়াছে, সে কথা আমরা কেমন করিয়া বলিব? এ-যোগ্যতার সার্টিফিকেট দিবার একমাত্র অধিকারী স্বয়ং আল্লাহ্‌। কাজেই এ-সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্‌ কী বলিতেছেন, সর্বাগ্রে আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হইবে।

মি'রাজ-রজনীর ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্‌ পাক তাঁহার প্রিয় রসুল সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন:

"অতঃপর তিনি (মুহম্মদ) আল্লার নিকটবর্তী হইলেন এবং বিনীত হইলেন, দুটি ধনুকের জ্যা অথবা তদপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী হইলেন।"

—(৫৩: ৮-৯)

উপরোক্ত আয়াত হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, হযরতই সর্বাপেক্ষা আল্লার নিকটবর্তী হইয়াছিলেন। 'দুইটি ধনুকের জ্যা' একটি আরবী প্রবাদবাক্য, ঘনিষ্ঠতম নৈকট্যই হইতেছে উহার তাৎপর্য। কাজেই হযরত মুহম্মদ যদি আল্লার ঘনিষ্টতম নৈকট্যই লাভ করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, তিনিই ছিলেন আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; অন্য কথায়: তিনিই সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্য, সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং সর্বাপেক্ষা মঙ্গল। বলা বাহুল্য বিশ্বনবীর মধ্যে আমরা এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই

পরিপূর্ণরূপে দেখিতে পাই। তিনি প্রকৃতই ছিলেন সত্য, সুন্দর ও মংগলের আধার। তিনি যে সত্য ছিলেন তাহার প্রমাণ: আপামর সাধারণের নিকট তিনি 'আল্-আমিন্' বা সত্যময় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি যে সুন্দর ছিলেন, তাহার প্রমাণ: আল্লাহ্, তাঁহাকে 'ওসওয়াতুন্ হাসানা' (অর্থাৎ সুন্দরের শ্রেষ্ঠ আদর্শ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর তিনি যে মংগল ছিলেন, তাহার প্রমাণ: তিনি ছিলেন 'রহ্‌মতুল্লিল্ আলামিন্' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের মূর্তিমান কল্যাণ বা আশীর্বাদ। বস্তুতঃ বিশ্বমানবের মুক্তি ও কল্যাণই ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের একমাত্র সাধনা।

কাজেই দেখা যাইতেছে, হযরত ছিলেন সত্য, সুন্দর ও মংগলের মূর্তিমান আদর্শ। আল্লার নৈকট্যলাভের ইহাই হইল গূঢ় তাৎপর্য।

কিন্তু কাহারও নৈকট্যলাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ কাহারও আদর্শের অনুকরণ করিতে হইলে, একজন শিক্ষক বা পথপ্রদর্শকের প্রায়োজন হয় নিশ্চয়ই। হযরতের শিক্ষক বা পথপ্রদর্শক কে ছিলেন? এ-প্রশ্ন এখানে উঠা স্বাভাবিক।

আল্লাহ্ নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন:

"অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তাঁহাকে (মুহম্মদকে) শিক্ষা দিয়াছেন।" —(৫৩:৫)

মানুষ নয়, ফিরিশ্‌তা নয়, স্বয়ং আল্লাই হইতেছেন হযরতের শিক্ষক। কাজেই, এ-শিক্ষা নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ না হইয়াই পারে না। কোন শিল্পী নিজেই একটা মডেল বা আদর্শ স্থাপন করিয়া নিজেই যদি তাহার রচনা কৌশল তাঁহার শিষ্যকে শিখাইয়া দেন, তবেই সে-শিষ্য গুরুর অনুরূপ হইতে পারে, অন্যথায় নয়। বিশ্বশিল্পী আল্লাহ্ তাই তাঁহার প্রিয় হাবিবকে নিজে শিক্ষা দিয়াছেন। অন্য কোন মানুষের নির্দেশ বা শিক্ষাক্রমে যদি রসুলুল্লাহ্ তাঁহার জীবন-শিল্প রচনা করিতে যাইতেন, তবে তাহা কিছুতেই নির্ভুল বা সম্পূর্ণ হইতে পারিত না, কারণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তি লইয়া কোন মানুষই নির্ভুল পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই তো হযরত ছিলেন 'উম্মি' অর্থাৎ নিরক্ষর। তিনি যে জগতের কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন নাই, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ! আল্লাহ্ নিজেই হযরত মুহম্মদকে শিক্ষা দিয়া পরিপূর্ণ আদর্শরূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করাইবেন বলিয়াই তাঁহাকে 'উম্মি' করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন

মানুষের নিকট হইতে কোন-কিছু শিক্ষা লাভ করা বিশ্বগুরুর পক্ষে শোভা পায় না।

অতএব, দেখা যাইতেছে, স্বয়ং আল্লাহ্ই ছিলেন হযরত মুহম্মদের শিক্ষাদাতা, এবং এই কারণেই তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হইতে পারিয়াছিল।

হযরত যে সত্যসত্যই পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আল্লাও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছেন :

"শক্তির অধিকারী তিনি (আল্লাহ্), কাজেই তিনি (মুহম্মদ) পূর্ণতা লাভ করিলেন।" —(৫৩ : ৬)

অতএব, যিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তিনি যে আমাদের আদর্শ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কী? আল্লাহ্ তাই স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন :

"নিশ্চয়ই আল্লার রসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রহিয়াছে।" —(৩৩ : ২১)

তিনি যে আমাদের পথপ্রদর্শক, সতর্ককারী এবং পথের আলোক-স্বরূপ তাহাও আল্লাহ্ বলিয়া দিতেছেন :

"হে রসুল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীস্বরূপ, সংবাদ-দাতা-স্বরূপ এবং সতর্ককারীস্বরূপ এবং আল্লার দিকে আকর্ষণকারী স্বরূপ এবং আলোক-বিচ্ছুরণকারী মশাল-স্বরূপ।" —(৩৩ : ৪৫-৪৬)

তাহা হইলে স্বয়ং আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং নিখিল বিশ্বের পরিপূর্ণ আদর্শ বা পথপ্রদর্শক।

তা যদি হয়, তবে এ কথা অনায়াসেই বলা চলে যে, হযরত মুহম্মদ বিশ্বনিখিলের জন্য একটা মূর্তিমান করুণা বা আশীর্বাদও বটেন। দিশা-হারা মানুষ, সীমাবদ্ধ তাহার জ্ঞান, পদে পদে ভ্রান্তি, পদে পদে প্রলোভন; পথ অতি বন্ধুর, আলো নাই, সাথী নাই—সর্বোপরি শয়তান তাহার প্রকাশ্য দুশ্‌মন্! কেমন করিয়া সে তাহার লক্ষ্যস্থলে পৌছিবে! সে চায় তাই একজন উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের সাহায্য—চায় একটা নিখুঁৎ আদর্শ যাহার পদাংক অনুসরণ করিয়া সে তাহার গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারে! এরূপ একটা বিশ্বজনীন ধ্রুব আদর্শ উদ্‌ভ্রান্ত মানুষেরও পক্ষে নিশ্চয়ই প্রয়োজন। সুতরাং সেরূপ আদর্শ যদি মিলে, তবে তাহাকে সৃষ্টির বুকে আল্লার দেওয়া

একটা মূর্তিমান করুণা বা আশীর্বাদ ছাড়া আর কী বলা যায়? আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ্ হযরতকে ঠিক এই বেশেই আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন :

"এবং আমরা তাহাকে (মুহম্মদকে) নিখিল বিশ্বের জন্য মূর্তিমান করুণাস্বরূপ পাঠাইয়াছি।" —(২১ : ১০৭)

এইরূপে যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, আমরা দেখিতে পাইতেছি—হযরত মুহম্মদ আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও পরিপূর্ণ আশীর্বাদ। কাজেই আমাদের জীবন তাঁহারই অনুকরণে গঠিত করিতে হইবে। কিন্তু সন্দেহবাদী প্রশ্ন করিবেন : আদর্শের মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে ? তবে তো আমাদের জীবন-গঠনও ত্রুটিপূর্ণ হইবে! কাজেই আমাদের আদর্শ নির্ভুল ও চিরনির্ভরযোগ্য কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের স্থিরনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন! এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কী বলিতেছেন, দেখুন :

"তোমাদের বন্ধু (মুহম্মদ) কখনও ভুল করেন না, বা কখনও অকার্যকরী হন না।" —(৫৩ : ২)

ইহার তাৎপর্য এই যে, হযরত মুহম্মদ চির-অভ্রান্ত এবং চিরনির্ভরযোগ্য আদর্শ। হযরত যদি চির-অভ্রান্তই হন, তবে ইহা দ্বারা এ কথাও বলা যায় যে, তিনি 'মাসুম' বা চির-নিষ্পাপ ; কেননা ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতেই হয় পাপের জন্ম। যিনি কখনও ভুল করেন না, তিনি নিশ্চয়ই চির-নিষ্পাপ।

কিন্তু এই চির-নিষ্পাপ হওয়া তো সহজ কথা নয় : মানুষ কিরূপে চির-নিষ্পাপ হইতে পারে ? এরূপ হওয়া তখনই সম্ভব হয়, যখন কাহারও বচন ও কর্ম, ধ্যান ও ধারণা, সেই চিরপবিত্র আল্লার দ্বারা চালিত হয়। বিশ্বনবীর বেলায় আমরা ঠিক তাহাই পাইতেছি। তিনি নিজে কিছুই করেন নাই বা বলেন নাই। সারাটি জীবনই তাঁহার আল্লার ইংগিতে চালিত হইয়াছে ; আল্লাহ্ যেরূপ নির্দেশ দিয়াছেন, তিনি সেইরূপই চলিয়াছেন বা বলিয়াছেন :

"তিনি (মুহম্মদ) নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না।" —(৫৩ : ৩)

অন্যত্র :

"তাঁহারা (পয়গম্বরগণ) তাঁহাকে (আল্লাকে) অতিক্রম করিয়া কোন কথা বলেন না এবং কেবলমাত্র আল্লার আদেশানুসারেই সমস্ত কার্য করেন।" —(২৯ : ২৭)

অতএব আমরা এবার চূড়ান্তরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইবার সকল লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যই আছে হযরত মুহম্মদের মধ্যে।

হযরত মুহম্মদকে আমরা নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিলাম। কিন্তু এ কথা বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, আল্লার পরেই হইতেছে মুহম্মদের স্থান; অর্থাৎ আল্লাহ্ ও মুহম্মদের মধ্যে আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাই। অন্য কথায়ঃ মুহম্মদই হইতেছেন আল্লার প্রতিনিধি (Viceroy) বা খলিফা।

একদিক দিয়াও আল্লাহ্ আমাদিগকে কোন সন্দেহের অবকাশ দেন নাই। হযরতকে তিনি তাঁহার প্রতিনিধি (খলিফা) রূপেই পাঠাইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

হযরত আদমকে সৃষ্টি করিবার প্রাক্কালে আল্লাহ্ এবং ফিরিশ্‌তাদিগের মধ্যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, পাঠক তাহা এখানে স্মরণ করুন। আল্লাহ্ বলিতেছেনঃ

> "এবং যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিলেন, আমি দুনিয়াতে আমার খলিফা পাঠাইব, তখন ফিরিশ্‌তারা বলিলঃ সে কি! আপনি কি দুনিয়াতে এমন জীব পাঠাইবেন যাহারা ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও খুন-খারাবি করিবে? আমরাই তো আপনার পবিত্রতার গুণগান করিতেছি। তখন আল্লাহ্ বলিলেনঃ নিশ্চয়ই আমি যাহা জানি, তোমরা তাহা জান না।" —(২ : ৩০)

এখানে সাধারণ মানুষ বা আদমকেই খলিফা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু গূঢ় অর্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, হযরত মুহম্মদকেই ইংগিত করা হইয়াছে। "আমি যাহা জানি, তোমরা তাহা জান না" এ কথার গূঢ় রহস্য এই। আমরা যখন বলিঃ "পানি আমাদের জীবন ধারণের উপায়, তখন যেমন আদর্শ পানিকেই বুঝি, দূষিত পানিকে বুঝি না, সেইরূপ মানুষকে খলিফা বলিলে আদর্শ মানুষকেই বুঝায়, নিকৃষ্ট বা পশুপ্রকৃতির মানুষকে বুঝায় না। সেই আদর্শ মানুষই যখন হযরত মুহম্মদ, তখন তিনিই হইতেছেন আল্লার খলিফা বা প্রতিনিধি!

একটি হাদিস হইতেও আমাদের এই কথার সমর্থন মিলেঃ

আবু হোরায়রা বলিতেছেনঃ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, হে রসুলুল্লাহ্,

আল্লাহ্ আপনাকে কখন নবুয়ৎ দান করিয়াছিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন : আদম যখন রুহ্ এবং দেহের মধ্যবর্তী ছিলেন, অর্থাৎ আদমের যখন সৃষ্টিই হয় নাই।* ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, হযরতই সেই খলিফা বা প্রতিনিধি এবং ইঁহারই প্রেরণের ইংগিত আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদিগের নিকট দিয়াছিলেন।

কথা উঠিতে পারে : হযরত মুহম্মদই যদি সেই প্রতিনিধি হন, তবে তাঁহার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ ? তাঁহাদের অপেক্ষা তবে কি তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন ?

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কী বলিতেছেন, দেখুন :

"এবং নিশ্চয়ই আমরা কোন কোন পয়গম্বরকে কোন কোন পয়গম্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছি।" —(১৭ : ৫৫)

বলা বাহুল্য, এখানে হযরত মুহম্মদকেই যে নির্দেশ করা হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে সকল তফ্সীরকারই একমত।

হযরত মুহম্মদ যে অন্যান্য পয়গম্বরদিগের অপেক্ষা সত্যই শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে যে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অপূর্ণতা ছিল না, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, সমস্ত পয়গম্বরের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র 'রসুলুল্লাহ্'। সকল পয়গম্বরই নবী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কেহই 'রসুলুল্লাহ্' নামে অভিহিত হন নাই। হযরত আদমকে বলা হইয়াছে : 'আদম সফিউল্লাহ্', হযরত নূহকে বলা হইয়াছে 'নূহ নবীউল্লাহ্', হযরত ইব্রাহিমকে বলা হইয়াছে 'ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্', হযরত ইসমাইলকে বলা হইয়াছে 'ইসমাইল জবিহ উল্লাহ্, হযরত মুসাকে বলা হইয়াছে 'মুসা কলিমুল্লাহ্', হযরত ঈসাকে বলা হইয়াছে 'ঈসা রুহ-আল্লাহ্'; কিন্তু হযরত মুহম্মদকে বলা হইয়াছে 'মুহম্মদ রসুলুল্লাহ্'। কাজেই দেখা যাইতেছে, অন্য কোন পয়গম্বরকেই আল্লাহ্ 'রসুল' বলিয়া অভিহিত করেন নাই। ইব্রাহিম রসুলুল্লাহ্, মুসা রসুলুল্লাহ্ বা ঈসা রসুলুল্লাহ্—এই ধরণের উক্তি কোথাও নাই। পক্ষান্তরে কুরআনের যেখানেই 'আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল', 'রসুলুল্লাহ্' অথবা শুধু 'রসুল' শব্দের উল্লেখ আছে, সেখানেই হযরত মুহম্মদকে বুঝান হইয়াছে। ইহার কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই : ইহা দ্বারা বুঝা যায় : রসুলের একটা বিশিষ্ট অর্থ আছে এবং উহা অনন্য সাধারণ একটি

* 'কুনতু নাবীয়্যান অ আদামো বাইনাররুহ্ হে অল্জাসাদে।'

খিতাব ; এ-খিতাব একমাত্র হযরত মুহম্মদের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছিল।*

এই 'রসুলের' অর্থ কী ? রসুলের গূঢ় অর্থ হইতেছে 'খলিফ' অর্থাৎ আল্লার প্রতিনিধি।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্যান্য পয়গম্বরগণ আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, কিন্তু হযরত মুহম্মদকে পাঠান হইয়াছিল বিশ্বমানুষের মুক্তির জন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আল্লাহ্ হযরত নূহ্ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"নিশ্চয়ই আমরা নূহ্‌কে তাঁহার লোকদিগের নিকট পাঠাইয়াছিলাম।"

—(৭ : ৫৯)

হযরত হুদ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং আদ বংশের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা হুদকে পাঠাইয়াছিলাম।"

—(৭ : ৬৫)

হযরত সালেহ্ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং সমুদ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম।"

—(৭ : ৭৩)

হযরত শোয়েব সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং মিদীয়দিগের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোয়েবকে পাঠাইয়াছিলাম।"

—(৭ : ৮৫)

হযরত মুসা সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং নিশ্চয়ই আমরা মুসাকে আমাদের বাণীসহ এই বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম : তোমার লোকদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আইস।"

—(১৩ : ৫)

হযরত ঈসা সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং তিনি (আল্লাহ্) তাঁহাকে (ঈসাকে) ইসরাইল বংশীয়দিগের জন্য পয়গম্বর করিবেন।"** —(৩ : ৪৮)

কিন্তু হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং আমরা তোমাকে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে ছাড়া পাঠাই নাই।" —(৩৪ : ২৮)

---

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য মৎপ্রণীত "বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য" নামক পুস্তকখানি দেখুন। আমি সেখানে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছি যে হযরত মুহম্মদ (দঃ) একক রসুল ছিলেন।

** বাইবেলে যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"I am not sent but unto the lost ship of the house of Israel".—Mt. 15 : 24.

ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, হযরত মুহম্মদ ছিলেন 'বিশ্বনবী'।

হযরতকে যে বিশ্বনবীরূপেই পাঠান হইবে, সে কথা আল্লাহ্ তাঁহার অন্যান্য পয়গম্বরকেও জানাইয়া দিয়াছেন :

"এবং আল্লাহ্ সমস্ত নবীদিগের মধ্যবর্তিতায় এই স্বীকারোক্তি করিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগের যে-সব কিতাব এবং জ্ঞান দান করিয়াছি, (তাহা সত্য); তারপর একজন **রসুল** তোমাদের মধ্যে আসিবেন এবং তোমাদের নিকট যাহা আছে, তাহার সত্যতা প্রমাণ করিবেন; তোমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিও এবং অবশ্য তাঁহাকে সাহায্য করিও।" —(৩ : ৮০)

তাহা হইলে এ কথা এখন পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, হযরত মুহম্মদ ছিলেন পয়গম্বরদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কাজেই নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ।

যুক্তিবাদী তার্কিক এখানে বলিবেন : হযরত মুহম্মদ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদিগের মধ্যে না হয় শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পরে যে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর কোন পয়গম্বর আসিবেন না, তাহার প্রমাণ কী ?

এ-প্রশ্নের একটি মাত্রই সদুত্তর আছে। আমরা যদি দেখাইতে পারি যে, হযরত মুহম্মদের পর আর কোন নবীই জন্মগ্রহণ করিবেন না, তবেই তাঁহার শ্রেষ্ঠতর দাবী অক্ষুণ্ণ থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হযরতকে আল্লাহ্ ঠিক 'শেষনবী'ই বলিয়াছেন। —আল্লাহ্ ঘোষণা করিতেছেন :

"মুহম্মদ তোমাদের কাহারও জনক নন, তিনি আল্লার রসুল এবং সর্বশেষ নবী।" —(৩৩ : ৪৪)

হাদিস শরীফ হইতেও জানা যায়, হযরত মুহম্মদ নিজেকে 'শেষনবী' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হাদিস দেখুন :

"ইসরাইল-বংশীয়দিগকে হেদায়েত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে অনেক নবী আসিয়াছিলেন, কিন্তু যেহেতু আমিই শেষ নবী, এ কারণ আমার পরে আর কেহই নবী আসিবে না।" —(বোখারী)

আর একটি হাদিসে আছে :

"আমার উম্মতদিগের মধ্যে ত্রিশজন লোক নবী বলিয়া মিথ্যা দাবী করিবে; কিন্তু প্রকৃত কথা এই—আমিই নবীদিগের মধ্যে সর্বশেষ। কাজেই কোন নূতন নবী আসা আর সম্ভব নয়।" —(তিরমিজী, আবু দাউদ)

অতএব আমরা দেখিলাম, হযরত মুহম্মদ নবীদিগের মধ্যে শুধু সর্বশ্রেষ্ঠই নহেন, সর্বশেষও বটেন।

দার্শনিক ভংগিতে দেখিতে গেলেও দেখা যায়, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ ঠিক একই বিন্দুতে না মিশিয়া পারে না। অন্য কথায়ঃ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহাকেই সর্বশেষ হইতে হয়। আবার যিনিই সর্বশেষ হইবেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ না হইয়া পারেন না। পরিপূর্ণতার মধ্যেই চরমত্ব নিহিত। চন্দ্র ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া অবশেষে যখন ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন সে সর্বশ্রেষ্ঠও বটে, সর্বশেষও বটে। পূর্ণচন্দ্রের পরের যে অবস্থা, তাহার মধ্যে আর কোন অভিনবত্বই নাই; চন্দ্রের ক্রমবিকাশের চরম অবস্থা ঠিক পূর্ণচন্দ্রেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। কাজেই বলিতে হইবে পূর্ণচন্দ্রই চন্দ্রের শেষ অবস্থা (**last phase**)। অতএব, এ কথা বুঝা এখন কঠিন নয় যে বিকাশের শেষ যেখানে, শ্রেষ্ঠত্বও সেখানে। শ্রেষ্ঠত্বের পরে যদি কিছু আসে; তবে সে তাহার অনুকরণ, অতিকরণ নয়। একবার যাহা পূর্ণত্ব লাভ করে, তাহা আর অধিকতর পূর্ণ হইতে পারে না। কোন বৃত্ত সত্যই যদি গোল হয়, তবে তাহা আর অধিকতর গোল হইতে পারে না, আবার কোন সরল রেখাই অধিকতর সরল হইতে পারে না। সেইরূপ হযরত মুহম্মদ যদি পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তবে এ কথা স্বয়ংসিদ্ধ যে, তদপেক্ষা পূর্ণতর বা শ্রেষ্ঠতর আর কেহই হইতে পারে না।

শরিয়ত বা শাস্ত্রবাণীর দিক দিয়া আমরা হযরতকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু হযরতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের আরও একটি দিক আছে। সেটি হইতেছে সৃষ্টিতত্ত্বের দিক। সৃষ্টির দিক দিয়া ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলেও দেখা যাইবে, হযরত মুহম্মদই হইতেছেন সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

ইসলামের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আদিতে অন্য কিছু ছিল না, ছিল কেবল নিরাকার নির্বিকার বিশুদ্ধ এক আল্লাহ্! সুতরাং সৃষ্টির উৎপত্তি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া হইতেই পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন:

"কুল্হু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ, লামইয়ালিদ অলাম ইউলাদ, অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফ্ওয়ান আহাদ।"

অর্থাৎ: বল, আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি কাহাকেও 'জন্ম' দেন না, অন্য কাহারও দ্বারা জাতও নহেন, তাঁহার মত এক আর নাই।

আল্লাহ্ এখানে 'আহাদ' রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই আহাদ শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ ও নির্বিকার এক (Absolute One)—যে একের সহিত বহুত্বের বা ভিন্নত্বের কোন সম্বন্ধই নাই। অথচ সৃষ্টি হইতেছে বহু বা ভিন্নত্ব-বোধক। কেমন করিয়া তবে 'আহাদ' হইতে এই সৃষ্টির উৎপত্তি হইতে পারে ? একটা মাধ্যম তাহার চাই-ই চাই।

আল্লার মনে সৃষ্টির ব্যগ্রতা যখন জাগিল, তখন একটা জ্যোতির্ময় ধ্যান বিচ্ছুরিত হইয়া আসিল। ইহারই নাম নূরে-মহম্মদী। সেই নূর হইতেই বস্তু-জগতের (Objective World) সৃষ্টি আরম্ভ হইল। একমাত্র 'কুন' শব্দ দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তালা অনস্তিত্বের মধ্য হইতে নিখিল সৃষ্টিকে প্রকট করিয়া তুলিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, সৃষ্টির আদিতেই ছিল মুহম্মদের পরিকল্পনা। অন্য কথায়: জন্মের আগেই তিনি জন্মিয়াছিলেন। কোন চিত্র বাহিরে অংকিত হইবার পূর্বেই যেমন শিল্পীর ধ্যানে তাহা অংকিত হইয়া যায়, হযরত মুহম্মদ তেমনি সৃষ্টির বহু পূর্বেই আল্লার ধ্যানে প্রকট হইয়া ছিলেন। শিল্পী যেমন তাহার মনের সেই চৈতন্য-চিত্রটিকে ধীরে ধীরে রূপ দেয়, বিশ্বশিল্পী আল্লাও ঠিক তেমনি করিয়া তাঁহার প্রধান পরিকল্পনাটিকে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন।

সেই প্রধান পরিকল্পনাটি কী ?

সেইটিই হইতেছে হযরত মুহম্মদ। মুহম্মদকে প্রকাশ করিবার জন্যই অন্যান্য সব কিছুকে সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। মুহম্মদই হইতেছেন তাই সমগ্র সৃষ্টির ধ্যানের ছবি বা সৃষ্টিনাট্যের প্রধান চরিত্র। এই মূল লক্ষ্যবস্তুটি না হইলে আল্লাহ্ হয়ত আদৌ কোন কিছু সৃষ্টি করিতেন না। ইহা আমাদের কল্পনার বিলাস নয়, হাদিস কুদসীতে স্বয়ং আল্লাই এ কথা বলিতেছেন :

> "তুমি না হইলে আমরা আকাশ-মণ্ডলী (গ্রহ-নক্ষত্র) সৃষ্টি করিতাম না।"

কিন্তু শুধু প্রধান কল্পনাটিকে সোজাসুজি রূপ দিলেই সে-ছবি কখনও আদর্শ শ্রেণীর হইতে পারে না, তাহার জন্য চাই background—চাই একটা পারিপার্শ্বিকতা। সাদা কাগজের উপর শিল্পী যদি খুব সুন্দর একটা ছবি আঁকেন, তবে তাহা নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে না। তাহাকে দাঁড়

করাইতে হইবে আলো-আঁধারের পশ্চাদ্ভূমিতে—যেখানে নাচিয়া চলিবে একটা গিরি-নির্ঝর, হাসিয়া উঠিবে একটা ফুল-বিতান—গাহিতে থাকিবে কোয়েল-পাপিয়া, মাথার উপরে শোভা পাইবে মুক্ত নীল আকাশ—ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিবে পূর্ণিমার চাঁদ আর তারা। রূপে-রসে বর্ণে-গন্ধে এমনি করিয়া সাজাইয়া দিতে হয় মনের কেন্দ্রীয় ভাববস্তুটিকে। আল্লাহ্‌তালাও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে আগেই প্রকাশ করিয়া দেন নাই; সর্বাগ্রে তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার ব্যাকগ্রাউণ্ড। ঊর্ধ্বে কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রশোভিত নীল আকাশ, নিম্নে সবুজ ঘাসের গালিচা-পাতা শ্যামলা ধরণী,—কোথাও বা ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা কুঞ্জবন, কোথাও বা নদ-নদী, কোথাও বা বিশাল বারিধি, কোথাও বা গগনচুম্বী পর্বতমালা। এইরূপে যেখানে যাহা সাজে তাহাই সাজাইয়া দিয়া অবশেষে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন তাঁহার সেই ধ্যানের ছবি মুহম্মদকে। বর আসিবার বহু পূর্ব হইতেই যেমন বিবাহ বাড়িতে নিশিদিন বরের জন্য আয়োজন চলিতে থাকে এবং সমস্ত কার্যে ও সমস্ত চিন্তায় জাগিয়া রহে তাহারই ধ্যানমূর্তি, সমস্ত উপকরণে যেমন জড়াইয়া যায় তাহারই রূপ ও রং, উৎসব-আয়োজনের প্রত্যেক নরনারীই যেমন জানে সেই বরের পরিচয়,—হযরত মুহম্মদের বেলাও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-বাতাস, গিরি-নদী, ফুল-ফল, জীব-জন্তু—সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল কাহার জন্য এই বিশ্বনিখিলকে এমন পরিপাটি করিয়া সাজান হইতেছে; কাহার রং-এ তাহাদের ভিতর-বাহির এমন রাঙাইয়া যাইতেছে। সেই চিরবাঞ্ছিত অনাগত অতিথির আশাপথ চাহিয়া তাই প্রতীক্ষা করিতেছিল কুল্-মখ্‌লুকাৎ; তাঁহারই ধ্যান তাঁহারই স্বপ্ন জাগিয়া ছিল তাহার নয়ন-তারায়, তাঁহারই চরণধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতেছিল তাহার প্রাণের গোপন গহনে! ফুল ফুটিবার পূর্বেই যেমন ফুলতরুর শাখায়-শাখায় পল্লবে-পল্লবে জাগে সেই ফুলের স্বপন হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই তেমনি ভুবন ভরিয়া জাগিতেছিল তাঁহার ধ্যান, তাঁহার ছায়া, তাঁহার রূপ, তাঁহার মায়া। মাটি-জল, রৌদ্র-বৃষ্টি, আলো-বাতাস সবাই যেন ফুল ফুটাইবার জন্য ফুলতরুর অন্তরে-বাহিরে তাহাদের প্রাণের সমস্ত সম্পদ উজাড় করিয়া দেয়, বুল্‌বুল্ যেমন সেই ফুলের আশাতেই নীরবে কুঞ্জতলে অপেক্ষা করে, হযরত মুহম্মদের আশাপথ চাহিয়া বিশ্বপ্রকৃতিও তেমনি অপেক্ষা করিতেছিল। সকলেই জানিত হযরত মুহম্মদ আসিবেন।

বেদ-পুরাণে, জবুর-তাওরাতে তাই ছিল তাঁহার আগমনের সুস্পষ্ট ইংগিত ; আদম, মুসা, ইব্রাহিম, ঈসা প্রভৃতি পয়গম্বরগণ তাই শুনিয়াছিলেন তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী। এইরূপে না-জন্মিবার পূর্বেই তিনি জন্মিয়াছিলেন, না-আসিবার পূর্বেই তিনি আসিয়াছিলেন। ভুবনে-ভুবনে গগনে-গগনে তাই তো খেলিয়া বেড়াইতেছিল তাঁহারই নূর—তাঁহারই জ্যোতি আভা!

সৃষ্টিতত্ত্বের আর এক দিক দিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে, মুহম্মদ ছিলেন আল্লার পরিপূর্ণ সৃষ্টি। বিশ্বপ্রকৃতিতে আমরা দেখিতে পাই : প্রত্যেক বস্তুরই উৎপত্তি (origin), বিকাশ (development) এবং অবসান (end) আছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হয় অতি ক্ষুদ্র অবস্থায়, তারপর ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া এমন একটি চরম বিকাশ-বিন্দুতে (culminating point) আসিয়া পৌঁছায়—যাহার পর আর তাহার বৃদ্ধি হয় না : তখন আসে তাহার অবরোহণের সময়। তখন হইতে সে দিনে-দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে ; অবশেষে একদিন চিরবিদায় গ্রহণ করে। বৃক্ষ প্রথম অংকুরিত হয় ক্ষুদ্র অবস্থায়, তারপর ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে ; বৃদ্ধির চরম অবস্থায় পৌঁছিলে সে আর বাড়ে না, তখন হইতেই সে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দেয়। চন্দ্র বাড়িতে বাড়িতে যখন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন আর বাড়ে না। তখন হইতে আসে তাহার অপচয়ের পালা, ধীরে ধীরে সে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, অবশেষে অমাবস্যায় তাহার অবসান ঘটে। এইরূপে প্রত্যেক বস্তুই একটা বৃত্ত (cycle) ঘুরিয়া আসে। সেটিকে তাহার জীবনচক্র বলা যাইতে পারে।

বহিঃপ্রকৃতিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু সম্বন্ধে যাহা সত্য, সমগ্র সৃষ্টি সম্বন্ধেও তাহা তদ্রূপই সত্য। সৃষ্টিরও আদি আছে, বিকাশের চরম বিন্দু আছে, অবসান আছে। প্রভাত-সূর্য যেমন পূর্ব গগনে উদিত হইয়া ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে মধ্য গগনে আসিয়া পূর্ণতার রূপ পায়, তারপর নিস্তেজ হইয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়ে এবং অবশেষে সন্ধ্যাকালে অস্তসাগরে ডুবিয়া যায়, নিখিল সৃষ্টিও তেমনি চলিয়াছে তাহার চক্রপথ ধরিয়া। ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া সে চলিয়াছে পূর্ণতার দিকে, এই পূর্ণতা লাভ করিলেই বিবর্তনের ধারা পরিবর্তিত হইবে, তখন হইতে সে চলিবে অবসানের পথে। অবশেষে আসিবে একদিন মহাপ্রলয়—রোজ-কিয়ামত। ইহাই সৃষ্টির নিয়তি।

এখন কথা এই : সৃষ্টি তাহার চরম পূর্ণতার বিন্দুতে পৌছিয়া গিয়াছে, না এখনও পৌছায় নাই ?

আমার মতে সৃষ্টি তাহার চরম পূর্ণতার বিন্দুতে পৌছিয়া গিয়াছে : এখন তাহার অধোগতির সময়।

কবে কখন্ পৌছিল ?

মধ্যযুগে—৫৭০ খৃষ্টাব্দে।

কোথায় কেমন করিয়া কাহার মধ্য দিয়া ?

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের মধ্য দিয়া। সৃষ্টির পরিপূর্ণ বিকাশের-প্রতীকই হইতেছে হযরত মুহম্মদ।

এই সত্যই আল্লাহ্‌তালা কী সুন্দরভাবেই না ব্যক্ত করিয়াছেন :

"এবং তিনি (মুহম্মদ) দিঙমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্থানে পৌছিয়াছেন।"

—(৫৩ : ৭)

হযরত মুহম্মদকে মধ্যাহ্ন-সূর্যের সহিত তুলনা করাই সব দিক দিয়া সংগত ও শোভন হইয়াছে। সৃষ্টির গগন-আঙিনায় মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতই তো তিনি দীপ্তিমান।

বস্তুতঃ হযরত মুহম্মদ সমগ্র সৃষ্টিরই পরম প্রিয়। প্রত্যেকেই তাঁহার মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান পায়। জড়-চেতন প্রত্যেকের সংগেই তিনি বিজড়িত। আলো-বাতাস-মাখা ঘাস ও পানি খাইয়া গরু দুধ দেয়, সেই দুধ হইতে হয় সর, সর হইতে হয় মাখন, মাখন হইতে হয় ঘি। ঘি-এর ভিতর থাকে তাই মাখন, সর, দুধ, ঘাস, পানি, আলো, বাতাস—প্রত্যেকেরই অংশ বা দান। হযরতের সংগেও আছে তেমনি সৃষ্টির সমস্ত উপাদানের সম্বন্ধ ; প্রত্যেকেই তাই তাঁহার সংগে আত্মীয়তার দাবী করিতে পারে। এই সৃষ্টির মূলে ছিল পানি, তারপর আসিল মাটি, তারপর আসিল উদ্ভিদ্‌জগত, তারপর জীন-ফিরিশ্‌তা ও পশুপক্ষী, সর্বশেষে আসিল মানুষ। মানুষই হইল "অশরাফুল্‌-মাখ্‌লুকাৎ" অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা-সৃষ্টি। কিন্তু এই মানুষের মধ্যেও আবার চলিল সাধনা। মানুষ ক্রমেই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একজনকে-না-একজনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ হইতেই হইবে। কে সেই পরিপূর্ণ মহামানব ?—ইনিই সেই হযরত মুহম্মদ। মুহম্মদের মধ্যে প্রত্যেকেই খুঁজিয়া পাইয়াছে তাহার জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা। মুহম্মদের জন্ম-মুহূর্তে

গ্রহে-গ্রহে লোকে-লোকে যে এমন পুলক-শিহরণ লাগিয়াছিল, জিন-ফিরিশ্‌তা, পশু-পক্ষী, তরু-লতা, ফুল-ফল, আকাশ-বাতাস—সকলেই যে দুলিয়া উঠিয়াছিল, সে আর কিছু নয়, প্রত্যেকেরই ধন্য হইবার আনন্দ,—প্রত্যেকেরই আত্মোপলব্ধির আনন্দ।

ইহাই হইতেছে হযরত মুহম্মদের প্রকৃত স্বরূপ। হযরত মুহম্মদ শুধু আরবের নন, এশিয়ার নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের; শুধু মুসলমানদের নন, মানুষের নন—তিনি সমগ্র সৃষ্টির। তিনি শুধু আদর্শ মানব নন, আদর্শ পয়গম্বর নন—তিনি হইতেছেন আদর্শ সৃষ্টি। হযরতের মধ্যে তাই দেখি আমরা এক বিশ্বজনীন রূপ। মুসলমানেরা যদি বলে মুহম্মদ শুধু তাহাদের পয়গম্বর, অথবা যদি বলে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পরগম্বর, তবে সে তাঁহার পূর্ণ পরিচয় নয়—সে কথার দ্বারা বরং হযরতকে খাটো করাই হয়। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে: তিনি শুধু মুসলমানদিগের পয়গম্বর নন—তিনি 'রহমতুল্লিল্ আলামিন'—তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য পরিপূর্ণ কল্যাণ ও আশীর্বাদ। মুসলমানও যেমন করিয়া তাঁহাকে আপনার বলিতে পারে, হিন্দু-পাশী-খৃষ্টানও ঠিক তেমনি করিয়া তাঁহাকে আপনার বলিতে পারে। সবার জন্যই তিনি আদর্শ—সবার জন্যই তিনি পথপ্রদর্শক। ধর্ম ও জাতির অভিমান এবং যুগসঞ্চিত সংস্কারের মোহে পড়িয়াই মানুষ আজ তাঁহাকে গণ্ডীগত করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে—অনাত্মীয়ের মত তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে; কিন্তু ইহা তাহাদের মস্ত বড় ভুল। এ ভুল কবে ভাঙিবে ?

হযরত মুহম্মদকে আমরা শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া দাবী করিলাম। যুক্তিজ্ঞান এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিও দেখাইলাম। তিনি তো কল্পনার মানুষ নন, ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কাজেই ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এ-দাবী টিঁকে কিনা তাহাও আমাদের দেখা উচিত। হযরত মুহম্মদকে শ্রেষ্ঠ বলিলে তাঁহার সহিত অন্যান্য মহাপুরুষদিগের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিতেই হয়। আমাদিগকে দেখাইতে হয়, তাঁহার পূর্বে এবং পরে যে সমস্ত পয়গম্বর বা মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বা পরিপূর্ণ (perfect)।

এইবার সেই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

হযরতের পূর্বে যে-সমস্ত পয়গম্বর বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইঁহারাই ছিলেন প্রধান। হযরত আদম, হযরত

নূহ, হযরত ইব্রাহিম, হযরত মুসা, হযরত ঈসা ইত্যাদি। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ছিলেন : মহাত্মা বুদ্ধ, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, জোরোষ্টার, কনফুসিয়াস, সক্রেটিস ইত্যাদি। ইঁহাদের অপেক্ষা হযরত মুহম্মদ সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কিনা—ইহাই আমাদের বিচার্য।

এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া উচিত ছিল : কিন্তু তাহার স্থান এ নহে। সংক্ষেপে এই কথাই বলিতে চাই যে, উপরে যে সমস্ত মহাপুরুষদিগের নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের একজনও হযরত মুহম্মদের মত পরিপূর্ণ (perfect) নহেন। তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরিচয়ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই। অথচ হযরত মুহম্মদ হইতেছেন খাঁটি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার জন্মমুহূর্ত হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয়েরই বিশ্বস্ত বিবরণ মৌজুদ রহিয়াছে। জীবনের প্রতি স্তরে, প্রতি পদক্ষেপে আমরা যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হই, তাহার সবগুলির সমাধানই দেখিতে পাই এই আদর্শ মহামানুষের মধ্যে। যে-কোন অবস্থায় আমরা তাঁহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর। কিন্তু হযরতের পূর্ববর্তী মহাপুরুষদিগের মধ্যে এই জিনিসটির খুবই অভাব। মানব-জীবনের কোন-কোন সমস্যার সমাধান তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন বটে, অথবা কোন-কোন বিষয়ে নির্দেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু গোটা মানব-সমাজের পথপ্রদর্শক বা আদর্শরূপে তাঁহাদের কাহাকেও আমরা দেখিতে পাই না। কে কেমনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেমনভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কেমনভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন, কেমনভাবে ঘর-সংসার পাতিয়াছিলেন, কেমনভাবে প্রতিবেশীর সহিত কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, কেমনভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কেমনভাবে যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করিয়াছিলেন, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি কেমনভাবে আচরণ করিয়াছিলেন, শত্রু বা বিধর্মীদের সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন, নারীকে কতখানি মর্যাদা দিয়াছিলেন, দাসদাসীদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, জীবন ও জগতকে তাঁহারা কী চোখে দেখিতেন, কেমনভাবে তাঁহারা জাতি-গঠন করিয়াছিলেন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন তাঁহাদের কেমন ছিল, যুগ-সমস্যার কোন সমাধান তাঁহারা করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, বিশ্বমানবের প্রতি তাঁহারা কোন বাণী দান করিয়া গিয়াছেন কিনা—ইত্যাদি দিক বিচার করিতে গেলে তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-না-কোন অভাব বা ত্রুটি

দেখিতে পাওয়া যাইবে ; হযরত মুহম্মদের ন্যায় অত সুস্পষ্ট জীবন তাঁহাদের কাহারও নয়। দয়া, ক্ষমা, দান, মহত্ব, জ্ঞানানুরাগ, ত্যাগ, সেবা, প্রীতি; প্রেম, ভালবাসা, উদারতা-ইত্যাদি যাবতীয় গুণেরই বিকাশ দেখিতে পাই আমরা হযরত মুহম্মদের জীবনে। ধর্ম ও কর্মের, দান ও দুনিয়ার এমন সুষ্ঠু সমন্বয় আমরা আর কাহার মধ্যে পাই ?

এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আমাদের এখানে সম্ভব হইল না ; পাঠককে আমরা আলোচনার সূত্রটি ধরাইয়া দিলাম মাত্র। পাঠক ইচ্ছা করিলে উপরি-উক্ত মহাপুরুষদিগের প্রত্যেককে হযরত মুহম্মদের পার্শ্বে আনিয়া এক একটি দিক দিয়া মিলাইয়া দেখিতে পারেন, তারপর তাহার ফলাফল একত্র করিয়া হযরতের মূল্য নির্ধারণ করিতে পারেন। হযরত মুহম্মদকে যাঁহারা পরিপূর্ণ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিবেন না, তাঁহাদের প্রতি আমাদের আরয্ : হযরতের পূর্ববর্তী মহাপুরুষদিগের কাহাকে লইবেন লউন ; তুলনামূলক সমালোচনা করুন, তারপর বিচারে প্রবৃত্ত হউন। নিম্নলিখিত পয়েন্ট (points)-গুলি লইয়া বিচার আরম্ভ করিতে পারেন :

বিচার-বিন্দু

(১) জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ এবং বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় কিনা।

(২) সমগ্র জীবনের সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক বিবরণ আছে কিনা।

(৩) মানবীয় উপাদান কতখানি ; অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া ঘর-সংসার করিয়াছিলেন কিনা ; সামাজিক, নাগরিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন কিনা এবং জীবন-যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন কিনা।

(৪) মানব-জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন কিনা।

(৫) সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

(৬) জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব-জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেক কার্যের আদর্শ বা বিধান দিয়াছেন কিনা।

(৭) নারীজাতি, দাসদাসী, শত্রু-মিত্র, স্বদেশী-বিদেশী, স্বধর্মী-বিধর্মী—সর্বশ্রেণীর লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন বা করিতে বলিয়াছিলেন।

(৮) কী কী জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

(৯) সততা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-নীতি, স্নেহ, মমতা, প্রীতি, প্রেম, ক্ষমা, ত্যাগ, সেবা, সংগ, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সৎসাহস নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, বীরত্ব, আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বন, মানবপ্রেম, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা, আন্তর্জাতীয়তা, বিশ্বমানবতা—ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর কী কী পরিচয় পাওয়া যায়।

(১০) আপন ধর্মমত প্রচার করিবার জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার এবং বিপদ-বরণ করিয়াছিলেন।

(১১) আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উৎকর্ষ কাহার কতখানি হইয়াছিল।

(১২) কোন ঐশীগ্রন্থ লাভ করিয়াছিলেন কিনা, এবং করিলে তাহা অদ্যাবধি অবিকৃত অবস্থায় আছে কিনা।

(১৩) শিষ্যদিগের উপর কে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন ; শিষ্যদিগের মধ্যেই বা কে কতখানি গুরুভক্তি এবং ধর্মনিষ্ঠা দেখাইতে পারিয়াছিলেন।

(১৪) কাহার ধর্মবিধান বিশ্বমানুষের উপর সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হইয়াছে।

(১৫) ধর্ম ও কর্মের, অথবা ইহকাল ও পরকালের মিলিত আদর্শ তাঁহার মধ্যে পাইতে পারি কিনা।

(১৬) জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারী তাঁহার মধ্যে জীবনের আদর্শ খুঁজিয়া পায় কিনা, অন্য কথায় : বিশ্বমানবের তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন কিনা।

(১৭) যুগসমস্যার সমাধানকল্পে কে কতখানি সহায়ক।

(১৮) বহির্জগতের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার গুণ কাহার ধর্মে কত বেশী।

(১৯) কাহার ধর্ম কত উদার এবং কত ব্যবহারোপযোগী (practical)।

(২০) জ্ঞান-সভ্যতায় কোন্ ধর্মের দান কতখানি।

আপাততঃ এই points-গুলি লইয়া তুলনামূলক সমালোচনা করা যাইতে পারে।

আমরা একটি দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষা করিব। উপরি-উক্ত পয়েন্টগুলির

ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া হযরত মুহম্মদের সহিত এইখানে আমরা বুদ্ধদেবের তুলনা করিয়া দেখিব, অবশ্য কোন মহাপুরুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; ইসলামে তাহা নিষিদ্ধও বটে। শুধু হযরত মুহম্মদকে যথার্থরূপে বুঝিবার বা বুঝাইবার জন্যই এই তুলনার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি।

বুদ্ধ	মুহম্মদ
(১) জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ দিনক্ষণ অথবা বংশ-পরিচয় আংশিক রূপে পাওয়া যায়।	(১) সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়।
(২) সমগ্র জীবনের ঐতিহাসিক বিবরণ নাই—আংশিক বিবরণ পাওয়া যায়। সুস্পষ্টতার অভাব।	(২) সমগ্র জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণ আছে। স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট তাঁহার জীবন, যে-কোন অংশকেই পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।
(৩) মানবীয় উপাদান খুব বেশী নাই; বুদ্ধ সারাজীবন সংসারী ছিলেন না; সামাজিক বা রাষ্ট্র-জীবনের কোন সুস্পষ্ট আদর্শ তিনি রাখিয়া যান নাই। জীবন সংগ্রামে তিনি নামেন নাই।	(৩) মানবীয় উপাদানে পরিপূর্ণ। হযরত বাহ্য-জীবনে আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন। পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রজীবনেরও সকল আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। জীবন সংগ্রামে তিনি বীরের মত যুদ্ধ করিয়াছেন।
(৪) মানব-জীবনের বিভিন্ন সমস্যার উপর তেমন কোন আলোকপাত তিনি করেন নাই। বরং সমস্যাকে এড়াইয়া তিনি নির্বাণের পথে গিয়াছেন।	(৪) বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। রাখাল হইতে সম্রাট পর্যন্ত সকল অবস্থার মধ্য দিয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।
(৫) সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে বুদ্ধ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন বিস্তৃতরূপে জানা যায় না।	(৫) জানা যায়।

বুদ্ধ	মুহম্মদ
(৬) জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কার্যের কোন বিধান বা আদর্শ বুদ্ধের জীবনে কচিৎ পাওয়া যায়।	(৬) বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। শিশু ভূমিষ্ট হইলে কি করিতে হয়, কিরূপভাবে তাহাকে লালন-পালন করিতে হয়, কিরূপে শিক্ষা দিতে হয়, বিবাহ দিতে হয়, ঘর-সংসার করিতে হয়—মৃত্যুকালে কি করিতে হয় প্রত্যেকটি কার্যেরই বিধান হযরত দিয়াছেন।
(৭) নারী জাতির প্রতি বুদ্ধের খুব উচ্চধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না। স্ত্রী-পুত্রকে তিনি সাধন-পথের বিঘ্নস্বরূপ মনে করিতেন। দাসদাসী সম্বন্ধেও তাঁহার মনোভাব অজ্ঞাত। অন্যান্য সকলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে না হইবে, তাহার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ তিনি দেন নাই।	(৭) নারী-জাতিকে হযরত পুরুষের সম-অধিকার দিয়াছেন। দাস-দাসীর প্রতিও আদর্শ ব্যবহার করিয়াছেন। দাসমুক্তির তিনি ছিলেন অগ্রদূত। শত্রুমিত্র বা স্বধর্মী-বিধর্মীদিগের সহিত তাঁহার ব্যবহার ছিল আদর্শ।
(৮) জরা-মৃত্যু ও শোক-দুঃখ হইতে মানুষ যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, ইহাই ছিল বুদ্ধের সাধনা। জাতি-গঠনের বা সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের মধ্য দিয়া মানুষকে প্রেম করিয়া বা সেবা করিয়া নয়- সমাজ বা রাষ্ট্র হইতে দূরে থাকিয়া আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া	(৮) হযরত মানুষের পাশে দাঁড়াইয়া ভাইয়ের মত, প্রতিবেশীর মত সকলকে সাহায্য ও সেবা করিয়াছেন। মানব-কল্যাণই ছিল তাঁহার প্রচারিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বমানুষের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। সারাটি জীবন ব্যাপিয়াই তিনি মানুষের সর্ব-

বুদ্ধ	মুহম্মদ
মুক্তিলাভ করাই ছিল বুদ্ধের ধর্ম পদ্ধতি।	বিধ কল্যাণ চিন্তা করিয়া গিয়াছেন।
(৯) অহিংসা, জীবে প্রেম, সততা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়, নীতি—ইত্যাদি অনেক মহৎ গুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তবে মানব-জীবনের সম্পূর্ণ গুণাবলীর একত্র সমাবেশ তাঁহার মধ্যে নাই। কোন কোনদিক অতি উজ্জ্বল আছে।	(৯) সম্পূর্ণ গুণাবলীই হযরতের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়—কোনটিরই অভাব সেখানে নাই। প্রত্যেক গুণেরই তিনি পরিচয় দিয়াছেন।
(১০) আপন ধর্মমত প্রচার করিতে গিয়া বুদ্ধ বিশেষ কোন বাধা বা বিপদের সম্মুখীন হন নাই, কাজেই তাঁহার কোন পরীক্ষা হয় নাই।	(১০) হযরতকে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষায় তিনি গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।
(১১) বুদ্ধের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অন্য প্রকারের ছিল। তিনি ছিলেন সংশয়বাদী, অনেকের মতে নিরীশ্বরবাদী, কাজেই তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নয়ন কোন্ পথে কতখানি হইয়াছিল বলা কঠিন। অবশ্য নৈতিক উৎকর্ষ বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষের যথেষ্ট ছিল। ওরূপ ত্যাগী পুরুষ পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্মিয়াছেন।	(১১) হযরতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন একেবারে পূর্ণ পরিণত হইয়াছিল।
(১২) ঈশ্বরকেই যখন পান নাই, তখন ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে কোন ঐশ্বরিক গ্রন্থও তিনি পান নাই।	(১২) আল্লার কুরআন তিনি লাভ করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত ইহা অবিকৃত অবস্থায় আছে।

বুদ্ধ	মুহম্মদ
(১৩) শিষ্যদিগের উপর বুদ্ধের প্রভাব খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পাঁচ-জন শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। শিষ্য-দিগকে নূতন ধর্ম্মমতের জন্য কঠোর কোন অগ্নি-পরীক্ষায় পড়িতে হয় নাই। তবে সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে সর্বাপেক্ষা বেশী।	(১৩) শিষ্যদিগের উপর অসাধারণ প্রভাব ছিল। হযরতের জন্য শিষ্যেরা অকাতরে প্রাণদান করিয়াছেন, কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে দাঁড়াইয়াও কেহ হযরতকে বা তাঁহার ধর্মকে পরিত্যাগ করেন নাই। এখন পর্যন্ত এ প্রভাব সমভাবে বলবৎ রহিয়াছে।
(১৪) বুদ্ধের ধর্ম-বিধান মানব-সমাজের উপর খুব বেশী কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বুদ্ধের অহিংসাবাদ বা সন্ন্যাস জগতের কোন জাতিই পালন করিতেছে না—এমন কি তাঁহার আপন শিষ্যেরা পর্যন্ত না। তবে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী-তে বুদ্ধের ত্যাগ ও অহিংসার বাণী অন্যভাবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, পৌত্তলিকতা, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও দেবদেবীবাদকে অস্বীকার করিয়া এবং মানুষে মানুষে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিয়া বুদ্ধ মানব-সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।	(১৪) জগতের সমস্ত চিন্তাধারা আজ ইসলামমুখীন। ইসলামের তৌহিদ, সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, বিশ্বমানবতা, নারী-প্রগতি, দাসমুক্তি, সমাজতন্ত্র —সমস্তই এখন বিশ্বের সাধারণ সম্পদ।
(১৫) বুদ্ধের মধ্যে ধর্ম ও কর্মের	(১৫) হযরতের মধ্যে দুইটিই পুরা

বুদ্ধ	মুহম্মদ
মিলিত আদর্শ নাই।	মাত্রায় আছে। ধর্ম ও কর্মকে তিনি একসাথে মিলাইয়া দিয়াছেন।
(১৬) বুদ্ধের জীবনে মানব জীবনের সর্বস্তরের দৃষ্টান্ত নাই।	(১৬) হযরতের জীবনে রাখাল হইতে সম্রাট পর্যন্ত সকল স্তরেরই দৃষ্টান্ত আছে। সকলেই তাঁহার মধ্যে আদর্শ খুঁজিয়া পাইতে পারে।
(১৭) যুগে যুগে মানব-সমাজে যে সব সমস্যার উদ্ভব হইতেছে তাহার সমাধানকল্পে বুদ্ধ কোন আদর্শ বা বিধান রাখিয়া যান নাই।	(১৭) হযরতের জীবনে সব সমস্যারই সমাধানের দৃষ্টান্ত বা ইংগিত রহিয়াছে। যে-কোন যুগ-সমস্যার সমাধান তাঁহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।
(১৮) বহির্জগতের সহিত কেমন করিয়া নিজেকে থাপ খাওয়াইয়া চলিতে হইবে, তাহার কোন নির্দেশ বুদ্ধের জীবনে পাওয়া যায় না।	(১৮) বাহিরের সহিত থাপ-খাওয়ানো (adaptability) ইসলামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।
(১৯) বুদ্ধের ধর্ম অনেকাংশে উদার ছিল বটে ; অন্য ধর্ম হইতে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশাধিকারই তাহার প্রমাণ ; জাতিভেদ ছিল না, ইহাও উল্লেখযোগ্য। তবে, বৌদ্ধধর্ম খুব যে ব্যবহারোপযোগী ছিল, তাহা বলা যায় না। কর্মজগতে বুদ্ধের বাণী অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে।	(১৯) ইসলাম সর্বাপেক্ষা উদার—বিশ্ব-মানবের সমন্বয়-সাধনই ইসলামের লক্ষ্য—মহামানবতাই তাহার বাণী। ইসলামই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারোপযোগী সাম্য-মৈত্রীর ধর্ম। বস্তুজগতের সহিত ইসলামের আদর্শের চমৎকার সুসংগতি আছে।

বুদ্ধ	মুহম্মদ
(২০) বিশ্বসভ্যতায় বৌদ্ধধর্মের দান কম নয়। নালন্দার ইউনিভার্সিটি উল্লেখযোগ্য —চীনাদের দানও যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে দান কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কোন বিপ্লবী চিন্তা বা মতবাদ বৌদ্ধধর্মে অনুপস্থিত।	(২০) বিশ্বের জ্ঞানসভ্যতা হযরতের কাছে বহু পরিমাণে ঋণী—বর্তমান যুগ (**Modern age**) ইসলামেরই সৃষ্টি। নানাভাবে ইসলাম জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বর্তমান যুগের প্রায় সমস্ত আন্দোলনই ইসলাম দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইসলাম বিপ্লবী ধর্ম। বিশ্ব-মানবতা, নারী-পুরুষের সম-অধিকার, গণতন্ত্র, আন্তর্জাতীয়তা সমস্তই ইসলামের দান।

বস্তুতঃ আমাদের দাবী এই যে, হযরত মুহম্মদ তাঁহার পূর্ববর্তী সমুদয় মহাপুরুষ-দিগের অপেক্ষা সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যাঁহারা এ দাবী মানিবেন না, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের দাবী পেশ করুন এবং প্রমাণ করিয়া দেখান যে, তাঁহাদের মনোনীত মহাপুরুষই হযরত মুহম্মদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এ-প্রমাণের দায়িত্ব আমাদের নয়, তাঁহাদের।

সৃষ্টির আদিকাল হইতে হযরত মুহম্মদের সময় পর্যন্ত যত মহাপুরুষ জন্মিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা মোটামুটিভাবে পরীক্ষা করিলাম এবং দেখিলাম, তুলনায় তাঁহাদের কেহই হযরত মুহম্মদের সমকক্ষ অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। এইবার হযরত মুহম্মদের মৃত্যু হইতে আজ পর্যন্ত যে-সমস্ত মহাপুরুষ বা ধর্মপ্রচারক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করা যাউক:

হযরত মুহম্মদের মৃত্যুকাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; এই সময়ের মধ্যে কোন পয়গম্বর যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। মার্টিন লুথার, চৈতন্য, কবীর, রামমোহন রায়,—কেহই পয়গম্বর ছিলেন না। ছোট ছোট কোন মতবাদ তাঁহারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের জীবনের কার্যও তত ব্যাপক নয়। অনেকে আবার ইসলামের নিকট হইতে প্রেরণা

লাভ করিয়াই স্বীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন, কাজেই হযরত মুহম্মদের সহিত তাঁহাদের কোন তুলনাই চলে না।

আর কাহাদের কথা তবে বলিব ? নেপোলিয়ান, পিটার, আকবর, হিটলার, মুসোলিনী,- ইহাদের কথা তো আসিতেই পারে না, কারণ ইহারা মাত্র রাজনৈতিক নেতা। মানব-চরিত্রের দুই-একটা দিক ইহাদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে মাত্র; ইহারা কোন ধর্ম বা নীতির বাস্তব আদর্শ স্থাপন করেন নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে এমন কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই—যিনি হযরত মুহম্মদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা সমকক্ষ।

বাকী রহিল ভবিষ্যৎ। সন্দেহবাদীরা নিশ্চয়ই বলিবেন: চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে, হযরতের সমকক্ষ অথবা শ্রেষ্ঠতর কেহ না জন্মাইতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতে যে জন্মাইবে না, তাহার প্রমাণ কী ?

বেশ ভাল কথা। কিন্তু জন্মিবে যে তারই বা প্রমাণ কী ?

(২) বস্তুগতভাবে

যুক্তিজ্ঞান এবং শরিয়তের দিক দিয়া আমরা নানাভাবে হযরত মুহম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া দেখাইলাম। এইবার আমরা তাঁহার বাস্তব জীবনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইব এবং দেখিব কার্যতও তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ কিনা।

হযরতের বিশ্বজনীন রূপ

সর্বপ্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে হযরতের বিশ্বজনীন রূপের প্রতি। এমন সর্বগুণসমন্বিত অসাধারণ ব্যক্তি মহামানব বিশ্বজগতে আর দ্বিতীয়টি নাই। হযরত মুহম্মদ যে কেবলমাত্র মানুষের জন্যই পূর্ণ আদর্শ ছিলেন, তাহা নহে; সমগ্র সৃষ্টির (creation) জন্যই তিনি ছিলেন চিরন্তন আদর্শ। জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণিজগৎ, মানবজগৎ, আধ্যাত্মজগৎ, সৌরজগৎ, ফিরিশ্তাজগৎ—ইত্যাদি মিলিয়া যে বিশ্বজগৎ (universe) সেই বিশ্বজগতেরই তিনি আদর্শ। অন্য কথায় তিনি হইতেছেন সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র প্রতিনিধি (representative)—যাহার

মধ্যে সকলেই নিজ নিজ আদর্শ ও প্রেরণা খুঁজিয়া পাইতে পারে। হযরতের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যত ঘটনা ঘটিয়াছে সমস্তকে মিলাইলে দেখা যাইবে নিখিল সৃষ্টি তাঁহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

এই জন্যই তো হযরতের জীবনের পরিসর ছিল এত ব্যাপক। ধূলার ধরণী হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লার আরশ পর্যন্ত সপ্ত-আসমানের সর্বত্র ছিল তাঁহার কর্মভূমি। একদিকে যেমন দেখিতে পাই: রাখাল বেশে তিনি মাঠে মাঠে মেষ চরাইতেছেন, অপরদিকে তেমনি দেখি: সম্রাট বেশে তিনি রাজ্য চালনা করিতেছেন; একদিকে তিনি কুলি-মজুর সাজিয়া মাটি কাটিতেছেন, গৃহনির্মাণ করিতেছেন, জুতা সেলাই করিতেছেন, পিরহান তৈয়ার করিতেছেন, মেথরের কাজ করিতেছেন, অন্যদিকে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন, দেশ-দেশান্তরে যাইতেছেন, সেবা সংঘ গঠন করিয়া আর্তপীড়িতের সেবা করিতেছেন। এদিকে তিনি বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছেন, স্বামী, পিতা ও প্রতিবেশীর কর্তব্য পালন করিতেছেন, দুনিয়ার সবকিছু উপভোগ করিতেছেন, অপরদিকে নিভৃত গিরিগুহায় বসিয়া কঠোর সাধনায় মগ্ন রহিতেছেন,—রোজা রাখিয়া পেটে পাথর বাঁধিয়া দিন কাটাইতেছেন। একদিকে হিযরৎ করিয়া অত্যাচারীদিগের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন, অপরদিকে জালিমকে বাধা দিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন: একদিকে সেনাপতি বেশে বীরের মত যুদ্ধ করিয়া শত্রুজয় করিতেছেন, অপরদিকে পরম শত্রুকেও ক্ষমা করিয়া কোলে স্থান দিতেছেন; একদিকে সঞ্চয় করিতেছেন, অপরদিকে সর্বস্ব বিলাইয়া দিতেছেন; একদিকে দুনিয়ার খবর রাখিতেছেন, অপরদিকে অসীম রহস্যলোকে প্রবেশ করিয়া আল্লার সহিত কথা কহিতেছেন। বস্তুতঃ রাখাল, ভিখারী, দাস-দাসী, পিতা পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, স্বামী-স্ত্রী, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, গৃহী, প্রতিবেশী, নাগরিক, কর্মী, জ্ঞানী, সন্ন্যাসী, স্বধর্মী, বিধর্মী, স্বদেশী, বিদেশী, যোদ্ধা, সেনাপতি, শত্রু, মিত্র, রাজা, প্রজা, ধনী-নির্ধন, জিন-ফিরিশ্‌তা, গওস-কুতব, ফকীর-দরবেশ, নবী-রসুল—সকলের জন্যই তিনি ছিলেন আদর্শ। কর্মজগতেও তিনি যেমন আদর্শ, আধ্যাত্মিক জগতেও ছিলেন তেমনি আদর্শ। পূর্ণ আদর্শের বৈশিষ্ট্যই তো এই। যে-আদর্শের মধ্যে বিশেষ লোক বা বিশেষ বিশেষ শ্রেণী মাত্র প্রেরণা

পায়, সে আদর্শ কখনও সম্পূর্ণ নয়। বিশ্বনিখিলের আদর্শ হইতে হইলে সমস্ত উপাদানই তাহার মধ্যে থাকা চাই। হযরত মুহম্মদের মধ্যে ছিল ঠিক তাহাই।

এই জন্যই হযরতকে যাঁহারা আমাদেরই মত সাধারণ মানবরূপে কল্পনা করেন, আবার তাঁহাকে পূর্ণ আদর্শও বলেন, তাঁহাদের কথা আত্মবিরোধী। শুধু রক্তমাংসের মানুষ হইলে তিনি কিছুতেই বিশ্বনিখিলের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন না। কাজেই হযরতের জীবন হইতে সমস্ত অলৌকিকত্বকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া যাহারা তাঁহাকে কেবলমাত্র মাটির মানুষ বেশেই দাঁড় করাইতে চান, তাঁহারা দস্তুর মত হযরতকে খাটো করেন। হযরত মুহম্মদকে একান্তরূপে মানুষের মত করিয়া যিনি দেখিতে চান, দেখুন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যদি বলেন যে, হযরত মানুষ বৈ আর কিছু নন, তবে সেখানেই হইবে তাঁহার গলৎ। একজন রাখাল বালকের হাতে যদি একখানি খরধার তরবারি দেওয়া যায়, তবে সে তাই দিয়া ঘাস কাটিবে, লাঠি চাঁচিবে, আম ছুলিবে, গর্ত খুঁড়িবে—ইত্যাদি ভাবে তাঁহার জীবনের ছোটখাটো অভাব-গুলি সে মিটাইয়া লইবে; কিন্তু তাই বলিয়া তরবারির সত্য পরিচয় তো ইহা নয়। উপযুক্ত সৈনিকের হাতে পড়িলে উহাই দিয়া সে উৎপীড়িতকে রক্ষা করিবে বা দেশ জয় করিবে। তরবারির এই পরিচয় রাখালের নিকট অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু সে জোর করিয়া বলিতে পারে না যে, তরবারির কাজ শুধু ঘাস কাটা। একই সূর্যের আলোকে ভিখারী শীত নিবারণ করি-তেছে, গৃহিণী ধান শুকাইতেছে, তরুলতা নিজেদের জীবনী-শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া কত গবেষণা করিতেছে, শিল্পী তাহার সাহায্যে আলোকচিত্র ফুটাইয়া তুলিতেছে, ডাক্তার তাহার মধ্য হইতে রোগ নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে, কবি-দার্শনিক তাহার মধ্য আল্লার মহিমা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছে, আবার হিংস্র পশুর দল সেই আলোকেই ভয় করিয়া বিজন বনে আত্মগোপন করিতেছে। হযরত মুহম্মদ ঠিক এই সূর্যরশ্মির মত। যাহার যেরূপ প্রয়োজন সে তাহার মধ্যে তাহাই পাইবে।

জিন্-ফিরিশ্‌তা বা অন্যান্য অশরীরী প্রাণীদিগেরও তিনি যে আদর্শ ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা কুরআন-হাদিস হইতেই পাই। কুরআন বলিতেছে:

"বল (হে মুহম্মদ), ইহা (কুরআন) আমার কাছে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহা একদল জিন্ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিল: নিশ্চয়ই আমরা এক অপূর্ব কালাম শ্রবণ করিলাম। উহা সত্য পথে চালিত কর; কাজেই আমরা উহাকে বিশ্বাস করি এবং আমরা আমাদের প্রভুর পার্শ্বে আর কাহাকেও স্থাপন করি না।" —(২৭ : ১-২)

হযরত নিজেও বলিতেছেন :

"ইন্না কাফ্ ফাতাল্লিন্নাসে ফা আরসালাহু ইলালজিন্নি ওয়াল ইনসে।" —(দারিমী)

অর্থাৎ : তাঁহাকে (হযরতকে) জিন্ এবং মানুষ উভয়ের জন্যই পাঠান হইয়াছে।

ফিরিশ্তারা যে হযরতের অনুরক্ত ভক্ত ছিল, তাহা বহুভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি তাহাদের দ্বারা আল্লাহ্ আদমকে সিজদা পর্যন্ত করাইয়াছেন। আদম সম্বন্ধেই যখন এই, তখন হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে তো কথাই নাই।

শুধু জিন্-ফিরিশ্তা নয়, সমস্ত পয়গম্বরও হযরত মুহম্মদকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আবার পশুপক্ষী, তরুলতা, চাঁদসূর্য, মেঘবিদ্যুৎ ইত্যাদি সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকেই হযরতকে আদর্শ জ্ঞানে তাজিম করিত, তাহারও প্রমাণ আছে। মেঘ যে তাঁহাকে ছায়া দান করিয়া গিয়াছিল, শুষ্ক তরুশাখা যে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল; চাঁদ যে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল, অগ্নি যে নিবিয়া গিয়াছিল, মূর্তি যে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই—স্বাভাবিকভাবেই ইহা হইয়াছিল। কেন? তাহা বলিতেছি :

হাদিস শরীফ হইতে জানা যায়—হযরত বলিতেছেন :

"কুল্লু মওলুদুন ইউলাদো আলাল্ ফিৎরাতে।"

অর্থাৎ : প্রত্যেকেই স্বভাবের উপর সৃষ্ট হইয়াছে।

এই স্বভাবের (Nature) স্বভাব কী? স্বভাবের স্বভাব হইতে ছে আল্লার হুকুমে চালিত হওয়া অর্থাৎ আল্লার ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসম
পীর-পয়গম্বর, আলি-আল্লাহ্ বা গওস-কুতব আল্লারই নিয়োজিত দূত বিশে' ; আল্লার শক্তিতে শক্তিমান হইয়াই তাঁহারা আসেন। কাজেই ইচ্ছা করিলে তাঁহারা (আল্লার অনুগ্রহে) স্বভাবকে আয় করিতে পারেন। যেহেতু

স্বভাব আল্লাকে মানিতে বাধ্য, কাজেই পয়গম্বরদিগকে মানিতেও সে বাধ্য।

হযরতকে এইরূপ সর্বব্যাপী আদর্শ হইতে হইয়াছিল বলিয়াই আমরা তাঁহাকে বহু রূপে দেখিতে পাই। শুধু প্রথম শ্রেণীর নীতিপূর্ণ ঘটনাবলী দ্বারাই তাঁহার জীবন গঠিত হয় নাই! মানুষের বাস্তব জীবনে প্রতিদিন যাহা ঘটে—হাসি-কান্না, দ্বন্দ্ব-কোলাহল, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্যচালনা—সবকিছুর আদর্শই আছে হযরতের জীবনে! শুধু অলৌকিক বা আভিজাত্যপূর্ণ ঘটনা দ্বারাই যদি তাঁহার জীবন গঠিত হইত, তবে তিনি চিরদিন আমাদের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া থাকিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা তিনি হইয়া যাইতেন 'দেবতা', মানুষ তাঁহার দিকে শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকাইয়াই থাকিত, বন্ধু বলিয়া হাত ধরিয়া আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া বসাইতে পারিত না, অথবা তাঁহার নিকট হইতে কোন-কিছু গ্রহণ করিবারও ভরসা পাইত না। এই জন্যই হযরতকে আল্লার দূত হইয়াও মাটির মানুষ হইতে হইয়াছে। ইহাতে মানুষেরই পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেহ যেন মনে না করেন যে, হযরত আমাদের মতই সাধারণ মানুষ ছিলেন। অনেকে ওই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই আয়াতটির উল্লেখ করেন :

"কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিস্‌লুকুম ইউহা এলাইয়া।"
অর্থাৎ "বল, আমি তোমারই মত মানুষ যাহার উপর অহি নাযিল হয়।"

এই আয়াত দ্বারা এ কথা বলা হয় নাই যে, হযরত আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। যাঁহারা এই অর্থ করেন, তাঁহারা উপরোক্ত আয়াতটির দুইটি অংশ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করেন, তাই এই ভুল হয়। উহা একটি মিশ্র বাক্য; অখণ্ডরূপে ইহার অর্থ করিতে হইবে। "আমি তোমাদের মতই মানুষ। আমার উপর অহি নাযিল হয়।"—এরূপ করিলে চলিবে না। "আমি তোমার মতই মানুষ যাহার উপর অহি নাযিল হয়"—ইহাই হইবে উহার প্রকৃত অর্থ। "যাহার উপর অহি নাযিল হয়" এই অংশটুকু "মানুষ" শব্দের বিশেষণজ্ঞাপক। অতএব, বাক্যটির অর্থ প্রকারান্তরে এইরূপ দাঁড়ায় : "আমি একজন 'অহি-নাযিল' হওয়া মানুষ।" 'অহি-নাযিল-হওয়া'

মানুষ নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক, কারণ সাধারণ মানুষের উপর অহি নাযিল হয় না।

হযরত যে আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন :

"লাস্‌তো কা আহাদিকুম ইন্নি আবিতো ইনদা রাব্বি ইউৎমিনি অ ইউস্‌কিনি।"

অর্থাৎ : "(হযরত বলিতেছেন) আমি তোমাদের কাহারও মত নই, আমি আমার প্রভুর সান্নিধ্যে রাত্রি যাপন করি, তিনি আমাকে পানাহার করান।"

ইহাই যখন হযরতের সত্যরূপ তখন কেমন করিয়া তাঁহাকে আমরা শুধুই 'আমাদের মত' মানুষ বলিতে পারি? জাতে (genus) তিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অতিমানুষ (Superman) বা পূর্ণ মানুষ (ইন্‌সান্‌-ই-কামিল)।

শেষোক্ত অর্থে হযরতকে আমরা অতিমানুষ নাও বলিতে পারি। মানুষকে ছোট করিলেই অতিমানুষকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কুর-আনের নির্দেশ অনুসারে মানুষ সংজ্ঞা নির্ণয় করিলে আর এই অতিমানবতা দাঁড়াইতে পারে না। আল্লাহ্ বলিতেছেন : মানুষ হইতেছে 'আশরাফুল্‌-মাখ্‌লুকাৎ' অর্থাৎ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। জিন্‌-ফিরিশ্‌তা, চন্দ্রসূর্য—সবকিছুর অপেক্ষা মানুষ বড়। মানুষ আল্লার খলিফা, অন্য কথায় আল্লার নীচেই মানুষের স্থান। সেই মানুষের মধ্যেই হযরত হইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। এরূপ ধরিলে হযরতকে আর অতিমানব বলিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। তখন যুক্তিধারা এইরূপ দাঁড়ায় :—

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ,
মানুষের মধ্যে হযরত মুহম্মদ শ্রেষ্ঠ;
অতএব, হযরত মুহম্মদ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ।

এই হিসাবে হযরতকে মানুষ বলিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। যদি আমরা স্বীকার করি যে, মানুষের ভিতর অসীম শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনা লুক্কায়িত রহিয়াছে; তবে এ কথা সহজেই বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদ যাহা-যাহা করিয়াছেন, তাহা সমস্ত মানবীয় আবেষ্টনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যাহাকে আমরা মো'জেজা বা অলৌকিক বলি, অস্বাভাবিক বা অতি প্রাকৃতিক বলি, তাহাও আর তখন মানব-গণ্ডীর বাহিরে পড়িয়া থাকে না। তখন অতি-মানবতাকেও মানবতার আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়।

শুধু ইহজগতে নয়, পরজগতেও হযরত মুহম্মদ নেতৃত্ব করিবেন। মহা-বিচারের দিন মানুষের মুক্তির জন্য অন্য কোন পয়গম্বরের সুপারিশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, সে ক্ষমতা থাকিবে শুধু হযরত মুহম্মদের। এ সম্বন্ধে কুরআন বলিতেছে :

> "তিনি (আল্লাহ্) জানেন তাঁহাদের (পয়গম্বরদিগের) সম্মুখে এবং পশ্চাতে কী আছে এবং তাঁহারা শাফায়াৎ করিতে পারিবেন না।—কেবলমাত্র একজন ছাড়া যাঁহাকে আল্লাহ্ মনোনীত করিয়াছেন এবং তাঁহার (আল্লার) ভয়ে তাঁহারা কাঁপিতে থাকিবেন।"
> —(২১ : ২৮)

অন্যত্র :

> "এবং যাঁহাদিগকে তাহারা (মানুষেরা) ডাকিবে, তাঁহারা কেহই শাফায়াৎ করিতে পারিবে না—কেবল তিনিই পারিবেন যিনি সত্যের সাক্ষী এবং তাহারা তাঁহাকে চিনে।"
> —(৪৩ : ৮৬)

হাদিস শরীফেও অবিকল এই কথারই প্রতিধ্বনি আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি হাদিস এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

আনাস বলিতেছেন :

"রসুলুল্লাহ্ বলিয়াছেন : রোজ-কিয়ামতের দিন ভালমন্দ লোকসমূহ একত্রে মিশ্রিত থাকিবে। তাহারা প্রথমতঃ হযরত আদমের নিকট গিয়া বলিবে : আমাদের জন্য আল্লার কাছে সুপারিশ করুন। আদম বলিবেন : আমি এ কার্যের যোগ্য নই, তোমরা ইব্রাহিমের নিকট যাও। ইব্রাহিম বলিবেন : আমি ইহা পারিব না, মুসার কাছে যাও। মুসা বলিবেন : আমি অক্ষম, ঈসার কাছে যাও। ঈসা বলিবেন : আমি পারিব না, তোমরা মুহম্মদের কাছে যাও। (প্রত্যেকেই আত্মকৃত ত্রুটির কথা চিন্তা করিয়া শরমেন্দা হইয়া পড়িবেন।) তখন সকলে আমার নিকট আসিবে। আমি বলিব : ইন্‌শা আল্লাহ্ আমি ইহা পারিব। তখন আল্লার অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং যেরূপ তিনি শিক্ষা দিয়াছেন, সেইরূপভাবে সিজদায় থাকিব। তখন আল্লাহ্ বলিবেন : হে মুহম্মদ, ওঠ, তোমার কী

প্রার্থনা, বল। আমি বলিব: হে প্রভু আমার উম্মতের কী হইবে? আল্লাহ্ বলিবেন: যাও, যাহাদের অন্তরে একটি যব-পরিমাণ ঈমানও আছে, তাহাদিগকে বাছিয়া লইয়া যাও। আমি তাহাই করিব। অতঃপর পুনরায় আসিয়া পূর্ববৎ আল্লার সমীপে সিজদা করিব। আল্লাহ্ বলিবেন: তোমার আরয কী, বল, আমি মঞ্জুর করিব। তখন আমি বলিব: হে প্রভু, আমার উম্মৎ! ইহাতে আল্লাহ্ বলিবেন: যাও। যাহাদের অন্তরে শস্যকণা-পরিমাণ ঈমানও আছে, তাহাদিগকে লইয়া যাও। আমি তাহাই করিব (এইরূপে) হযরত মুহম্মদ বারে বারে সুপারিশ করিয়া যাহারা শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রসুলুল্লাহ্'—এইটুকু বলিয়াছে, তাহাদিগকেও তিনি দোযখের আগুন হইতে বাঁচাইয়া বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন।" —(মেশকাত)

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি: ইহলোকে-পরলোকে, জড়-জগতে জগতে, আধ্যাত্মিক জগতে, মানুষ বেশে, পয়গম্বর বেশে, সর্বক্ষেত্রেই এবং সর্ব অবস্থাতেই হযরত মুহম্মদ কুল্‌মাখলুকের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

পরিপূর্ণতার খাতিরেই তাঁহাকে এমন সর্বব্যাপী হইতে হইয়াছে। পূর্ণ আদর্শ যিনি হইবেন, তাঁহাকে সকলের ডাকেই সাড়া দিতে হয়, সকলের জিজ্ঞাসারই জবাব দিতে হয়, সকলের কাছেই ধরা দিতে হয়।

হযরতের জীবন তাই মধ্যদিনের সূর্যালোকের ন্যায় একেবারে সুস্পষ্ট। ইহার কোনখানে কোন হেঁয়ালী নাই, অস্পষ্টতা নাই, অনুমানের বা কল্পনার অবসর নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনে যাহা কিছু ঘটে সমস্তই তাঁহার মধ্যে আছে। শিশু জন্মিলে কী করিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহাকে লালনপালন করিতে হইবে, শিক্ষা দিতে হইবে, কেমন করিয়া সে মাতাপিতা ও অন্যান্য গুরুজনকে ভক্তি করিবে, কেমন করিয়া সে বিবাহ করিবে, কেমন করিয়া ঘর-সংসার পাতিবে, কেমন করিয়া ধর্মকর্ম করিবে, কেমন করিয়া খাইবে, পরিবে, শুইবে, বসিবে—সর্ববিষয়ের আদর্শই তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

শুধু মানুষের বাহিরের দিক নয়, ভিতরের দিক দিয়াও আমরা সেখানে নিরাশ হই না। মানুষের দাম্পত্য জীবনের যে অংশ অতি গোপন, সেখানেও হযরত আমাদের আদর্শ। তাঁহার সেই গোপন অংশেরও বিবরণ আমরা জানি এবং সেখানেও তাঁহার সহিত নিজদিগকে মিলাইয়া লইতে পারি। এই সুস্পষ্টতা শ্রেষ্ঠত্বেরই লক্ষণ, সন্দেহ নাই। অন্যান্য পয়গম্বরদিগের

সহিত হজরতের পার্থক্য এইখানে। এ-জীবনের কোনখানে কোন তিলিসমাতের খেলা নাই, খানিকটা দেখাইয়া খানিকটা লুকাইয়া দর্শকবৃন্দকে সম্মোহিত করিয়া রাখিবার প্রয়াস নাই। জীবনের সবখানি উন্মুক্ত করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে; যাহার যেখানে খুশি, দেখুক এবং শিখুক। কোন বস্তু সম্পূর্ণরূপে আদর্শস্থানীয় বা নিখুঁৎ না হইলে দিবারাত্রি এরূপভাবে খোলা যায়গায় লোকচক্ষুর সম্মুখে ফেলিয়া রাখা সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ হযরত মুহম্মদ সত্যই এক অপরূপ সৃষ্টি। আল্লাহ্ তাঁহাকে বিশ্বনিখিলের জন্য পরিপূর্ণ বাস্তব আদর্শ রূপে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য কুরআন শরীফে মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়; কিন্তু সে ভাবগতভাবে, বস্তুগতভাবে নয়। শুধু মুখে উপদেশ দিলে কাজ হয় না; আদর্শও দেখাইয়া দিতে হয়। রাসায়নিক যেমন শিক্ষার্থীদিগকে তাঁহার বক্তব্য বলিয়া অবশেষে হাতে-কলমেও (demonstration) দেখাইয়া দেন, হযরত মুহম্মদের মধ্য দিয়াও আল্লাহ্ ঠিক তাহাই করিয়াছেন। আল্লাহ্ যাহা কুরআন বলিয়াছেন, হযরতের জীবনের মধ্যে তাহার বাস্তব রূপও দেখাইয়া দিয়াছেন। হযরত মুহম্মদ তাই আমাদের মূর্তিমান কুরআন।

সর্বধর্মের প্রতি উদারতায়

হযরতের জীবনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে: সর্বধর্মের প্রতি তাঁহার উদারতা। এই দুনিয়ায় কত ধর্ম কত জাতিই না আছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হইতে স্বতন্ত্র। ইসলামের সহিত তাহাদের কোনটিরই প্রায় কোন মিল নাই, কারণ ইসলাম হইতেছে বিশুদ্ধ তৌহিদবাদ: অথচ অন্যান্য সব ধর্মই অল্প-বিস্তর পৌত্তলিকতায় বা নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ইসলাম একেবারে শান্ত ও শান্তিকামী। প্রকৃত মুসলমান হইতে হইলে পূর্ববর্তী নবী-রসুলদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে ইহা কুরআনের আদেশ। বিশ্বাসীদিগের সংজ্ঞা দিতে গিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন:

"বল, আমরা আল্লাতে বিশ্বাস করি এবং যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের প্রতি এবং অন্যান্য গোত্রের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা ঈসার প্রতি অবতীর্ণ

হইয়াছে এবং যাহা (অন্যান্য) পয়গম্বরদিগের প্রতি তাঁহাদের প্রভুর তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে ; আমরা তাহাদের কাহারও ভিতরে কোন ভেদাভেদ করি না এবং আল্লার প্রতিই আমরা আত্মসমর্পণ করি।"

—(২ : ১৩৬)

অন্যত্র :

"এবং যাহারা তোমার প্রতি (হযরত মুহম্মদের প্রতি) যাহা (যে ঐশী গ্রন্থ) অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে ; তাহাদের পরকাল সম্বন্ধে কোন ভয় নাই।"

—(২ : ৪)

অন্যত্র :

"আল্লার রসুল তাঁহার উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাসীরাও ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস করে ; তাঁহারা সকলেই আল্লাকে, তাঁহার ফিরিশ্‌তাদিগকে, তাঁহার কিতাবসমূহকে এবং তাঁহার পয়গম্বরদিগকে বিশ্বাস করে।" —(২ : ২৮৫)

ইহাই হইতেছে কুরআনের শিক্ষা। আল্লাহ্‌তালা আরও বলিতেছেন :

"এমন কোন জাতি নাই—যেখানে আমি আমার সতর্ককারী পাঠাই নাই।" —(৩৫ : ২৪)

অন্যত্র বলিতেছেন :

"এবং প্রত্যেক জাতিরই এক একজন পয়গম্বর ছিল।"

—(১০ : ৪৭)

তাহা হইলে আল্লার কথার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, সর্বদেশে এবং সর্বজাতির মধ্যে কোন-না-কোন পয়গম্বর আসিয়াছেন। কাজেই ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যেও পয়গম্বর আসিবার কথা। তাহা যদি হয়, তবে ব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, প্রভৃতি মহাপুরুষেরা (অথবা অন্য কেহ) পয়গম্বর হইলেও হইতে পারেন। আর পয়গম্বর হইলেই কুরআনের শিক্ষা অনুসারে মুসলমান তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য।

ধর্মনীতি হিসাবে ইসলামের এই বিধান কত উদার, কত সহনশীল। বস্তুত ইসলামের ধাতুগত অর্থই হইতেছে 'শান্তি'। সকল বিরোধ ও বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয় করিয়া শান্তিতে বাস করাই হইতেছে তাহার লক্ষ্য।

ধর্মপ্রচারে যে বলপ্রয়োগ নাই, আল্লাহ্ তাহাও বলিয়া দিয়াছেন : ধর্মপ্রচারে বলপ্রয়োগ নাই। নিশ্চয়ই সত্য মিথ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।"

—(২ : ২২৫)

"(হে মুহম্মদ, কাফিরদিগকে বল) তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে।"

এমন কি পৌত্তলিকদিগের আরাধ্য দেবদেবীদিগের পর্যন্ত গালাগালি দিতে আল্লাহ্ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন :

"এবং তাহারা (পৌত্তলিকেরা) আল্লার পার্শ্বে যে-সমস্ত দেবতাদিগকে স্থাপন করিয়া পূজা করে, তাহাদিগকে গালাগালি দিও না।"

—(৮ : ১০৯)

উপরের উদ্ধৃতি হইতে এই কথাই বুঝা যাইতেছে যে, প্রকৃত মুসলমান হইতে হইলে আপন আদর্শকে বজায় রাখিয়া, অথচ অপরের ধর্ম ও সংস্কারকে অশ্রদ্ধা না করিয়া চলিতে হইবে এবং পরস্পরের প্রতি সহনশীল হইয়া শান্তিতে বাস করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, হযরত মুহম্মদ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে ঠিক এই আদর্শই পালন করিয়া গিয়াছেন। মক্কা হইতে হিযরৎ করিয়া তিনি যখন মদিনায় যান, তখন তিনি মদিনার ইহুদী ও পৌত্তলিকদের সহিত সন্ধি করিয়া যে-সনদ দিয়াছিলেন, তাহাতে এই আদর্শই প্রতিফলিত ছিল। পৌত্তলিক তায়েফ-বাসীদিগের প্রতিনিধিগণ যখন মদিনায় হযরতের নিকট উপস্থিত হন, তখন তাঁহাদিগকে মদিনার মসজিদ-প্রাংগণে স্থান দিয়াছিলেন। আবার নজরানের খৃষ্টানদিগের এক প্রতিনিধিসংঘ যখন মদিনায় আসেন, তখন হযরত তাঁহাদিগকে সান্ধ্য উপাসনার জন্য মদিনা-মসজিদেই স্থান দান করেন, একই ছাদের নীচে একই সময়ে খৃষ্টানেরা পূর্বদিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিতে থাকেন, মুসলমানেরা হযরতের পিছনে দাঁড়াইয়া কা'বা-শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে থাকেন। পরধর্মের প্রতি এতবড় উদারতা সত্যই বিরল নহে কি? ভিন্ন ধর্মের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার বিধান বা দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে ইহাই প্রথম। হযরত মুহম্মদের পূর্বে অন্য কোন ধর্মপ্রচারকের মধ্যে এই আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

বিধর্মীদিগের সহিত ব্যবহারে

বিধর্মীদিগের সহিত হযরতের ব্যবহার ছিল একেবারে অনবদ্য। এমন উদার মনোভাব কোন মহাপুরুষের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই না। ইসলামের বিরোধী জানিয়াও তিনি কোনদিন কোন লোককে অযথা তিরস্কার করেন নাই, ঘৃণা করেন নাই বা শাস্তি দেন নাই। অবিশ্বাসী কোরেশ-ইহুদী-খৃষ্টান-পারসিক প্রভৃতি কাহারও প্রতিই তাঁহার জাতক্রোধ ছিল না। ইসলাম সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে: 'কাফির' হইলেই মুসলমানদিগের নিকট তাহাদের আর রক্ষা থাকিত না; 'কাফির' দেখিলেই তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিত। বলা বাহুল্য, এ প্রবাদের মূলে কোন সত্য নাই। কাফির কাহাকে বলে, তাহা জানিলে এই ভ্রান্ত ধারণা তৎক্ষণাৎ সকলের মন হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

কাফিরের অর্থ হইতেছে অবিশ্বাসী। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রসুলুল্লাহ্"—এই কলেমাই হইতেছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্ণয়ের মাপকাঠি। যাহারা এই কলেমা ও তাহার ভাবপুষ্ট জীবনাদর্শে কার্যতঃ বিশ্বাস করে, তাহারাই মুমিন, যাহারা তাহা করে না, তাহারা 'কাফির'। মানব জাতির এ দুই প্রশস্ত শ্রেণী-বিভাগ। মুমিন হইলেই যে সব সময়ে সে ভাল কাজ করিবে, আর কাফির হইলেই যে মন্দ কাজ করিবে, তাহাও নহে। মুমিন হইয়াও সে কাজ মন্দ করিতে পারে, কাফির হইয়াও সে ভাল কাজ করিতে পারে, এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্যের ফল ভোগ করিবে, ইহাই ইসলামের বিধান। কাফির বা মুনাফিক হইলেই যে মুসলমান তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, তাহাও নহে। দুনিয়ার কাজকর্ম কাফিরের সঙ্গেও করা চলে। খাজরাজ-নেতা আব্দুল্লাহ্-বিন-উবাই হযরতের সহিত অনেক মুনাফিকি করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত কোনদিন তাঁহাকে কাফিররূপে বর্জন করেন নাই। তিনি মারা গেলে হযরত তাঁহার কাফনের জন্য নিজের উত্তরীয় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার জানাজা-কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্যও আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। হযরতের পিতৃব্য আবুতালিব কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু হযরত তাঁহাকে সেই কারণে কখনও অশ্রদ্ধা দেখান নাই; মৃত্যুকালে তাঁহার জন্যও তিনি আল্লার কাছে

মুনাজাত করিয়াছিলেন।* আপন জামাতা আবুল আ'স যতদিন বিধর্মী ছিলেন ততদিন হযরত তাঁহার প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করেন নাই। ইহুদী এবং খৃষ্টানদিগের সহিত যে-সব সন্ধি হইয়াছে, অথবা হযরত তাহাদিগকে যে সনদ দান করিয়াছেন, তাহাতেও এ কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে যে, তাহাদের ধর্মে কখনও হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মহামানবতায়

হযরত মুহম্মদের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য: বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মহামানবতার আদর্শ প্রচার। শুধু আরববাসীদিগের জন্যই তিনি আসেন নাই, শুধু মুসলমানদিগের মধ্যেই তিনি একতা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক মিলন প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। ধর্ম, জাতি এবং দেশ বিভিন্ন হইলেও সকল মানুষই যে মূলতঃ এক পরিবারভুক্ত, সকলেরই উৎসমুখ যে সকল মানুষেরই অন্তরে যে একটা নিগূঢ় আত্মীয়তার যোগসূত্র আছে এবং তাহারা যে পরস্পর ভাই ভাই এ কথা দুনিয়ার একজন মহাপুরুষই হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এবং তিনি হইতেছেন মুহম্মদ।

এ-সম্বন্ধে আল্লার বিধানও অত্যন্ত সুস্পষ্ট: কুরআন বলিতেছেন:

"সমস্ত মানবমণ্ডলী এক জাতি।" —(২:২১৩)

অন্যত্র আছে:

"হে লোকসকল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদিগকে একই পুরুষ ও একই নারী হইতে সৃজন করিয়াছি এবং বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত করিয়াছি—যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লার নিকট অধিকতর সম্মানার্হ যিনি অপরের প্রতি নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ!" —(৪৯:১৩)

বস্তুতঃ, ইসলামকে যাহারা একটুও চিনেন তাঁহারা বলিবেন: মহামানবতাই তাঁহার আদর্শ, বিশ্বভ্রাতৃত্বই তাঁহার স্বপ্ন। হিন্দী, আরবী, আফগানী, কাফ্রী, নিগ্রো, চীনা, ইউরোপীয়—বিশ্বের সর্বদেশের সর্বজাতীয় লোককে একত্র করিয়া একই মিলন-সূত্রে আবদ্ধ করিবার মত বিরাট মন এবং পরিকল্পনা জগতে আর কার হইয়াছে? এত বড় শক্তিই বা কার?

* অবশ্য কাফির জানিয়া কাহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করা বা তাহার আত্মার কল্যাণ-প্রার্থনা করা মুসলমানদের পক্ষে জায়েজ নহে। (বোখারী)

ইহা স্বপ্ন নয়, সত্য! আজ পর্যন্ত কা'বা-শরীফে প্রতি বৎসর একবার করিয়া এই মহামিলন সাধিত হয়। পবিত্র হযের দিনে সকলেরই এক ধ্যান এক ধারণা, এক বেশ এক ভূষা, এক বাণী এক লক্ষ্য—সবাই মিলিয়া সেদিন এক। হযরত মুহম্মদের পূর্বে এই বিশ্বমানবতা বোধ একেবারেই অচিন্ত্য ছিল না কি?

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ইসলামের মজ্জাগত। অবশ্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে ইসলামের ধারণা একটু স্বতন্ত্র। যে-অর্থে সাধারণতঃ আমরা এই দুইটি কথাকে বুঝি, ইসলামের ধারণা ঠিক তাহা নয়। কেবলমাত্র ভৌগোলিক হিসাবে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রচালনা করার নামও স্বাধীনতা নয়, অথবা ভোট দ্বারা সভ্য নির্বাচন করার নামও গণতন্ত্র নয়। মানুষের মনোরাজ্যে যেখানে থাকে শত প্রকারের বন্ধন, ছোট-বড়, ইতর-ভদ্রের প্রভেদ, জঘন্য জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, সেখানে গণতন্ত্রের বুলি একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতই মনে হয়। এমন মাথাগণতি গণতন্ত্র, ইসলামের কাম্য নয়। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের গোড়ার কথা হইল ধর্ম ও কর্মে মানুষের সম-অধিকার প্রদান। সব মানুষই সমান এবং সকলেরই ধর্মে-কর্মে সম-অধিকার আছে, এই নীতি গ্রহণ না করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র লাভ করা অসম্ভব। মুক্তি-সাধনার পথে সর্বাগ্রে তাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় আল্লার একত্ববাদকে। আমাদের উৎপত্তি বা উৎসমুখ যে এক, এই কথা না মানিলে মানুষে মানুষে কখনো সমতা আসিতে পারে না। এক-পিতার সন্তানদের মধ্যে যেমন আপনা-আপনি ভ্রাতৃত্ববোধ জন্মে, তেমনি আমরা যদি স্বীকার করি যে, আমাদের সকলের 'রব' এক, তবে আমরাও পরস্পর ভাই ভাই হইতে পারি। ইস্‌লামের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এই সত্য বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌ এক এবং প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার সমান-- ইসলাম এই দুইটি কথাই মানুষকে শিখাইয়াছে। ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য! তাহার কাছে কোন বর্ণ-বৈসম্য নাই; কৌলিন্যপ্রথা নাই। এখানে কর্ম দ্বারা-- সাধনার দ্বারা মানুষকে বড় হইতে হয়, বংশ-মর্যাদা বা জাতিভেদ দ্বারা নয়।

কিন্তু ইহাও ইসলামের স্বাধীনতার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। "Freedom

is our birthright"—স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার—এ ধরণের ভূয়া-কথা ইসলাম বলে না। জন্ম হইতেই আমরা কখনও স্বাধীন নইও, হইতেও পারি না। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই সে তাহার মায়ের সম্পূর্ণ অধীন, বড় হইলে তাহার পারিপার্শ্বিকতার অধীন, প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন—কোন্‌খানে তবে তাহার স্বাধীনতা ? বস্তুতঃ স্বাধীনতার অর্থ তা নয়। কোন নিয়ম নিগড়কে না-মানার নাম স্বাধীনতা নয়—উচ্ছৃংখলতা। প্রকৃত স্বাধীনতা নিয়ম নিগড়ে আবদ্ধ। নৈতিক শৃংখলার অধীন হইয়াই স্বাধীনতাকে চলিতে হয়। ফুলের সৌরভ যেমন পাপড়ি-দলে আবদ্ধ থাকে, মেশ্‌কের খোশবু যেমন মৃগনাভির আধারে বদ্ধ থাকে, স্বাধীনতার পদযুগলও তেমনি থাকে নিয়ম-নীতির স্বর্ণ-শৃংখলে আবদ্ধ। ইসলামের স্বাধীনতা ঠিক এইরূপ। সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং শক্তি লইয়া মানুষ কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না ; পারিলেও তাহাতে বিপদ ঘটে। পরস্পর নির্ভরতা ও সহযোগিতার সেখানে একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামের গণতন্ত্রও একটু স্বতন্ত্র ধরণের। ধর্মে ও কর্মে সে সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছে। একজন দীন ভিখারীও মসজিদে আসিয়া বাদশার পার্শ্বে অথবা অগ্রে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পারে, যে-কোন লোক যে কোন কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারে ; সাধনা দ্বারা যে-কোন দিক দিয়া জগতে বড় হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া ইসলাম স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেয় না। যার-খুশী-যা, সে তাই করিবে বা বলিবে, অথবা কোন গুরুতর ব্যাপারে যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে প্রত্যেকেই মতামত দিয়া একটা অনর্থের সৃষ্টি করিবে, ইসলাম তাহা বলে না। এইরূপ বিকৃত গণতন্ত্রের সে সমর্থক নয়। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবারও তাহার যেমন অধিকার আছে, নেতৃ-আদেশ মানিবারও সেইরূপ কড়া তাগিদ আছে। আধুনিক যুগের উৎকট গণতন্ত্রবাদ ইসলামে নাই।

এ সম্বন্ধে কুরআন বলিতেছে :

"আল্লাহ্‌কে মানো, তাঁহার রসূলকে মানো, এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা নেতৃস্থানীয়, তাহাদিগকে মানো।" —(৪ : ৫৯)

স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিলাম, হযরত মুহম্মদ ঠিক সেই আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন। আল্লার একত্বকে ভিত্তি করিয়া সমস্ত মুসলমানকে তিনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, ধর্মে ও কর্মে

সকলকে সমান অধিকার দান করিয়াছেন, পক্ষান্তরে নেতৃ-আদেশ মানিয়া চলিবার জন্যও ভীষণ তাগিদ দিয়াছেন। যিনি নেতা হইবেন, আমীরুল-মু'মিনীন হইবেন, তাঁহার হুকুম পালন করিতেই হইবে। সেখানে কোন ভিন্নগোঠ সৃষ্টি করিলে চলিবে না। হযরতের ব্যক্তিগত জীবনেই এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন নেতা, ভক্তবৃন্দের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার তিনি দিয়াছিলেন, অনেক সময় তাঁহারা কোন কোন কার্যে হযরতের কথার প্রতিবাদও করিয়াছেন, কিন্তু একবার তিনি যেই কোন একটি আদেশ দিয়াছেন অমনি সকলেই তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন :

ক্রীতদাস জায়েদ। হযরত তাহাকে মুক্তি দিয়া স্বাধীন মানুষের মর্যাদা দিলেন। তাহাকে তিনি আপন পুত্রের মত লালন-পালন করিলেন, নিজ ফুফাতো বোনের সহিত বিবাহ দিলেন, অবশেষে তাহাকে মুতা-অভিযানে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। অনেক সাহাবা ইহাতে আপত্তি তুলিলেন, কিন্তু হযরত তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া সেই আপন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন, অমনি সমস্ত মুসলমান সেই ক্রীতদাস সেনাপতির অধীনেই অম্লানবদনে যুদ্ধ করিতে চলিলেন। এমন কি আবুবকর, আলি, ওমর প্রভৃতির মত বিশিষ্ট ব্যক্তি—যাঁহারা হযরতের মৃত্যুর পরে মুসলিম-জগতের খলিফা হইয়াছিলেন—তাঁহারাও জায়েদের অধীনে সাধারণ সৈনিকবেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ক্রীতদাস কুতুবুদ্দীন যে ভারতের সর্বপ্রথম মুসলমান সম্রাট হইয়াছিলেন তাহাতেও কোন মুসলমানই কোনরূপ আপত্তি করে নাই।

ইহাই ইসলামের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বরূপ। মানুষের আভ্যন্তরীণ ব্যক্তি-স্বাধীনতাই তাহার প্রধান লক্ষ্য।

এখানে কেহ যেন মনে না করেন: তবে কি ইসলামের জন্য রাষ্ট্র-স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই? নিশ্চয়ই আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইসলামের যাবতীয় ধ্যান-ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে হইলে তাহার পশ্চাতে চাই শক্তির সাধনা। কাজেই রাষ্ট্র-স্বাধীনতাও তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্র-স্বাধীনতা না থাকিলে অনেক সময় ধর্ম-স্বাধীনতার অস্তিত্বই থাকে না; ইসলামে রাষ্ট্র ও ধর্ম তাই একসঙ্গে বাঁধা।

নারীজাতির উন্নয়ন

হযরতের অন্যতম প্রধান সংস্কার : নারীজাতির মর্যাদা ও মূল্যদান। নারীকে দিয়াছেন তিনি কল্যাণময়ী, মহিমময়ী, পুণ্যময়ীর রূপ। হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে জগতের সর্বত্র নারীকে অস্থাবর সম্পত্তির মতই মনে করা হইত। কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মিশর, কি আরব, কি ইউরোপ— কোথাও নারীর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। নারীকে দাসীর মতই মনে করা হইত এবং তাহাকে লইয়া যদৃচ্ছ ব্যবহার করা চলিত। এমন কি সভ্যতার প্রাচীন লীলাভূমি ভারতবর্ষেও নারীর পদমর্যাদা খুব উন্নত ছিল না। বৈদিক যুগে কোন কোন বিষয়ে নারীর অধিকার থাকিলেও সাধারণতঃ তাঁহারা পুরুষের কৃপার পাত্রীরূপেই পরিগণিত হইতেন। সে যুগে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বেদবাণী' হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

> "বৈদিক যুগে বিবাহ ধর্মানুষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছিল। বৈদিক যুগে বাল্যবিবাহ হইত না বোধ হয়, কারণ বিবাহের সম্পর্কে পরিণতবয়স্ক যুবক-যুবতীর উল্লেখই বারংবার পাওয়া যায়। বহু যুবতীর বিবাহ হইত না, তাহারা কুমারী অবস্থাতেই পিতৃগৃহে থাকিত। বিকলাংগ কন্যাদের বিবাহ হইত না। বিবাহ হইয়া গেলে কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে আর অধিকার থাকিত না। এইজন্য কন্যার ভ্রাতারা ভগিনীর বিবাহ দিতে চেষ্টিত থাকিত।— বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। বিধবা প্রায়ই স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করিত। এজন্য স্বামীর ভ্রাতার নাম হইয়াছিল দেবর (দ্বিতীয় বর)। পুরুষেরা বহু-বিবাহ করিত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ব্যভিচারই নিন্দনীয় ছিল। কন্যা হরণ করিয়াও বীরগণ বিবাহ করিত।…বিধবা হইলে পত্নী পতির চিতায় শয়ন করিয়া, দেবরের আহ্বানে উঠিয়া আসিত ও পতির শব দাহ করিত।"
>
> —(বেদবাণী, ৩২৪-৩২৭)

ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, ভারতীয় নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রম খুব বেশী ছিল না ; নানাভাবে তাহারা লাঞ্ছনা ভোগ করিত। অবশ্য গার্গী, উভয়ভারতী, সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি মহিমময়ী ও বিদুষী নারীও যে ছিলেন না, তাহা নহে ; তবে সাধারণতঃ নারীজাতির অবস্থা খুব উন্নত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

নারীর এই লাঞ্ছনা চরমে উঠিয়াছিল খৃষ্টানদের হাতে। নারী যে চির-অভিশপ্ত, নারীই যে সকল পাপ ও সকল অকল্যাণের মূল, ইহা শুধু সংস্কার নহে—ইহা তাহাদের কর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা বলে: Adam (আদম) এবং Eve (হাওয়া) যখন স্বর্গে ছিলেন, তখন Eve-ই শয়তানের প্ররোচনায় প্রথম মুগ্ধ হন, তারপর আল্লার আদেশ লংঘন করিয়া নিজে জ্ঞান-বৃক্ষের (Tree of Knowledge) ফল ভক্ষণ করেন এবং Adam-কে দিয়াও ভক্ষণ করান।* সেই পাপের জন্যই আল্লাহ্ Adam এবং Eve-কে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দুনিয়ায় পাঠাইয়া দেন। Adam-এর এই পতনে সমগ্র মানব-জাতির পতন হইয়াছে, আর এই পতনের মূল কারণই হইতেছে Eve—Adam নহে। অন্য কথায়, নারীজাতিই হইতেছে সকল পাপের মূল। এইজন্যই খৃষ্টান পাদ্রীগণ নারীকে "শয়তানের যন্ত্র" (Organ of the devil), "কামড় দিবার জন্য সর্বদা-প্রস্তুত বিচ্ছু" (a scorpion ever ready to sting), "বিষাক্ত বোলতা" (the poisonous ant) ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু মানব-পতনের এই কাহিনী ইসলামের নহে। এই পতনের জন্য ইসলাম বিবি হাওয়াকে কোনদিনই দায়ী করে নাই। এসম্বন্ধে কুরআন বলিতেছে:

"এবং (আমরা বলিলাম) হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই উদ্যানে (স্বর্গোদ্যানে) বাস কর; খুশী মত সব ফল-ফলালি খাও, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না, কারণ তাহা হইলে তোমরা অন্যায়কারীদিগের মধ্যে গণ্য হইবে।"

"কিন্তু তাহাদের ভিতরকার কুপ্রবৃত্তিগুলি যাহাতে বাহির হইয়া আসে, সেই উদ্দেশ্যে সে (শয়তান) বলিল: তোমাদের প্রভু (আল্লাহ্) এই গাছের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন, জানো? তোমরা উভয়ে দুইটি ফিরিশ্‌তা না বনিতে পার অথবা যাহাতে অমর না হইতে পার। এবং সে উভয়ের নিকটেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের হিতৈষী বলিয়াই উপদেশ দিতেছি।"

* "And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree and I did eat."—Genesis : 3.

"তখন সে তাহাদিগকে ধোঁকা দিয়া পতন ঘটাইল ; কাজেই যখন তাহারা সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিল, তাহাদের কুপ্রবৃত্তিগুলি তাহাদের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিল এবং তখন উভয়েই বৃক্ষের পত্রদ্বারা নিজদিগের আচ্ছাদিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তখন তাহাদের প্রভু বলিলেন: আমি কি তোমাদিগকে ঐ বৃক্ষের নিকট যাইতে নিষেধ করি নাই এবং বলি নাই যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?" তাহারা বলিল: "হে আমাদের প্রভু, আমরা নিজেদের প্রতি নিজেরাই অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব।"

—(৭ : ১৯-২৩)

শয়তান যে তাহার কু-প্রস্তাব প্রথমতঃ আদমের নিকটেই করে, এবং আদমই যে প্রথম প্রলুব্ধ হইয়া বিবি হাওয়ার সহিত একত্রে মিলিয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে, কুরআন তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে:

"কিন্তু শয়তান তাহার নিকট (আদমের নিকট) কুপ্রস্তাব করিল, বলিল: হে আদম, আমি কি তোমাকে অমরতা বৃক্ষের কাছে এবং অনন্তকালস্থায়ী একটি রাজ্যে লইয়া যাইব ?"

"তখন তাহারা উভয়েই সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিল, কাজেই তাহাদের কু-প্রবৃত্তিগুলি তাহাদের নয়ন-সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল এবং তাহারা তখন উভয়েই বৃক্ষপত্রের দ্বারা নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। এইরূপে আদম তাহার প্রভুর আজ্ঞা লংঘন করিল এবং তাহার জীবন দুঃখময় হইল।"

—(২০ : ১২০-১২১)

অতএব দেখা যাইতেছে, মানব জাতির এই পতনের জন্য নারী দায়ী নহে। ইসলাম নারীকে এই অপবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। নারীকে সে দিয়াছে এক মহিমময়ীর রূপ। সুখ-দুঃখ সুদিনে-দুর্দিনে নারী যে পুরুষের চিরসঙ্গিনী, এই আদর্শই দেখিতে পাইতেছি আমরা বিবি হাওয়ার মধ্যে। আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর ন্যায়ই তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া বেহেশ্‌ত্‌ হইতে বিদায় লইয়াছেন। এখানে ইস-লাম নারী-পুরুষ দাম্পত্য জীবনের যে মহনীয় চিত্র আঁকিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। এতবড় সর্বনাশের পরও কাহারও প্রতি কেহ অনুযোগ করিতেছে না, বা সে সম্বন্ধে কোন একটি কথাও উঠিতেছে না। স্বামীর অপরাধ

হইলেও হইয়াছে, স্ত্রীর অপরাধ হইলেও হইয়াছে—উভয়েই উভয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুঃখবেদনাকে সমানভাবে ভাগ করিয়া লইয়া পথে বাহির হইতেছে। দাম্পত্য জীবনেই কী পবিত্র ও উজ্জ্বল আদর্শ এ!

ইসলামে নারীর জন্মের যে ইতিহাস আছে, তাহা হইতেও দেখা যাইবে নারী-পুরুষে মূলতঃ কোনই পার্থক নাই; একই উপাদান দ্বারা আল্লাহ্ উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন:

"হে লোকসকল, তোমাদের প্রভুর প্রতি (কর্তব্য সম্বন্ধে) সজাগ হও—যিনি তোমাদিগকে একটি প্রাণী (আদম) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার সংগিনীকে (হাওয়াকে) একই উপাদান হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।" —(৪ : ১)

বিবি হাওয়া যে হযরত আদমের পার্শ্বদেশ হইতে সৃষ্টি হইয়াছিলেন, অন্য কথায় পুরুষ ও নারীর উপাদান যে একই, এ কথাও কুরআনে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে:

"এবং আল্লার একটা নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদের সংগিনীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাতে তোমরা মনের শান্তি পাইতে পার।"

অতএব দেখা যাইতেছে, উৎপত্তির দিক দিয়া ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্যই রাখে নাই—উভয়কেই তুল্য মর্যাদা দান করিয়াছে।

স্ত্রীরূপে নারীর মর্যাদা এবং অধিকার সম্বন্ধে কুরআন কি বলিতেছে দেখুন:

"তাহারা (তোমাদের স্ত্রীগণ) তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরা তাহাদের অঙ্গাবরণ।" —(২ : ১৮৭)

অন্যত্র:

"এবং পুরুষদের উপর তাহাদের ঠিক সেইরূপ ন্যায্য অধিকার আছে—যেমন তাহাদের উপর পুরুষদের আছে।" —(২ : ২২৮)

পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর যে কতখানি অধিকার আছে, সে কথাও এখানে স্মরণীয়। এ সম্বন্ধে ইসলাম নারীকে যাহা দান করিয়াছে, আজ পর্যন্ত অন্য কোন ধর্ম তাহা করিতে পারে নাই।

বিবাহকালীন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর দেনমহর-দানও মুসলিম নারীর সম্ভ্রমের আর একটি দৃষ্টান্ত। ইসলামে শুধু যে পুরুষই স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে

তাহা নহে, স্ত্রীও প্রয়োজন হইলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করাইতে পারে। নারী-জাতির অধিকারের ইহা এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নাই।

নারীদের আত্মা আছে কিনা এবং তাহারা স্বর্গে যাইবার অধিকারী কিনা, ইহা খৃষ্টান জগতে আজও সমস্যার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বহু গবেষণার পর পাদ্রীগণ স্থির করিয়াছেন: স্ত্রীলোকেরা স্বর্গে যাইতে পারিবে বটে, কিন্তু তাহাদের নারীত্বের কোন চিহ্ন থাকিবে না!

ঠিক ইহারই পার্শ্বে ইসলাম কী বলিতেছে দেখুন:

"এবং যে কেহই ন্যায় কার্য করিবে—স্ত্রীই হউক, পুরুষই হউক—এবং যদি সে বিশ্বাসী হয়—স্ত্রীই হউক পুরুষই হউক—তাহারা সকলেই বেহেশ্‌তে যাইবে।" —(৪০: ৪০)

"একই ফল মিলিবে সেথায়
পাবে তারা পবিত্রা সঙ্গিনী
একসাথে তারা সেথা রবে চিরকাল।" —(২: ২৫)

"অনন্তকাল স্থায়ী বেহেশ্‌তের সেই উদ্যান—যেখানে তাহারা (পুণ্যবানেরা) প্রবেশ করিবে তাহাদের সৎকার্যশীল মাতাপিতার সহিত এবং তাহাদের স্ত্রীদিগের সহিত এবং পুত্রকন্যাদিগের সহিত এবং ফিরিশ্‌তাগণ প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদের নিকট হাজির হইবে।"
—(১৩: ২৩)

নারীজাতি সম্বন্ধে কুরআনের—তথা হযরত মুহম্মদের—ইহাই হইতেছে অভিমত। হযরত নিজে যে এইসব নির্দেশ সর্বতোভাবে মানিয়া চলিতেন, সে কথা বলাই বাহুল্য: নারীদিগের সম্বন্ধে তিনি নিজে কী বলিতেছেন, দেখুন:

"তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন শাসনকর্তা, কাজেই আল্লাহ্ প্রত্যেককে তাহাদের প্রজাদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। আমির (রাজা) দেশের শাসনকর্তা, পুরুষ তাহার বাড়ির সকলের উপর শাসনকর্তা। স্ত্রী তাহার স্বামীর গৃহের এবং তাহার পুত্রকন্যাদের শাসনকর্তা এবং এই জন্যই তোমাদের প্রত্যেককেই তোমাদের প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।"

"তোমাদের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগের প্রতি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করে।"

"কোন মুসলিম তাহার স্ত্রীকে ঘৃণা করিবে না। সে যদি তাহার স্ত্রীর একটি দোষের জন্য অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আর একটি গুণের জন্য তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকিবে।"

"তোমার স্ত্রীকে সদুপদেশ দাও, ক্রীতদাসীর মত তোমার সম্ভ্রান্ত স্ত্রীকে মারপিট করিও না।"

"তোমরা যখন খাইবে, তোমাদের স্ত্রীদিগকেও খাইতে দিবে। তোমরা যখন নূতন বসন-ভূষণ পরিবে তোমাদের স্ত্রীদিগকেও পরিতে দিবে।"

হযরত শুধু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। নিজের স্ত্রীদিগের প্রতি তিনি এই 'শ্রেষ্ঠ ব্যবহার'ই করিয়া গিয়াছেন। হযরত যখন ২৫ বৎসরের যুবক, তখন তিনি ৪০ বৎসর বয়স্কা বিধবা নারী খাদিজাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর সহিত তিনি ২৫ বৎসর একত্রে বাস করেন। ৬৫ বৎসর বয়সে বিবি খাদিজার মৃত্যু হয়, তখন হযরতের বয়স ৫০ বৎসর। কাজেই বলা যাইতে পারে, জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ তিনি এই বৃদ্ধা স্ত্রীকে লইয়াই কাটাইয়া দেন। তবু কী মধুর সম্বন্ধই না ছিল এই দম্পতি-যুগলের মধ্যে! হযরত যে বিবি খাদিজাকে কত গভীরভাবে ভালবাসিতেন এবং কত যে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন, তাহা এই কথা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বিবি খাদিজার জীবদ্দশায় তিনি অন্য কাহাকেও বিবাহ করেন নাই; ইহার পরেও যে-সমস্ত নারীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার ব্যবহার ছিল একেবারে অনবদ্য। তিনি কাহাকেও নিগ্রহ, কাহাকেও অনুগ্রহ করেন নাই। সকল স্ত্রীর প্রতিই সমান ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।*

অবশ্য হযরত যে নারীকে অবাধ স্বাধীনতা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাও নয়। আদর্শচ্যুত বিকৃতি নারী-প্রগতিকে তিনি কখনও সমর্থন করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন উহা নারীর প্রগতি নহে—অধোগতি। সমাজে যাহাতে দুর্নীতি না ঢুকে, সেজন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দান করিলেও

* হযরতের বহুবিবাহের গূঢ় কারণ এবং উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তাহাকে তাহার স্বামীর অধীন করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিজের ইচ্ছা নয়, স্বয়ং আল্লার বিধান :

"এবং তোমাদের উপর তাহাদের (স্ত্রীদের) ন্যায্য অধিকার আছে, তবে পুরুষ নারীর অপেক্ষা এক ধাপ উর্ধ্বে।" —(২ : ২২৮)

অন্যত্র :

"পুরুষ স্ত্রীদিগের রক্ষাকর্তা, কারণ আল্লাহ্ একজনের অপেক্ষা আর একজনকে (কোন কোন বিষয়ে) শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।"

—(৪ : ৩৪)

বলা বাহুল্য, এই বিধান খুবই সংগত হইয়াছে। পুরুষ নারী অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও শক্তিমান ; কঠোর জীবন-সংগ্রামের জন্য সে উপযোগী। পক্ষান্তরে নারী দয়ামায়া, স্নেহমমতা ও প্রীতিপ্রেমের জীবন্ত মূর্তি। এইজন্য উভয়ের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কাহারও চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যেকের কার্যই মহৎ এবং অপরিহার্য। সৃষ্টির মূলে দেখিতে পাওয়া যায় দুইটি শক্তি : সংরক্ষণ এবং প্রতিপালন (Protection and Preservation)। সংরক্ষণের কার্য পুরুষের, আর প্রতিপালনের কার্য নারীর। সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে হইলে আগে সংরক্ষণের প্রয়োজন। এই হিসাবেই নারী পুরুষের অধীন। অন্যান্য কতকগুলি স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকও নারীকে পুরুষ অপেক্ষা 'একধাপ নীচে' নামাইয়া রাখিয়াছে।

স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা সম্বন্ধেও ইসলাম সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। ইসলামে নারীর অবরোধের ব্যবস্থা নাই সত্য, কিন্তু পর্দার ব্যবস্থা আছে। কুরআন বলিতেছে :

"বিশ্বাসী পুরুষদিগকে বল, তাহারা তাহাদের দৃষ্টি নত করুক এবং গুপ্ত স্থানগুলি আচ্ছাদিত রাখুক ; ইহাই তাহাদের পক্ষে পবিত্রতা ; এবং বিশ্বাসী নারীদিগকেও বল, তাহারাও তাহাদের দৃষ্টি নত করুক এবং গোপনীয় অংশগুলি আবৃত রাখুক এবং যেটুকু না-বাহিরে রাখিলে চলে না সেইটুকু ছাড়া (অর্থাৎ হাত, পা ও মুখ) অন্য কোন অংশের অলংকার প্রদর্শন না করে।" —(২৪ : ৩০-৩১)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলিতেছেন :

"হে রসুল, তোমার স্ত্রী-কন্যাদিগকে এবং বিশ্বাসীদিগের স্ত্রী-কন্যাদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের গায়ের উপর একটি অংগাবরণ

(**over-garment**) দেয়, ইহাই অধিকতর সংগত হইবে কারণ তাহা হইলে লোক তাহাদিগকে (সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বলিয়া চিনিতে পারিবে এবং পীড়া দিবে না)।"

ইহা দ্বারা এ কথা যেন মনে না করেন: তবে আর নারীর স্বাধীনতা রহিল কোথায়? রইল বৈ কি। উচ্ছৃঙ্খলতা বা বাড়াবাড়ি দমন করিলেই যে স্বাধীনতার লোপ হয়, তাহা নহে। মুসলিম নারী অবাধে মসজিদে গিয়া নামায পড়িতে পারে, ঈদ-উৎসবে যোগ দিতে পারে, হজে যাইতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের সেবা করিতে পারে, নিজে যুদ্ধ করিতে পারে, রাজকার্য পরিচালনা করিতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে, জ্ঞানচর্চা করিতে পারে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সে স্বাধীনভাবে বহু কাজ করিতে পারে। সর্বক্ষেত্রেই নারীর প্রবেশাধিকার আছে। ইসলামের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ।

সমাজে যাহাতে ব্যভিচার ও দুর্নীতির প্রসার না হয়, তজ্জন্যও ইসলাম কঠোর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে কুরআনের বিধান দেখুন:

"ব্যভিচারকারিণী এবং ব্যভিচারকারী সম্বন্ধে প্রত্যেককে ১০০টি দোররা (চাবুক) মার এবং কোনরূপ অনুকম্পা-দ্বারা চালিত হইয়া আল্লার বিধান পালনে শৈথিল্য করিও না—যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং রোজকিয়ামতে বিশ্বাস কর, এবং একজন বিশ্বাসীকে তাহাদের শাস্তির সাক্ষী করিয়া রাখ। ব্যভিচারকারী অথবা কোন পৌত্তলিক নারীকে বিবাহ করিবে না এবং ব্যভিচারিণী সম্বন্ধে বিধান এই: যে তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে সে অথবা কোন পৌত্তলিক ছাড়া অন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না; বিশ্বাসীদিগের এ কার্য করা নিষেধ। এবং যাহারা স্বাধীন স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করে, অথচ চারিটি সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে না, তাহাদিগকে ৮০টি চাবুক মার এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না; ইহারাই সীমালঙ্ঘনকারী; শুধু তাহারা ছাড়া—যাহারা অনুতপ্ত হয় এবং ন্যায় কার্য করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং দয়াময়! এবং যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগের (চরিত্র) সম্বন্ধে দোষারোপ করে, কিন্তু নিজে ছাড়া অপর কোন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে না, তাহাদের উভয়ের মধ্যে (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে) একজনের সাক্ষ্য

চারিবার লইতে হইবে ; আল্লাকে সাক্ষী করিয়া তাহাকে বলিতে হইবে যে, সে নিশ্চয়ই সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবার তাহাকে এই বলিতে হইবে যে, আল্লার অভিশাপ যেন তাহার শিরে নামিয়া আসে—যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। এবং তাহার (স্ত্রীর) শাস্তি মাফ হইবে – যদি সে চারিবার আল্লার কসম করিয়া বলে যে সে (পুরুষ) মিথ্যা কথা বলিতেছে। এবং পঞ্চমবার যদি বলে যে আল্লার গজব তাহার (নিজের) উপর পড়িবে যদি পুরুষটি সত্যবাদী হয়।"

—(৩৪ : ২-৯)

আল্লাহ্ এবং রসুলের এই সব বিধান নারীজাতির মর্যাদাকে যে কতদূর বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না। মুসলিম নারীর সহিত একজন অ-মুসলিম নারীর তুলনামূলক সমালোচনা করিলেই তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। এই প্রগতির যুগেও অন্য সমাজে নারী জাতির দুর্গতির অন্ত নাই। পতিতা বা অধঃপতিতা নারীর সংখ্যা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, মুসলিম সমাজে ঐ শ্রেণীর নারী নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ এই যে, মুসলিম সমাজে এই জঘন্য পরিস্থিতি ঘটিবার কোন অবসর নাই। মুসলমান পুরুষ কোন নারীর উপর যত অত্যাচার করুক না কেন, নারীকে কখনও গৃহ বা সমাজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয় না ;—আপন পায়েই সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামে শিক্ষার গুণে কোন পুরুষ কোন নারীকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিবার মত নির্মম হইতেও পারে না, কারণ সে কুরআনের বিধানকে ভয় করে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা তার মজ্জাগত। এমন কি নারী হরণের মত এমন জঘন্য পাপ কার্যের মধ্যেও ইসলাম পথভ্রষ্টদিগকে পুণ্য ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। অ-মুসলমান গুণ্ডা নারীহরণ করিলে সে নিজে তো অধঃপাতে যায়ই, সঙ্গে সঙ্গে অপহৃতা নারীটির সমগ্র জীবনকেও ব্যর্থ করিয়া দেয় ; হতভাগিনীর ইহকাল-পরকাল দুই-ই নষ্ট হইয়া যায়। তার সারাজীবন ধরিয়া বাজে শুধু একটা ব্যর্থতার সুর। মহিমময়ী কুলবধুর মর্যাদা সে কিছুতেই পায় না। কাজেই কোন অমুসলমানের নারীহরণের মধ্যে শুধু থাকে পাপ, শুধু থাকে ছলনা, শুধু থাকে সর্বনাশের পরিকল্পনা। মনুষ্যত্বের নামগন্ধও সেখানে নাই—কোন কল্যাণ-জিজ্ঞাসা নাই—আছে কেবল পশুজীবনের ঘৃণিত সুখভোগের উদগ্র

কামনা। কিন্তু মুসলমানের নারী হরণের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব আছে। পাপপথে নামিলেও পুণ্যের প্রতি তাহার আকর্ষণ আছে। অ-মুসলমান গুণ্ডার মত কিছুতেই সে অপহৃতা নারীকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করে না; সে চায় প্রকাশ্য দিবালোকে সমাজ-জীবনের মধ্যে আনিয়া মানুষের মর্যাদা দিয়া তাহাকে উপভোগ করিতে। বাহিরের সকল ভ্রূকুটি এবং সকল বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া সে যখন কোন পতিতাকে বা কোন অপহৃতা নারীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে গৃহিণীর গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করে, তখন একটা সবল মনুষ্যত্বই তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে। সে নিজেও বাঁচে, নারীটিকেও বাঁচায়। একটা নারীর ব্যর্থ জীবন যখন এইরূপে সার্থকতার ফলপুষ্পে পল্লবিত হইতে দেখি, তখন অন্তরের সকল শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় সেই "গুণ্ডার" পদতলে, আর মনে জাগে সেই মহাপুরুষের শিক্ষা ও আদর্শের কথা—যাঁহার জন্য এমন জঘন্য পাপকার্যের মধ্য দিয়াও এতবড় কল্যাণ সম্ভব হয়।*

মাতৃভক্তিতে

"বেহেশ্‌ত্‌ জননীর চরণ-তলে অবস্থিত"—এই অমর বাণী হযরত মুহম্মদের মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা—ইহা অপেক্ষা আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে কি? মাতাপিতাকে সেবা করিবার সুযোগ তাঁহার জুটে নাই, তবু আপন মৃত জননী এবং দুধ-মা হালিমার প্রতি তিনি যে-ব্যবহার দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। পরিণত বয়সে হযরত একবার বিবি আমিনার সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কবর জিয়ারৎ করিয়াছিলেন এবং নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। দুধ-মা

* এখানে কেহ যেন ভুল না বুঝেন। আমরা এই কথা দ্বারা কিছুতেই নারীহরণ বা গুণ্ডামীকে সমর্থন করিতেছি না। ইসলামে নারীহরণ বা ব্যভিচার মহাপাপ এবং এর জন্য শাস্তিও খুব কঠোর। তা ছাড়া গুণ্ডাদিগের কোন তারতম্য নাই—জাতিভেদ নাই: গুণ্ডা চিরকাল গুণ্ডাই। কোন মুসলিম যদি গুণ্ডামি করে, তবে সে ইসলামের বেইজ্জতি করে। কাজেই সমাজের উচিৎ কঠোর হস্তে গুণ্ডাদিগকে শায়েস্তা করা। গুণ্ডাদিগকে এই তুলনামূলক সমালোচনার মধ্যে পাঠক শুধু ইসলামের কল্যাণরূপই দেখিবেন। গুণ্ডাদিগকে সমর্থন করিবেন না।

হালিমার প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। একবার হালিমা মদিনায় হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, হযরত তখন সভাসদবৃন্দের মধ্যে বসিয়া ছিলেন। হালিমাকে দেখিতে পাইয়াই তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়ান এবং তাঁহার বসিবার জন্য নিজের শিরস্ত্রাণ বিছাইয়া দেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলের নিকট পরিচয় দেন: "ইনি আমার মা।" হালিমা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। হোনায়েনের যুদ্ধে তাঁহার দুধ-বোন শায়েমার খাতিরেই তিনি ৬০০০ বন্দীকে বিনাপণে মুক্তিদান করেন।

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি অন্যান্য যে-সব উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য:

"পিতার সন্তোষই আল্লার সন্তোষ, পিতার অসন্তোষই আল্লার অসন্তোষ।"

মাতাপিতা মারা গেলেই যে তাঁহাদের প্রতি কর্তব্য বা বাধ্যতার শেষ হয়, তাহা নহে। "তাঁহাদের আত্মার মুক্তির জন্য পুত্রকে প্রার্থনা করিতে হইবে, এবং তাঁহাদের নামে দান খয়রাত ও পুণ্যকার্য করিতে হইবে"—ইহাই হযরতের আদেশ।

সাম্য-স্থাপনে

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মানব জাতির এক চিরন্তন অভিশাপ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, প্লেবিয়ান-পৈট্রিসিয়ান, শরীফ-আতরাফ—ইত্যাদি ভাবের নানা বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে। মুষ্টিমেয় কতিপয় উচ্চবর্ণের মানুষ সমাজের কোটী কোটী মানুষকে উপেক্ষিত ও নিগৃহীত করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় মানুষও এমন নির্বোধ যে, উচ্চবর্ণের সেই মনগড়া বিধানকেই যুগযুগান্ত ধরিয়া অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। কে কবে কাহাকে শূদ্র বলিয়া ছাপ মারিয়া দিয়াছে, কে কবে কাহাকে মন্দিরে ঢুকিতে দেয় নাই, কে কবে কাহাকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, আর যায় কোথায়! যুগযুগ ধরিয়া সে তাহাই মানিয়া চলিবে! বুদ্ধির এমন দৈন্য, মনের এমন ভীরুতা আর দেখা যায় না। এই অন্যায় বিধান মানবজাতির প্রগতির পথে মস্ত বড় এক বাধা। ইহারই ফলে কোটী কোটী মানুষ

নিজদিগকে ঘৃণা, অস্পৃশ্য, শক্তিহীন ও অপদার্থ মনে করিয়া ব্যর্থ জীবন লইয়া জগৎ হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। সেই অবজ্ঞাত বিরাট শক্তিকে কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের, জাতির এবং জগতের কী মহাকল্যাণই না সাধিত হইতে পারিত।

মানবাত্মার এই গুরুলাঞ্ছনায় জগতের কয়জন মহাপুরুষের প্রাণ কাঁদিয়াছে? হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য, কোন দেশেই এই অত্যাচারিত পদদলিত মানুষের জন্য কেহ কখনও সত্যকার ব্যথা অনুভব করেন নাই। সব মানুষই যে আল্লার চোখে সমান, সব মানুষেরই ধর্মীয় ও কর্মীয় অধিকার যে সমান, সব মানুষই যে পরস্পর ভাই-ভাই এ কথা শুধু একজন মহাপুরুষই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—তিনি মুহম্মদ। শুধু মুখে বলেন নাই, আপন জীবন দ্বারা কার্যতও দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ইসলামের সাম্য এত সুপরিচিত যে নূতন করিয়া তাহার পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। ভিখারী-সুলতান, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন সকলেই এখানে সমান। কোন শূদ্র-মুসলমান কুরআন পাঠ করিলে কেহ তাহার কর্ণে উত্তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিবে না; কোন পারিয়া-মুসলমান মসজিদে ঢুকিলে কেহ তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিবে না। নামাযের সময় কোন ভিখারী যদি আগে আসিয়া সামনের কাতারে দাঁড়ায় আর তাহার পরে যদি দেশের বাদশাও মসজিদে নামায পড়িতে আসেন, তবু ভিখারীকে আসন ছাড়িয়া পিছনে হটিয়া আসিতে হয় না, সুলতানকেই ভিখারীর পিছনে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে হয়। এক পংক্তিতে বসিয়া সব মুসলমান খানা খাইতে পারে, তাহাতে কাহারও 'জাতি' যায় না। কোন শূদ্র-মুসলমান যদি কোনো ধর্মোৎসব করে, তবে দেশের বাদশা গিয়া নিজ হস্তে তাহার মাথা কাটিয়া আসেন না। সমসূত্রে গ্রথিত ফুলমালার মত ছোটবড় সকল মুসলমানই এক হইয়া প্রকাশ পায়।

মানুষে মানুষে এতবড় সাম্য জগতে আর কোনো ধর্মে নাই।

ক্রীতদাসের মুক্তিদানে

ক্রীতদাস-সমস্যা মানবেতিহাসের এক বড় সমস্যা। হযরত এ সমস্যার যে সমাধান করিয়া গিয়াছেন তাহা একেবারে চূড়ান্ত। এব্রাহিম লিঙ্কন এবং বুকার ওয়াশিংটন দাস-ব্যবসায় তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আজ জগতের

সর্বত্র পূজিত হইতেছেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি : হযরত মুহম্মদ ক্রীত-দাসের সহিত যে-ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে যে-আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক কণাও কি পাশ্চাত্য জগৎ কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে ? দাসপ্রথা তুলিয়া দেওয়াই বড় কথা নয়, বড় কথা হইতেছে দাসত্বকে তুলিয়া দেওয়া। এব্রাহাম লিঙ্কন, অথবা বুকার ওয়াশিংটন কি কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকে আপন পালিত পুত্র করিয়াছেন ? আপন ফুফাতো বোনের সহিত কোন হাবশী দাসকে বিবাহ দিয়াছেন ? একসঙ্গে খানাপিনা করিয়াছেন ? নামায পড়িয়াছেন ? তাহাকে কি কোন যুদ্ধের সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছেন ? অথবা কোন ক্রীতদাসকে কি নিজে বিবাহ করিয়াছেন ? যদি না করিয়া থাকেন, তবে বলিব : এত বড় আড়ম্বরের মধ্যেও লুকাইয়া আছে একটা নিষ্ঠুর ছলনা ও ভণ্ডামী। এর নাম আর যাই-কিছু হউক, মানবপ্রেম নয়। দাসদাসীর ক্রয়বিক্রয় বন্ধ হইলেই দাসদাসীদের মর্যাদা বাড়ে না ; একসঙ্গে খাওয়া-পরা করিলে, রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিলে অথবা তাহাদের উন্নতির সকল পথ খুলিয়া দিলে তবেই হয় তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ।

হযরত দেখিয়াছিলেন, ধনসম্পদের সমবণ্টন ব্যবস্থা (equi-distribution of wealth) যখন সম্ভব নয়, তখন দাসদাসীর প্রথা জগত হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবার কোন আশা নাই। সংগতি সম্পন্ন লোকেরা বাড়ীতে দাসদাসী রাখিবেই। নিঃস্ব দরিদ্র নরনারীর পক্ষে এ-প্রথা থাকারও প্রয়োজন ; না থাকিলে তাহাদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থাই বা কেমন করিয়া হইবে। কাজেই, দাসদাসীপ্রথা কোন ক্রমেই অকল্যাণকর নয়। ইহা না থাকিলে সমাজ-জীবন অচল হইয়া পড়িত। এই উন্নত সভ্যতার দিনেও দাসদাসীপ্রথা একেবারে রহিত হইয়া যায় নাই। প্রত্যেক অবস্থাপন্ন লোকই দাসদাসী রাখিয়া বহু কাজ করিতেছেন। যাহারা দাসপ্রথা তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া বাহবা লইতেছেন, সেই ইউরোপ ও আমেরিকাতেও দাসপ্রথা রহিত হইয়া যায় নাই। তবে তাহাদের মর্যাদার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রসুলুল্লারও লক্ষ্য ছিল তাহাই। দাসদাসীর মর্যাদা-দান এবং শ্রমের মর্যাদা-দানই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কাজেই হযরত মুহম্মদ দাসপ্রথা একেবারে তুলিয়া দিবার খেয়াল না করিয়া উহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। দাসের মুক্তিই হইতেছে দাসপ্রথা

নিবারণের চরম ব্যবস্থা। হযরত সে আদর্শ কী সুন্দরভাবেই না দেখাইয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ ক্রীতদাসপ্রথার উচ্ছেদসাধন যদি কেহ করিয়া থাকে, তবে সে ইসলাম; যদি কেহ তাহাদের দরদী বন্ধু থাকেন, তবে সে হযরত মুহম্মদ।

যুদ্ধ-বন্দী হইতেই দাসপ্রথার সৃষ্টি। অতএব, এই বন্দীদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহাই হইল ক্রীতদাস-সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন কী বিধান দিয়াছে, দেখুন :

> "যখন তোমরা অবিশ্বাসীদিগের মুকাবেলা করিবে, তখন তাহাদের ঘাড় ভাংগো (যুদ্ধ কর) যতক্ষণ না তাহারা পরাজিত হয়, এবং বন্দী কর; তারপর তাহাদিগকে (বন্দীদিগকে) হয় অনুগ্রহ করিয়া (বিনাপণে) অথবা মুক্তিপণ লইয়া ছাড়িয়া দাও—যে পর্যন্ত যুদ্ধ না থামে।"
>
> —(৪৭ : ৪)

বন্দীদিগের সম্বন্ধে ইহাই আল্লার বিধান। একবার বন্দী হইলে আজীবন দাসদাসীরূপে প্রভুর অধীন থাকিতে হইবে—ইহা ইসলাম নিষেধ করিতেছে। যে-পর্যন্ত যুদ্ধ চলিবে, কেবলমাত্র সেই পর্যন্ত বন্দীদিগকে আটক রাখা চলিবে, তারপর হয় তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া বিনাপণে ছাড়িয়া দিতে হইবে, নয় তো মুক্তিপণ লইয়া মুক্তি দিতে হইবে। এরূপ হইলে আর দাসপ্রথা রহিবে কোথায়? এইখানেই ইহার মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল নাকি?

কুরআনের এই বিধানকে হযরত নিজের জীবনে কিরূপ রূপ দিয়াছেন, তাহাও দেখুন :

(১) হোনায়েনের যুদ্ধে ৬০০০ শত্রু বন্দী হইয়াছিল, হযরত বিবি হালিমার পুণ্যস্মৃতির মর্যাদা রক্ষাকল্পে সকলকেই বিনাপণে মুক্তি দিয়াছিলেন।

(২) একটি খণ্ডযুদ্ধে একশত ঘর বনি-মুস্তালিককে বন্দী করা হইয়াছিল; হযরত তাহাদিগকেও বিনাপণে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

(৩) বদর যুদ্ধে ৭০ জন কোরেশ বন্দী হইয়াছিল। হযরত তাহাদের অনেককেই বিনাপণে মুক্তি দিয়াছিলেন; কাহারও কাহারও নিকট হইতে তাহাদের সামর্থ্যানুসারে মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কেহ বা মুক্তিপণের বিনিময়ে মদিনাবাসীদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিয়াই মুক্তিলাভ করিতে

পারিয়াছিল। তা ছাড়া যতদিন তাহারা মদিনাবাসীদিগের হস্তে বন্দীজীবন যাপন করিয়াছিল. ততদিন তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল ? বন্দীদিগকে প্রত্যেক বাড়ীতে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সেখানে তাহারা সম্মানিত অতিথির মতই ব্যবহার পাইয়াছিল। অনেক সময় গৃহস্বামী শুষ্ক খেজুর খাইয়া বন্দীদিগকে রুটি খাইতে দিতেন, এ কথা বন্দীগণ নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন।

বস্তুতঃ হযরত জীবনে কোনদিন কোন বন্দীকে ক্রীতদাস করিয়া রাখেন নাই, স্বাধীন মানুষের সমস্ত অধিকার তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন।

জ্ঞান সাধনায়

জ্ঞান-সাধনার প্রতি হযরত মুহম্মদের ছিল অপরিসীম আগ্রহ। পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি : ইসলামের সর্বপ্রথম বাণীই হইল : পাঠ কর। কাজেই জ্ঞানচর্চাই যে হইবে তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, সে কথা বলাই বাহুল্য। এক কথায় বলিতে গেলে : বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলই হইতেছে কুরআন। হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত রহস্যকে দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদিকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত। কিন্তু ইসলাম সর্বপ্রথম ঘোষণা করিল : সমস্ত জড়প্রকৃতি মানুষের আয়ত্তাধীন। কুরআন বলিতেছে :

"এবং তিনি (আল্লাহ্) নিজ নিজ কক্ষপরিভ্রমণকারী সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন এবং অধীন করিয়াছেন দিবা ও রাত্রিকে।" —(১৪ : ৩৩)

এই গুপ্ত মন্ত্রই হইতেছে বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারের কুঞ্জিস্বরূপ। এই সত্য জানিবার পর মানুষের কৌতূহলী মন গ্রহে-গ্রহে তারায়-তারায় সন্ধানীর মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, ফলে বিজ্ঞান-জগতের অনেক রহস্য আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি এবং নৈসর্গিক অনেক শক্তিকেই কাজে লাগাইতেছি। কাল যাহারা দেবতা ছিল, আজ তাহারা আমাদের পায়ের ভৃত্য হইয়াছে। ইসলাম যদি এই গোপন কথাটি না বলিয়া দিত, তবে মানুষ হয়ত চিরদিনই বহিঃপ্রকৃতিকে ভয় ও ভক্তিতে দূর হইতে শুধু নমস্কার করিয়াই নিজেদের কর্তব্য পালন করিত।

জ্ঞানসাধনার সম্বন্ধে হযরতের বাণী একেবারে অতুলনীয়। তিনি বলিতেছেন :

"জ্ঞানানুসন্ধানের জন্য যদি সুদূর চীন দেশ পর্যন্তও যাইতে হয় যাও!"

"জ্ঞান-সাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।"

"জ্ঞান-সাধনার জন্য যে ঘরের বাহিরে হয় সে আল্লার পথে চলে।"

"এক মুহূর্তের জ্ঞানচিন্তা সহস্র রজনীর উপাসনা অপেক্ষা শ্রেয়।"

"প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর পক্ষে জ্ঞানশিক্ষা করা ফরজ।"

জ্ঞানলাভের জন্য শিষ্যবৃন্দের প্রতি হযরতের ছিল এমনি নির্দেশ।

পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, বদর-যুদ্ধে যে সমস্ত কোরেশ বন্দী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে হযরত কাহাকেও বিনাপণে মুক্তি দিয়াছিলেন, কাহারও নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা লেখাপড়া জানিত, তাহাদের নিকট হইতে তিনি কোন পণ গ্রহণ করেন নাই। মুক্তিপণের বিনিময়ে তিনি এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বন্দী দশজন মদিনাবাসী মুসলিম বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিবে। জ্ঞানানুরাগের এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত নহে কি?

পরবর্তীকালে এই মহাপুরুষের শিষ্যবৃন্দই বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া কত অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নিজেরাও কত মৌলিক অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, সে কথা ইতিহাস বলিবে।

আল্লার প্রতি নির্ভরতায়

আল্লার প্রতি নির্ভরতা হযরতের জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেক মহাপুরুষেরই ভগবদ্ভক্তির কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু হযরত মুহম্মদের ন্যায় এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। আল্লা-প্রেমে এ জীবনের আগাগোড়া মণ্ডিত। ইসলামের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে আল্লাহ্‌তালার ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে তিনিই আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য। এই আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই আমরা হযরতের জীবনে। মহাপুরুষের সমগ্র জীবন নিবেদিত হইয়াছিল তাঁহার সেই পরম-প্রভুর উদ্দেশ্যে। আল্লার প্রতি কী গভীর তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরতা! আল্লার আদেশ পালনে কী তৎপরতা! আসুক দুঃখ, আসুক বিপদ, আসুক উৎপীড়ন, আসুক মরণ—আল্লার জন্য তিনি সমস্তই বরণ করিতে প্রস্তুত।

যেদিন হইতে তিনি সত্যপ্রচারের আদেশ লাভ করিলেন, সেইদিন হইতে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সর্বদাই আল্লাগতপ্রাণ ছিলেন। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, শয়নে-স্বপনে, জীবনে-মরণে কখনও তিনি আল্লাকে ভুলেন নাই। কোরেশগণ শত প্রকারে তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিয়াছে, উৎপীড়ন করিয়াছে, কত প্রলোভন দেখাইয়াছে, তবু মহাপুরুষ তাঁহার আপন সত্যে অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্পষ্টাক্ষরে তিনি ঘোষণা করিতেছেন: "তোমরা যদি আমার এক হাতে চন্দ্র, অপর হাতে সূর্য আনিয়া দাও, তবু আমি আমার সত্যপ্রচারে ক্ষান্ত হইব না।" মহাপুরুষ সদলবলে বন্দী অবস্থায় সংকীর্ণ গিরি-সংকটের মধ্যে বাস করিতেছেন, অনাহারে ও পিপাসায় সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত—তবু তিনি আল্লাকে ছাড়িয়া মানুষের সহিত সন্ধি করেন নাই। মহাপুরুষ দেশত্যাগ করিয়া তায়েফে প্রচার করিতেছেন, পাষণ্ডেরা লোষ্ট্রনিক্ষেপে তাঁহাকে জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে, তবু তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে আল্লারই মহিমা ক্ষরিত হইতেছে। কোরেশদিগের অত্যাচারে হযরত দেশত্যাগ করিতেছেন, গিরিগুহায় আবু-বকর ও তিনি আশ্রয় লইয়াছেন, শত্রুরা দেখিতে পাইয়া ধাইয়া আসিতেছে। আবুবকর বিচলিত হইয়া বলিতেছেন: "কী গতি হইবে আমাদের! আমরা যে মাত্র দুজন।" হযরত তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত চিত্তে আবুবকরকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন: তুমি ভুল করিতেছ আবুবকর, আমরা দুজন নই—তিন জন। ওহদ-ময়দানে যুদ্ধ হইতেছে, হযরতের জীবন-সংশয়: দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শত্রুর তরবারি মস্তকে পড়িয়াছে, তবু কোন লক্ষ্যচ্যুতি নাই, পরম নির্ভাবনায় তিনি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। মহানবী বৃক্ষতলে ঘুমাইতেছেন, শত্রু সেই সুযোগে শাণিত তরবারি উত্তোলন করিয়া বলিতেছে: "মুহম্মদ, এখন তোমাকে কে রক্ষা করে?" হযরত সেই তরবারির নিম্ন হইতেই অকম্পিত কণ্ঠে বলিতেছেন "আল্লাহ্!" অমনি ঘাতকের হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িতেছে। মহাপুরুষ ইহুদিনীর দত্ত বিষ পান করিতেছেন। একই বিষে বশর প্রাণত্যাগ করিতেছেন, তবু হযরত তখনও এই বিশ্বাসে অটল হইয়া আছেন যে, আল্লার ইচ্ছায় এই অবস্থাতেও তিনি বাঁচিয়া যাইবেন। এমনিভাবে আল্লার রাহে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিয়া তিনি আল্লার বাণী প্রচার করিয়াছেন। চেষ্টা যেখানে ব্যর্থ হইতেছে, সেখানে তিনি দমিয়া

যাইতেছেন না; নিজের দোষত্রুটি বা অক্ষমতার কথা ভাবিয়া আল্লারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। আবার সত্য যখন জয়যুক্ত হইতেছে, তখনও তিনি সমস্ত সফলতা আল্লাতে সমর্পণ করিতেছেন। কর্তব্য পালন করিয়াও তাঁহার মনে হইতেছে—হয়ত বা কোথাও কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল। মীনা-প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাই তিনি সমবেত লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন: "আমি কি আল্লার বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছি?" সকলে সমস্বরে বলিতেছেন: "নিশ্চয়ই!" তখন মহা-পুরুষ কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন: "প্রভু হে, সাক্ষী থাকো, ইহারা বলিতেছে —আমি তোমার বাণী ইহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি।" তারপর মৃত্যুশয্যায়। কী চমৎকার সে মহাপ্রয়াণ! "হে রফীক্-ই-আলা!— হে আমার পরম বন্ধু, তোমার কাছে"………ইহাই বলিতে বলিতে তিনি শেষ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। এমনি চমৎকার তাঁহার জীবন! ইহার প্রারম্ভও যেমন মধুর, অবসানও ঠিক তেমনি মধুর।

ক্ষমায়

ক্ষমা ছিল হযরতের চরিত্রের প্রধান ভূষণ। কোরেশ, ইহুদী ও অন্যান্য বিধর্মীরা কতভাবেই না তাঁহাকে নির্যাতন করিয়াছে, কিন্তু মহাপুরুষ সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন। জীবনে কোনদিন কাহারও উপর তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। অত্যাচারীদের অপরাধ যে অজ্ঞানকৃত, এই মনোভাবই তিনি সর্বত্র দেখাইয়া আসিয়াছেন। তাহাদের কোন অপরাধ গ্রহণ করা তো দূরে থাকুক, পাছে তাহাদের উপর আল্লার কোন অভিশাপ নামিয়া আসে, এই ভয়ে তিনি তাহাদের হইয়া আল্লার কাছে মার্জনা চহিয়া-ছেন। মহাপুরুষের সমগ্র যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যই ছিল সংশোধনমূলক— প্রতিশোধমূলক নয়। তাহা না হইলে মক্কা-বিজয়ের পর তিনি তাঁহার জ্ঞানী-দুষমনদিগকে অমনভাবে ক্ষমা করিতে পারিতেন না। আমরা তাঁহার ক্ষমার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি:

(১) ওয়াশী নামক একজন কোরেশ বীর হামজাকে হত্যা করিয়াছিল। মক্কা-বিজয়ের পর সে শাস্তির ভয়ে নানাস্থানে পলাইয়া ফিরিতেছিল, হযরত তাহাকে অভয় দিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

(২) আবুসুফিয়ানের মত শত্রুকেও হযরত ক্ষমা করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, তাহার স্ত্রী হিন্দা, যে নাকি বীরবর হামজার হৃদপিণ্ড চিবাইয়া খাইয়াছিল, তাহাকেও তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন।

(৩) সাফওয়ান ছিল হযরতের অন্যতম প্রধান শত্রু। মক্কা-বিজয়ের পর সে জেদ্দায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। হযরত তাহা জানিতে পারিয়া নিজ মাথার পাগড়ী পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে অভয় দান করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

(৪) আবদুল্লাহ্-বিন্-উবাই ছিলেন মদিনায় হযরতের প্রধান শত্রু। কিন্তু হযরত কোনদিন তাহাকে কি বলেন নাই। আবদুল্লার মৃত্যুকালে হযরত তাহার কাফনের জন্য নিজ দেহের চাদর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

(৫) তায়েফবাসীরা হযরতকে যে এত নির্যাতন করিয়াছিল, তবু হযরত কোনদিন তাহাদিগকে কোন শাস্তি দেন নাই। তায়েফবাসীদিগের প্রতিনিধিসংঘ যখন মদিনায় হযরতের সংগে দেখা করিতে গিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে হযরতের অংগে আঘাতকারীদেরও দুই-একজন ছিল। কিন্তু ক্ষমাসুন্দর মহামানব সেকথা একটুও মনে রাখেন নাই, পরম আদরে তিনি তাহাদিগকে মসজিদ-প্রাংগণে স্থান দান করিয়াছিলেন।

(৬) বিবি আয়েষার চরিত্রে যে সমস্ত লোক কলংক-কালিমা লেপন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মিস্‌তা ছিল অন্যতম। হযরত তাহাকেও ক্ষমা করিয়াছিলেন।

(৭) শেব গিরি-সংকটে যে সময় হযরত বন্দী-অবস্থায় কাল কাটাইতে-ছিলেন, তখন মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আবুসুফিয়ান ইহাতে বিচলিত হইয়া হযরতের নিকটে উপস্থিত হয় এবং মুসিবৎ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লার নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করে। হযরত অম্লান বদনে তাহাই করেন ; ফলে এই বিপদ হইতে মক্কাবাসীরা রক্ষা পায়।

(৮) মহাপুরুষ কোনদিন কোন শত্রুকে অভিশাপ দেন নাই, অথবা আল্লার কাছে ফরিয়াদ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে চান নাই। শত্রু-দিগের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া অনেক সময় কোন কোন সাহাবী তাঁহাকে আল্লার নিকট ফরিয়াদ করিতে বলিয়াছেন এবং যাহাতে শত্রুকুল ধ্বংস হইয়া যায়, এই অভিশাপ দিতে বলিয়াছেন। কিন্তু দরদী নবী কোনদিন

তাহা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন : "অভিশাপ দিবার জন্য আমি আসি নাই, মানুষের কল্যাণ করিবার জন্য আসিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, "হে আল্লাহ্, অজ্ঞ পথভ্রান্ত মানুষকে তুমি ক্ষমা কর।"

এইরূপ অসংখ্য ক্ষমা ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত মহাপুরুষের জীবনকে মহিমামণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

ন্যায়বিচারে

এইখানে হযরতকে ভুল বুঝিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। কেহ যেন মনে না করেন যে, হযরত ছিলেন শুধুই করুণা ও ক্ষমার প্রতীক এবং কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্যের অতীত। তাহা ঠিক নয়। মানুষের সকল প্রবৃত্তিই তাঁহার মধ্যে ছিল এবং তিনি সবগুলিকে লইয়াই তাঁহার জীবন-শিল্প রচনা করিয়াছিলেন। সব প্রবৃত্তিকে বজায় রাখিয়া মানুষ-বেশে কিরূপ করিয়া পথ চলিতে হয়, তাহারই আদর্শ দেখানোই তো ছিল হযরতের প্রধান লক্ষ্য। সব প্রবৃত্তিই আল্লার দেওয়া, কাজেই প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। জগতের কোন বস্তুই আল্লাহ্ অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা আছে; তবে তাহার ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং প্রক্রিয়া জানা চাই। এমন যে সাপের বিষ, তাহাও অমৃততুল্য হইতে পারে—যদি ইহার মাত্রা এবং গ্রহণ-পদ্ধতি জানা যায়। মানুষের প্রবৃত্তিনিচয়ও ঠিক সেইরূপ। যথাযোগ্যভাবে উহাদিগকে ব্যবহার করিলে উহাদের দ্বারা প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। প্রবৃত্তি-নিচয়ের শুদ্ধিকরণ (sublimation) তাই আমাদের প্রয়োজন। কোন প্রবৃত্তিকে একেবারে দমন করিয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু সবগুলিকে সোজা পথে চালানো কঠিন। হযরত এই অসাধ্যই সাধন করিয়াছিলেন। 'কামিনী-কাঞ্চন' পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া তিনি বনে যান নাই, বা অহিংসা পরমধর্ম বলিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন নাই। সমস্ত প্রবৃত্তিকে তিনি শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। কামকে শুদ্ধ করিলে আমরা পাই প্রেম; ক্রোধকে শুদ্ধ করিলে পাওয়া যায় তেজস্বিতা। লোভকে শুদ্ধ করিলে সে হয় তখন আকাঙ্ক্ষা, মোহকে শুদ্ধ করিলে পাওয়া যায় মায়া-মমতা ও আকর্ষণ, মদকে শুদ্ধ করিলে সে হয় নিষ্ঠা বা তন্ময়তা, আর মাৎসর্যকে শুদ্ধ করিলে পাই আমরা সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব। হযরতের জীবনের আমরা প্রবৃত্তি-

নিচয়ের এই খাঁটি রূপেরই পরিচয় পাই। তাইত আমরা দেখিতে পাই, একদিকে যেমন তিনি অতি বড় শত্রুকেও ক্ষমা করিতেছেন, অপরদিকে তেমনি অন্যায়ের খাতিরে কাহারও প্রাণদণ্ডের বিধান দিতেছেন; বিধর্মীরা সত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেছে, তিনিও তাহাদিগকে রোধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন; ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করিতেছে, তিনিও তাহা-দিগকে শায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এইরূপে বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তিনি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। অন্যায় করিয়া কোথাও তিনি কাহাকেও আঘাত করেন নাই। চিরদিন তিনি ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। যে ইহুদিনী জয়নবকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ক্ষমা করিতেছেন, তাহাকেই আবার ন্যায়ের খাতিরে ও আন্তর্জাতিক নীতি অনুসারে প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতেছেন। বিবি আয়েষার পূত চরিত্রে অযথা কলংক-দান ব্যাপারে আপন শ্যালিকা হাম্না যখন অপরাধিনী সাব্যস্ত হইলেন, তখন বিচারানুসারে তাঁহাকেও তিনি শাস্তি দিতে ছাড়েন নাই; আবার শাস্তি দানের পর মিস্‌তা, হাসান প্রভৃতিকে ক্ষমা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। হোদায়বিয়ার সন্ধি হইবার পর আবুজন্দল আসিয়া হযরতের শরণাপন্ন হইল, তখন ন্যায়ের খাতিরে তিনি তাহাকে আশ্রয় দেন নাই, কোরেশদিগের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছেন। ওৎবার বেলাতেও তিনি ঠিক একইরূপ করিয়াছেন—তাহাকেও তিনি কোরেশদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসাই যাঁহার জীবন-ব্রত ছিল, তিনিই ন্যায়ের খাতিরে আলোক-প্রাপ্তকে পুনরায় অন্ধকারে ফিরাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ হযরতের জীবনে এমন কোন ঘটনা কেহ দেখাইতে পারিবেন না—যেখানে তিনি ন্যায় ও নীতির মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। ন্যায়ের অর্থ শুধু ক্ষমা—শুধু করুণা নয়, কঠোরতাও তাহার মধ্যে আছে; অপরাধীর শাস্তিবিধানও তাহার মধ্যে আছে। হযরত এইরূপ ন্যায়েরই পক্ষপাতী ছিলেন।

বদান্যতায়

দান-খয়রাত হযরতের জীবনের আর এক বৈশিষ্ট্য। দুঃস্থ নিপীড়িত মানবের সাহায্যকল্পে সতত তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। জীবনে কোনদিন কোন লোক হযরতের নিকট কিছু চাহিয়া বিমুখ হয় নাই। পাঠক

জানেন, বিবি খাদিজার অগাধ ধনসম্পদ ছিল। খাদিজার সহিত বিবাহের পর তিনি সেই সমস্ত সম্পদের প্রকৃত অধিকারী হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধলব্ধ ধনরত্নের এক-পঞ্চমাংশ তাঁহার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এত ধনদৌলতের অধিকারী হইয়াও মহাপুরুষ ছিলেন একেবারে নিরাসক্ত। তাঁহার গৃহের পারিপাট্য ছিল না; অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল না, সমস্ত বিলাইয়া দিয়া দরদী নবী কোনদিন অনাহারে পেটে পাথর বাঁধিয়া, কোনদিন বা দুইটি খোর্মা খাইয়া জীবন যাপন করিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি পরমসুখে ভোগবিলাসের মধ্যে বসিয়া দিন কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। প্রচুর অর্থ তাঁহার হাতে আসিয়াছে বটে, কিন্তু তিন দিনের বেশি সে-অর্থ তিনি গৃহে সঞ্চিত করিয়া রাখেন নাই। একবার শিষ্যবৃন্দের সহিত নামায পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তিনি উঠিয়া আসিয়া গৃহে গমন করেন; ক্ষণপরে আবার ফিরিয়া গিয়া নামাযে যোগ দেন। শিষ্যবৃন্দ অবাক হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন: কতিপয় দিনার গতকল্য হইতে এখনও আমার বিছানায় পড়িয়া আছে, তাহা আজও বিতরণ করা হয় নাই। নামায পড়িতে পড়িতে সেই কথা মনে পড়ায় আমি উঠিয়া যাই; দিনারগুলি বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম।

এইরূপভাবে সারাটি জীবন ধরিয়াই তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। এমন কি মৃত্যুশয্যায় থাকিয়াও তিনি দান করিতে ভুলেন নাই। মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি বিবি আয়েষাকে জিজ্ঞাসা করেন: "তোমার কাছে যে দিনারগুলি রাখিতে দিয়াছিলাম, সেগুলি কোথায়?" আয়েষা উত্তর দিলেন: "আমার কাছেই আছে।" হযরত বলিলেন, "সেগুলি শীঘ্র দান করিয়া দাও।" বলিতে বলিতেই হতচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দান করিয়াছ কি?" আয়েষা বলিলেন: "না, এখনও করি নাই।" তখন হযরত সেগুলি আনিতে বলিলেন। আয়েষা তাহা আনিয়া হযরতের হাতে দিলেন। দেখা গেল ছয়টি দিনার। হযরত কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে তাহা বিতরণ করিয়া দিয়া বলিলেন: "এখন আমার শান্তি হইল। দিনারগুলি রাখিয়া আমার প্রভুর সান্নিধ্যে উপনীত হইলে কী লজ্জার কথাই না হইত।"

হযরতের নিজস্ব তিনটি ভূ-সম্পত্তি ছিল: ফেদাকে একটি, আর দুইটি

মদিনায় এবং খায়বারে। পূর্বে তিনি তিনটি সম্পত্তিই দরিদ্রদিগের সাহায্যকল্পে ওয়াক্‌ফ্ করিয়া যান; নিজের স্ত্রীদিগের জন্য বিশেষ কিছুই রাখেন নাই। মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহে কোন ধনরত্ন দেখা যায় নাই। কোন দাসদাসীও তিনি রাখিয়া যান নাই। শুধু তাঁহার প্রিয় অশ্ব 'দুলদুল' এবং কয়েকটি যুদ্ধের উপকরণ ছাড়া আর কিছুই তাঁহার ছিল না। তিনি বলিয়া গিয়াছেন: "পয়গম্বরদিগের সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী নাই; যাহা কিছু থাকিবে সমস্তই দানের বস্তু।"

বস্তুতঃ ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভই হইতেছে যখন জাকাত (অর্থাৎ দরিদ্রদিগের সাহায্যেকল্পে সঞ্চিত অর্থের শতকরা আড়াই ভাগ বিতরণ), এবং কুরআন শরীফে যখন বহুস্থানে দানের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে, তখন হযরত মুহম্মদ যে আদর্শ দানবীর হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্যের কী আছে।

জীবে দয়া

জীবজন্তুর প্রতি—এমন কি তরুলতার প্রতিও—হযরতের দয়ার অন্ত ছিল না। তিনি বলিয়াছেন: "এই সব পশুপক্ষীদের সম্বন্ধে আল্লাকে ভয় করিও। সুস্থ অবস্থায় তাহাদের উপর চড়িয়া বেড়াও, সুস্থ অবস্থায় তাহাদিগকে রাখ।" তিনি বলিয়াছেন: "একটি স্ত্রীলোককে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল, কারণ সে একটি বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়া অনাহারে মারিয়া ফেলিয়াছিল।" তিনি বলিয়াছেন: "একটি স্ত্রীলোকের গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছিলেন, কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি খাওয়াইয়াছিল।" একদা এক ব্যক্তি অনর্থ একটি গাছের পাতা ছিঁড়িতেছিল; হযরত তাহাকে সে কাজ করিতে নিষেধ করিয়া বলেন: "প্রত্যেক পাতাটি আল্লার গুণগান করে।"

এখানে একটি কথা। অ-মুসলিমেরা প্রশ্ন করিতে পারেন: জীবের প্রতি যদি হযরতের সত্যিকার দরদই থাকিবে, তবে কুরবানি ও জীবহত্যার ব্যবস্থা কেমন করিয়া তিনি দিলেন? জীবে দয়া এবং জীবহত্যার ভিতরে সামঞ্জস্য কোথায়?

পূর্বেই বলিয়াছি, ইসলাম ব্যবহার্য ধর্ম; এমন কোন বিধান সে কখনও দেয় নাই—যাহা মানুষ কার্যতঃ পালন করিতে পারে না। 'অহিংসা পরম-ধর্ম'—তাহার বাণী নয়। উৎকট পশুপ্রীতিও তাহার ধর্মনীতি নয়। সে বলে: সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হইতেছে 'আশ্‌রাফুল মাখলুকাৎ'; মানুষের সংরক্ষণ এবং পরিপুষ্টির জন্যই আল্লাহ্ অন্যান্য সব-কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। নিখিল সৃষ্টি তাই মানুষকে সেবা করিতে ব্যস্ত। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-বাতাস, পশু-পক্ষী, আগুন-পানি, তরু-লতা, ফুল-ফল সমস্তই মানুষের উপভোগের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই আত্ম-সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হইলে মানুষ যাহাকে খুশি ভোগ করিতে পারে। এইজন্যই ইসলামে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ নয়; প্রয়োজনের তাগিদে প্রাণিহত্যা পাপ নহে। অবশ্য বিনা কারণে নিষ্ঠুরতা মহাপাপ।

শ্রমের মর্যাদা-দানে

কোন কার্যকেই হযরত ঘৃণ্য মনে করিতেন না। রাখাল সাজিয়া তিনি বক্‌রী চরাইয়াছেন, মজুর সাজিয়া মাটি কাটিয়াছেন, জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছেন, পানি টানিয়াছেন, চামার সাজিয়া জুতা মেরামত করিয়াছেন, দর্জি সাজিয়া জামা সেলাই করিয়াছেন, মেথর সাজিয়া মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপে তিনি সকল শ্রমকেই মর্যাদা দান করিয়াছেন। সংগে সংগে সমাজের এই সব নিম্নস্তরের লোকদিগের প্রাণে বিপুল বল ও ভরসাও জোগাইয়াছেন। অতি নগণ্য লোকও আজ হযরতের জীবন হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারে; হযরত যে তাহাদের মতই শ্রমিক ছিলেন, এই জ্ঞান তাহাদিগকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে।

গৃহীরূপে

সাধারণতঃ মানুষ গৃহ-সংসার পাতিয়া বাস করে। গৃহধর্ম বড় কঠিন। গৃহীর জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আপদ-বিপদ, ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা প্রভৃতি শত প্রকারের অভিব্যক্তিতে এ জীবন ভরপুর। এক এক সময় এমন এক একটা সমস্যা আসে যে মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে। কী করিবে ভাবিয়া পায় না। হযরতের জীবনে গৃহধর্মের সব সমস্যারই সমাধান আছে। কেমন করিয়া স্ত্রীপুত্রপরিজন লইয়া ঘর-সংসার করিতে

হয়, সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে কর্তব্য পালন করিতে হয়, সংসারের খুঁটিনাটি কার্যে স্ত্রীকে সাহায্য করিতে হয়. কোন্ জিনিসটি কিরূপভাবে কখন খাইতে হয়, কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি হারাম, কোন্‌টি হালাল – ইত্যাদি সব বিষয়েরই বিস্তৃত বিবরণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। কেমন করিয়া গোসল করিতে হয়, চুল ছাঁটিতে হয়, দাড়ি রাখিতে হয়, কাপড় পরিতে হয়, ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে হয়, খানা-মেজবানি করিতে হয়, অতিথি-সৎকার করিতে হয়, সঞ্চয় করিতে হয়, দান করিতে হয়— ইত্যাদি যত কিছু আমাদের জীবনে প্রায়োজন, সমস্তরই আদর্শ আছে হযরতের মধ্যে। এমন কি, মানব-জীবনের যে-অংশ অতি গোপনীয়, তাহার সম্বন্ধেও তিনি সুস্পষ্ট বিধান দিয়া গিয়াছেন।

স্বামিরূপে

হযরত ছিলেন আদর্শ স্বামী। বিবি খাদিজার সহিত তিনি ২৫ বৎসর কাল কাটাইয়াছিলেন। খাদিজা ছিলেন প্রৌঢ়া, তিনি ছিলেন যুবক। অথচ একদিনের জন্যও তিনি খাদিজার উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হন নাই। প্রথম যৌবনের সমস্ত অনুরাগ দিয়া তিনি তাঁহাকে ভালোবাসিয়াছেন। এবং চিরদিন তিনি খাদিজার স্মৃতিকে শ্রদ্ধাভরে বহন করিয়া গিয়াছেন। খাদিজার প্রতি কত তাঁহার সম্ভ্রম, কত তাঁহার প্রেম। তরুণবয়স্কা আয়েষার প্রতিই বা কী মধুর ব্যবহার ছিল তাঁহার! শুধু আয়েষা কেন, কোন স্ত্রীর প্রতিই তিনি কোনদিন পক্ষপাতিত্ব করেন নাই, বা অবজ্ঞা করেন নাই. সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসিয়াছেন, শ্রদ্ধা করিয়াছেন।

নিম্নের কয়েকটি হাদিস হইতেই জানা যাইবে, স্ত্রীর প্রতি হযরতের মনোভাব কিরূপ ছিল :

(১) পুণ্যময়ী স্ত্রী-রত্ন লাভ করা জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

(২) তোমাদের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগের নিকট শ্রেষ্ঠ।

(৩) নামায, স্ত্রী এবং সুগন্ধদ্রব্য—এই তিনিটি আমার কাছে অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক।

(৪) স্ত্রীর সহিত যে-কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদ করা জায়েজ।

স্বাবলম্বনে

স্বাবলম্বন হযরত চরিত্রের একটা প্রধান গুণ। জীবনে কোনদিন তিনি পরমুখাপেক্ষী হন নাই। তাঁহার গৃহে কোনদিন কোন ক্রীতদাস ছিল না। আপন স্নেহের কন্যা ফাতিমা পর্যন্ত নিজহস্তে গৃহের সমস্ত কাজকর্ম করিতেন। হযরতও যথাসাধ্য গৃহকর্মে তাঁহার স্ত্রীকন্যা-দিগকে সাহায্য করিতেন। ভিক্ষাকে তিনি সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করিতেন। একবার একজন অভাবগ্রস্ত লোক হযরতের নিকট আসিয়া বলিল: "হযরত, ভিক্ষা করা ছাড়া আমার জীবিকার্জনের আর অন্য পথ নাই।" হযরত বলিলেন: "তোমার ঘরে কি কোন দ্রব্যই নাই?" লোকটি বলিল: "একটি বাঁটহীন কুড়ালি আছে মাত্র।" হযরত বলিলেন: "তাহাই লইয়া আইস।" লোকটি গৃহে গিয়া সেই কুড়ালির ফলাটি লইয়া আসিল। তখন হযরত নিজহস্তে একটি গাছের ডাল কাটিয়া কুড়ালির বাঁট লাগাইয়া দিয়া বলিলেন: "এই কুড়ালিটি লও, বনে গিয়া কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া কিছু উপার্জন কর, তবু খবরদার ভিক্ষা করিও না।"

বলা বাহুল্য, সেই উপায়েই লোকটি তাহার অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিল।

চরিত্র-মাধুর্যে

হযরত ছিলেন আদর্শ চরিত্রের। মানব-চরিত্রের সকল দিকই আমরা তাঁহার মধ্যে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। স্বয়ং আল্লাহ্ বলিয়া দিতেছেন: "এবং নিশ্চয়ই তিনি (মুহম্মদ) উন্নত চরিত্র লাভ করিয়াছেন।" (কুরআন, ৫৮ : ৪)। সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, বীরত্ব, স্বাবলম্বন, সৎসাহস, নির্ভীকতা, সেবা, সাহায্য, সহানুভূতি, ভক্তি, প্রেম, বদান্যতা, উদারতা, মহত্ব, ত্যাগ, ক্ষমা, সংযম, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি সমস্ত গুণেরই তিনি অধিকারী ছিলেন. হাদিস শরীফ পাঠ করিলে প্রত্যেকটিরই দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এখানে অসম্ভব।

বীরবেশে

বীরত্বের দিক দিয়াও হযরত ছিলেন আমাদের আদর্শ। নিঃসহায় অবস্থায় তিনি অত্যাচারীকে বাধা দিতে পারেন নাই সত্য, সে সময়ে তিনি

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তারপরেই আমরা তাঁহাকে দেখি নির্ভীক বীরবেশে। তিনি বুঝিয়াছিলেন: শুধু বিনতি, শুধু ক্ষমা, শুধু নম্রতা, শুধু ধৈর্য দ্বারা জীবনকে সব সময় সফল করা যায় না। পৌরুষ-ব্যঞ্জক দৃঢ়তা ও বীরত্ব জীবনে একান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই তো তিনি সত্যের সহিত শক্তির সমন্বয় করিয়া দিয়াছেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, খায়বার প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে হযরত যুদ্ধ করিয়াছেন, সর্বত্রই আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি নির্ভীক বীরবেশে। *

কোন যুদ্ধক্ষেত্রেই কোন অবস্থাতেই তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। শত্রু-সেনার সংখ্যা বা অস্ত্রবল দেখিয়া দারুণ সংকটের মধ্যে দাঁড়াইয়াও তিনি স্থিরচিত্তে সৈন্যচালনা করিয়াছেন। যেখানে যুদ্ধের উপকরণ কোন কিছুই নাই,—সেখানে নিঃস্ব একজন মানুষ পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র কুড়াইয়া মুষ্টিমেয় কতিপয় যোদ্ধা লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন। তারপর আপন প্রতিভা দ্বারা ধীরে ধীরে শিষ্যবৃন্দকে সমর-বিশারদ ও অজেয় করিয়া তুলিতেছেন, অবশেষে তাহাদিগকেই জগতের মধ্যে একটি দুর্বার শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত করিতেছেন—এ কি কম বীরত্বের কথা ? জগতের অন্য কোন ধর্মপ্রচারককে এরূপ বীরবেশে আমরা দেখি নাই। এতবড় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও মনোবলও আর কাহারও মধ্যে পাই নাই।

রাষ্ট্রনায়করূপে

হযরতের ন্যায় এত বড় রাষ্ট্রবিদও আর দেখা যায় না। পাঠক একবার বদর-যুদ্ধের অবস্থার সহিত হযরতের মৃত্যুকালীন অবস্থার তুলনা করিয়া দেখুন। এই ১০।১২ বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্তন ! মাত্র ৩১৩ জন যোদ্ধা লইয়া যিনি বদর-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মৃত্যুর পূবে তিনিই রোম-সম্রাট, পারস্য-সম্রাট, আবিসিনিয়া-সম্রাট, মিশরাধিপতি প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা রাজশক্তির নিকট সন্ধির সর্ত নির্দেশ করিয়া পত্র লিখিতে পারিয়াছিলেন। কোরেশ, ইহুদী, বেদুইন, খৃষ্টান, পারসিক—সকল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বীরের মত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইয়াছিল।

* ইবনে-ইসহাক বলিতেছেন: রসূলুল্লাহ্ মোট ২৭টি যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯টিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা: বদর, ওহুদ, খন্দক, কোরাইজা, মুস্তালিক, খায়বার, মক্কা-বিজয়, হুনায়েন ও তায়েফ।

অসভ্য কতিপয় আরব সন্তানের মধ্যে দিয়া জগতময় একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করা এবং "পশ্চিমে হিস্পানি শেষ, পূর্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ" পর্যন্ত জয় করা কি সহজ শক্তির কথা! অসাধারণ প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব না থাকিলে এতবড় সংগঠন কেহ করিতে পারে না। যে-ইসলামি রাষ্ট্রতন্ত্র তিনি গঠন করিয়া গিয়াছেন, আজ পর্যন্ত তাহা কার্যকরী রহিয়াছে; জগতের মধ্যে ইসলাম এখনও একটা রাষ্ট্রশক্তি বলিয়া পরিগণিত। আলেকজান্দার, হানিবল, নেপোলিয়ান প্রভৃতি কোন বীরই এমন চিরস্থায়ী একটা রাষ্ট্রশক্তি গঠন করিয়া যাইতে পারেন নাই। হযরতের রচিত গণতন্ত্রবাদ ও রাষ্ট্রনীতি বিশ্বের রাজনৈতিক দর্শনকে অদ্যাবধি প্রভাবান্বিত করিতেছে। রাজ্যশাসনের যে বিধান তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষা উন্নততর কোন বিধানই জগৎ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই।

আদর্শ-প্রতিষ্ঠান

প্রত্যেক মহাপুরুষই এক একটা নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। সেই মতবাদ কতখানি সত্য এবং টেকসই, তাহা প্রমাণিত হয় দুইটি প্রশ্নের বিচারে: (১) মহাপুরুষ নিজের জীবনে সেই আদর্শ কতখানি পালন করিলেন, (২) শিষ্যেরা গুরুর আদর্শ কতখানি গ্রহণ করিতে পারিলেন। কোন্ ধর্ম কতখানি সত্য, এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিলেই তাহা সুন্দররূপে ধরা পড়ে। পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষেরা মুখে যাহা বলিয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রে কাজে তাহা দেখাইতে পারেন নাই, অথবা নিজেরা সেটা করিয়া দেখাইলেও শিষ্যেরা তাহা পারেন নাই। বুদ্ধ মধ্যপথের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কাজে তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা রীতিমত যুদ্ধ করিয়াই সেই বাণীর মর্যাদা রক্ষা করিতেছে। যিশুখৃষ্ট প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার শিষ্যেরা কার্যতঃ আগেই চড় মারিয়া বসিতেছে। কাজেই বুঝিতে হইবে, ঐ সব আদর্শ স্বাভাবিক নয়, মানুষের প্রকৃতির সহিত উহারা খাপ খায় না। কিন্তু হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। তিনি যে-বাণী ও যে-আদর্শ প্রচার করিলেন, কার্যতও তাহা দেখাইয়া গেলেন।

শত বাধা, শত বিপদ, শত প্রলোভন অতিক্রম করিয়া তিনি আপন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখাইলেন ; পক্ষান্তরে শিষ্যদের উপরেও তিনি একইরূপ প্রভাব বিস্তার করিলেন। শিষ্যেরাও যেন গুরুর এক একখানি প্রতিকৃতি হইয়া দাঁড়াইলেন। আল্লাহ, রসুল, ইসলাম এবং মুসলমান—সবই যেন একসুরে বাঁধা হইয়া গেল। এক কলেমা, এক ধ্যান, এক আদর্শ, এক প্রাণ। এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

অন্যান্য ক্ষেত্রে

অন্যান্য ক্ষেত্রেও হযরতকে আমরা আদর্শ রূপে দেখিতে পাই। অতিথি-সৎকারে, আর্ত, পীড়িত ও দুর্গতদের সেবা ও সাহায্য দানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও অন্যান্য কর্মে, নাগরিক জীবনের কর্তব্য পালনে—ইত্যাদি কোন বিষয়েই তিনি আমাদিগকে নিরাশ করেন নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক স্বতন্ত্রভাবে এই সব বিষয় পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

বিবাহ প্রথার উন্নয়নে

বিবাহ-প্রথার উন্নতি-সাধন হযরতের একটি প্রধান সংস্কার। ইহা দ্বারা নারী-জাতির মহিমা ও মর্যাদাকে তিনি বাড়াইয়া দিয়াছেন। বিবাহকে তিনি একটা পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন। হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে জগতের প্রত্যেক জাতিই বিবাহকে অতি হালকাভাবে গ্রহণ করিত ; আরবে তো বিবাহের কোন মর্যাদাই ছিল না, যখন খুশি যাহাকে খুশি বিবাহ করা যাইত ; যখন খুশি তালাক দেওয়া যাইত ; এক পুরুষ বিভিন্ন নারীকে তো বিবাহ করিতই, এক নারীও একই সময়ে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করিত। ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যেও বিবাহের নামে যথেচ্ছাচার চলিত। বাহিরে একবিবাহের প্রচলন থাকিলেও ভিতরে ভিতরে বহু প্রকারের অনাচার ও ব্যভিচারের স্রোত বহিত। স্বাধীন প্রেমই ছিল তাহাদের যৌনমিলনের আদর্শ। প্রাচীন ভারতেও বিবাহের কোন মর্যাদা ছিল না। রাক্ষস-বিবাহ, পৈশাচিক-বিবাহ, গন্ধর্ব-বিবাহ ইত্যাদি তো ছিলই, তাহার উপর আবার কৌলিন্য প্রথার কল্যাণে বিবাহের নামে যে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা চলিত, তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ।

কিন্তু হযরত আসিয়া এই বিবাহ-প্রথাকে মধুর এবং মহিমান্বিত করিয়াছেন বিবাহকে ধর্মের অংগীভূত করিয়া তিনি ইহাকে পবিত্র করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

"যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে তাহার অর্ধেক ধর্ম পালন করে।"

ইসলাম বিবাহকে কী চক্ষে দেখে কুরআনের আয়াত হইতেই তাহা সুস্পষ্ট হইবে। কুরআন বলিতেছে:

"হে লোক সকল, তোমাদের প্রভুর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তোমরা সাবধান হও—যে-প্রভু একজন হইতে (হযরত আদম হইতে) তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার সংগিনীকে (হাওয়াকে) একই উপাদান হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের দুই জন হইতে বহু নরনারীকে ছড়াইয়া দিয়াছেন।" —(৪ : ১)

অন্যত্র বলিতেছে:

"তিনিই তোমাদিগকে একটি প্রাণী হইতে পয়দা করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্য হইতে তাহার সংগিনীকে পয়দা করিয়াছেন যাহাতে সে (স্বামী) তাহার (স্ত্রী) প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে।"

—(৭ : ১৮৯)

আর এক স্থানে আছে:

"এবং তাঁহার (আল্লার) একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের সংগিনী পয়দা করিয়াছেন—যাহাতে তোমরা তাহাদের মধ্যে মনের সুখ পাইতে পার।"

—(৩০ : ২১)

"তাহারা (স্ত্রীরা) তোমাদের (পুরুষদের) ভূষণ এবং তোমরা তাহাদের ভূষণ।"

—(২ : ১৮৭)

উপরোক্ত আয়াতগুলি হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিবাহ শুধু দেহিক সম্বন্ধ নয়,—আত্মিক এবং ইহা এমন দুইটি হৃদয়ের মিলন,—যাহারা মূলতঃ এক এবং অভিন্ন।

স্বামী-স্ত্রীর এই অভিন্নতা এবং আত্মিক মিলনের উপরই ইসলামের বিবাহ-প্রথা সংস্থাপিত। কাজেই এ-সম্বন্ধ অতি পবিত্র। ইহজীবনেই ইহার শেষ নয়— অনন্তকাল ইহা স্থায়ী। কুরআন বলিতেছে:

"চিরস্থায়ী সেই জান্নাত-বাগিচা—যেখানে তাহারা (পুণ্যাত্মারা) তাহাদের সৎকর্মশীল মাতাপিতার এবং স্ত্রীপুত্রের সহিত প্রবেশ করিবে এবং ফিরিশ্‌তারা প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদের খিদমতে হাজির হইবে।*"

—(১৩ : ২৩)

সমগ্র জগৎ জুড়িয়া যখন নারীর লাঞ্ছনার সীমা ছিল না, তখন মহামানব মুহম্মদ আনিলেন এই নববিধান। ধূলিধূসরিত অবজ্ঞাত নারীকে তিনি করিলেন মহিমময়ী, চিরকল্যাণী ও গরিয়সী।

বিদায়-হজের সময় হযরত মুসলমানদিগকে যে শেষ-উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি নারীকে ভুলেন নাই। বারবার তিনি মুসলমানদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন: "হে মুসলমানগণ, তোমাদের স্ত্রীদিগের কথা ভুলিও না। মনে রাখিও, আল্লাকে সাক্ষী করিয়া তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ।"

বিবাহকালে স্ত্রীর দেনমহর, যৌতুক ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার দানও স্ত্রীর মর্যাদাকে বাড়াইয়া দিয়াছে।

বহুবিবাহের ব্যবস্থায়

এইখানে ইসলামের বহুবিবাহের প্রশ্ন তুলিয়া কেহ কেহ একটা সন্দেহের ছায়াপাত করিতে পারেন। বলিতে পারেন: বহুবিবাহই যদি সমর্থিত হইল, তবে আর একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের স্থান রইল কোথায় ?

ঠিক কথাই বটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইসলামে বহুবিবাহ নিয়ম নহে—ব্যতিক্রম। আমরা সর্বক্ষেত্রেই বলিয়া আসিতেছি, ইসলাম কোথাও এমন বিধান দেন নাই যাহা বাস্তব জীবনে অচল হয়। প্রত্যেক সম্ভাব্য অবস্থার জন্যই সে পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। দূরদর্শিতা ও সনাতনত্ব তাহার বৈশিষ্ট্য। পুরুষের চারিটি পর্যন্ত বিবাহ করিবার

* মুসলমান আইনে বিবাহকে একটি সামাজিক চুক্তি (Civil contract) বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা শুধু সামাজিক চুক্তি নয়, আত্মিক চুক্তিও বটে। অনন্তকাল স্থায়ী এই মিলন। পুরুষের পাশে নারীও রহিবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কাজেই পরকালেও স্বামী-স্ত্রীর কল্পনা আদৌ অসংগত বা অস্বাভাবিক নয়। কুরআন তাই বেহেশ্‌তেও নারীর স্থান নির্দেশ করিয়াছে।

অধিকার সে দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অবস্থা বিশেষে; সাধারণতঃ এক বিবাহই ইসলামের বিধান। কুরআন বলিতেছে :

"এবং যদি তোমরা আশংকা কর, অনাথ (এতিম)দিগের প্রতি তোমরা যথাযোগ্য ন্যায়-ব্যবহার করিতে পারিবে না, তখন যাহাদিগকে ভাল মনে কর, তাহাদের মধ্য হইতে দুই, তিন বা চারিটিকে বিবাহ কর; কিন্তু যদি ভয় কর যে, তাহাদের (স্ত্রীদের) প্রতি সম-ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে মাত্র একটিই বিবাহ কর।" —(৪ : ৩)

ইহা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, যখন-তখনই আপন খুশিমাফিক চারিটি বিবাহ করিবার আদেশ দেওয়া হয় নাই। মানুষের জীবনে এমন এক-একটি অবস্থা আসে, যখন একাধিক বিবাহ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যুদ্ধে যখন সমাজের পুরুষ-সংখ্যা কমিয়া যায়, অথবা প্রথমা স্ত্রী যদি বন্ধ্যা বা চিররুগ্না হয় অথবা অন্য কোন কারণে যদি স্বামী-স্ত্রীর মিল-মহব্বৎ না হয়, তখন দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন অনুভূত হয় বৈ কি! সেরূপ অবস্থার জন্য ইসলাম পূর্ব হইতেই এই বিধান দিয়া ভাল করেন নাই কি? এই যে ইউরোপের এক-একটা মহাসমরে লক্ষ লক্ষ পুরুষ নিহত হইল, তাহাদের বিধবা স্ত্রী এবং কন্যাদিগের অবস্থা কি দাঁড়াইল? তাহাদের বিবাহ হইল কি? কোথায় অত পুরুষ মিলিবে? পুরুষদিগের একাধিক বিবাহ করিবারও উপায় নাই, কারণ খৃষ্টধর্মে বহুবিবাহ (ploygamy) নিষিদ্ধ। বাধ্য হইয়া নারীপুরুষ ব্যাভিচার আরম্ভ করিল এবং তাহার ফলে জন্মগ্রহণ করিল লক্ষ লক্ষ অবৈধ সন্তান, আর তাহাদের নাম দেওয়া হইল "War babies"! ইহাই কি সুব্যবস্থা? এই বিধানই কি হইল কল্যাণকর? ইহাই কি হইল নৈতিক জীবনের আদর্শ? তার চেয়ে ইসলাম যে-ব্যবস্থা দিয়াছে, তাহা কত সুন্দর! এই অবস্থায় অসহায় নারীরও আশ্রয় মিলে, সমাজও ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা পায়। ইহাই কি ভাল নয়?

সম্রাট নেপোলিয়নের কথা ভাবুন। রাজনৈতিক কারণে অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারীকে তাঁহার বিবাহ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু কেমন করিয়া করিবেন? তিনি যে বিবাহিত! তখন বাধ্য হইয়া জোসেফিনের ন্যায় অমন সতীসাধ্বী স্ত্রী-রত্নকে বিনা কারণে তালাক (divorce) দিতে হইল। খৃষ্টধর্মে যদি বহুবিবাহের বিধান থাকিত, তবে আর এই নিষ্ঠুরতা তাঁহাকে দেখাইতে হইত না।

মানুষের বলিষ্ঠ রূপদানে

মানুষের বলিষ্ঠ রূপদান হযরতের আর একটি অবদান। হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছিল; সে যে কত বড়—কত মহীয়ান, তাহার শক্তি যে কত ব্যাপক এবং অন্তহীন সে তাহা জানিত না। মেষের মধ্যে থাকিতে থাকিতে সিংহ-শিশু যেমন আত্মপরিচয় ভুলিয়া যায়, মানুষও সেইরূপ নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া গিয়াছিল। হযরত মুহম্মদ আসিয়া মানুষকে তাহার আত্মরূপ দর্শন করাইলেন। তিনি বলিলেন: হে মানুষ, তুমি ছোট নও, তুচ্ছ নও; ঘৃণ্য নও, অস্পৃশ্য নও—তুমি মহান, তুমি শক্তিমান। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-বাতাস, মেঘ-বিদ্যুৎ, পর্বত-নদী, তরুলতা সমস্তই তোমার সেবায় নিয়োজিত। আল্লার নীচেই তোমার আসন, তুমি কেন অন্য কাহারও নিকট নতশির হইবে ?

মানুষের ভিতর এতদিন একটা নারীসুলভ ভীরুতাও লুকাইয়া ছিল; শুধু বিনয়, শুধু নম্রতা, শুধু ক্ষমা, শুধু করুণা ইত্যাদিই ছিল তাহার বৈশিষ্ট্য। সংসারের কঠোরতা হইতে সে রহিত তাই দূরে দূরে—নিজেকে সবার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সে করিত ভয় ও সংকোচ। হযরত দিলেন মানুষের জীবনের এক অপূর্ব নূতন ব্যাখ্যা; ভীরু মানুষকে তিনি করিলেন সাহসী। হস্তে দিলেন তরবারি, বুকে দিলেন নববল, নয়নে দিলেন নব্যজ্যোতিঃ, প্রাণে দিলেন নব আশা, কণ্ঠে দিলেন নবভাষা অন্তরে দিলেন আল্লার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও নির্ভরতা। নির্ঝরের স্বপ্নভংগের মতই হইল তাহার জীবনের জাগরণ। ধর্মে-কর্মে, প্রেমে-পুণ্যে, জ্ঞানে-গরিমায়, শৌর্যে-বীর্যে তাহার অন্তর-মানুষ যখন জাগিয়া উঠিল, তখন দুর্বার বেগে সে ছুটিল সাগর-পানে। স্বর্গমর্ত্য আলোড়ন করিয়া ফিরিতে লাগিল সে। পরিপূর্ণ জীবনের এই যে পুলক-স্পন্দন, এই যে বিশ্বনিখিলের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞান—ইহা মানুষের পক্ষে এক মস্তবড় সম্পদ। এই মহাসম্পদ প্রকৃতপক্ষে হযরতেরই দান।

যুগ-সমস্যার সমাধানে

যুগে যুগে মানবসমাজে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হইতেছে, তাহার সমাধানের জন্য হযরতই আমাদের একমাত্র ভরসার স্থল। সমস্ত সমস্যার

সমাধানই তাঁহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বিশ্বমানবতা, আন্তর্জাতীয়তা, নারী-স্বাধীনতা, নারীজাতির অধিকার, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, ধনিক ও শ্রমিক-সমস্যা, সুদ-সমস্যা, মুহাজির-সমস্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ-সমস্যা, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, বলশেভিকবাদ—ইত্যাদি সমস্ত যুগ-সমস্যার সমাধানই হযরত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাদের কোন কোনটি জগত গ্রহণ করিয়াছে, কোন কোনটি এখনো করে নাই বা করিলেও পুরাপুরিভাবে করে নাই। আর এই না-করার দরুণই হইতেছে যত অশান্তি আর যত যুদ্ধবিগ্রহ। ইউরোপের পুঁজিবাদ (capitalism)-কেও ইসলাম সমর্থন করে নাই, আবার বলশেভিকবাদকেও সমর্থন করে নাই। সমস্ত অর্থ একজন লোক জমা করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া দিবে, আর দরিদ্রেরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে, ইসলামে তাহার উপায় নাই; পক্ষান্তরে প্রত্যেক মানুষের সঞ্চিত ধন-সম্পদ যে রাজকোষে আনিয়া জড় করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারকে খর্ব করিতে হইবে, ইসলামে তাহার বিধানও নাই।* ইসলামের 'জাকাত' ও 'ওশর' প্রথা ধনিক ও শ্রমিক উভয়কেই রক্ষা করিয়াছে। ইসলাম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তুলিয়া দিয়াছে, অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়াছে, দাস-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়াছে, নারীজাতিকে মর্যাদা ও অধিকার দিয়াছে, বিশ্বমানবতা ও আন্তর্জাতীয়তা সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র জগৎ আজ হযরতের এই আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছে।

জগতে আজ ভাঙা-গড়ার যুগ আসিয়াছে; এই যুগসন্ধির দুয়ারে দাঁড়াইয়া আজ শুধু এই কথাই মনে জাগিতেছে: জগতে যদি কোন নূতন যুগ (new order) আসে, তবে তাহা হযরত মুহম্মদের আদর্শেই রচনা করিতে হইবে, অন্যথায় এই হানাহানি, এই রক্তারক্তি থামিবে না— শান্তি আসিবে না।

বৈজ্ঞানিক রূপে

আজ আমরা এক নূতন বৈজ্ঞানিক যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এ যুগ নভোভ্রমণের (space-flight) যুগ; রকেট-শিপে চড়িয়া বৈজ্ঞানিকেরা আজ গ্রহে-গ্রহে ভ্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। এই নূতন বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রপথিক রূপে আমরা দেখিতে পাই হযরত মুহম্মদকে। পৌরাণিক

এ সম্বন্ধে লেখকের ইসলাম ও কমিউনিজম পুস্তক দ্রষ্টব্য।

কাহিনী নয়, কিংবদন্তী নয়—ঐতিহাসিক সত্য রূপেই সশরীরে তিনি 'মিরাজ' করিয়াছিলেন। আজিকার নভোভ্রমণ সেই মিরাজেরই প্রেরণাদীপ্ত বৈজ্ঞানিক রূপ। কাজেই বলা যাইতে পারে, এযুগের পূর্বাভাস রসুলুল্লাই জগদ্বাসীকে দিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সফল মানুষ রূপে

বিশ্বনবীর জীবনকে আমরা নানাদিক হইতে দেখিলাম। আমরা কি এখন এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি না যে, জগতে যদি কোন সর্বাংগসুন্দর ও সর্বতোভাবে সফল মহামানব আসিয়া থাকেন, তবে তিনি হযরত মুহম্মদ ? মানুষের তিনটি মৌলিক সম্বন্ধ আছে : আল্লার সহিত সম্বন্ধ, মানুষের সহিত সম্বন্ধ, বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ। রসুলুল্লাহ্ তিনটি সম্বন্ধই পুরাপুরি স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তিন দিক দিয়াই তিনি সফলতা অর্জন করিয়াছেন। ধর্ম-জীবনে, কর্ম-জীবনে, ইহজীবনে, পরজীবনে, দৈহিক-জীবনে, আধ্যাত্মিক-জীবনে, নাগরীক-জীবনে, পরিবারিক-জীবনে, নৈতিক-জীবনে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক-জীবনে, সংস্কার-সাধনে, জাতি-গঠনে, রাষ্ট্র-রচনায়, জ্ঞানে, পুণ্যে-প্রেমে, বীরত্বে, সৎসাহসে, সংযমে, ত্যাগে, মুক্তি-সংগ্রামে, স্বাবলম্বনে, সততায়, সত্যবাদিতায়, ন্যায়নিষ্ঠায়, উদারতায়—যে কোন দিক দিয়াই দেখি না কেন এমন পরিপূর্ণ আদর্শ মহামানব আর কে আছেন ? সর্বদিক দিয়া এমন সার্থক জীবনই বা কাহার ? যে জীবনের সাধনার ফলে সমগ্র জগতে আজ চিরকল্যাণের উৎস বহিয়া চলিয়াছে,—যাঁহার চরণ-পরশে মরুসাহারায় ফুল ফুটিয়াছে, বিরান্ মুলুক আবাদ হইয়াছে, আলোকে-পুলকে হাসি-গানে সমগ্র জগৎ মুখরিত হইতেছে, গৃহে গৃহে সুখ-শান্তির বাতাস বহিতেছে, তাঁহার জীবন নিশ্চয়ই ধন্য, তিনি নিশ্চয়ই 'রহমতুল্লিল্ আলামিন,' —তিনি নিশ্চয়ই সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—তিনি নিশ্চয়ই আমাদের চিরন্তন আদর্শ—তিনি নিশ্চয়ই চরম প্রশংসার যোগ্য—তিনি নিশ্চয়ই **মুহম্মদ** (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম)।

পরিচ্ছেদ : ১৩

হযরতের বহুবিবাহের তাৎপর্য

এইবার একটি গুরুতর প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। হযরত মুহম্মদ তেরটি বিবাহ করিয়া গিয়াছেন, এর ব্যাখ্যা কী? ইহা কি তাঁহার পক্ষে কোন গৌরবের কথা?

হযরত মুহম্মদকে যাঁহারা একটুও চিনিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি যাঁহাদের একটুও শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা এ-প্রশ্ন করিবেন না, নিশ্চয়ই। দুষ্টবুদ্ধি কতিপয় খৃষ্টান লেখকই হযরতের মহিমাকে এইখানে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, মুহম্মদ ছিলেন কপট (imposter) ও কামুক (profligate), কামপ্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই অতগুলি বিবাহ করিয়া তিনি তাঁহার ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

হযরতের প্রতি এতবড় নিষ্ঠুর আঘাত আর হয় না। সততা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা যাঁহার জীবনের ভূষণ; ছলনা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ও কপটতাকে যিনি সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন; আদর্শ ও নীতির জন্য যিনি সারা জীবন সংগ্রাম করিয়া ফিরিয়াছেন; সত্য-প্রচারের জন্য যিনি জীবন পণ করিয়া শত দুঃখদৈন্য ও আপদবিপদকে বরণ করিয়াছেন; সাধনা, সংযম ও মিতাচার দ্বারা যাঁহার সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তিনি হইবেন কামুক, তিনি হইবেন লম্পট, তিনি হইবেন কপট?

লম্পট ও কামুকের স্বভাব আমাদের জানা আছে। যে কামুক বা লম্পট প্রকৃতির হয়, তাহার মনের গতিও হয় সেইরূপ। লাম্পট্য কখনও একা আসে না, আরও অনেককে সঙ্গে লইয়া আসে। তাই আমরা দেখিতে পাই, যে লম্পট হইবে সে বিলাসী হইবে, মিথ্যাবাদী হইবে, ভোগলিপ্সু হইবে, অত্যাচারী হইবে, নিষ্ঠুর হইবে, ছলনাময় হইবে, পানাসক্ত হইবে, চরিত্রহীন হইবে, ধর্মবিমুখ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই হযরতকে যাঁহারা লম্পট বলিবেন, তাঁহাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি মিথ্যা-বাদী ছিলেন, ভোগ-বিলাসী ছিলেন, অত্যাচারী ছিলেন, বদমায়েশ ছিলেন,

ধর্মবিমুখ ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরতের জীবন হইতে কেহ এমন কোন একটি প্রমাণও দিতে পারিবেন কি ?

লাম্পট্য ও কামুকতা যৌবনের সহচর। কাজেই, হযরতের যৌবন-কাল কেমন করিয়া কাটিল, তাহাই আমাদিগকে বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। সাধারণতঃ ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্তই মানুষের কামপ্রবৃত্তি প্রবল থাকে—এই সময়টাই মানুষের পদস্খলনের সময়। কিন্তু হযরতকে আমরা এই সময়ে কী বেশে দেখিতে পাই ? ২৫ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করিলেন ৪০ বৎসরের প্রৌঢ়াকে। একাদিক্রমে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি এই বর্ষীয়সী স্ত্রীর সংগে কাল কাটাইলেন। ৬৫ বৎসর বয়সে বিবি খাদিজার মৃত্যু হয়। হযরতের বয়স তখন ৫০ বৎসর, অতএব জীবনের প্রথম ৫০ বৎসর তিনি কাটাইলেন বিগতযৌবনা এক প্রৌঢ়া নারীর সহিত। ইহাই কি লাম্পট্য বা কামুকতার লক্ষণ ? তারপর ৩৫ বৎসর বয়স হইতেই তিনি হেরাগিরিগুহায় কঠোর সাধনায় মগ্ন ; ৪০ বৎসর বয়সে যখন তিনি নবুওৎ লাভ করিলেন, তখনও তিনি বাহিরের সকল চিন্তা ভুলিয়া সত্য প্রচারে ব্যাকুল। গৃহসুখ বিসর্জন দিয়া, শত অত্যাচার ও নিপীড়ন সহিয়া মহাপুরুষ চলিয়াছেন সত্যের পতাকা বহন করিয়া ! ভোগ-বাসনার দিকে দৃষ্টি দিবার তাঁহার অবসর কোথায় ? তিনি তখন আল্লার ধ্যানে তন্ময়।

বিবি খাদিজা ছাড়া হযরত আরও ১২টি বিবাহ করিয়াছিলেন। সব-গুলিই বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর, অর্থাৎ ৫১ বৎসব হইতে ৬৩ বৎসরের মধ্যে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, জীবনের শেষ ১৩ বৎসরের মধ্যে তাঁহার চরিত্রে এই লাম্পট্য ও কামুকতা দোষ ঘটিয়াছিল। মানুষের কামপ্রবৃত্তি ও ভোগলালসা প্রশমিত হইয়া মানুষ যে-বয়সে আরও পরহেজ-গার ও ইন্দ্রিয়বিমুখ হয়, চরিত্র যখন অধিকতর নির্মল জ্যোতিদীপ্ত হয়, ঠিক সেই সময়েই হযরত হইতেছেন লম্পট ও কামুক ! এ কথা কি কেহ বিশ্বাস করিবেন ?

বস্তুতঃ হযরতের বহুবিবাহের মধ্যে লাম্পট্য নাই, কাপট্য নাই। এক সুমহান আদর্শ ও প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি এতগুলি বিবাহ করিয়া-ছিলেন। নিছক মানব-কল্যাণের প্রেরণা ও তাগিদেই তিনি অসময়ে এতগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে ছিল না। নিম্নের আলোচনা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট হইবে।

হযরত মুহম্মদ জীবনে যে-সকল নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল। হযরত কোন্ বয়সে কাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাও দেখান হইল :—

(১)	খাদিজা (বিধবা)………হযরতের	বয়স তখন	২৫	বৎসর
(২)	সওদা (বিধবা)	”	৫১	”
(৩)	আয়েষা (কুমারী বালিকা)	”	৫২	”
(৪)	হাফসা (বিধবা)	”	৫৪	”
(৫)	জয়নব-বিন্‌তে খোজাইমা (বিধবা)	”	৫৫	”
(৬)	উম্মে-সালমা (বিধবা)	”	৫৫	”
(৭)	জয়নব (জায়েদের পরিত্যক্তা স্ত্রী)	”	৫৬	”
(৮)	জোয়ায়েরা (বিধবা, বনি-মুস্তালিক গোত্র)	”	৫৬	”
(৯)	রায়হানা (ইহুদিনী, বিধবা)	”	৫৭	”
(১০)	মেরী (খৃষ্টান, উপহৃতা বিধবা)	”	৫৭	”
(১১)	সফিয়া (কিনানার স্ত্রী, বিধবা ইহুদিনী)	”	৫৮	”
(১২)	উম্মে-হাবিবা (আবুসুফিয়ানের কন্যা, বিধবা)	”	৫৮	”
(১৩)	মায়মুনা (বিধবা)	”	৫৯	”

এই তালিকা দৃষ্টে দেখা যাইতেছে, মাত্র একজন ছাড়া অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন বিধবা। কাজেই এ কথা নিশ্চয়ই যে, এই বিবাহগুলির কারণ আর যাই হউক, কামুকতা নয়।

পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, হযরত ছিলেন আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ। নিজের জীবন, সাহাবীদের জীবন এবং স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গের জীবনের মধ্যে তিনি আমাদের জন্য সমস্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন আদর্শ স্থাপনের জন্য তাঁহাকে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। বিবাহ ব্যাপারেও তাহাই। বিভিন্ন আদর্শ স্থাপনের জন্যই হযরত এতগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন। সে আদর্শগুলি এই।

(১) **নারীত্বের মর্যাদা দান:** হযরতের সময় নারীত্বের কোন মর্যাদা ছিল না। যখন খুশি বিবাহ করা যাইত; যখন খুশি, যাহাকে খুশি তালাক দেওয়া যাইত। বিধবাদিগের দুর্গতিই ছিল সবচেয়ে বেশী। তাহাদিগকে কেহ বিবাহ করিতেও চাহিত না, ভদ্রভাবে বাঁচিয়া থাকিতেও দিত না। মহানুভব হযরত তাই এই শ্রেণীর বিধবা-নারীকে বিবাহ করিয়া

এবং চিরদিন তাহাদিগকে সমানভাবে স্ত্রীর অধিকার দিয়া আরববাসীদিগের সম্মুখে মনুষ্যত্বের একটা উন্নত আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সওদা জয়নব-বিন্‌তে-খোজাইমা ও উম্মে সাল্‌মাকে এই কারণেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

(২) **প্রেমের বিস্তার :** মানুষের প্রতি প্রেম ছিল হযরতের অপরিসীম। এত যে আঘাত, এত যে লাঞ্ছনা, এত যে বেদনা তিনি পাইয়াছেন মানুষের হাতে, তবু কোনদিন কাহাকেও তিনি অভিশাপ দেন নাই বা কাহারও ধ্বংস কামনা করেন নাই; তিনি জানিতেন, মানুষ না বুঝিয়া তাঁহাকে আঘাত হানিয়াছে। আল্লার নিকট শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা তো দূরের কথা, পাছে অত্যাচারী জালিমদিগের উপর আল্লার অভিশাপ নামিয়া আসে, এই ভয়ে মহাপুরুষ ছিলেন সদা শংকিত। সব সময়ে তিনি তাই প্রার্থনা করিতেন: "হে আল্লাহ্, এই মূঢ় পথভ্রান্তদিগকে ক্ষমা কর। ইহারা না বুঝিয়া আমাকে আঘাত দিতেছে।" প্রয়োজনের তাগিদে বিধর্মী-দিগের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা আত্মরক্ষামূলক, সংহারমূলক নয়, সংশোধনমূলক (corrective), প্রতিহিংসামূলক, (vindictive) নয়। কোরেশ, ইহুদী, বেদুইন, খৃষ্টান, পারসিক—কাহারও প্রতিই তাঁহার কোন জাতক্রোধ ছিল না। যে-মুহূর্তে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে বা শান্তির প্রস্তাব করিয়াছে, সেই মুহূর্তেই তিনি অস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুহূর্তেই তিনি তাহাদিগকে আপন বুকে টানিয়া লইয়াছেন। বিধর্মীদিগের সহিত শান্তিতে বাস করাই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। অতিবড় শত্রুর জন্যও যে তাঁহার অন্তরে করুণা ও প্রেম সঞ্চিত হইয়া আছে, এ কথা কার্যতঃ প্রমাণ করিবার জন্য হযরতকে কয়েকটি বিবাহ করিতে হইয়াছিল, ইহার ফলে শত্রুদিগের অন্তর্লোক তিনি অলক্ষ্যে জয় করিয়া লইয়াছেন। উম্মে-হাবিবা (আবসুফিয়ানের কন্যা), মায়মুনা (বীরবর খালিদের খালা), জোয়ায়েরা (বনি-মুস্তালিক নামক বেদুইন গোত্রের কন্যা)—ইহাদিগকে হযরত এই কারণেই বিবাহ করিয়াছেন। এই তিনটি বিবাহের ফলেই কোরেশ ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা হযরতকে আত্মীয় ও বন্ধু মনে করিতে পারিয়াছিল এবং হযরতের প্রতি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। উম্মে-হাবিবাকে বিবাহ করায় তিনি অবুসুফিয়ানকে জয় করিয়াছিলেন, বৃদ্ধা মায়মুনাকে বিবাহ করায় তিনি খালিদকে পাইয়াছিলেন

জোয়ায়েরাকে বিবাহ করায় তিনি বনি-মুস্তালিক ও অন্যান্য গোত্রকে পাইয়াছিলেন। এইরূপেই মক্কা-বিজয়ের পথ তাঁহার সহজ ও সুগম হইয়া গিয়াছিল। সম্মান দিয়া, প্রেম দিয়া, কোন জ্ঞানী দুষমনকে এমনভাবে জয় করিবার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখি নাই। মনুষ্যত্বের কত বড় আদর্শ এইখানে!

হযরত বলিয়াছেন: "বিবাহ-সম্বন্ধই অন্যান্য সব-কিছু অপেক্ষা মানুষের মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি করে!" এই নীতি কার্যতও দেখাইয়া গিয়াছেন। শুধু মৌখিক ভালবাসা দেখাইয়া, শুধু ক্ষমা ও করুণা করিয়া তিনি শত্রুদিগকে জয় করেন নাই, রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তিনি সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। এই বিরাট মনুষ্যত্ব ও মহানুভবতার তুলনায় তাঁহার বহুবিবাহের দোষত্রুটি দাঁড়াইতে পারে কি?

(৩) **বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের কন্যাগ্রহণের আদর্শ স্থাপন:** হযরত তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি দিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুসলমানদিগকে সারা-জগতে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে এবং নানাজাতীয় লোকের সম্পর্কে আসিতে হইবে; কাজেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করা যায় কিনা, এ-প্রশ্ন একদিন জাগিবেই। ইহার আদর্শ দেখানো হযরতের পক্ষে তাই ছিল অপরিহার্য। অবশ্য ইসলাম বিধান দিয়াছে যে, যাহারা 'আহ্‌লে কিতাব' (অর্থাৎ যাহাদের নিকট ঐশীগ্রন্থ নাযিল হইয়াছে) তাহাদের সহিত মুসলমানদিগের বিবাহ-শাদী চলিতে পারে। কিন্তু শুধু বিধান দিয়া রাখিলেই হয় না, বাস্তব আদর্শও দেখান চাই। এই কারণেই হযরতকে ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্য হইতে বিবাহ করিতে হইয়াছে। মেরী (খৃষ্টান) এবং সফিয়া ও রায়হানা (ইহুদী) এই পর্যায়ভুক্ত। ইহাদিগকে বিবাহ করিয়া হযরত খৃষ্টান ও ইহুদী জাতির প্রতি আপন হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; হযরত যে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অন্যান্য ঐশীগ্রন্থপ্রাপ্ত জাতিকে ঘৃণা করেন না, তাহাদিগকেও যে তিনি ভালোবাসেন—এই তিনটি বিবাহ দ্বারা তিনি তাহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পাঠক দেখিয়াছেন, মেরী, সফিয়া বা রায়হানা কেহই হযরতের অন্যান্য স্ত্রী অপেক্ষা মর্যাদায় কোন অংশে কম ছিলেন না। হযরতের পুত্র ইব্রাহিম এই মেরীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেড় বৎসর বয়সে ইব্রাহিম যখন মারা যান, তখন হযরতের সে কী আকুল শোকোচ্ছ্বাস! মুসলমানগণ ঠিক এই আদর্শ

আজও বজায় রাখিয়া চলিয়াছে ; হযরতের অনুকরণে হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী বা অন্য যে-কোন জাতির নারীকে শরীয়তের বিধান অনুসারে বিবাহ করিতে তাহাদের কোন বাধা নাই।

(৪) **পরিজনবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন :** হযরতের পরিবার-বর্গকে 'আহলে-বায়েত' বলে। আবুবকর, ওমর, আলি ও ওসমান—ইসলামের এই প্রথম খলিফা চতুষ্টয় 'আহলে-বায়েতে'র অন্তর্ভুক্ত। হযরত এই চারিজন খলিফাকে রক্তের সম্বন্ধ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। হয় কন্যা দিয়া, না হয় কন্যা গ্রহণ করিয়া হযরত এই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছিলেন। আবুবকরের কন্যা এবং ওমরের কন্যাকে তিনি স্ত্রীরূপে নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর আলি ও ওসমানকে আপন কন্যা দান করিয়াছিলেন। আয়েষা এবং হাফ্‌সাকে বিবাহ করিবার গূঢ় কারণ ইহাই।

(৫) **অনুরোধ-রক্ষা :** অনেক স্ত্রীলোক নিজেরা ইচ্ছা করিয়া পয়গম্বরের সহধর্মিণী হইবার জন্য লালায়িত ছিলেন। তাঁহারা ইহকাল ও পরকালে হযরতের সাহচর্যে কাল কাটাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কাজেই বিবাহবন্ধন দ্বারাই তাঁহাদিগকে হযরত নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। কোন কোন সাহাবাও নিজেদের কন্যা বা ভগিনীকে দিয়া হযরতের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কারণেও হযরতকে ২।১টি বিবাহ করিতে হইয়াছিল। বিবি সওদা, জয়নব ও মায়মুনা এই পর্যায়ভুক্ত। স্ত্রীদিগের কেহ কেহ নিজেদের 'বারী' (পালা) ত্যাগ করিয়াও শুধু পত্নীত্বের সম্বন্ধটুকুর জন্যই হযরতের স্ত্রী হইয়াছিলেন। বিবি সওদা বিবি আয়েষার অনুকূলে তাঁহার বারী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৬) **আদর্শের পূর্ণতা-সম্পাদন :** পূর্বেই বলিয়াছি, হযরত ছিলেন আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ। আমাদের জীবনে যত কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে সবগুলিরই পূর্বধারণা করিয়া তাহাদের সমাধান বা তাহার ইংগিত তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—শুধু আদেশ-নিষেধ দ্বারা নয়, বাস্তব আদর্শ দ্বারা। আদর্শের পরিপূর্ণতার খাতিরেই তাই তাঁহাকে এতগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। এক স্ত্রীর দ্বারা বিভিন্ন আদর্শ দেখান কিরূপে সম্ভব হইত। তিনি যদি শুধু খাদিজাকে বিবাহ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তবে আমরা কুমারী স্ত্রীর সহিত স্বামীর ব্যবহার কিরূপ হইবে, জানিতে পারিতাম না ; যদি শুধু কুমারী আয়েষাকেই

বিবাহ করিতেন, তবে বিধবা ও বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার কিরূপ হইবে, জানিতে পারিতাম না। শুধু যদি স্বগোত্র বা স্বধর্মাবলম্বীদিগের কন্যাকেই বিবাহ করিতেন, তবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিবাহ করা যায় কিনা এবং তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, জানিতে পারিতাম না। শুধু যদি সম্ভ্রান্ত বংশ হইতেই বিবাহ করিতেন, তবে ক্রীতদাসকে যে বিবাহ করা যায় বা সেও যে সমস্ত ঘরের ঘরণী হইতে পারে, এ আদর্শ আমরা পাইতাম না। শুধু যদি সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ করিতেন, তবে বন্ধ্যানারীর মনের খবর আমরা পাইতাম না। স্বামী-স্ত্রীর বিভিন্ন চিত্র দেখাইবার জন্যই এবং বিভিন্ন নারীপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্যই হযরত বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন অবস্থার নারীদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এক জীবনে সমস্ত আদর্শ স্বপ্ন ও পরিকল্পনা দেখাইতে গিয়াই হযরতকে বিচিত্র ধরণের একাধিক নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

(৭) **কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন:** মৌখিক সম্বন্ধকে ইসলাম্ স্বীকার করে না। কিন্তু হযরতের সময়ে এ-প্রথা আরবে বিদ্যমান ছিল। অনেকেই পিতা, ভ্রাতা, ধর্ম-মা ইত্যাদি সম্বন্ধ পাতাইয়া বিবাহ-শাদী ব্যাপারে অনেক কুসংস্কারের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। এই কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য হযরত তাঁহার পালিত পুত্রের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তালাক-দেওয়া স্ত্রীলোককে সেকালে কেহ বিবাহ করিতেও চাহিত না। বিবাহ করিলেও ইসলামি প্রথানুসারে কিরূপ করিয়া করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন করার প্রয়োজন হইয়াছিল। বিবি জয়নবের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কি বলিতেছেন, দেখুন:

"কিন্তু জায়েদ যখন তাহাকে (জয়নবকে) পরিত্যাগ করিল, তখন আমরা তাহাকে তোমার স্ত্রীরূপে দান করিলাম, যাহাতে পালিত পুত্রের স্ত্রী সম্বন্ধে বিশ্বাসীদিগের মনে কোনরূপ খট্‌কা না লাগে!"

—(৩৩ : ৩৭)

এই সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলিতেছেন:

"রসুলকে যাহা করিতে আদেশ দিয়াছি তাহা করিলে কোনই অন্যায় হয়না।" —(৩৩ : ৩৮)

ক্রীতদাসী, নিঃসহায়া বিধবা, ভিন্নধর্মাবলম্বী নারী—ইত্যাদিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলে কিভাবে তাহাদের সহিত ঘর-সংসার করিতে হয়, অথবা তাহাদিগকে কিরূপভাবে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার আদর্শও আমরা পাই অন্যান্য স্ত্রীদিগের মারফৎ। কাজেই বলা যাইতে পারে, হযরতের স্ত্রী-সংখ্যা ১৩ হইলেও ধ্যানতঃ তাঁহারা সংখ্যায় এক। ১৩ জনকে মিলাইয়া যে নারীমূর্তি, হযরত ছিলেন তাহারই স্বামী। এক স্ত্রী বিবাহ করিলে এসব আদর্শ আমরা কোথায় পাইতাম ?

সপত্নীদিগের সহিত স্ত্রীরা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, অথবা একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিলে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর কর্তব্যই বা কিরূপ হইবে, সে আদর্শ স্থাপনও এতগুলি বিবাহের অন্যতম কারণ।

(৮) **আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন ঃ** এক-বিবাহ দাম্পত্য জীবনের আদর্শ বটে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বহুবিবাহ যে সর্বদা নিন্দনীয়, তাহাও নয়। বহুবিবাহের মধ্যেও একটা বিরাট মহত্ব লুকাইয়া আছে। এক-বিবাহের মধ্যে আছে খানিকটা স্বার্থপরতা ও মানসিক সংকীর্ণতা। আমার স্ত্রী, আমি এবং আমাদের দুই জনের পুত্র-কন্যা— এই সংকীর্ণ গণ্ডী-সৃষ্টিই হইতেছে এক-বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এক-স্ত্রীকে লইয়া পুরুষের অন্তরের বহু মহদ্বৃত্তি তাই খেলা করিতে পারে না। প্রেম কোন নির্দিষ্ট পাত্রে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহা সংকীর্ণ হইয়া আসে; সে প্রেম মানুষকে অন্তর্মুখীন করিয়া তুলে, বহির্মুখীন করে না; ভোগী করিয়া তুলে, ত্যাগী করে না। নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার মধ্যেই হইতেছে প্রেমের চরম সার্থকতা। একাধিক স্ত্রী হইলে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বাড়িয়া যায়। কর্তব্য এবং দায়িত্ব যেখানে বহুমুখীন হয়, সেইখানেই হয় মানুষের সত্যিকার পরীক্ষা। একাধিক স্ত্রী থাকিলে পুরুষ এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সকল পত্নীর প্রতি বা সকল সন্তানের প্রতি সে তুল্যরূপে তাহার কর্তব্য পালন করিতেছে কিনা, এ কথা তখন তাহাকে ভাবিতে হয়। বহুর মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সে তখন আত্মোপলব্ধি করিবার সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে পত্নীদিগের অন্তরের বহু সুপ্ত বৃত্তির জাগরণ হইতে পারে। একক স্ত্রী আত্মসর্বস্ব হয়, কেমন করিয়া পরের জন্য কিছুটা ত্যাগ করিতে হয়, সে তাহা জানে না। কিন্তু সপত্নীর মধ্যে বাস করিলে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত না হইয়া পারে না। যে-

ত্যাগ তাহাকে করিতে হয়, যে-বঞ্চনা তাহাকে সহিতে হয়, তাহা একদিক দিয়া পীড়াদায়ক হইলেও উহাই তাহার অন্তরের মহত্বকে জাগাইয়া তুলে। সপত্নীদিগের মধ্যে সচরাচর যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোন নারীর পক্ষে গৌরবের কথা নয়। স্বামীর যথাসর্বস্ব একা অধিকার করিতে পারিলাম না, সব সুখ-সম্পদ একা ভোগ করিতে পারিলাম না, এই চিন্তা ও মনোবৃত্তি মানুষকে কখনও বড় করে না। সতীনের প্রতি এবং সতীনের সন্তান-সন্ততির প্রতি যে-স্ত্রী প্রেম ও স্নেহ-মমতা দেখাইতে পারে, তাহার অন্তঃকরণ মহৎ না হইয়াই যায় না। এরূপ নারীকে যেখানেই পাইবেন, সেখানেই দেখিবেন তিনি মহীয়সী। হযরত মুহম্মদ বিচিত্র ধরণের বহু স্ত্রীর মধ্য দিয়া মানব-চরিত্রের এই দিকটা উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। মহানুভবতা, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা, উদারতা, কর্তব্যপরায়ণতা, মানব-প্রেম প্রভৃতি নানা গুণের দৃষ্টান্ত তাঁহার এই বহু-বিবাহের মধ্য দিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

পরিশেষে আর একটি কথা বিশেষভাবে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। এক-বিবাহ (monogamy) যে সর্বত্রই দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ এবং বহুবিবাহ (polygamy) যে মানব-সমাজের অকল্যাণকর, এ কথাই বা কে বলিল? একটা মিথ্যা, অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক নীতিবোধের উপর দাঁড়াইয়া বহুবিবাহকে সর্বথা নিন্দা করা আমাদের উচিত নয়। ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ববিদ এবং যৌনবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিরা বলিতেছেন: এক-বিবাহ স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত নয়: মানব জীবনে বহুবিবাহের প্রয়োজন রহিয়াছে। এক-বিবাহ সর্ব অবস্থায়—দাম্পত্য জীবনের আদর্শ হইতে পারে না। এক-বিবাহ বহু মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে তিক্ত ও বিষাক্ত করিয়াছে এবং বহু দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছে। এক-বিবাহ যে-সমাজের বা যে-জাতির আদর্শ, অথবা বহু-বিবাহ যেখানে আইনতঃ নিষিদ্ধ, সেখানে নরনারীর নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত শিথিল। আইনের ভয়ে পুরুষেরা প্রকাশ্যে সেখানে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু গোপনে গোপনে তাহারা বহু উপপত্নী রক্ষা করে এবং অন্যান্য বহু দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। সেক্ষেত্রে বহুবিবাহই নৈতিক ধ্বংস হইতে নরনারীকে রক্ষা করে।

যে যে দেশে বা যে যে সমাজে এক-বিবাহের প্রচলন রহিয়াছে, সেখানে

মুহুর্মুহু বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভ্রূণ হত্যা এবং অন্যান্য শতপ্রকারের যৌন-বিভ্রাটে সমাজ-জীবন বিড়ম্বিত হইতে দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা—কোথাও দাম্পত্য জীবন আদর্শ নয়। কুমারী জননীর সংখ্যা সেখানে অত্যন্ত প্রবল। মানব জাতির স্বাভাবিক যৌন-চেতনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দূরদর্শী হযরত মুহম্মদ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বহুবিবাহের বিধান দিয়া নারী-জাতিরও কি কল্যাণ সাধন করেন নাই? বহুবিবাহ না থাকিলে নারীর দুর্গতির সীমা থাকিত না। 'রক্ষিতা' বা 'পতিতা' অবস্থায় কি নারী-জাতির সম্মান বাড়িত? এক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ্ বহুবিবাহের বিধান দিয়া নিশ্চয়ই জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। বর্তমানে পুরুষেরা যাহাতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে না পারে, সেজন্য নারীদের তরফ হইতে কোন কোন স্থানে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এক-বিবাহের আন্দোলন নারীদের পক্ষে সর্বথা কল্যাণপ্রদত্ত নয়, সমর্থন-যোগ্যও নয়। বহুবিবাহের প্রকাশ্য দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অবৈধ প্রেম ও অনাচারের গুপ্ত দুয়ার খুলিয়া যাইবে। দুইটির মধ্যে প্রথমটিই কি শ্রেয়ঃ ও বরণীয় নয়।

পরিচ্ছেদ : ১৪

মুহম্মদ 'আহ্‌মদ' ছিলেন কিনা ?

এইবার আমরা হযরত মুহম্মদকে 'আহ্‌মদ'-রূপে দেখিব, অর্থাৎ তিনি আল্লার চরম পরিচয়দাতা ছিলেন কিনা, পরীক্ষা করিব।

আল্লার প্রকৃত পরিচয় মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। আল্লাহ্‌কে তাঁহার স্বরূপ কী, গুণাবলী কী, ইত্যাদি বিষয় না জানিলে মানুষের জীবনের লক্ষ্য, পরিণতি ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোনই চেতনা আসিতে পারে না।

কিন্তু হযরত মুহম্মদ আল্লার কি পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন-না-দিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে তাঁহার পূর্ববর্তী অন্যান্য মহাপুরুষগণ আল্লাহ্ সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করিয়া গিয়াছেন অথবা অন্যান্য ধর্মে আল্লার কী পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, জানা দরকার। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহাই আগে আলোচনা করিব।

আলোচনার প্রারম্ভেই বলিয়া রাখা ভালো : বিশুদ্ধ একত্ববাদের আলোকেই আমরা আল্লার স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রয়াস পাইব। আল্লাহ্ যে আছেন এবং তিনি যে এক এবং অদ্বিতীয়, এ কথা স্বতঃসিদ্ধভাবেই আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে। আল্লাহ্ আছেন কি নাই, তিনি এক কি বহু—এসব প্রশ্নের আর নূতন করিয়া মীমাংসা করিব না। কোন ধর্মে আল্লার একত্ব সর্বাপেক্ষা সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আল্লাহ্, মানুষ এবং বিশ্বজগৎ—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কাহার কোন্ সম্বন্ধ, ইহাই হইবে আমাদের এই আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরতত্ত্ব

সর্বপ্রথমেই হিন্দুধর্মের আলোচনা করা যাউক।

হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মশাস্ত্র বেদ, পুরাণ, উপনিষদ ও গীতা।

বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বেদ চারিটি : ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ। বেদই আদিম গ্রন্থ, ইহার পরিণতি উপনিষদ বা বেদান্ত।

প্রথমেই বেদের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। বেদ যে ঈশ্বরের একত্ব

স্বীকার করিয়াছে, এ কথা বলা কঠিন। বেদের ধর্ম বহুদেববাদ।* প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখিয়া ঋষিগণ তাহাদিগকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। ইন্দ্র, অরুণ, মিত্র, অগ্নি, সবিতা, বিষ্ণু, আদিত্য, পূষা, ঋতু, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ, বেন, সরস্বতী, উষা, দ্যাবা পৃথিবী, গো, অশ্ব, মণ্ডুক ইত্যাদিই ছিল বৈদিক যুগের আরাধ্য দেবতা। আর্যঋষিরা এই সব দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠ করিয়া হোমাগ্নিতে সোমরস আহুতি দিতেন। বেদে প্রধান দেবতার সংখ্যা ৩৩।

বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রই হইতেছেন প্রধান। ইন্দ্রের স্বরূপ বা পরিচয় বেদে নিম্নলিখিতভাবে আছে :

"ইন্দ্র অন্তরীক্ষের প্রধান দেবতা।... ইন্দ্রের বর্ণ, কেশ, শ্মশ্রু, রথ, অস্ত্র সবই হরিৎ বা পিংগলবর্ণ (১০।৯৬), তাঁহার দুই দীর্ঘ হাত, তাঁহার অস্ত্র বজ্র (৮।৯৬।৭, ১১), ধনুর্বাণ, অংকুধশ (৮।১৭।১০); ইন্দ্রের জন্ম আছে, জনয়িতা ও জনয়িত্রী আছে (১।১২৯।১২)। ঋগ্বেদে গোটা দুই সূক্তে (৩।৪৮, ৪।১৮) তাঁহার জন্মের বিবরণ আছে। তিনি মাতৃগর্ভে থাকিয়াই মাতার পার্শ্ব ভেদ করিয়া জন্ম লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জন্মিয়াই তিনি আকাশকে উজ্জ্বল করেন (৩।৪৪।৪) ও সূর্যের রথচক্র নিক্ষেপ করেন (১।১৩০।৯), তিনি জন্মাবধিই যোদ্ধা (৩।৫১।৮, ৫১০।৫), তাঁহার জন্মসময়ে ভয়ে পর্বত, আকাশ, পৃথিবী প্রকম্পিত হইয়াছিল এবং দেবগণ ভীত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রের জন্মসময়ে গাভিগণ (মেঘ) রব করে। ইন্দ্র গাভী-মাতার বৎস—তিনি গৃষ্টির পুত্র গাষ্টের (১০।১১।১২)। তাঁহার মাতার নাম নিষ্টিগ্রী। তাঁহার পিতা অদিতি।—তিনি দ্যাবা পৃথিবীর পুত্র ও জনক দুইই (১০।৫৪।৩)। তাঁহার পিতা দৌ ও তষ্টা। অগ্নি ও পূষা তাঁহার ভ্রাতা। তাঁহার স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণী ও শচী—সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ্রই অত্যধিক সোমাসক্ত ও সোমপায়ী।—ইন্দ্র ২০টা বৃষের মাংস ও ৩০০টা মহিষের মাংস ভক্ষণ করেন (১০।২৮।৩, ১।২৯, ২৭)"। —(বেদবাণী : ৬৭-৭৪ পৃষ্ঠা)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বেদে আমরা একেশ্বরবাদ খুঁজিয়া পাইতেছি না। অবশ্য বেদের কোন কোন সূক্তে 'শুদ্ধম্', 'অপাপবিদ্ধম্',

* বেদের ধর্ম যে 'বহুবাদ', তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

'আবঙ্‌মানসগোচরম্‌' ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা মনে হয় সেই চিরজ্যোতির্ময়ের দীপ্তিরেখা কোন কোন সময়ে কোন কোন মুনি-ঋষির অন্তর্লোকে প্রতিভাত হইয়াছিল, তবে সেই পরম একের সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা তখনও তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দৃষ্টি তাঁহাদের সৃষ্টিতে নিবদ্ধ ছিল; সৃষ্টির অন্তরালে কে আছে, সে রহস্য হয়ত তাঁহারা তখনও সম্যকরূপে ভেদ করিতে সক্ষম হন নাই।

পুরাণ

বেদেই যখন ঈশ্বরের একত্ব বিরল, তখন পুরাণে তো নাই-ই কারণ পুরাণ শুধু দেবদেবীর কাহিনীতেই পরিপূর্ণ।

ষড়্‌দর্শন

এইবার হিন্দুদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক।

হিন্দুদর্শন ছয়ভাগে বিভক্ত: ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত। ন্যায়-দর্শনের প্রণেতা গৌতম, বৈশেষিক-দর্শনের প্রণেতা কনাদ, সাংখ্য-দর্শনের প্রণেতা কপিল, পাতঞ্জলের প্রণেতা পাতঞ্জলি, পূর্বমীমাংসার প্রণেতা জৈমিনী এবং উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তের প্রণেতা বাদরায়ণ বা ব্যাস।

হিন্দুদর্শনের গোড়ার কথাই হইতেছে দুঃখবাদ। সংসার দুঃখের আলয়, এখানে প্রকৃত সুখ নাই, এই দুঃখ হইতে মানুষ কিরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারে—এই তত্ত্বই ষড়দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এক বেদান্তদর্শন ছাড়া অন্য পাচটি দর্শনেই এই দুঃখনাশের প্রণালীর সহিত ঈশ্বরের বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। পাণ্ডিতপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ সম্বন্ধে কী বলিতেছেন দেখুন:

> "দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন ভিন্ন অন্যান্য দর্শনের উদ্ভাবিত দুঃখ-হানির প্রণালীর সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ নহে। সাংখ্য ও পূর্ব-মীমাংসায় তো ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শন ঈশ্বরের প্রতিপাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের উপদিষ্ট

উপায়ের সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। পাতঞ্জল-দর্শন যদিও ঈশ্বরকে যোগপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, কিন্তু সে দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরই বেদান্ত-দর্শনের প্রতিপাদ্য বটেন, তথাপি বেদান্তের প্রণালীতে এবং গীতার প্রণালীতে প্রভেদ অল্প নহে।" —(গীতায় ঈশ্বরবাদ, ৭-৮ পৃষ্ঠা)

কোন্ দর্শনের কী মত দেখা যাউক :

ন্যায়দর্শনের মতে তত্ত্বজ্ঞানলাভই হইতেছে মোক্ষলাভের উপায়।

কিন্তু কিসের তত্ত্বজ্ঞান? ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান? না। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই দুঃখের নিবৃত্তি বা অপবর্গলাভ হইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই ষোড়শ বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নাই। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, তাহাতে ন্যায়-দর্শনের কিছুই যায় আসে না। ঈশ্বরকে অবলম্বন না করিয়াই মানুষের মুক্তিলাভ হইতে পারে।

বৈশেষিক দর্শনের মতেও মুক্তির উপায় এই তত্ত্বজ্ঞান। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয় বস্তুর স্বাধর্ম ও বৈধর্ম-জ্ঞান জন্মিলেই মানুষ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে।

"বৈষেশিক-দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করে নাই বটে, কিন্তু ঈশ্বরের স্থান সেখানে মুখ্য নহে—গৌণ। বৈষেশিক-দর্শনকার নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির জন্য যে প্রণালীর নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অত্যল্প। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, জীবের সহিত তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হউক বা না হউক, বৈশেষিকের তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। সপ্ত পদার্থ (ঈশ্বর যাহার অন্তর্গত নহেন) ও তাহাদের স্বাধর্ম ও বৈধর্মজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকুক, বৈশেষিক সেই তত্ত্বজ্ঞানের বলে দুঃখের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিবেন। ইহাই বৈশেষিক অনুমোদিত মুক্তিপথ।" —(গীতায় ঈশ্বরবাদ, ২০ পৃষ্ঠা)

সাংখ্য-দর্শন রীতিমত একখানি নিরীশ্বরশাস্ত্র। দুঃখমুক্তি বা কৈবল্য-লাভের ২৫টি উপায় উহাতে নির্দেশিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন স্থানই নাই। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ—ইহাই তাহার মত। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতিই হইতেছে নিত্য, আর সবকিছু অনিত্য। পুরুষ বহু, প্রকৃতি এক। এই পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ

করিলেই মুক্তিলাভ করা যায়। বলা বাহুল্য, ইহা বৌদ্ধ দর্শনেরই প্রকার ভেদমাত্র। সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে Max Muller বলিতেছেন :

"There is a place in his system for any number of subordinate Devas, but there is none of God, whether as the Creator or as the Ruller of all things."

—(Indian Philosophy : Atheism of Kapila, p. 397)

পাতঞ্জল-দর্শনও মূলতঃ সাংখ্য-দর্শনেরই অনুরূপ। সাংখ্যের সমস্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তকেই পতঞ্জলি মানিয়া লইয়াছেন, পুরুষ-প্রকৃতিকেই তিনি জগতের একমাত্র নিত্যবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে একটা বিশেষত্ব তাঁহার এই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নাই, এবং যোগসাধনাই মুক্তি-সাধনের উপায়, এই কথা বলিয়াছেন। সাংখ্যে মুক্তি-সাধনের প্রক্রিয়া ২৫টি, পাতঞ্জলে ২৬টি; এই অতিরিক্ত প্রক্রিয়াটি হইতেছে ঈশ্বর-প্রণিধান; অন্য কথায় পাতঞ্জল সাংখ্যের সব কিছুই গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু ঈশ্বর-বিশ্বাসটুকু ইহাতে জুড়িয়া দিয়াছেন মাত্র। কাজেই এই ঈশ্বর-প্রসংগটুকু তুলিয়া লইলে সাংখ্যে ও পাতঞ্জলে আর কোনই প্রভেদ থাকে না।

পাতঞ্জলি ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন এবং ঈশ্বর-প্রাণিধান দ্বারা কৈবল্য লাভ ঘটিতে পারে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানই যে যোগসিদ্ধির সর্বপ্রধান ও একমাত্র উপায়, এ কথা বলেন নাই। শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দত্ত তাঁহার "হিন্দুদর্শন ও খৃষ্টীয় দর্শন" গ্রন্থে বলিতেছেন :

"পতঞ্জল-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ-মতে যোগসিদ্ধির কোন বিশেষ বাধা হয় না; কারণ, ঈশ্বর-প্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্যতম উপায় মাত্র। আর ইহাও দ্রষ্টব্য যে, পতঞ্জলের মতে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ নহে, ঈশ্বরে কর্মাপর্ণমাত্র। ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাঁহাকে কর্মসন্ন্যাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র।" —(১৫ পৃষ্ঠা)

পূর্ব-মীমাংসাও নিরীশ্বরবাদের সমর্থক। পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিতেছেন :

"মীমাংসকেরা নিরীশ্বরবাদী; তাঁহারা বেদকে নিত্য ও অভ্রান্ত বলে

বটে কিন্তু বেদ যে ঈশ্বরবাক্য, তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ মীমাংসা-দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোন প্রসংগ নাই। সেইজন্য "বিদ্বোন্মাদতরংগিনী গ্রন্থকার মীমাংসকদিগের পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন, তাহারা ঈশ্বর মানে না, জগতের যে কেহ স্রষ্টা পালয়িতা বা সংহর্তা আছেন, এ কথা স্বীকার করে না।"

— গীতায় ঈশ্বরবাদ : ২৬ পৃষ্ঠা)

এইবার বেদান্ত-দর্শন কি বলে দেখা যাউক :

বেদান্ত-দর্শনের প্রচারক শঙ্করাচার্য। তিনি যে-দার্শনিক মতবাদের প্রচার করেন, তাহা বেদান্ত বা উপনিষদের উপর সংস্থাপিত। কাজেই তাঁহার কথা আলোচনা করিবার পূর্বে বেদান্তে ঈশ্বর সম্বন্ধে কী কথা বলা হইয়াছে, আমাদের জানা দরকার।

বেদান্ত বা উপনিষৎ

বেদের সারাংশ বা শেষাংশের নামই বেদান্ত। বেদান্তের অপর নাম উপনিষৎ। উপনিষদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। কাহারও কাহারও মতে উপনিষদের মোট সংখ্যা ১০৮। তন্মধ্যে ঈশোপনিষৎ, কেনোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, প্রশ্নোপনিষৎ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় কী ? ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার ধারণা কী ? উপনিষদের ধর্ম কি একেশ্বরবাদ ?

বলা কঠিন। উপনিষদ আমাদিগকে কী যে শিক্ষা দিতে চায়, পরিষ্কার বুঝা যায় না। ইহাতে একেশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ নিরীশ্বরবাদ—সব কিছুই আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এক-একটা শ্লোক এমন আছে যে তাহাতে একেশ্বরবাদই প্রতিপন্ন হয়; আবার বেদের বহুবেদবাদ ও বুদ্ধের সংশয়বাদ বা নিরীশ্বরবাদও ইহাতে পাওয়া যায়। উপনিষদ বেদকে একবার অভ্রান্ত বলিতেছে আবার বেদজ্ঞান যে অতি নিম্নস্তরের এবং উহা দ্বারা যে মোক্ষলাভ হইতে পারে না, তাহাও বলিতেছে। উপনিষদে এত বিভিন্ন প্রকারের মত আছে যে, যে-কোন মতাবলম্বীই স্বীয় মতের সমর্থন উপনিষদে পাইতে পারেন।*

* "There is no important form of Hindu thought; heterodox Buddhism included, which is not rooted in the Upanishads."—Bloomfield, The Religion of the Vedas, p. 51.

Prof. S. Radhakrishnan তাই বলিতেছেন :

"It is not easy to decide what the Upanishads teach. Modern students of the Upanishads read them in the light of this or that preconceived theory."—Indian Philosophy. p. 139.

ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষদ কী বলে ?

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (এক ছাড়া দুই নাই) এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (সব-কিছুই ব্রহ্ম)—ইহাই হইতেছে উপনিষদের বাণী। উপনিষদের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। 'তত্ত্বমসি' (তুমিই তিনি), 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (এই আত্মাই ব্রহ্ম), 'সোঽহং' (সে-ই আমি), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম)—এই শিক্ষাই উপনিষদ দিয়াছে।

এই ব্রহ্ম কে ? তাঁহার স্বরূপ কী ?

উপনিষদ বলিতেছেন :

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়ব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান বেদধাচ্ছাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ॥

অর্থাৎ : তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীরী, অক্ষত শিরাহীন নির্মল, অপাপবিদ্ধ সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম ও স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্য-কালস্থায়ী সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য যথানুরূপ কর্তব্যবিধান করিয়াছেন।—ঈশোপনিষ।

কোন কোন স্থানে ব্রহ্মকে 'মহতোমহীয়ান', 'সচ্চিদানন্দ', 'আনন্দরূপমমৃতং' প্রভৃতি বিশেষণেও বিশেষিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত গুণাবলী কুরআনে বর্ণিত আল্লার গুণাবলীর অনুরূপ, সন্দেহ নাই।

কিন্তু হইলে কি হয়। যে উপনিষৎ আল্লার এমন সুন্দর ধারণা করিয়াছে, সেই উপনিষদই আবার বলিতেছে :

ওঁ ব্রহ্ম দেবনাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
সব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অর্থবায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১

—(মুণ্ডকোপনিষৎ)

অর্থাৎ : নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও ভুবনের পালয়িতা পিতামহ ব্রহ্ম দেবগণের অগ্রণী স্বয়ম্ভূরূপে অভিব্যক্ত হইলেন। তিনি অর্থবা নামক জ্যেষ্ঠপুত্রকে সর্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন।

মুণ্ডকোপনিষদে আছে :

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম—অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে :

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্র তদ্বক্ষ তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥

অর্থাৎ : সেই পরমাত্মাই (ব্রহ্মই) অগ্নি, তিনি সূর্য, তিনিই বায়ু; তিনিই চন্দ্র, তিনিই দীপ্তিমান নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরণ্যগর্ভ, তিনি জল, এবং তিনিই বিরাট।

উপরোক্ত শ্লোকগুলি একসঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠে বলিয়া মনে হয় না। আল্লাহ্ বলিলে আমরা যাহা বুঝি, হিন্দুশাস্ত্রে কোন্ নামের দ্বারা সেই বস্তুকে বুঝান হইতেছে বলা কঠিন। ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—ইহাদের কে সেই আল্লাহ্ স্থানীয়? যদি বলি ঈশ্বর, তবে ভুল করা হইল। ঈশ্বরের আভিধানিক অর্থ এই :

"ঈশ্বর—শিব, ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ভগবান, কামদেব, রাজা, বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য, অন্তর্যামী, জীবাত্মা, প্রকৃতি। স্ত্রী—ঈশ্বরা, ঈশ্বরী।"

আবার 'ঈশ্বরী'র অর্থ হইতেছে : "দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী" ইত্যাদি।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ঈশ্বরকেই যদি সেই পরম 'এক' বলিয়া ধরা হয়, তবে তাহা দ্বারা শিব, ব্রহ্ম ইত্যাদি অনেক কিছু বুঝায়; পক্ষান্তরে ঈশ্বরের আবার স্ত্রী-পুত্রাদিও আছে। স্ত্রী-পুত্র সমন্বিত ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই 'এক' বলা চলে না।

ঈশ্বর অর্থে যদি ব্রহ্মা হয়, তবে দেখা যাউক ব্রহ্মা কে।

ব্রহ্মা—বিরিঞ্চি, বিধাতা, সৃষ্টিকর্তা, ব্রাহ্মণ্য।...

পুরাণাদি হইতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার এইরূপ বিবরণ করা যায় : "ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, প্রথমে সমুদয়ই তমসাচ্ছন্ন ছিল। পরে বিরাট মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দূর করিয়া জলের

সৃষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীজ সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হইলে, তন্মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্মারূপে অবস্থিত করেন। (এই জন্যই তিনি হিরণ্যগর্ভ।) পরে উক্ত অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া একভাগে আকাশ ও অপরভাগে পৃথিবী সৃষ্ট হয়। অতঃপর ব্রহ্মা দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করেন, যথা – মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ। এই সকল প্রজা-পতি হইতে যাবতীয় জীবজন্তুর উদ্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদকেও সৃষ্টিকার্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বর সাধনার (ঈশ্বর তবে কে?) ব্যাঘাতাশংকায় নারদ ইহাতে অস্বীকৃত হইলে ব্রহ্মা অভিশাপ প্রদানে তাঁহাকে গন্ধর্ব ও মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ব্রহ্মার ভার্যার নাম সাবিত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা দুই কন্যা।”—(সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাংলা অভিধান')

এখানেও আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। ব্রহ্মাকে একবার সৃষ্টিকর্তা বলা হইল আবার দেখিতেছি তিনিই হিরণ্যগর্ভ রূপে জন্মলাভ করিলেন। কাজেই একবার তিনি স্রষ্টা, আর একবার তিনি সৃষ্ট। অথচ তাঁহাকে স্বয়ম্ভুও বলা হইতেছে। পক্ষান্তরে—ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, দশজন প্রজাপতি (সৃষ্টিকর্তা) কর্তৃকই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এর উপর আবার ব্রহ্মার স্ত্রীও আছেন, সন্তানসন্ততিও আছেন। এরূপ মতবাদকে একেশ্বরবাদ বলা সহজ নয়।

'ভগবান', 'নারায়ণ', 'বিষ্ণু', ইত্যাদির অর্থও অনুরূপ। (অভিধান দেখুন।) অতএব দেখা যাইতেছে, আল্লাহ্ ও ঈশ্বর দ্বারা একই বস্তুকে বুঝা যাইতেছে না। অথবা ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ইত্যাদি দ্বারাও একবস্তু বুঝাইতেছে না।

উপনিষদকে আমরা দেখিলাম। এইবার বেদান্ত-দর্শন কী বলে, দেখা যাউক।

বেদান্ত-দর্শন

উপনিষদের শিক্ষার উপরেই বেদান্ত-দর্শন দাঁড়াইয়া আছে। 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'—এক ছাড়া দুই নাই—ইহাই হইতেছে বেদান্ত-দর্শনের সার কথা। শঙ্করের মতে ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য-- আর সব মিথ্যা। চন্দ্র সূর্য

আকাশ-পৃথিবী, দেব-দেবী, মানুষ-গরু, পাহাড়-পর্বত ইহাদের কোন স্ব-অস্তিত্ব নাই, ইহারা ব্রহ্মেরই প্রকাশ বা ব্রহ্মেরই অংশ। কাজেই পরিণামে ইহারা ব্রহ্মেই লীন হইবে।

এই মতবাদের নাম 'অদ্বৈতবাদ'।

অদ্বৈতবাদ আবার দুই প্রকার : (১) অদ্বৈতবাদ, (২) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। আচার্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক, অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র। শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য, রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য—নির্গুণ নহেন।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, উপনিষদ বা বেদান্ত-দর্শন বিশেষ কোন নূতন কথা বলে নাই। অদ্বৈতবাদ সর্বত্রই সমানভাবে অক্ষুন্ন রাখা হইয়াছে।

গীতা

গীতা কী বলে ?

গীতা উপনিষদ হইতে বিভিন্ন নয়। গীতাতেও বহুদেববাদই সমর্থিত হইয়াছে, তবে গীতায় ঈশ্বরকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। গীতার মতে 'পুরুষোত্তমই' শ্রেষ্ঠ সত্ব, তাহার উপরে আর কেহ নাই। সগুণ এবং নির্গুণ—এই দুইভাব লইয়া পরব্রহ্ম এবং তিনিই গীতার 'পুরুষোত্তম'।...ভগবান পুরুষোত্তম চৈতন্যস্বরূপ, আর তাঁহার এই চৈতন্যের যে সক্রিয়তার দিক, তাহাই তাহার প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতঃ অভিন্ন।"

—(শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, অনিলবরণ রায়)

কিন্তু গীতার এই ভগবান বা পুরুষোত্তমের স্বরূপ কী ?

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই সেই ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম। অবতাররূপে তিনি স্বয়ং ভগবান। বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুই তাঁহার অংশ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

অর্থাৎ : জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ।

"প্রপূজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণম্।"

অর্থাৎ : ভগবানের অংশরূপী দেহী (জীবকে) দেহ পূজা করিবে।

অতএব, আমরা দেখিতেছি, গীতাও অদ্বৈতবাদই মানিয়া লইয়াছে। জীব এবং ব্রহ্ম এক—ইহাই গীতার শিক্ষা।

ঈশ্বর সম্বন্ধে গীতার ধারণা এই। ইহার উপর আবার অবতারবাদ আসিয়া ঈশ্বরবাদকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

গীতা বলিতেছে :

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

অর্থাৎ : ভগবান ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবানের পূর্ণাবতার!

ইহাই মোটামুটিভাবে গীতার ঈশ্বরবাদ।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা কী দেখিলাম? দেখিলাম : হিন্দু-ধর্মে ঈশ্বরবাদ সুস্পষ্ট নয়। কোন একটি বিশিষ্ট মতবাদ এখানে নাই, বিভিন্ন মতবাদের ইহা একটি সমষ্টি মাত্র।

বলা বাহুল্য, বিভিন্ন সময়ে মুনি-ঋষিরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করার ফলেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা রচিত এবং প্রত্যেকটির মধ্যেই যে নানা প্রক্ষেপ ও বিকৃতি বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে এখন প্রায় সকল পণ্ডিতই একমত। আমরা নিম্নে কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি :

"উপনিষদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার, কেননা দেখা যায় যে বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবল হইয়া স্বমতকে শ্রুতিসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে এবং উহাকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে বিভিন্নকালে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা উপনিষৎ নামে সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন। এই রূপে সম্রাট আকবরের কালে অল্লোপনিষৎ বিরচিত হয়।"—(উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়—১৮ পৃঃ)

"কি গীতা, ব্রহ্মসূত্র উভয়ই কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাদরায়ণ কৃত ব্রহ্মসূত্রে পরবর্তীকালে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ নূতন নূতন সূত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এইরূপ বেদব্যাস রচিত প্রাচীন ভারত-সংহিতার অন্তর্গত গীতাও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত এবং নূতন শ্লোক সংযোজন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।"

—(হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, "গীতায় ঈশ্বরবাদ," ২০৫ পৃঃ)

"বঙ্গের পণ্ডিতাগ্রগণ্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রমাণে সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে, পদ্মনাভ ঋষিই (ব্যাস নহেন ?) গীতা রচনা করিয়া মহাভারত কাব্যগ্রন্থে যোগ করিয়া দিয়াছেন। মৈথিলী মহামহোপাধ্যায় কাঞ্চ পদ্মনাভ দত্ত জাতিতে গোপাল ছিলেন, তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক; তিনি নিজ ব্যাকরণ (কলাপ) মধ্যে বাণভট্ট প্রণীত কাদম্বরীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায়, হর্ষবর্দ্ধনের জীবনালেখ্য (হর্ষচরিত) প্রণেতা বাণভট্টের পরে পদ্মনাভ দত্ত বর্ত্তমান ছিলেন। রাজা হর্ষবর্ধন ৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চীন দেশীয় লেখক মাতলীনের মতে খৃষ্টীয় ৫৪৮ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন ইহলোক ত্যাগ করেন। সুতরাং বলিতে হইতেছে: ভাগবদ্‌গীতা সপ্তম শতাব্দীর শেষে রচিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শংকরাচার্য এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বোপদেব গীতার টীকা রচনা করিয়াছেন। আরও প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গীতা আধুনিক; গীতায় বহু নূতন শব্দ পাওয়া যায়। এমন কি গীতা কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রভৃতিরও পর-সাময়িক।" —(হিন্দুদর্শন ও খৃষ্টীয় দর্শন, একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

গীতায় কেন্দ্রীয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, অথবা তিনি যে ভগবানের অবতার নন, তাহাও অনেকে প্রমাণ করিয়াছেন। পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত 'ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ৪২২ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন:

"শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম অথবা পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি: শ্রীকৃষ্ণ কোনস্থানে কি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম বা পূর্ণব্রহ্মের অবতার? এ কথার উত্তরে কৃষ্ণোপাসক সহজেই বলিলেন: কেন, গীতায় তিনি আপনাকে পুনঃপুনঃ ব্রহ্মরূপে ব্যক্ত করিতেছেন। এ কথার উত্তরে প্রথমতঃ এই বলি যে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বক্তা এবং অর্জুন শ্রোতা। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন, ইহাও সত্য। কিন্তু বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ এরূপে অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, অথবা গীতাকার তাঁহাকে বক্তা করিয়া অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন,

ইহা কে মীমাংসা করিবে? একদিকে পাণ্ডব-সৈন্য অপরদিকে কুরু-সৈন্য। এই উভয়ের মধ্যে অর্জুনের রথ। সকলেই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। এমন সময় অর্জুনের সংশয় নিরাকরণ জন্য তাঁহার প্রশ্নোত্তরে তিনি তাঁহাকে এত উপদেশ দিলেন যে, তাহাতে একখানি গ্রন্থ হইয়া গেল। ইহা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? যদি কেহ বলেন: কোন মানুষের পক্ষে যাহা অসম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে তাহাই সম্ভব; ঐশী শক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে। তাহা হইলে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার কিনা, ইহাই তো প্রশ্ন। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন করিবার পূর্বে স্বীকার করিয়া লইলে চলিবে কেন? বক্তা ও শ্রোতা কল্পনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করা আমাদের দেশের চিরন্তন প্রথা। মহাভারতাদি প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ ঐ প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রসমূহে মহাদেব বক্তা, পার্বতী শ্রোতা। বাংলা ভাষাতেও অনেক স্থলে উক্ত প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। এমন কি প্রতি বৎসর যে শ্রীরামপুর পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, উহার বক্তা মহাদেব এবং শ্রোতা পার্বতী। যথা:

"হর প্রতি প্রিয়ভাবে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।
কোন্ গ্রহ হইল রাজা, কেবা মন্ত্রীবর
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি দিগম্বর।
ভব কন ভবানীকে কহি বিবরণ।
বৎসরের ফলাফল করহ শ্রবণ।"

এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীরামপুরের পঞ্জিকাকে কি শিবোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? হিন্দু মাত্রই বলিবেন, না ইহা কল্পনা মাত্র।"

(হিন্দু-দর্শন ও খৃষ্টীয়-দর্শন, ৪২৬-৪২৭ পৃঃ)

নগেন্দ্রবাবু আরও বলেন:

"কৃষ্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন এ কথা ভাগবতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ অবস্থায় দেখিলেন, তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে:

"ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং···প্রকৃতে পরং ॥

অর্থাৎ : "কোথাও সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন, কোথাও বা প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরমাত্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন।

এইরূপে কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন। কৃষ্ণ যদি নিজেই পূর্ণব্রহ্ম, তবে তিনি অপর কোন্ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন ?"

গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলা হইয়াছে। এই অবতারবাদও যে হিন্দুধর্মের নিজস্ব মত নয় উহা যে ধার করা, ইহাও অনেক পণ্ডিতের মত :

"উপনিষদে ও বৈদিক সময়ে অবতারবাদ ছিল না……দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মে অবতারবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পণ্ডিত ৺ব্রজেন্দ্রকুমার শীল মহাশয় তৎকৃত 'খৃষ্টধর্ম' ও 'বৈষ্ণবধর্ম' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম ও তাহার ভিত্তি, উৎপত্তি, বিস্তৃতি খৃষ্টধর্ম হইতে হইয়াছে। প্রথম শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম হইতে অবতারবাদ লওয়া হইয়াছে, গীতায় পরে উহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।……প্রথম শতাব্দীতে সাধু টমাস এবং বার্থালমিউ ভারতভূমে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পাঞ্জাব প্রদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং অনেক লোককে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহারাই এ দেশে অবতারের কথা আনিয়াছিলেন। …যিশুখৃষ্টের বাল্যলীলা অবলম্বনে ভারতীয় বালকৃষ্ণ উপাখ্যান রচিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার ছিলেন না, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ আর একটি প্রমাণ দেখাইতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলিয়া কখনই মনে করিতেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে তিনি স্পষ্ট করিয়া অর্জুনকে বলিতেছেন : পূর্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় এক্ষণে আর আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না।" তিনি পূর্ণব্রহ্মের অবতার, তিনি আপন কথা আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন—আর উহা স্মৃতিপথে উদিত হইবে না—ইহা বড় চমৎকার কথা! তারপর আবার বলিতেছেন : এক্ষণে আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্তন করিতে পারি না, আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্তন করিয়াছিলাম।"—(হিন্দুদর্শন ও খৃষ্টীয় দর্শন)

শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব এবং ঐতিহাসিক সত্তা সম্বন্ধেও অনেকের সন্দেহ আছে। শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় সম্বন্ধে বেদ, উপনিষদ, মহাভারত এবং গীতা—কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই :

"বেদে দুই কৃষ্ণ, একজন মন্ত্ররচয়িতা ঋষি, আর একজন যোদ্ধা। মহাভারত ও পুরাণে এই দুই বৈদিক কৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন। মহাভারতে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, কিন্তু অনার্য, গোপকুলে প্রতিপালিত ; বেদের ঋষি-কৃষ্ণও আঙ্গিরস অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ আঙ্গিরস বংশোদ্ভব, কিন্তু যোদ্ধা-কৃষ্ণ অনার্য। পৌরাণিক কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের সদ্ভাব নাই, নানাস্থানে উভয়ে কলহ ও যুদ্ধ। বৈদিক অনার্য-কৃষ্ণ ইন্দ্রের ঘোর শত্রু, কিন্তু বেদে ইন্দ্রের নিকট কৃষ্ণ পরাস্ত। পুরাণে আবার সেই পরাজয়ের যথেষ্ট প্রতিশোধ—প্রতিপদেই ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'দেবকী-নন্দন কৃষ্ণের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার গীতায় সেই শ্রীকৃষ্ণই ভগবানের পূর্ণ অবতার। যে-বেদব্যাস মহাভারতে কৃষ্ণকে সারথি, মিথ্যাবাদী শঠ ও প্রতারক সাজাইয়াছেন, তিনিই আবার গীতায় তাঁহাকে ভগবানের অবতার করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ভারতে সারথি, অথচ গীতায় অবতার! সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে, বেদব্যাস গীতা রচনা করেন নাই।" —(হিন্দুদর্শন ও খৃষ্টীয় দর্শন)

"পুনশ্চ বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসর ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ, প্রণীত 'পাগলা-ঝোরা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে 'গীতায় প্রক্ষিপ্তবাদ' (১৩ পৃঃ) নিবন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, গীতা গ্রন্থ প্রক্ষিপ্ত। লেখক বলেন : "কথায় কথায় গীতার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, যতই ভাল করিয়া দেখিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে গীতা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে বোঝাই। ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় কেন, অর্জুনও প্রক্ষিপ্ত। একটু সমঝাইলে আপনারাও ইহা ধরিতে পারিবেন। দেখুন, উভয়ের কথোপকথন স্থলে উপদেশ দান—এই নাটকীয় কৌশল মহাভারতের সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং গীতা প্রথমে তত্ত্বোপদেশের আকারে লিখিত হয়, পরে যখন ব্যাস, সৌমিল্ল, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ নাটক লেখা সুরু করেন, তখন তদ্দৃষ্টে কোন অজ্ঞাতনামা কবি 'গীতা' খানির একঘেয়ে

ধরণ দূর করিবার মানসে প্রশ্নোত্তরের (catechism) আকারে পুনর্লিখিত করিলেন। অর্জুনকৃত বিশ্বরূপ-স্তব আদিম ও অকৃত্রিম, কিন্তু উহা গ্রন্থকারকৃত স্তবাকারে গ্রন্থারম্ভেই ছিল, অর্জুনের নাম-গন্ধও ছিল না। বিশ্বরূপদর্শনের প্রসঙ্গও ছিল না। পরে খুব একটা জমকালো দৃশ্য (scenic effect) দেখাইবার জন্য বিশ্বরূপ-দর্শন প্রাক্ষিপ্ত হয়।—সাহিত্যে এই থিয়েটারী ভাব প্রকাশ করিলে গীতার প্রচলিত নাটকীয় সংস্করণ হইল। ইহাই গীতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস।" — (হিন্দুদর্শন ও খৃষ্টীয় দর্শন)

অতএব দেখা যাইতেছে বিশুদ্ধ একত্ববাদ হিন্দুধর্মে নাই বলিলেই চলে। যেটুকু আছে, তাহাও নানা মুনির নানা মত দ্বারা বাধিত ও খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। অদ্বৈতবাদের যে একত্ববাদ তাহা ইসলামের একত্ববাদ বা তৌহিদ নহে; সর্বভূতে ঈশ্বরত্ব কল্পনা করিলে যে একত্ব পাওয়া যায়, তাহাও তৌহিদ নহে। ইসলামের স্রষ্টা এবং সৃষ্টি পৃথক। সৃষ্টি বহু, কিন্তু স্রষ্টা এক। ইহাই ইসলামের একত্ববাদ বা তৌহিদ।

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর ধর্ম। ইহাও দুঃখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের পন্থাই হইতেছে 'নির্বাণ'।

বৌদ্ধধর্ম কোন নূতন ধর্ম নয়; উপনিষদই হইতেছে ইহার ভিত্তি।* Max Muller বলিতেছেন :

"Many of the doctrines of the Upanishads are of no doubt pure Buddhism or rather Buddhism is on many points the consistent carrying out of the principle laid down in the Upanishads."

বুদ্ধের নির্বাণ সম্বন্ধে Dr. Radhakrishnan বলিতেছেন :

"At any rate, Nirvan, according to Buddhism, is not the blessed fellowship with God, for that is a perpetuation of the desire for life."

* উপনিষদই বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি অথবা বৌদ্ধধর্মই উপনিষদের ভিত্তি, ইহা নিশ্চিত বলা কঠিন।

বৌদ্ধ ধর্মে যখন ঈশ্বরই অংগীকৃত হয় নাই, তখন তাহাতে একেশ্বরবাদ আছে কি না, সে কথাই আসিতেই পারে না। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না; তবে বৌদ্ধ ধর্মের স্বপক্ষে একটু বলা যায় যে, তাহারা ঈশ্বর মানে না বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীবাদও মানে না।

খৃষ্টধর্ম

ত্রিত্ববাদ (Trinity) খৃষ্ট ধর্মের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র পিতা (God the Holy Father), পবিত্র পুত্র (God the Holy Son) এবং পবিত্র আত্মা (God the Holy Ghost) এই ত্রয়ীর মিলিত রূপই হইতেছে ঈশ্বর। যীশুখৃষ্টকে খৃষ্টানগণ ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া জানেন এবং বলেন যে, তিনি ঈশ্বরের অবতার (Incarnation of God)।

কিন্তু খৃষ্টধর্মের আদিতেও যে ঈশ্বরের স্বরূপ এইরূপই ছিল, তাহা নহে; তিনি একে-একে-তিন--- এই অভিনবত্ব New Testament-এর সৃষ্টি, Old Testtament-এ ইহা নাই। সেখানে ঈশ্বর একক এবং অদ্বিতীয়রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন।*

এখানে বলিয়া রাখা ভালো, মূল বাইবেলে হযরত ঈসা আলায়হিস্-সালাম আল্লার যে-পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইসলামের ন্যায় সম্পূর্ণ না হইলেও মিথ্যা ছিল না। সে পরিচয় প্রত্যেক মুসলমান মানিয়া লইতে পারে; কারণ কুরআন বলিতেছে: মুসলমান হইতে হইলেই হযরতের পূর্ববর্তী সমস্ত ঐশীগ্রন্থকে বিশ্বাস করিতে হইবে। এইজন্যই বাইবেল (ইঞ্জিল) কখনও মুসলমানের নিকট অশ্রদ্ধার বস্তু নয়। সুতরাং খৃষ্ট বা খৃষ্টের ধর্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করা আমাদের শোভা পায় না; বাইবেলকে খৃষ্টান পাদ্রীগণ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এই ত্রিত্ববাদ তাহাদেরই সৃষ্টি—ইহাই আমাদের কথা, আর এইখানেই আমাদের আপত্তি।

খৃষ্টানেরা যিশুখৃষ্ট এবং পবিত্রাত্মাকেই শুধু ঈশ্বরত্বে উন্নীত করেন নাই, যিশুখৃষ্টের মাতা মেরীতেও ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, মুসলমানেরা যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধে এই মত স্বীকার করেন না।

* Hear, O Israel, The Lord, Our God is one Lord—Deut (4 : 6).

যিশুখৃষ্টকে তাঁহারা একজন পয়গম্বর বলিয়াই জানেন। কুরআন এ সম্বন্ধে কী বলিতেছে দেখুন :

"হে গ্রন্থধারিগণ, তোমরা ধর্মের গণ্ডী লংঘন করিও না। মরিয়ম-পুত্র ঈসা আল্লার প্রেরিত একজন রসুল এবং মরিয়মের নিকট প্রেরিত আল্লার কালাম ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছুই নন; অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলকে বিশ্বাস কর এবং 'তিন' বলিও না। ক্ষান্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম কার্য। আল্লাহ্‌ মাত্র একজন; তাঁহার কোন পুত্র আছে—ইহা তাঁহার পক্ষে মস্ত বড় অগৌরবের কথা; স্বর্গে-মর্ত্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার এবং রক্ষকের পক্ষে আল্লাই যথেষ্ট।"

অন্যত্র আছে :

"নিশ্চয়ই তাহারা অবিশ্বাসী—যাহারা বলে : অবশ্যই আল্লাহ্‌ তিন জনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি।" —(৫ : ৭৩)

"মরিয়মের পুত্র মসিহ্‌ (যিশু) একজন পয়গম্বর মাত্র; তাঁহার পূর্ববর্তী পয়গম্বরেরা মারা গিয়াছেন; এবং তাঁহার মাতা একজন সত্যবাদিনী নারী ছিলেন; তাঁহারা উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করিতেন। দেখ আমরা তাহাদিগের নিকট কিরূপ সুস্পষ্ট বাণী প্রেরণ করিলাম এবং কিরূপে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গেল।

— ৫ : ৭৫)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, হযরত মুহম্মদের সমসময়ে খৃষ্টান-জগৎ আল্লার স্বরূপ ও একত্ব সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা পোষণ করিত। পথের দিশা পাইয়াও তাহারা পথহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

পারসিক, ইহুদী, চীন, গ্রীক, রোমান ও অন্যান্য জাতিও যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা পোষণ করিত, এ কথা সর্বজনবিদিত। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে-সকল আলোচনা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম।

হযরত মুহম্মদের আল্লাহ্‌

এইবার হযরত মুহম্মদ আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে কী পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন, দেখা যাউক :

আল্লাহ্‌ শব্দটি অতুলনীয়। অন্য কোন ধাতু বা শব্দ হইতে ইহা

উদ্ভূত নহে ; ভগবান ঈশ্বর, God, ইত্যাদি শব্দের বহুবচন আছে স্ত্রীলিঙ্গ আছে, কিন্তু আল্লাহ্ শব্দের সেরূপ কোন রূপান্তর নাই। ইহা সর্বপ্রকার সম্বন্ধরহিত একক ও অনুপম এক নাম।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ইসলামের আল্লাহ্ তাঁহার নামের মধ্যেই ব্যাখ্যাত হইয়া আছেন।

এই আল্লাকে বুঝিতে হইলে দুই উপায়ে বুঝিতে হইবে : (১) আল্লাহ্ কী নন, (২ আল্লাহ্ কী।

আমরা প্রথমে আল্লাহ্ কী নন, সেই দিক দিয়া আরম্ভ করিব। বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে সব ধারণা করা হইয়াছে, দেখা যাউক, সেগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা। প্রতিবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আল্লাহ্ কী বলিতেছেন, দেখুন :

> "এবং যাহারা তাঁহাকে (আল্লাহ্‌কে) ছাড়িয়া অপর কাহাকেও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং বলে যে আল্লার নৈকট্যলাভের সহায়তা করিবে বলিয়াই আমরা তাহাদিগকে পূজা করি, আল্লাহ্ তাহাদের বিচার করিয়া দেখাইয়া দিবেন যে, কোথায় তাহাদের পার্থক্য। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাকে সত্যপথে চালিত করেন না-- যে মিথ্যাবাদী এবং অকৃতজ্ঞ।"
>
> --(৩৯ : ৩)

এখানে পৌত্তলিকতা ও দেবদেবীবাদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা হইতেছে এবং এসব করিতে নিষেধ করা হইতেছে। আল্লার প্রকৃত পরিচয় যে এ নয়, এই কথাই এখানে বুঝা যাইতেছে। যাহারা প্রকৃতি-পূজক তাহাদের সম্বন্ধেও বলা হইতেছে :

> "—এবং তাঁহারা (আল্লার) নিদর্শনের মধ্যে রাত্রি, দিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি, (কাজেই) চন্দ্রকে বা সূর্যকে আল্লাহ্ বলিও না, (কারণ) তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"
>
> —(৪১ : ৩৭)

পারস্যবাসীরা জগতের মংগল ও অমংগল লক্ষে দুইজন খোদার কল্পনা করিয়াছিলেন ; মংগলের খোদা আরমুজ্‌দ, অমংগলের খোদা আহরিমন। আল্লাহ্ যে তাহা নন, তাহাও তিনি বলিয়া দিতেছেন :

> "এবং আল্লাহ্ বলিয়াছেন : দুইজন আল্লাহ্ আছেন একথা বিশ্বাস করিও না, আল্লাহ্ শুধুই একজন এবং কেবলমাত্র আমাকেই ভয় করিবে।"
>
> —(১৬ : ৫১)

খৃষ্টানদিগের ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"অতএব আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার পয়গম্বরদিগকে বিশ্বাস কর এবং বলিও না যে (আল্লাহ্‌) তিনজন। ক্ষান্ত হও, ইহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম ; আল্লাহ্‌ মাত্র একজন।" —(৪ : ১৭১)

আল্লার যে স্ত্রীপুত্রাদি নাই, সে সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং তাহারা বলে, করুণাময় আল্লাহ্‌ একটি পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তোমরা একটি ঘৃণিত ধারণা করিতেছ ; আকাশ-পৃথিবী বিদীর্ণ হউক যদি তাহারা আল্লাতে পিতৃত্ব আরোপ করে !"

—(৪ : ১৭১)

"—নিশ্চয়ই তাহারা অবিশ্বাসী "যাহারা বলে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনের মধ্যে একজন ; এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন আল্লাহ্‌ নাই এবং তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা হইতে যদি প্রতিনিবৃত্ত না হয় ; তবে সেই সব অবিশ্বাসীদিগের উপর ভীষণ শাস্তি হইবে।"

—(৫ : ৭৩)

অতএব দেখা যাইতেছে, হিন্দু, খৃষ্টান, পার্শী বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যে-রূপে আল্লাকে কল্পনা করিয়াছে, আল্লাহ্‌ তাহা নন।

আল্লাহ্‌ তবে কে বা কী ?

সূরা 'এখ্‌লাসে' অতি অল্প কথায় আল্লাহ্‌ কী সুন্দর ভাবেই না আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

"কুল্‌হু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্‌ সামাদ, লাম-ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ্‌ অলাম অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফ্‌ওয়ান আহাদ।"

অর্থাৎ : বল হে মুহম্মদ) আল্লাহ্‌ এক—আল্লাহ্‌ সমস্ত-কিছুর নির্ভর, তিনি জন্ম দেন না, জন্ম গ্রহণও করেন না, তাঁহার সমতুল্য আর কেহই নাই।

এখানে আল্লাহ্‌ তাহার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতেছেন, (১) তিনি বিশুদ্ধ এক (২) সব-কিছুর নির্ভর (৩) তিনি জন্ম দেন না (৪) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন না (৫) তাঁহার সমতুল্য অন্য কিছুই নয়। এই পাঁচটি কথার মধ্যেই সৃষ্টিতত্ত্বের সমস্ত দার্শনিক ব্যাখ্যা লুক্কায়িত আছে। আল্লাহ্‌ যে বিশুদ্ধ এক, সমস্ত সৃষ্টি যে তাঁহা হইতেই [illegible]রিত হইয়াছে, আল্লার যে-স্ত্রী-পুত্রাদি নাই, পুত্ররূপে বা অবতাররূপে তিনি

জন্মগ্রহণ করেন না এবং কোনরূপ প্রতীক দ্বারাই যে তাঁহাকে বুঝান যায় না, এই কথাই এখানে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই অতি-উর্ধ্ব ভাবই হইতেছে ইসলামের আল্লার বিশেষত্ব। 'আল্লাহ্ কাহারও মতই নন.'—ইহাই আল্লার পরিচয়! তাঁহার সহিত সাদৃশ্য থাকিতে পারে—এমন কিছুই নাই। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'সোঽহং' বা 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—অথবা 'জীবই ঈশ্বর'—এ সব কথা ইসলামের আল্লাহ্ সম্বন্ধে বলা যাইবে না। আমরা যাহা, আল্লাহ্ তাহা নন। আমাদের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে; আল্লার তাহা নাই। আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাম-ক্রোধ আছে, আল্লার তাহা নাই; আমাদের সন্তান-সন্ততি আছে আল্লার তাহা নাই; এমন কি আমরা যে অবস্থান করি,—এই অবস্থানের (**existance**-এর) গুণ হইতেও তিনি মুক্ত; অর্থাৎ অবস্থান না করিয়াও তিনি থাকিতে পারেন। ইহাই আল্লার 'আহাদ' রূপ! এই 'একের' সহিত 'বহুত্বের' ভাব আদৌ জড়িত নাই।

আল্লাহ্ যে আমাদের সকল পরিচয় ও সকল বিশেষণের উর্ধ্বে, আল্লাহ্ তাহা নিজেই বলিয়া দিতেছেন:

"কোন-কিছুই তাঁহার (আল্লার) মত নয়।"—(৪২ : ১১) কাজেই তুলনা দিয়া মূর্তি কল্পনা করিয়া তাঁহাকে বুঝিবার বা বুঝাইবার উপায় আমাদের নাই। যতই বলি, যতই বুঝাই, আল্লাহ্ সমস্ত কিছুরই অতীতে।

এই বিশুদ্ধ চির-পবিত্র একের নামই আল্লাহ্!

ইসলামে আল্লার ৯৯টি নাম আছে কিন্তু সেগুলি আল্লার গুণ, আল্লার প্রকৃত স্বরূপ নয়; কেননা গুণ হইতে বস্তু পৃথক। শিখার জ্যোতিঃ যেমন শিখা নয়, আল্লার গুণও তেমনি আল্লাহ্ নয়। 'আল্লাহ্' হইতেছে সেই আসল বস্তুটির নাম (ইস্‌মে জাত) বাকী নামগুলি হইতেছে তাঁহার বিশেষণ (ইস্‌মে সিফাৎ); আল্লাকে কেন্দ্র করিয়াই এই নামগুলি চতুর্দিকে ছড়াইয়া আছে।

আল্লার আস্‌লিয়াৎ বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই; গুণ দ্বারা তাহাকে বুঝিতে হইবে। কাজেই আল্লার স্বরূপ বুঝিবার জন্য এই নামগুলি আমাদের জানা দরকার।

অবশ্য প্রথমেই বলিয়া রাখা ভালো: এই নামগুলির মধ্যে মানবোচিত

বিশেষণই প্রকাশ পাইয়াছে : আল্লাহ্ 'শ্রোতা', 'জ্ঞাতা' ইত্যাদি ধরণের অনেক কথা আছে। ইহা দ্বারা পাঠক যেন মনে না করেন যে, আল্লাহ্ বুঝি আকার-বিশিষ্ট। তাহা নিশ্চয়ই নয়। আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবেই আমাদিগকে এ-সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেছেন :

"দৃষ্টি তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকল দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন।" —(৬ : ১০৪)

কাজেই যদি বলা হয় : তিনি 'দেখেন' বা 'শুনেন', তবে এ-কথার অর্থ এ নয় যে, তাঁহার চোখ আছে বা কান আছে। চোখ ছাড়াও তিনি দেখেন, কান ছাড়াও তিনি শোনেন। আরস, কুর্সী, লওহ্, মাহফুজ— ইত্যাদির ব্যাখ্যাও অনুরূপ।

আল্লার ৯৯ নাম

ইসলামের আল্লার আর একটি বৈশিষ্ট্য—তাঁর ব্যক্তিত্ব। নানাগুণে তিনি গুণান্বিত।

আল্লার ৯৯টি নামের মধ্যে ৪টি সমধিক প্রসিদ্ধ : 'রব্' রহমান, 'রহিম' ও 'মালিক'। সূরা ফাতিহায় এই চারিটি নামের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। 'রব' অর্থে সৃজনকারী ও পালনকারী মহাপ্রভু ; 'রহমান' অর্থে পরম করুণাময়, 'রহিম' অর্থে পরম দাতা এবং দয়ালু এবং 'মালিক' অর্থে বিচারক। স্রষ্টা, প্রেমময়, দাতা এবং বিচারক এই চারিটি গুণের মধ্যেই মোটামুটি ভাবে আল্লার সমস্ত পরিচয় নিহিত আছে। আল্লাই একমাত্র সৃজনকর্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা ; তিনি প্রেমময়, সৃষ্টির প্রতি তাঁহার অফুরন্ত প্রেম ও করুণা ; তিনিই সব-কিছু দান করেন তিনি, পরম দাতা ; যাহা আমরা ভোগ করি সব তাঁহার নিকট হইতে আসে, পক্ষান্তরে অন্যায় করিলে সে অন্যায়ের ন্যায্য বিচার করিয়া তিনি অন্যায়কারীর শাস্তি বিধানও করেন। মোটামুটি এই ধারণাই আল্লাকে চিনিবার পক্ষে যথেষ্ট।

অন্য নামগুলি এই :

(১) আত্মপরিচয় সম্বন্ধীয় :

আল্-আহাদ (এক), আল্ হক (সত্যময়), আল্-কুদ্দস (পবিত্র)

আস্-গনি (সকলের নির্ভরস্থল), আল্‌নি (নিজেই নিজের জন্য যথেষ্ট), আল্-আউয়াল (আদি), আল্-আখির (অন্ত) আল্-হাই (চিরকাল স্থায়ী), আল্-কাইউম (অন্যনিরপেক্ষ)।

(২) সৃষ্টি বিষয়ক :

আল্-খালিক (স্রষ্টা), আল্-বারী (আত্মার স্রষ্টা), আল্-মুসাব্বির (আকার দাতা), আল্-বদী (প্রথম আবিষ্কারক)।

(৩) প্রেম ও করুণা বিষয়ক :

আর্-রহমান (করুণাময়), আর্-রহিম (অদ্বিতীয় দাতা), আল্-গফুর (ক্ষমাকারী), আর্-রউফ (স্নেহময়), আল্-অদুদ (প্রেমময়), আল্-লতিফ (অনুগ্রহশীল), আত-তাওয়াব (পুনঃ পুনঃ দয়ায় প্রত্যাবর্তনকারী), আল্-হালিম (ধৈর্যশীল), আল্-আফু (ক্ষমাশীল), আশ্ শাকুর (বহুগুণ পুরস্কারদাতা) আস্-সালাম (শান্তিদাতা), আল্-মুমিন (অভয়-দাতা), আল্-বারর্ (সদাশয়), রফিউদ-দারাজাত (সম্মানদাতা), আর্-রাজ্জাক (জীবিকা-দাতা), আল্-ওহাব (চরম দাতা), আল্-অসী (প্রচুর দাতা)।

(৪) গৌরব ও মহত্বসূচক :

অল্-আজিম (মহান), আল্-আজিজ (সর্বশক্তিমান), আল আলি (সুউন্নত), আল কা'বি (সরল), আল্-কাহহার (শাস্তিদাতা), আল্-জাব্বার (ক্ষতিপূরণ-কারী), আল্-মুতাকাব্বির (মহত্বের অধিকারী), আল্-কবীর (মহৎ) আল-করিম (সম্মানাস্পদ), আল-হামিদ (প্রশংসার্হ), আল-মজিদ (গৌরবান্বিত), আল্-মতিন (সক্ষম), আল্-জাহির (সর্ব-অতিক্রমকারী), জুলজালালে-আল্-ইকরাম (গৌরব ও সম্মানের প্রভু)।

জ্ঞান সম্বন্ধীয় :

আল্-আলিম (জ্ঞাতা), আর্-হাকিম (জ্ঞানী), আস্-সামী (শ্রোতা), আল্-খবীর (সজাগ), আল্-বসীর (দ্রষ্টা), আশ্-শহীদ (সাক্ষী), আর-রকীব (পাহারাদাতা), আল্ বাতিন (গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা), আল্-মুহাইমিন (সকলের অভিভাবক)।

(৬) শক্তি ও শাসন-ক্ষমতা সম্বন্ধীয় :

আল্-কাদির (শক্তিময় , আল্-আকিল (সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক), আল-অলিহ্ (সর্ব বিষয়ের অভিভাবক), আল্-হাফিজ (রক্ষক), আল্-মালিক (সম্রাট), আল্-মালিক (প্রভু), আল্-ফাতাহ (বিচারক), আল্-হাসিব হিসাব-

নিকাশ গ্রহণকারী), আল্‌-মুন্তাকিম (প্রতি কার্যের পুরস্কার বা শাস্তিদাতা), আল্‌-মুকিৎ সর্ব বিষয়ের নিয়ন্তা।

অন্যান্য নামগুলির দ্বারাও আল্লার এইরূপ কোন-না-কোন গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিলাম না।

এখানে কেহ যেন মনে না করেন : তবে কি আল্লার পরিচয় মাত্র এই ৯৯টি নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ? নিশ্চয়ই নয়। গুণের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দিলেও ত আল্লাহ্‌ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়েন। আল্লাহ্‌ তাই এই গুণগুলির মধেই সীমাবদ্ধ নন। ইহারও বাহিরে তিনি আছেন। মানুষের জ্ঞান সসীম ; কাজেই আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি যত দূর নাগাল পায়, ততদূর পর্যন্তই আল্লাহ্‌ নিজের পরিচয় দিয়াছেন। মানুষের পক্ষে এই পরিচয়ই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ। ইহার ঊর্ধ্বে বা অতীতে আসলে তিনি কী, তাহা মানুষের বোধগম্য নয়। মানুষের যাহা ধারণার বাহিরে, তাহা বলিয়া লাভ কী ? আল্লাহ্‌ তাই বলেন নাই। সেই হিসাবে এখনও আল্লাহ্‌ আত্মগোপন করিয়াই আছেন। আল্লার স্বরূপ একমাত্র আল্লাই জানেন, অন্য কেহ জানে না।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

আল্লার পরিচয় সংক্ষেপে দিলাম। তিনিই যে বিশ্ব-নিখিলের স্রষ্টা ও পালয়িতা এবং আমাদের জীবন-মরণের প্রভু, আশা করি সেকথা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি (খালিক্ব ও মাখ্‌লুক)-এর মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ কী, সে কথাও আমাদের জানা দরকার, নতুবা আল্লার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

আল্লাহ্‌ স্রষ্টা। জগৎ তাঁর সৃষ্টি। আল্লাহ্‌ চিরসত্য ও চিরঞ্জীব, ইহা সর্ববাদীসম্মত। জগৎ সত্যি কি না, তাহাই লইয়া যত মতভেদ। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল বলিয়াছেন যে, একমাত্র সেই পরম সত্ত্বা (The Absolute Idea)-ই সত্য, জগৎ মিথ্যা, মায়া বা মরীচীকা (Illusion)। এই যে সুন্দর পরিদৃশ্যমান জগৎ, এর কোন মূল্য নাই ; স্বপ্নের মত একদিন ইহা মিলাইয়া যাইবে ; জাগিয়া রহিবে শুধু সেই পরম ধ্যান বা পরম সত্ত্বা। বলা বাহুল্য, জগৎ যদি

মিথ্যা হয়, তবে মানুষও মিথ্যা হইয়া যায়। প্লেটোনিক দর্শনে তাই মানুষের কোন স্থায়ী অস্তিত্ব নাই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেও সেই চরম সত্তার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই তাহাদের মত। এই দর্শন মানিলে চির-নিরাশায় মানুষের মন ভরিয়া উঠে, সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণ বা অবলম্বন সে খুঁজিয়া পায় না; স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ উদাসীন সন্ন্যাসী হইয়া উঠে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাই মানব জীবনের পরিচয় বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যখন চিরতরে লোপ পাইবেই, তখন কিসের সংসার, কিসের ঘরকন্না, কিসের ব্যবসা-বাণিজ্য, কিসের যুদ্ধবিগ্রহ? মহামৃত্যুর চিন্তা তখন মানুষকে হয় কর্মবিমুখ করে, না হয় ত লম্পট স্বেচ্ছাচারী বা ইহজীবন-সর্বস্ব জড়বাদী করিয়া তুলে। পরকাল নাই, অমর জীবনের আশা নাই, কর্মফলের ভয় নাই,—এমন এক অদ্ভুত জীবন-বোধ মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বলা বাহুল্য হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পরে ইউরোপের চিন্তাধারায় এই বৈশিষ্ট্যই প্রকট হইয়াছিল।

ভারতীয় দর্শনেও একই মায়াবাদ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ঈশ্বর সেখানে অংগীকৃত হয় নাই। ষড়দর্শনের প্রায় সবগুলিই নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের উদ্‌গাতা। একমাত্র বেদান্ত-দর্শনেই ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সেখানেও সেই প্লেটোর দর্শনই ক্রিয়া করিতেছে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—ইহাই বেদান্ত দর্শনের সার কথা। প্লেটোর মায়াবাদে এবং বেদান্ত মতে তাই বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই। মূলতঃ তাহারা একই। উভয় দর্শনেই সেই পরম সত্তাকে (Idea বা ব্রহ্মকে) একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পরম সত্তার একত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দুই উপায়ে করা যায়: হয় জগতকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়, না হয় ত জগতও ব্রহ্মময়—এই কথা বলিতে হয়। বেদান্ত-দর্শন এই দ্বিতীয় পথের অনুসারী। বেদান্তের মতে জগৎ ব্রহ্মময়, বা জীবই শিব; অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগতের সবকিছুই ব্রহ্মের অংশ, সবাইকে মিলাইয়া যে পরম এক, তিনিই ব্রহ্ম। এই মতবাদকে ইংরাজীতে **Pantheism** (সর্বব্রহ্মবাদ) বলে। এই মতানুসারেই বলা হইয়া থাকে 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম), 'সোঽহং' (সেই আমি) বা 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (এই আত্মাই ব্রহ্ম)।*

---

* বেদান্তের এই মতকে পরে শঙ্করাচার্য একটি দার্শনিক ভঙ্গি দিয়া দাঁড় করান। তাহার নাম দেন অদ্বৈতবাদ। শঙ্করাচার্য নবম বা দশম শতাব্দীর লোক।

বৌদ্ধদর্শনও অনুরূপ। 'নির্বাণ' বা মহাপ্রস্থানই বৌদ্ধদের কাম্য। মানবজীবন দুঃখকষ্ট, দ্বন্দ্ব-কলহ ও জরামৃত্যুতে পরিপূর্ণ। কর্ম করিতে গেলেই পাপ হয়, আর সেই কর্মফলেই বারে বারে জন্মলাভ করিয়া অশেষ দুঃখের ভাগী হইতে হয়। জীবন তাই একটি দুর্বিসহ অভিশাপ বিশেষ। এই অভিশাপ হইতে বাঁচিবার জন্য এমন মহামৃত্যু লাভ করা চাই—যাহার পর আর কোন প্রত্যাবর্তন নাই। ইহাই হইল নির্বাণের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য। বলা বাহুল্য, ইহাও সন্ন্যাস ও জীবনবিমুখিতার ধর্ম। ইহার মধ্যেও ধ্বনিত হয় চিরমৃত্যুর সুর।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে: খৃষ্টান, হিন্দু এবং বৌদ্ধ সব ধর্মেই জীবনকে কোন স্থায়ী মূল্য দেওয়া হয় নাই, মৃত্যুকেই বড় করিয়া দেখা হইয়াছে। জগৎ মিথ্যা, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের অবসান ঘটিবে অথবা পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে—ইহাই ছিল প্রাক্-ইসলামিক যুগের ধর্মবিশ্বাস। মানুষের যে স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্বা আছে এবং সে যে অমর জীবনের অধিকারী—এ কথা তাহাকে শোনান হয় নাই।

ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বনবী মুহম্মদ আনিলেন এক নূতন জীবন-দর্শন। তিনি শুনাইলেন নূতন বাণী। তিনি বলিলেন: আল্লাহ্ সত্য বটে কিন্তু তাঁর সৃষ্ট এই জগতও মিথ্যা নয়। এ-জগৎ আমাদের কর্ম-ক্ষেত্র বিশেষ, মানব জীবন অলীক নয়, স্বপ্ন নয়, ইহা বাস্তব—ইহা সত্য। তবে ইহাই পূর্ণসত্য নয়, এ জীবনের শেষে আমাদের পরজীবন আছে। উভয়কে মিলাইলে তবেই আমরা পূর্ণসত্য লাভ করিব। আমরা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যাইব না, অথবা আল্লাতেও লয়প্রাপ্ত হইব না। আমাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তিত্ব (individuality) আছে, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া আমরা অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিব। অন্তহীন প্রগতির মধ্য দিয়া আমাদের জয়যাত্রা। জীবন-পথে দুঃখকষ্ট দেখিয়া তাই আমরা পশ্চাদসরণ করিব না, বীরের মত যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইব।

ইসলাম জগতকে দিল এই বলিষ্ঠ পয়গাম।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় রসুলুল্লার ইন্তিকালের তিন-চার শতাব্দীর মধ্যেই মুসলিম জগতে এক অভিশাপ নামিল। গ্রীক, পারসিক এবং ভারতীয়

দর্শনের সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমানেরাও নিজেদের বলিষ্ঠ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইল; তাহাদের মধ্যেও গ্রীক মায়াবাদ ও ভারতীয় অদ্বৈতবাদ বাসা বাঁধিল। একদল মুসলিম সাধক সুফীমতবাদ প্রচার করিলেন। প্লেটো ও শঙ্করের ন্যায় তাঁহারা বলিলেন: এ জগৎ মিথ্যা, একমাত্র আল্লাহই সত্য; সুতরাং তাহারা দুনিয়াদারী ত্যাগ করিয়া শুধু আল্লার ধ্যানে তন্ময় হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তাঁহারা বলিলেন, জগতের সব কিছুই আল্লামময়। শঙ্কর যেমন বলিলেন: 'অহ্ ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম); সুফী মনসুর হাল্লাজও তেমনি বলিলেন 'আনাল্-হক্' (আমিই আল্লাহ্)। কাজেই দেখা যাইতেছে, অদ্বৈতবাদ এবং সুফীবাদে কোনই পার্থক্য নাই।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেন দেশীয় ইবনে আরাবী এই সুফী মতবাদকে একটা বিশিষ্ট দার্শনিক রূপ দেন। তিনি ইহার নাম দেন 'ওয়াহাদাতুল-অজুদ (অদ্বৈতবাদ)। ইংরাজীতে ইহাকে **Sufi-istic Pantheism** বা **Pantheistic Sufi-ism** বলা যায়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আলফ্সানি এই 'ওয়াহাদাতুল-অজুদ' মতবাদের খণ্ডন করেন। তিনি সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, খালেক-মাখলুকের অভিন্নতা বা একাত্মবোধ সাধনমার্গের একট স্তর বিশেষ; উহা চরম সত্য নয়। আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইলে এমন একটা পর্যায়ে আসিয়া সাধক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়—যেখানে মনে হয় স্রষ্টা এবং সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নাই। সর্বভূতে সে শুধু আল্লাকেই দেখিতে পায়। এই উপলব্ধির ফলেই সে বলিয়া উঠে 'আনাল্ হক্'। কিন্তু এখানে আসিয়া স্তব্ধ বা সম্মোহিত হইয়া গেলে চলিবে না। এ স্তরও অতিক্রম করিয়া আরো ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। তখন দেখা যাইবে—উপরে আরও দুইটি স্তর আছে: তাহাদের নাম 'জিল্লিয়াৎ' ও 'আবদিয়াৎ'। ওয়াহাদাতুল-অজুদ স্তরকে অতিক্রম করিলে দেখা যাইবে: সারা সৃষ্টি আল্লার নূরের তরঙ্গে দোল খাইয়া ফিরিতেছে। ইহাই 'জিল্লিয়াতের' অবস্থা। সর্বশেষে আসিবে আবদিয়াতের স্তর। এই স্তরে আসিলেই সাধক বুঝিতে পারিবে আল্লাহ্ মহত্তোমহীয়ান চিরগরীয়ান। বিশ্বনিখিলের তিনিই পরম প্রভু আর আমরা তাঁহার করুণার দান। জ্ঞান দ্বারা, প্রেম দ্বারা, অনুভূতি দ্বারা—কোনক্রমেই তাঁহাকে ধরা যায় না; সকল চিন্তা সকল অনুভূতি ব্যর্থ হইয়া তাঁহার দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসে।

এই সত্যকেই হযরত আবুবকর চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

"আল্ ইজ্‌জো আন্ দারকেল এদ্‌রাকুন্ ফহুয়া।
সুবহানো মানলাম্ ইয়াজ্ আল্ লিল্‌খাল্‌কি
ইলায়হি সাবিলা ইলা বিল্ ইজ্‌জি আন্ মারিফা তিহি।"

অর্থাৎ : তাঁহাকে জানা যায় না–ইহাই জানা হইতেছে তাঁহাকে চরম জানা। চির-পবিত্র সেই আল্লাহ্—যিনি তাঁহার নিকট পৌঁছিবার কোন পথই তাঁহার সৃষ্ট জীবনের জন্য উন্মুক্ত রাখেন নাই, শুধু মাত্র একটি পথই খোলা আছে - সেটি হইতেছে : তাঁহাকে জানা যায় না—এই জানার পথ।"

মুজাদ্দিদ আল্‌ফ্‌সানি ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়া এই মূল্যবান সংস্কার সাধন করেন। ইহার পর বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বকবি ইকবাল দার্শনিকতার দিক দিয়া বিকৃত সুফীবাদের কবল হইতে মুসলমানদিগকে রক্ষা করেন। ইসলামী দর্শনকে তিনি কাব্যের ভিতর দিয়া অপরূপ বেশে ফুটাইয়া তুলেন। মায়াবাদ এবং অদ্বৈতবাদের অসারতা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জগৎ যে মিথ্যা নয়, মানুষ যে মৃত্যুর সঙ্গেই চিরনির্বাণ লাভ করিবে না, অথবা আল্লাতে বিলীন হইয়া যাইবে না, তার আত্মা যে অমর, সীমাহীন শক্তি ও সম্ভাবনার সে যে অধিকারী, তার খুদীকে বা আত্মশক্তিকে পূর্ণরূপে জাগাইয়া দিলে সে যে আল্লার 'খলিফা'-রূপে তাঁহার পার্শ্বেই স্থান লাভ করিবে—এই কথা ইকবাল অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ইকবালের এই দর্শন নূতন কিছু নহে,—ইসলামের অন্তর্নিহিত মর্মকথারই প্রতিধ্বনি মাত্র। পুণ্যাত্মারা যে বেহেশতে অনন্তকাল ধরিয়া বাস করিবে (আসহাবুল জান্নাত্ ওয়াহুম ফিহা খালেদুন)—ইহা আল্লারই প্রতিশ্রুতি। এমন কি যাহারা পাপী, তাহাদিগকেও আল্লাহ্ ধ্বংস করিবেন না, তাহারাও চিরকাল দোজখে বাস করিবে (আসহাবুন্-নার ওয়াহুম ফিহা-খালেদু'ন)। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, মানুষের আত্মার বিনাশ নাই। অনেকের মতে জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয়। পাপীদের আত্মার ইহা শোধনাগার বিশেষ। সংশোধনের পর আল্লাহ্ গুনাহ্‌গারদিগকেও বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন এবং অনন্তকাল তাঁহারা তথায় বাস করিবে।

বস্তুতঃ মানুষ ছোট নয়, তুচ্ছ নয়, সে আল্লার খলিফা। চন্দ্র-সূর্য আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, বন-উপবন, পশুপক্ষী, তৃণলতা—সবই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। মানুষ আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—আল্লার নীচেই তার স্থান।

ইকবালের দর্শন তাই বলিষ্ঠ জীবনের দর্শন—দুর্জয় আত্মশক্তির দর্শন। নিজে শক্তিমান হইয়া বিশ্বকে জয় করিয়া আমরা আমাদের প্রগতির পথে অগ্রসর হইব, মৃত্যুর দুয়ার পার হইয়া অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিব; ইহাই তাঁহার বাণী। তিনি বলিয়াছেন: আমাদের 'খুদী'কে শক্তিশালী করিয়া গড়িতে হইবে, তাহা না হইলে নিজেরও কোন উন্নতি হইবে না, কওম বা বিশ্বেরও কোন উন্নতি হইবে না! একটা সুদৃশ্য ইমারত গঠন করিতে হইলে তাহার প্রতিটি ইট বা উপাদানকে মজবুত করিতে হয়, অন্যথায় গোটা ইমারতটাই দুর্বল হইয়া পড়ে। এই জন্যই 'খুদী'কে বলিষ্ঠ করার প্রয়োজন। অবশ্য এই আত্মশক্তিকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিলে চলিবে না; সমাজে আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে কার্য করিতে হইবে; কেন না মানুষ হইতেছে সামাজিক জীব। আত্মোন্নতির কথাও তাহাকে যেমন ভাবিতে হইবে, সমাজ বা বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর উন্নতির কথাও তাহাকে ঠিক তেমনি ভাবিতে হইবে।

উপরের আলোচনা হইতে একথা সুস্পষ্ট হইতেছে যে, ইসলামের জীবন-দর্শন হইতেছে: আল্লাহ্‌কে এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করা, পরকালে এবং অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করা, দুনিয়াকে মিথ্য বলিয়া বর্জন না করা, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগ্রাম করা এবং আল্লার খলিফার গৌরবময় পদমর্যাদা লাভ করিবার সাধনা করা। এই আদর্শই আমাদের মূল কলেমায় নিহিত রহিয়াছে:

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদ রসুলুল্লাহ্,

আল্লার নামের পাশেই মানুষের নাম! ইহা মানুষের চরম জয়-ঘোষণা নহে কি?

এখানে কলেমাটির কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন। সাধারণতঃ বাক্যটির এইরূপ অর্থ করা হয়: "আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ উপাস্য নাই। মুহম্মদ আল্লার রসুল।" কিন্তু এরূপ অর্থ সঙ্গত নহে। ইহা কোন যৌগিক বাক্য নহে—ইহা একটি মিশ্র বাক্য। যোগিক বাক্য হইলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া মুহম্মদ রসুলুল্লাহ্" হইত। 'ওয়া' যখন নাই তখন বাক্যটির অর্থ দ্বিধাবিভক্ত করা উচিত নহে। এরূপ করিলে উহার গূঢ় অর্থে তারতম্য ঘটিয়া যায়; কেহ বলিতে পারে: একত্ববাদই যদি স্বীকার ক হয়, তবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পর্যন্ত মানিলেই ত চলে; "মুহম্মদের

রসূলুল্লাহ্‌" এই অংশের কী প্রয়োজন ? এটুকু অনাবশ্যক। কিন্তু তাহা নহে। 'মুহম্মদর রসূলুল্লাহ্‌' সঙ্গে লইয়াই আল্লার একত্ব ঘোষণা করিতে হইবে। এবং অংশ বাদ দিলে আল্লার একত্ব অসম্পূর্ণ থাকে। কাজেই এ অংশ আমাদের বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ। কেমন করিয়া, তাহা বলিতেছি :

শুধু আল্লার একত্ব স্বীকার করিলেই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। তৌহিদের পক্ষে উহা নিরাপদও নয়। 'আল্লাকে মানি' বলিলেই প্রশ্ন জাগে : সে আল্লার স্বরূপ কী ? সে আল্লাহ্‌ কি এক ও লা-শরীক ? সে আল্লাহ্‌ কি দুই-এ মিলিয়া এক ? না কি তিনে মিলিয়া এক ? অথবা তিনি বহু ? আবার এরূপও প্রশ্ন জাগিবে, সে আল্লাহ্‌ পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ ? তাঁহার কি স্ত্রী-পুত্রাদি আছে ? সে কি কাহারও ঔরসজাত ? অথবা সে কি কাহারও জন্মদাতা ? পক্ষান্তরে, মুখে শুধু আল্লাকে বিশ্বাস করিলেও চলে না ; তোমার জীবনে সে বিশ্বাসকে কতটুকু তুমি রূপ দাও ? জীবন ও জগতকে তুমি কী চোখে দেখ ?—ইত্যাদি প্রশ্নও অনিবার্য হইয়া উঠে। এসব প্রশ্ন হয়ত জাগিত না ; কিন্তু মানুষের কারসাজির ফলেই জাগে। আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে নানা জাতি নানা ধারণা করিয়া বসিয়া আছে। পারসিকেরা মনে করে দুইজন আল্লাহ্‌ আছে : একজন মঙ্গলের আল্লাহ্‌, একজন অমঙ্গলের আল্লাহ্‌। খৃষ্টানেরা মনে করে, আল্লাহ্‌ তিন জন : God the Father, God the Holy Ghost এবং God the Son ; God-এর আবার স্ত্রী-লিঙ্গ (Goddess) আছে ; বহুবচন (Gods)-ও আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে নানা ধারণা বিদ্যমান। শুধু ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরীও আছে : ব্রহ্মার পুত্র-কন্যা আছে ; ভগবানেরও ভগবতী আছে, আবার বৈদান্তিক হিন্দুদের কাছে প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মের অংশ। অসংখ্য ঈশ্বরকে মিলাইয়া সেখানে এককে (অদ্বৈতবাদ) কল্পনা করা হইয়াছে। কাজেই, ঈশ্বর মানি বা God মানি বলিলেই তৌহিদ বা একত্ববাদ মানা যায় না। কিরূপ আল্লাকে মানো এবং কেমনভাবে মানো—সে প্রশ্নেরও জবাব দিতে হয়।

আল্লার দিক দিয়াও বিপদ কম নয়! মানুষের কারসাজিতে জগতময় মেকী আল্লার বাজার বসিয়াছে। 'আমাকে মানো' বলিয়া তাই আর তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি দেখেন, মানিতে গিয়া লোকেরা তাঁহাকে একদম বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহার যেরূপ খুশি সেই রূপেই সে তাঁহার মূর্তি গড়িয়া জগতের হাটে বিকিকিনি করিতেছে।

প্রত্যেকের দোকানেই আল্লাহ্ পাওয়া যায়; প্রত্যেকেই বলে: আমার আল্লাই খাঁটি, বাদ বাকী সব নকল। আল্লাহ্ তাই বাধ্য হইয়াই নিজের অকৃত্রিমতা রক্ষা করিবার জন্য আপন নামের শেষে একটি সিলমোহর মারিয়া দিয়াছেন। ঠিক যেন একটি ট্রেড-মার্ক। সেই সিল-মোহরটি কী? সেটি হইতেছে মুহম্মদের নাম—সেটি হইতেছে 'মুহম্মদর রসূলুল্লাহ্'। বাজারে শত শত মেকী আল্লাহ্ বাহির হওয়ায় আল্লাহ্ তাই ব্যবসায়ের ভঙ্গিতেই মুহম্মদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন: মুহম্মদ হইতেছে 'খাতামান্নবী'* অর্থাৎ নবীদের মধ্যে তিনি (আমার) সিলমোহর বা ট্রেড-মার্ক। তিনি তাই সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন: সত্য বা খাঁটি আল্লাকে যদি চাও, তবে মুহম্মদের সিল-দেওয়া আল্লাকে কিনিও, নতুবা ঠকিবে। এই জন্যই আমাদের মূল কলেমা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, মুহম্মদ-মার্কা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নাই।

এ কথার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য এই যে আল্লাকে যদি পাইতে চাও, তবে মুহম্মদের কাছে যাও, তাঁহার তরিকা ও নির্দেশ মত চল, তবেই আল্লাকে পাইবে। কাজেই 'মুহম্মদ-রসূলুল্লাহ'—আমাদের মূল-কলেমার অপরিহার্য অংশ। ইহাকে বাদ দিলে চলে না।

অতএব, এ কথা এখন আমরা বলিতে পারি যে, মুহম্মদের মধ্য দিয়া আমরা আল্লাকে চিনিলাম, নিজেকেও চিনিলাম, জীবন ও জগতকেও চিনিলাম।

তাহা হইলে আমাদের সিদ্ধান্ত হইল এই যে, মুহম্মদই আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারী, তিনিই আল্লার সত্য পূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন এবং এই কারণেই তাঁহার 'আহ্‌মদ' নাম সার্থক হইয়াছে।

এইখানেই যবনিকা টানি।

এই বিশ্বের নরনারী! এস হিন্দু, এস খৃষ্টান, এস বৌদ্ধ, এস নিগ্রো! এস আজ হাতে হাত রাখি আর সেই বিশ্বমানুষের চিরন্তন আদর্শ বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি-অসাল্লামের জয়গান করি:

ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা
সালাবা তুল্লাহ্ আলাইকা॥...

* 'ওয়ালাকির—রসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান-নবীইন্'—(৩৩:৪০)

তুমি যে নূরেরি রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি ॥…
চাঁদ-সুরুয্‌ আকাশে আসে
সে-আলোয় হৃদয় না হাসে
এলে তাই হে নব রবি
মানবের মনের আকাশে ॥…
তোমারি নূরের আলোকে
জাগরণ এল ভূলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল
হাসিল কুসুম পুলকে ॥…
নবী না হ'য়ে দুনিয়ার
না হয়ে ফিরিশ্‌তা খোদার
হ'য়েছি উম্মত তোমার
তার তরে শোকর হাজার বার ॥…

শুভম

প্রমাণপঞ্জী

১। The Holy Quarn by Moulana Mohammad Ali

২। মিশকাতুল-মুসাবিহ্—(Al-Hadis) by F. Karim

৩। বোখারী শরীফ

৪। তফসীরে হাক্কানী

৫। তফসীরে কাশ্ শাফ্

৬। The Ideal Prophet by Khawja Kamal Uddin

৭। The Prophet of the Desert—K. L. Gauba

৮। Life of Muhammad by Sir William Muir

৯। Life of Muhammad by W. Irving

১০। The Decline and fall of the Roman Empire—Gibon

১১। সীরাৎ-উন্-নবী (উর্দু) by Moulana Shibli Nomani

১২। মোস্তফা-চরিত by Moulana Md. Akram Khan

১৩। Muhammad by Margoliouth

১৪। Muhammad by Moulana Muhammad Ali

১৫। Essays on Mohammad & Islam by Sir Syed Ahmed

১৬। ইবনে-হিশাম—(আরবী গ্রন্থ)

১৭। মা'রেজুন-নবুয়ত

১৮। মাদারেজুন্-নবুয়ত

১৯। আসাহোস্-সীয়ার (উর্দু)—Moulana A. Rouf Danapuri

২০। Muhammad by Golam Sarwar

২১। Spirit of Islam by Syed Amir Ali

২২। The Religion of Islam by Moulana Muhammad Ali

২৩। Prophet in the World Scriptures by A. Huq Vidhyarthi

২৪। Mujaddid's Conception of Towhid by Dr. Faruqi

২৫। Islam and the Divine Comedy by Miguel Asin

২৬। History of Philosophy in Islam

২৭। The Philosophy of the Fakirs—Sir Ahmed Hossain

২৮। Mystical Elements in Muhammad by John Clerk Archer

২৯। Arabia by Sardar Iqbal Ali Shah

৩০। Mecca by C. Snouck Hurgronje

৩১। The Mysterious Universe by Sir James Jeans

৩২। The Universe Around Us by Sir James Jeans

৩৩। The New Background of Science by Sir James Jeans

৩৪। Bases of Modern Science by J. W. Sullivan

৩৫। The Expanding Universe by Edington

৩৬। The Nature of the Physical World by Edington

৩৭। Science and the Modern World—A. N. Whitehead

৩৮। Limitations of Science by J. W. N. Sullivan

৩৯। The Theory of Relativity—Albert Einstein

৪০। The ABC of Relativity by Bertrand Russel

৪১। Easy Lessons in Einstein by E. Slosson

৪২। Evidence for the Supernatural by Ivor L. Tuckett

৪৩। The Bible

৪৪। বেদবাণী by Charu Chandra Banerjee

৪৫। উপনিষদ গ্রন্থাবলী—উদ্বোধন কার্যালয়

৪৬। Indian Philosophy by Sir Radhakrishnan

৪৭। The Six Systems of Indian Philosphy by Max Muller

৪৮। গীতায় ঈশ্বরবাদ by Hirendra Nath Dutta

৪৯। হিন্দুদর্শন ও খৃষ্টিয় দর্শন by Paramananda

৫০। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা by Anilbaran Roy

৫১। Encyclopaedia Britannica

৫২। Zend Avesta (English Translation) by Max Muller

৫৩। Man and his Bodies by Annie Besant

৫৪। The Status of Women in Ancient India by Prof. Indra

৫৫। Manu Samhita

৫৬। One, Two, Three···Infinty by Gamow

৫৭। New Handbook of the Heavens
by Bernard-Bennett-Rice

৫৮। The Growth of Physical Science by Sir James Jeans

৫৯। The Exploration of Space by Arthur C. Clarke

৬০। Space Travel by Harold Leland Goodwin

৬১। Flighi into Space by J. N. Leonard

৬২। Man on the Moon by Von Braun and Whipple

৬৩। সীরাতে-রসূলুল্লাহ্—ইবনে-ইস্‌হাক (ইংরাজী অনুবাদ)

'বিশ্বনবী' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত :

ফুরফুরা শরীফের পীরসাহেব-কেবলা জনাব মওলানা আবুনসর মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব :—"কবি মৌলভী গোলাম মোস্তফা সাহেবের লিখিত হুজুরের (দঃ) জীবনী 'বিশ্বনবী' পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। উহার ভাব, ভাষা ও দার্শনিকতা কুরআন ও হাদিছ শরীফ এবং তাছাউফের সম্পূর্ণ অনুকূল ও ছুন্নাতুল-জামায়াতের আকায়েদ মোয়াফেক। যাঁহারা বাংলা ভাষায় হযরত রছুলে করিমের (দঃ) সঠিক জীবনী ও সত্যস্বরূপ জানিতে চান, তাঁহাদিগকে 'বিশ্বনবী' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম-এ, ডি-লিট :—"মৌলভী গোলাম মোস্তফা কবিরূপে সুপরিচিত। তাঁহার নব অবদান 'বিশ্বনবী'। বলা বাহুল্য, ইহা বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের (দঃ) একটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী জীবন-চরিত। এই গ্রন্থ-রচনায় গ্রন্থকার আঁ-হযরত সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘকালের গভীর চিন্তা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকখানিতে গোলাম মোস্তফা সাহেবকে একজন মোস্তফাভক্ত দার্শনিক ও ভাবুকরূপে পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষা, তথ্য ও দার্শনিকতার দিক হইতে গ্রন্থখানি অতুলনীয় হইয়াছে।"...

মৌলভী আবদুল মওদুদ, এম-এ, বি-এল :—"এ কী সওগাত আপনি বাংলার মুসলিমকে পরিবেশন করেছেন।...আপনার 'বিশ্বনবী' বাংলা ভাষায় লেখা হযরতের জীবনীসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করবে। আপনি কবি, আপনি রসস্রষ্টা—সে-সবের উপরেও আপনি একজন মুক্তমনা, ভাবুক ও ভক্ত। 'বিশ্বনবী'র পাতায় পাতায় আপনার ভক্তিরাশি গৈরিক ধারায় স্বতঃই উৎসারিত হয়েছে; যিনি সে ভাবধারায় বিগলিত না হবেন, মানুষ নামে পরিচিত হবার স্পর্দ্ধা তার থাকবে না।"

কবি শেখ হবিবর রহমান :—"সম্প্রতি আমার 'বিশ্বনবী' গ্রন্থখানি পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছে। গ্রন্থখানি পড়িয়াছি বলিলে ঠিক বলা হইবে না, দর্শন-বিজ্ঞানের অকাট্য যুক্তিসম্বলিত ইহার প্রত্যেক আলোচনা ও মীমাংসা, প্রত্যেক উচ্ছ্বাস, কবিত্বপূর্ণ ভাষার অতুলনীয় চমক, সমস্তই আমার অন্তরে অন্তরে গাঁথিয়া লইয়াছি।...লেখক লিখিয়াছেন : 'ইহাকে আমি আমার জীবনের চরম সঞ্চয় ও পরম সম্পদ বলিয়া মনে করি।' লেখকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমিও নিঃসন্দেহে বলিতেছি : ইহা শুধু তাঁহার নয়—সমগ্র জাতিরই অতুলনীয় সম্পদ ও

সঞ্চয়। শুধু মুসলমানের জন্য নয়, শুধু বাংলা-ভাষীদের জন্য নয়, তেমন ভাবে প্রচারিত হইতে পারিলে 'বিশ্বনবী' বিশ্বমানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গণ্য হইবে—ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কবি গোলাম মোস্তফা ছন্দের যাদুকর কবি। তাঁহার যে-ছন্দ এতদিন অপূর্ব ঝঙ্কারে বাঙ্গালী-হৃদয় মুগ্ধ করিতেছিল, আজ 'বিশ্বনবী'তে তাই গদ্যের মধ্যে মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অমৃতনিঃস্যন্দিনী কবির লেখনী গদ্য সাহিত্যকেও কেমনভাবে মধুর করিয়া তুলিতে পারে, 'বিশ্বনবী' তাহার এক সুন্দর নিদর্শন।"...

মৌলভী মুহম্মদ এস্‌হাক: "বিশ্বের নবী মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র জীবনকে আপনি দেখিয়াছেন কবির চোখ দিয়া, অনুভব করিয়াছেন অন্তরের অতল স্পর্শ দিয়া, তাই এত সুন্দর হইয়াছে আপনার বিশ্বনবী।...

সাহিত্যের দিক দিয়া ইহা হইয়াছে যেমন অভাবনীয়, তেমনি অতুলনীয়। এমন সরল ও আবেগময়ী ভাষা আর কোনদিন পড়ি নাই।"

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু:—"আপনার 'বিশ্বনবী' পড়লাম। অপূর্ব! জাতির একটা বড় কাজ করলেন আপনি।

মহামানুষেরা সর্বকাল ও সর্বদেশের সম্পত্তি। ভক্তির অন্ধ আবেগ অনেক সময়েই নিখিল নরনারীর নিকট থেকে এঁদের আড়াল করে রাখতে চায়। কিন্তু মহানবীর পরমাশ্চর্য বৃত্তান্ত লিখবার সময় আপনার কবিধর্ম সর্বদা আপনাকে গণ্ডী-সংকীর্ণতার উর্ধ্বে রেখেছে। আমি ও আমার মত আরও অনেকে ধর্মে মুসলমান না হয়েও হযরতকে একান্ত আপনার বলে অনুভব করতে পারলাম। মহানবীর কাছে পৌছবার এই সেতু-রচনা আপনার অতুলনীয় সাহিত্য-কীর্তি।

ভাষা কবিত্ব-ঝঙ্কার ও ভাবলালিত্যে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে। এই অনন্য অবদানের জন্য সাহিত্যসেবী হিসাবে আপনি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"

মৌলভী সৈয়দ আফতাব হোসেন:—"হযরতের জীবনকে দেখিয়াছেন আপনি এক নূতন সৌন্দর্যানুভূতি চোখে লইয়া, তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছেন এক সম্পূর্ণ অভিনব বেশে। মরু-দুলাল আজ শত সুষমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে বাংলার শান্ত-শীতল বুকে।"...